গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ এবং বাংলাদেশের পদাবলি কীর্তন

(The Nature of Gauriya Bhaishnabha Philosophy and Padabali Kirtan of Bangladesh)

অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ ২০২৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬০০০; ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৭২২২
ই-মেইল : bengali@du.ac.bd

Department of Bengali
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Call : 9661900-73/6000; Fax : 880-2-9667222
E-mail : bengali@du.ac.bd

তারিখ : ২৮ মার্চ ২০২৪

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের পিএইচডি গবেষক অলোক কুমার চ ত্রব কর্তৃক পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ এবং বাংলাদেশের পদাবলি কীর্তন (The Nature of Gauriya Bhaishnabha Philosophy and Padabali Kirtan of Bangladesh)* শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রণীত। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রিপ্রাপ্তি কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভ আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি। আমি আরও প্রত্যয়ন করছি যে, এ-অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism (কুম্ভিলবৃত্তি) নেই।

২৮/০৩/২০২৪

ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন (গিয়াস শামীম)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের প্রয়োজনে উপস্থাপিত *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ এবং বাংলাদেশের পদাবলি কীর্তন (The nature of Gauriya Bhaishnabha Philosophy and Padabali Kirtan of Bangladesh)* শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের (গিয়াস শামীম) তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনোপ্রকার ডিগ্রির জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এই অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষও উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, এই অভিসন্দর্ভে কোনোপ্রকার Plagiarism (কুম্ভিলবৃত্তি) নেই।

অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী

(অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী)
পিএইচডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০৬
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯ - ২০২০
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

প্রসঙ্গকথা

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায়ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন পরিচয় **১ - ১৪**

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ভক্তিধর্ম ও বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রয় **১৫ - ১২৩**

১ম পরিচ্ছেদ : প্রাক-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ

২য় পরিচ্ছেদ : চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ

৩য় পরিচ্ছেদ : চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ

৪র্থ পরিচ্ছেদ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রতিষ্ঠায় বৃন্দাবন ও গোস্বামীগণের ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায় : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ **১২৪ - ১৬৭**

১ম পরিচ্ছেদ : ভক্তিধর্মের তাৎপর্য ও তার উপযোগিতা

২য় পরিচ্ছেদ : শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

৩য় পরিচ্ছেদ : বৈষ্ণব পদাবলি বিকাশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের রসতত্ত্বের ভূমিকা (চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগ)

চতুর্থ অধ্যায় : কীর্তনের উৎস ও অর্থ-তাৎপর্য **১৬৮ -৩২৩**

১ম পরিচ্ছেদ : কীর্তনের শ্রেণি

২য় পরিচ্ছেদ : বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের রসময়তা

৩য় পরিচ্ছেদ : অষ্টকালীয় নিত্যলীলা ও অন্যান্য পালার পরিচয়

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পদাবলি কীর্তনচর্চা ও তার বৈশিষ্ট্য **৩২৪ - ৩৭১**

উপসংহার : **৩৭২ - ৩৭৪**

গ্রন্থপঞ্জি : **৩৭৫ -৩৮১**

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের (গিয়াস শামীম) তত্ত্বাবধানে *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ এবং বাংলাদেশের পদাবলি কীর্তন* শীর্ষক পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন হয়েছে।অভিসন্দর্ভ রচনায় নিরন্তর তাগিদ, সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শদানে তিনি আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং আমার গবেষণাকর্মকে করেছেন ত্বরান্বিত। তাঁর স্নেহ-ঋণ অপরিশোধ্য।

আমার স্বর্গত দাদু শ্রীঅনিলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল –উচ্চশিক্ষান্তরে আমি যেন বৈষ্ণবদর্শন ও পদাবলি কীর্তনের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে গবেষণা করি। তাঁর পদপ্রান্তে বসে বাল্যবেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-সম্পর্কিত পাঠ গ্রহণ করেছিলাম। গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি তাঁর ইচ্ছারই প্রতিফলন। গবেষণার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নিয়ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন আমার বাবা শ্রীঅশোক কুমার চক্রবর্ত্তী। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট পদাবলি কীর্তন শিল্পী এবং ভক্তিতত্ত্ববিদ। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দুর্লভ গ্রন্থের সন্ধান এবং কীর্তনের বিভিন্ন আঙ্গিকের বিষয়ে নানান তথ্য দিয়েছেন। তাঁর চরণতলে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাকে নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ কাদেরী, ড. উপল তালুকদার,ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর গাজী মাহবুব মুর্শিদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর অনিরুদ্ধ কাহালি, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মীর হুমায়ুন কবীর, বাংলাদেশের বিশিষ্ট পদাবলি কীর্তনীয়া গোপেশ মোহন্ত, বেণীমাধব ব্রহ্মচারী, মিহিরকান্তি ঘোষ, উত্তম কুমার সাহা উল্লেখযোগ্য। অভিসন্দর্ভ রচনায় আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. ফজলুর রহমান। এ জন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বৃন্দাবনের রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দিরের অধ্যক্ষ ড. কাশীনাথ ব্রহ্মচারী; গৌড়ীয় মঠ, মায়াপুর-এর কাশীনাথ সাহা; ইসকন, বাংলাদেশের প্রখ্যাত কীর্তনীয়া (সম্প্রতি প্রয়াত) কৃষ্ণকীর্তনদাস ব্রহ্মচারী, এছাড়াও ভারতের বৃন্দাবন, মথুরা, পুরী, নবদ্বীপ, মায়াপুর, একচক্রাধাম, শান্তিপুর; বাংলাদেশের গৌরাঙ্গবাড়ি, তমালতলী (খেতুরী, রাজশাহী), পাঠবাড়ী আশ্রম (বেনাপোল, যশোর), শ্রীহট্ট (ঢাকা দক্ষিণ, সিলেট) প্রভৃতি জায়গায় নানান বৈষ্ণবের সান্নিধ্য ও পরামর্শকে আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করার জন্য সিল্‌ভেস্টার পঙ্কজ গমেজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজের আমার অগ্রজ মোঃ আখতারুজ্জামান ; তাঁর স্নেহ-সাহচর্য ও ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া এই অভিসন্দর্ভের কাজ সম্পন্ন করা দুরূহ ছিল। তার স্নেহ-ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

সহধর্মিণী তনা ভট্টাচার্য রিংকু সংসারের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত না করলে অভিসন্দর্ভ রচনার মতো দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজটি হয়তো শেষাবধি অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। অরুণদ্যুতি চক্রবর্তী অথই এবং অরুণাভ চক্রবর্তী অভ্র– আমার পুত্র-কন্যার নন্দিত মুখচ্ছবি আমাকে দিয়েছে প্রেরণা, আমার প্রত্যেকটি মুহূর্তকে করেছে আনন্দঘন ও উপভোগ্য। তাদেরকে আমার প্রীতিস্নিগ্ধ শুভেচ্ছা।

Dhaka University Institutional Repository

পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভের সার-সংক্ষেপ

গবেষক : অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০৬, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অভিসন্দর্ভের বিষয় : *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ এবং বাংলাদেশের পদাবলি কীর্তন (The Nature of Gauriya Bhaishnabha Philosophy and Padabali Kirtan of Bangladesh)*

গবেষণার সার-সংক্ষেপ

প্রাচীনকাল থেকে বৈষ্ণবধর্মমতের পীঠস্থান ছিল বাংলাদেশ। মধ্যযুগের পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন যুগমানব চৈতন্যদেব। ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় ও 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্বের প্রসারে তিনি রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁরই সৌজন্যে গড়ে উঠেছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন। এই দর্শনের স্বরূপ এবং বাংলাদেশে পদাবলি কীর্তনের বিদ্যমান বাস্তবতা অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ এবং বাংলাদেশের পদাবলি কীর্তন' শীর্ষক পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ।

অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন পরিচয়'। এই অধ্যায়ে বৌদ্ধ-দর্শন, জৈন-দর্শন, সাংখ্য-দর্শন, পতঞ্জল-দর্শন, বৈশেষিক দর্শন, পূর্ব মীমাংসা, বেদান্ত-দর্শন এবং আচার্য শঙ্করের 'কেবলাদ্বৈতবাদ'; রামানুজাচর্যের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'; মধ্বাচার্যের' কেবলভেদবাদ'; নিম্বাকাচার্যের 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'; বল্লভাচার্যের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'; ভাস্করাচার্যের 'ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ' উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূল তত্ত্ব 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র তাত্ত্বিক দিক ও উপযোগিতা এবং বৈষ্ণবধর্মে তার অবস্থান সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ভক্তিধর্ম ও বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রয়'। এই অধ্যায়টি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ 'প্রাক-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ'। এই পরিচ্ছেদে প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ, বিষ্ণু-নারায়ণের প্রভাব, ভক্তির প্রতিষ্ঠা, পদাবলি সাহিত্যের যাত্রা বিষয়ে অনুসন্ধানী মূল্যায়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ'। প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবধর্মের বিবর্তিত রূপ চিহ্নিতকরণ, চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং নতুন আঙ্গিকে ধর্মের উন্মেষ, ভাব-ভক্তি আন্দোলনের স্বরূপ, এই যুগের বৈষ্ণব পদাবলি ও তার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'চৈতন্যোত্তরযুগের বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ'। এই পরিচ্ছেদে বৈষ্ণবধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ, বৈষ্ণব তত্ত্বের বিন্যাস, ভক্তিতত্ত্বের প্রায়োগিক দিক এবং বৈষ্ণবধর্মে তার উপযোগিতা-বিষয়ে অনুসন্ধানী মূল্যায়ন করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রতিষ্ঠায় বৃন্দাবন ও গোস্বামীগণের ভূমিকা' শিরোনামে গৌড়ীয় দর্শন প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী, তাঁদের গ্রন্থ ও ভূমিকা বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ'। এ-অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদ যথাক্রমে : 'ভক্তিধর্মের তাৎপর্য ও তার উপযোগিতা', 'শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব দর্শন', 'বৈষ্ণব পদাবলি বিকাশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্বের ভূমিকা' (চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তরযুগ)। এই পরিচ্ছেদসমূহে চৈতন্যদেবের ভক্তি-আন্দোলন, সাধন ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ এবং বৈষ্ণব পদাবলিতে নানান তত্ত্বের দর্শন-নির্ভর অনুসন্ধান করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়' কীর্তনের উৎস ও অর্থ-তাৎপর্য'। এই অধ্যায়টি তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্তঃ 'কীর্তনের শ্রেণি', 'বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের রসময়তা', এবং 'অষ্টকালীয় নিত্যলীলা ও অন্যান্য পালার পরিচয়'। পরিচ্ছেদগুলোতে কীর্তনের শ্রেণি-নির্ণয় ও তার স্বতন্ত্র পরিচয়, রসতত্ত্বে বৈষ্ণব পদাবলির উপযোগিতা, ভক্তিকে রসমর্যাদায় স্থাপন,

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত লীলার বাইরেও অন্যান্য লীলা রস-তাৎপর্যে মৌলিক লীলায় স্থাপনে প্রমাণ সাপেক্ষে অনুসন্ধানী মূল্যায়ন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পদাবলি কীর্তনচর্চা ও তার বৈশিষ্ট্য'। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের পদাবলি কীর্তনের ক্রমবিকাশের ধারা, পদাবলি কীর্তনচর্চা বিষয়ে অঞ্চলভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং ভৌগোলিক পরিবেশের নিরিখে তথ্য যাচাইপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু, প্রয়োগ এবং কাঠামোভিত্তিক ফলাফল মাঠপর্যায়ে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের সাক্ষাৎকার ও জরিপের ফলাফল সারণি ও ম্যাপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহার অংশে বর্ণিত হয়েছে অভিসন্দর্ভের পাঁচটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত বক্তব্যের সারাৎসার। সর্বশেষে প্রদর্শিত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

নানা প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে বৈষ্ণবধর্মমত বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। প্রচলিত এই ধর্মমতের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগের পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ যুগমানব চৈতন্যদেব। তিনি মানবিকতা, উদারতা ও সমন্বয় – এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসী ছিলেন। 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্বের প্রসারে তিনি রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। চৈতন্যযুগ ও চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বৈষ্ণব পদাবলি। চৈতন্যযুগে চৈতন্যদেবের আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং চৈতন্যোত্তর যুগে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী কর্তৃক যে বৈষ্ণবতত্ত্ব – তা প্রচারিত হয়েছিল বৈষ্ণব পদাবলিতে। পদাবলির মধ্যে রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব পদাবলি এক ভিন্ন মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণলীলা এবং নবদ্বীপ-নীলাচলের গৌরাঙ্গ লীলা – এই দুই লীলার বিপুলায়তনের মধ্যেই গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবলির নিজস্ব ভুবন। কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও মধুর লীলার আস্বাদনে যে তত্ত্বের প্রয়োজন হয়, তারই সৌজন্যে গড়ে উঠেছিল রসতত্ত্বে 'ভক্তিরস' এবং লীলার ধর্মবিস্তারে দর্শনতত্ত্ব; যা পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন নামে অভিহিত হয়। এই দর্শনের স্বরূপ এবং বাংলাদেশে পদাবলি কীর্তনের বিদ্যমান বাস্তবতা অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ এবং বাংলাদেশের পদাবলি কীর্তন' শীর্ষক পিইচডি অভিসন্দর্ভ।

অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন পরিচয়'। এই অধ্যায়ে পূর্বাপর দার্শনিক মত যেমন, বৌদ্ধ-দর্শন, জৈন-দর্শন, সাংখ্য-দর্শন, পতঞ্জল-দর্শন, বৈশেষিক দর্শন, পূর্ব মীমাংসা, বেদান্ত-দর্শন এবং আচার্য শঙ্করের 'কেবলাদ্বৈতবাদ'; রামানুজাচর্যের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'; মধ্বাচার্যের 'কেবলভেদবাদ'; নিম্বাকাচার্যের 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'; বল্লভাচার্যের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'; ভাস্করাচার্যের 'ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ' উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূল তত্ত্ব 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র তাত্ত্বিক দিক ও উপযোগিতা এবং বৈষ্ণবধর্মে তার অবস্থান সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ভক্তিধর্ম ও বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রয়'। এই অধ্যায়টি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদ 'প্রাক-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ'। এই পরিচ্ছেদে প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ, বিষ্ণু-নারায়ণের প্রভাব, ভক্তির প্রতিষ্ঠা, পদাবলি সাহিত্যের যাত্রা বিষয়ে অনুসন্ধানী মূল্যায়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ'। প্রাক-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবধর্মের বিবর্তিত রূপ চিহ্নিতকরণ, চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং নতুন আঙ্গিকে ধর্মের উন্মেষ, ভাব-ভক্তি আন্দোলনের স্বরূপ, এই যুগের বৈষ্ণব পদাবলি ও তার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ'। এই পরিচ্ছেদে বৈষ্ণব ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ, বৈষ্ণব তত্ত্বের বিন্যাস, ভক্তিতত্ত্বের প্রায়োগিক দিক এবং বৈষ্ণবধর্মে তার উপযোগিতা-বিষয়ে অনুসন্ধানী মূল্যায়ন করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রতিষ্ঠায় বৃন্দাবন ও গোস্বামীগণের ভূমিকা' শিরোনামে গৌড়ীয় দর্শন প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী, তাঁদের গ্রন্থ ও ভূমিকা বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ'। এ-অধ্যায়ের তিনটি পরিচ্ছেদ যথাক্রমে : 'ভক্তি ধর্মের তাৎপর্য ও তার উপযোগিতা', 'শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব দর্শন', 'বৈষ্ণব পদাবলি বিকাশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসতেত্ত্বের ভূমিকা' (চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগ)। এই পরিচ্ছেদসমূহে চৈতন্যদেবের ভক্তি-আন্দোলন, সাধন ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ এবং বৈষ্ণব পদাবলিতে নানান তত্ত্বের দর্শন-নির্ভর অনুসন্ধান করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় 'কীর্তনের উৎস ও অর্থ-তাৎপর্য'। এই অধ্যায়টি তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্তঃ 'কীর্তনের শ্রেণি', 'বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের রসময়তা', এবং 'অষ্টকালীয় নিত্যলীলা ও অন্যান্য পালার পরিচয়'। পরিচ্ছেদগুলোতে কীর্তনের শ্রেণি-নির্ণয় ও তার স্বতন্ত্র পরিচয়, রসতত্ত্বে বৈষ্ণব পদাবলির উপযোগিতা, ভক্তিকে রসমর্যাদায় স্থাপন, প্রতিষ্ঠিত লীলার বাইরেও অন্যান্য লীলা রস-তাৎপর্যে মৌলিক লীলায় স্থাপনে প্রমাণ সাপেক্ষে অনুসন্ধানী মূল্যায়ন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পদাবলি কীর্তনচর্চা ও তার বৈশিষ্ট্য'। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের পদাবলি কীর্তনের ক্রমবিকাশের ধারা, পদাবলি কীর্তনচর্চা বিষয়ে অঞ্চলভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং ভৌগোলিক পরিবেশের নিরিখে তথ্য যাচাইপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু, প্রয়োগ এবং কাঠামোভিত্তিক ফলাফল মাঠ পর্যায়ে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের সাক্ষাৎকার ও জরিপের ফলাফল সারণি ও ম্যাপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহার অংশে বর্ণিত হয়েছে অভিসন্দর্ভের পাঁচটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত বক্তব্যের সারাৎসার।

সর্বশেষে প্রদর্শিত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিচয়

আবহমানকালের অভিজ্ঞতাসূত্রে মানুষের মনে এই বিশ্বলোক সম্বন্ধে যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হচ্ছে – এই বিশ্বলোক অসংখ্য নশ্বর বস্তুর সমষ্টি। এই ধারণা স্বভাবতই মানুষের মনকে পীড়িত ও চঞ্চল করে। মানুষের এই পীড়িত ও দ্বিধাগ্রস্ত মন সমস্ত দুঃখবোধকে কাটিয়ে উঠে একপর্যায়ে আনন্দকেই জীবনের সার বলে ভাবতে শুরু করে।ফলে মানুষ বহুকে ত্যাগ করে একের প্রতি, নশ্বরকে ত্যাগ করে অবিনশ্বর সত্তার প্রতি মনঃসংযোগ করেছে। এর মূলে রয়েছে আকাঙ্ক্ষি সত্তাকে কাছে পাবার চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা; আধার হিসেবে আধেয়স্বরূপ আনন্দকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি এবং চরমতম সাধ্যবস্তুর সন্ধান। *উপনিষদের* ঋষিবাক্য :

> অসতো মা সদ্গময়
> তমসো মা জ্যোর্তিগময়।
> মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়
> আবিরাবীর্ম এধি ॥
> অর্থাৎ, আমাকে নিয়ে চলো অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে। এই অনিত্য মৃত্যুময় জগৎ থেকে আমাকে শাশ্বত আনন্দের জগতে নিয়ে চলো। তোমার করুণার দীপ্তিতে আমার অন্তরাত্মা সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।[১]

এই সহজাত আকুতি দর্শনের ক্ষেত্রে পৃথক পথে বিকাশলাভ করেসৃষ্টি করেছে দুটি স্বতন্ত্র তত্ত্বের । তা হলো–

ক. তুলনামূলক সহজ পথে ইন্দ্রিয়জ্ঞানসম্ভূত বহু বিষয়কে প্রপঞ্চ বা মায়া বলে ব্যাখ্যা।

খ. বিশ্বের মৌলিক রূপকে একক চৈতন্যময় সত্ত্বা হিসেবে গ্রহণ করে তার আনন্দময় স্বরূপের ব্যাখ্যা।

ফলে প্রাচ্য ভূগোলে একদিকে যেমন মায়াবাদী ভাষ্য, দেহসর্বস্ব চার্বাক দর্শন, ক্ষণকাল স্থায়ীরূপ থেকে নির্বাণলাভ-তত্ত্ব, অন্যদিকে সংঘতীর্থ-রূপী জৈনদর্শন, নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন, পাতঞ্জলদর্শন বা যোগদর্শন, ন্যায়দর্শন, বৈশেষিক দর্শন, পূর্ব মীমাংসা বা জৈমিনিদর্শন, উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন, ব্রহ্মতত্ত্বময় বেদান্ত দর্শন, আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মতত্ত্ব, শ্রুতিপ্রস্থানের ব্রহ্মতত্ত্ব, স্মৃতি ও ন্যায় প্রস্থানের ব্রহ্মতত্ত্ব, বেদান্ত দর্শনে মোক্ষতত্ত্ব-সাধনতত্ত্ব, মায়াবাদী মতবাদ – ভারতীয় দর্শনকে শুধু তাত্ত্বিক দিক থেকেই নয়, স্বরূপ বিকাশে যুক্তি ও ভাব – এই অসম দুই জ্ঞানসত্তাকে সমান্তরালে নিয়ে চলেছে।

সুখলাভ এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধানে দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন ধারার জন্ম হলেও বিভিন্ন দার্শনিক প্রসঙ্গসূত্রে নানান বিষয়ের অবতারণা করেছেন। অবশ্য এর যৌক্তিক কারণও রয়েছে। কোনো একটি তত্ত্ব বুঝতে হলে যেমন প্রচলিত ধারাটি জানাও বোঝার আবশ্যকতা রয়েছে, তেমনি ঐ তত্ত্ব কীভাবে বিবর্তিত

Dhaka University Institutional Repository

১. গীতা প্রেস প্রকাশিত, *উপনিষদ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ,* শ্লোক নং ১/৩/২৮), গোরক্ষপুর, ভারত, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৪১১

হয়েছে তা উপলব্ধিরও প্রয়োজন রয়েছে। প্রাচ্যদর্শনের ইতিহাসে চার্বাক যেমন আমি বা জীবাত্মার কোনো অস্তিত্ব স্বীকার করেনি, তেমনি পুরুষার্থ বলতে অঙ্গাদির সঙ্গজনিত সুখকেই বিবেচনা করেছে। চার্বাকপন্থিরা ভোগের মধ্য দিয়ে স্থূল দেহনাশকেই মুক্তি বলে প্রচার করেছেন। পরকাল, পুনর্জন্ম ভিত্তিহীন বলে চার্বাক দর্শনে প্রতিভাত হয়েছে। অর্থাৎ, চার্বাক দর্শনের উপযুক্ত চারটি তত্ত্বই পরিণতিতে দেহবাদে এসে পর্যবসিত হয়েছে। প্রত্যক্ষই তাঁদের কাছে একমাত্র প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অতঃপর বৌদ্ধ দর্শনে এসে শূন্যকেই একমাত্রসত্যতত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ। শূন্য অস্তিত্ববিশিষ্ট ও অস্তিত্বশূন্য – দুটোই; সুতরাং এই শূন্য হতেই সবকিছুর উৎপত্তি এবং শূন্যেই লয় ঘটে। অর্থাৎ, জীব-জগৎ–এসব সত্য নয়। সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক এবং ক্ষণস্থায়ী; আত্মা বলে কোনো নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধ দর্শনে পঞ্চভূতের মধ্যে চারটি অর্থাৎ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ (পৃথিবী, জল, আগুন এবং বাতাস) এই চারটির বস্তুত্ব স্বীকার করা হয়। ব্যোম বা আকাশের কোনো বস্তুত্ব নেই বলে তা আলোচিত হয় না, কারণ আকাশ অভাববস্তু। বাহ্যবস্তুর উৎপত্তি চার পরমাণু –পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় দ্বারা এবং এই চার ভূত হতেই শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উৎপত্তি হয়। রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার স্কন্ধের মাধ্যমে আন্তর ব্যাপার নিষ্পন্ন করা হয়। বৌদ্ধ দর্শন মতে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবত্ব শেষ হয়ে যায় না। কর্ম এবং কর্মফল এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাসনা যতদিন, কর্ম ও কর্মফলও ততদিন। সুতরাং কর্ম-অনুসারেই পাঁচ ধরনের দেহপ্রাপ্তি হতে পারে, তা জন্মান্তর নয়। সংসার অনাদি হলেও তা অনন্ত নয়। বাসনার নিবৃত্তিতেই কর্মের নিবৃত্তি ঘটে এবং দুঃখের অবসানই হলো নির্বাণ। নির্বাণের মধ্যে দেহ নয়, শূন্যতাপ্রাপ্তিই মুখ্য বিষয়। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধদর্শন দশ বস্তুর অনুশীলনকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং দুঃখের নিবৃত্তি ঘটানোই এই দর্শনে জীবনের চরম উপলক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

জৈন দর্শন নয়টি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। নয়টি তত্ত্ব সমান গুরুত্ব বহন করলেও মোক্ষই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মোক্ষলাভ সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চারিত্র্য–এই ত্রিতত্ত্ব দ্বারা লাভ করা যায়। জৈনদর্শনে জীবন থেকে মুক্তি স্বীকৃত নয়। সুতরাং, এই দর্শনে মোক্ষ আর মুক্তির মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। তত্ত্বটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ নির্ভর এবং এখানে কর্ম ও তার বন্ধন অহেতুক ও অনাদি বলে বিবেচিত। এক্ষেত্রে মূল দার্শনিক উপলক্ষ্য হলো – জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি এবং এই দুঃখ-নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলা হয়েছে। মুক্ত জীবনে সুখানুভব সম্ভব নয়; সংসারেই দুঃখের সঙ্গে সুখের সহবস্থান। আনন্দের হেতু হিসেবে এই দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নয়; ফলে আনন্দ-আস্বাদক কোনো সহযোগী শক্তিও এখানে স্বীকৃত হয়নি। আত্মা দেহ-পরিমিত হয়েই অবস্থান করে, অর্থাৎ যখন যে দেহে থাকে সেই দেহের আকার প্রাপ্ত হয়েই কর্ম-সম্পাদন করে। মহর্ষি কপিলনিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনের মধ্য দিয়ে পঁচিশটি তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন – যেখানে ঈশ্বর স্বীকৃত নয়। যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই, তাই সৃষ্টিকর্তা বলে কোনো ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব নেই। প্রকৃতিই হচ্ছে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। তিনটি প্রমাণ – প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগমের উপর এই দর্শন প্রতিষ্ঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

সাংখ্য দর্শনের মূল লক্ষ্য দুঃখের নিবৃত্তি এবং এই নিবৃত্তিতেই অপার সুখ, তা নয়; কেবল যুক্তির দ্বারা প্রমাণসুখই মুখ্য সুখ।

পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্যদর্শনেরই নবরূপায়ণ; পার্থক্য এই যে, এই দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছে। মহর্ষি পতঞ্জলি এই দর্শনের প্রবর্তক এবং তিনি যোগকেই মোক্ষপ্রাপ্তির অন্যতম উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও স্থিতিতে অভ্যাস ও বৈরাগ্য, উপাসনা, প্রাণায়াম, ধারণা (অঙ্গজাত), হৃৎপদ্ম-ধারণা, নিষ্কাম অনুকৃত ধ্যান, সাত্ত্বিকবৃত্তির আশ্রয়, রুচি অনুযায়ী ধ্যান – এসব দ্বারা যোগাসিদ্ধ হওয়া যায়। মোক্ষের উপলক্ষ্য কৈবল্য অর্থাৎ, চৈতন্যরূপেই তার জীবের মধ্যে নিত্য অবস্থান এবং এই কৈবল্যেই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে থাকে। বৈশেষিক দর্শনে পূর্বাজিত কর্মের ফল বা অদৃষ্ট স্বীকৃত। এই ধারায় ঈশ্বরের স্পষ্ট ধারণা দৃশ্যমান হয় না। পূর্বাজিত কর্মের ফলেই জীবের জন্ম ও দুঃখভোগ। ঋষি কণাদ এই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ছয়টি পদার্থের (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়) সম্যক তত্ত্বজ্ঞান লাভের কথা বলেছেন। অর্থাৎ, উল্লিখিত ছয়টি পদার্থের অন্তর্নিহিত তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমেই জীবের অদৃষ্ট বিনষ্ট হতে পারে এবং সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ ঘটতে পারে। এখানেও দুঃখের নিবৃত্তিই মুক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

পূর্বমীমাংসা দর্শন বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঋষি জৈমিনি এর প্রতিষ্ঠাতা। এই দর্শন মতে, পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদি, তার কোনো ধ্বংস নেই। যেহেতু এই অনাদি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তারূপে একজন ঈশ্বর রয়েছেনতা স্বীকার করার তেমন প্রয়োজন নেই। পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই। কর্মই জীবের ফলদাতা। সুতরাং, কর্মফলদাতারূপে ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজন।

বেদান্ত দর্শন পূর্বাপর দর্শন থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম সত্য হিসেবে স্বীকৃত এবং তাঁর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভ অনিশ্চিত বা অসম্ভব নয়। পরম পুরুষার্থের বিষয়ও বেদান্ত দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেদান্ত দর্শন অনুযায়ী ব্রহ্ম শুধু আনন্দস্বরূপমাত্র নয়, তিনি আনন্দদাতাও। ফলে এই দর্শনে শ্রুতি-কথিত ব্রহ্মই মুখ্যতত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে এই দর্শনের সূত্রপাত এবং জিজ্ঞাসার উত্তরের মধ্যেই বেদান্ত দর্শনের প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মের পরিচয়ের মাধ্যমেই জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মোক্ষতত্ত্ব বিষয় হিসেবে গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। সাধনার করণকৌশলও এই দর্শনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই বেদান্ত দর্শনকে কেন্দ্র করেই আচার্য শঙ্করের মতবাদ এবং তার খণ্ডনের মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

ক. বেদান্ত দর্শন মূলত অপৌরুষেয় শ্রুতি এবং শ্রুতির অনুগত স্মৃতিশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত দর্শনে মুখ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্বের আনুষঙ্গিক হিসেবে সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব,মোক্ষতত্ত্ব, আলোচিত হয়েছে। এই ব্রহ্মতত্ত্বকে দার্শনিকগণ মুখ্যা ও অবিধাবৃত্তিতে স্বতঃপ্রমাণতায় মুখ্যার্থ এবং গৌণীবৃত্তিতে যুক্তির নিরিখে অর্থ নিরূপণ করে বিভিন্ন ভাষ্যে তার প্রমাণ তুলে ধরেছেন। রামানুচার্য, মধ্বাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, বল্লভাচার্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ, ভাস্করাচার্য, শঙ্করাচার্য প্রমুখ ব্রহ্মতত্ত্ববিদ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষ্য প্রদান করেছেন। তাঁদের ভাষ্যের কারণেই অষ্টম শতাব্দীকে ধর্মনৈতিক আদর্শের পরিপন্থী যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১]

Dhaka University Institutional Repository

১. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে বাঙ্গালা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৯৪

আচার্য শঙ্কর এই যুগে আবির্ভূত হয়ে 'কেবলাদ্বৈতবাদ' প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্বৈতবাদের প্রবল আলোড়নে সে-সময় সকল ধর্মীয় অভিমত পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছিল এবং আচার্যশঙ্কর তাঁর কলাকৈবল্যবাদের দ্বারা বৌদ্ধ মহাযান-মতকে বিচারে পরাস্ত করে ব্রহ্মতত্ত্বকে এক নতুন দার্শনিক ধারায় প্রবাহিত করান এবং তাঁর দর্শন-তত্ত্বে বৌদ্ধ শূন্যতাবাদ খণ্ডিত হয়। তিনি তাঁর তত্ত্বে দেখালেন – ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক, সর্বগুণবিবর্জিতএবং নিরাকার। তিনি জ্ঞানস্বরূপ কিন্তু জ্ঞাতা নন; তিনি আনন্দস্বরূপ এবং সকল আনন্দের উৎস, কিন্তু তিনি আনন্দময় নন; আনন্দসত্তা এবং চিৎসত্তামাত্র। ব্রহ্ম জগতের কর্তা নন। যিনি জগতের কর্তা তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর এবং নির্গুণ ব্রহ্ম মায়ার সংযোগে সগুণ ব্রহ্ম হন।[১]

এই তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন বৌদ্ধ শূন্যবাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্মাতিরিক্ত জগৎ ধারণামিথ্যারই নামান্তর। ব্রহ্মই একমাত্র স্বতঃপ্রণোদিত সদবস্তু যার ত্রিকালিক সৎ-তৎপরতা আছে। ফলে জীবও ব্রহ্ম। বস্তুত আচার্য শঙ্কর বেদান্ত দর্শনের 'শারীরিক ভাষ্য' প্রণয়নের মধ্য দিয়ে দার্শনিক চিন্তায় এক নতুন পথের সন্ধান দেন। তাঁর এই দার্শনিক ধারায় সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় 'একমেবদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব এবং তিনি অদ্বৈতবাদী দার্শনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি এক ব্রহ্মের অস্তিত্বের বাইরে সব কিছুকে অস্বীকার করেছেন। তিনি দেখিয়েছিলেন –

১. জগৎ এবং জীবই ব্রহ্মস্বরূপ।

২. এই জগতের সমস্ত হেতু এবং সমস্ত উপাদান ব্রহ্ম।

৩. ব্রহ্ম ব্যাতিরেকে জগতের আস্তিত্বের কল্পনা ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং, মিথ্যা ইন্দ্রজালময়।

৪. বাস্তব জগৎ মূলত মায়ার কল্পনা এবং তা অজ্ঞানতা। মায়া উপাধি ছাড়া ব্রহ্ম ও জীবে কোনো প্রভেদ নেই।

৫. জীবের মোক্ষলাভ মূলত জীবের ব্রহ্মকৈবল্যলাভ। অর্থাৎ, কৈবল্য লাভের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ, মায়া-বিষয়ক জ্ঞান এবং মোক্ষলাভ ঘটে।

৬. জ্ঞানই ব্রহ্ম। এছাড়া যাবতীয় বিষয়-সম্বন্ধীয় জ্ঞান অসৎ ও মূল্যহীন। শুদ্ধজ্ঞান নির্গুণ ও নির্বিশেষ।

৭. মায়া প্রভাবে শুদ্ধ জ্ঞানের স্তর স্তিমিত হয়, অসৎ বিষয়ে প্রবৃত্তির জন্ম হয় এবং এক ধরনের সদবুদ্ধিরও জন্ম হয়। ফলে, বস্তুজগৎ ও জীবজগৎকে আমাদের কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হয় এবং আমরা নির্বিশেষে তা অবধারণ করি।

৮. এই চরাচর বা সর্বজগৎই ব্রহ্মের বিবর্ত অর্থাৎ, যা স্বরূপকে আচ্ছাদন করে রাখে এবং অন্যথা বিশ্বাস উৎপাদন করে।

৯. যথার্থ জ্ঞানই বিদ্যা। যে-জ্ঞান নিরর্থক তা অবিদ্যা এবং মায়া-হেতু অবিদ্যার জন্ম; মায়া অনির্বাচ্য ভ্রান্তিবিদ্যা। আবরণ ও বিক্ষেপের মধ্যেই তার যাতায়াত। জগতে যে পৃথক পৃথক অনুভূতির জন্ম হয় তার কারণ, মায়া-প্রভাবে কার্য-ব্রহ্ম আবরণ সূত্রে ব্রহ্মকে সঠিক উপলব্ধি করা

যায় না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো–জীব ও জড় বিষয়ক যাবতীয় বিষয় অধ্যাসমূলক, নামোপাধিএবং অবিদ্যা-প্রভাবে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধির ক্রিয়ায় চালিত হয়, ফলে অস্তিত্বের অনুভবে পৃথকত্ব আসে।

১. শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-১*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৬০

১০. আচার্য শঙ্করের ভাষ্য অনুযায়ী, একই শুদ্ধ-চিৎ জগৎ-রূপে অনন্ত রূপায়ণে প্রতিভূত ভৌত দেহে উদাসীন সাক্ষী ভাবে অবস্থান করে। তাঁর সঙ্গে রূপ-সম্পর্কিত বিষয় বা বিষয় সম্পর্কিত ভোগের কোনো প্রকার সম্বন্ধ নেই। দেহকেন্দ্রিকতাই রূপের অনন্য বিষয়, ইন্দ্রিয়াদি মন ও নিবিষ্ট অন্তঃকরণ বস্তুত তার ভোক্তা ও পরিগ্রাহক।[১]

১১. অন্তর পরিশুদ্ধ ও নির্মল হলে শুদ্ধ চেতনা (চিৎরূপী ব্রহ্ম) প্রত্যক্ষ হয়। অবিদ্যার প্রভাব থাকলে তা আর সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বস্তুত উপাধির বিনাশের মধ্যেই অন্তঃচেতনায় মায়িক প্রতীতির বিনাশ ঘটে এবং ব্রহ্মস্বাদস্বরূপ বোধকের একান্ত প্রকাশের মধ্যে জ্ঞানের মুক্তি ঘটে। এই মুক্তির মধ্য দিয়েই জীব ব্রহ্মবিদ হয়েওঠে এবং ব্রহ্মেই পর্যবসিত হয় তার সমগ্র অস্তিত্ব।

আচার্য শঙ্করের ভাষ্য-অনুযায়ী মায়ার রহস্য এক স্বতন্ত্র সত্তা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর মতে, মায়া ব্রহ্মের শক্তি নয়, মায়া কেবল মিথ্যা সৃষ্টিকারী। শঙ্করাচার্য মায়াকে ব্রহ্ম হতে পৃথক বা অপৃথক কিছুই বলেননি। এর কারণ, মায়াকে ব্রহ্ম হতে পৃথক করলে তার অদ্বৈততত্ত্বের হানি হয়। আবার একত্র করলে মায়া যে জ্ঞান-বিনাশী একথা বলা যায় না।

তিনি দেখিয়েছেন, ব্রহ্মের সাথে মায়ার একান্ত সম্পর্ক বিরাজমান। সুতরাং সূত্রায়ণ করলে দাঁড়ায়, মায়া অনাদি, অনন্ত বিবর্তসূত্রে প্রকাশমান জীবের রক্ষিকা এবং জ্ঞান-নাশিনী। মায়ার আধার ও আধেয় ব্রহ্মময় হলেও, ব্রহ্ম মায়া দ্বারা স্পৃষ্ট নন। উপর্যুক্ত বিষয়ই শঙ্করাচার্যের মায়াবাদী ভাষ্যের সরল সূত্রায়ন, যা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর বিপরীতে কোনো মতবাদই তখন দাঁড়াতে পারেনি। শঙ্কর-ভাষ্যের নানান অসঙ্গতিও কেউ তুলে ধরতে পারেনি। এ-বিষয়ে একজন গবেষকের মন্তব্য :

> The application of the modern critical apparatus raises considerable doubts whether the monistic interpretation of the Brahma-Sutra by Sankaracharya is always loyal and faithful to the views preached in the text itself.[২]

আচার্য শঙ্করের আর একটি মত সেই সময় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা হলো– লৌকিক জ্ঞানভিত্তিক সংশয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান-প্রসঙ্গ। তিনি এ-বিষয়কে মিথ্যা না বলে প্রাতিভাসিক সত্য বলেছেন এবং এর দ্বারাই বা আশ্রয় গ্রহণে পরমার্থ লাভ হতে পারে বলে ধারণা পোষণ করেছেন। ব্রহ্ম যেহেতু নির্গুণ ও ধারণাতীত সত্য, সুতরাং সগুণ উপাসনাই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা; সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং সত্ত্ব, রজঃ, তম–এই তিনগুণেই তাঁর প্রকাশ।

উপর্যুক্ত তত্ত্ব ছাড়াও রামানুজাচার্য ও নিম্বার্কাচার্যের দার্শনিক তত্ত্ব জনমানসে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল, কিন্তু এ-সবতত্ত্বের, বিশেষভাবে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করার কেউ ছিল না অথবা

Dhaka University Institutional Repository

ভক্তিপথের যারা পথিক তারাও বিরোধমূলক কিছু বলেননি। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে আচার্য শঙ্করের ভাষ্যকে পূর্বপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে যুক্তি তর্কাশ্রয়ে ভক্তিবাদীরা সপক্ষে দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য

---

১. ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ*, সোনার তরী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১২৮

২. Dr. Surandranath Dasgupta, *The Cultural Heritage of India*, Voll-111, (?), 1953, PP-7.

ভক্তিগ্রন্থ-অন্বেষণ ও ভিন্নমত স্থাপন করার প্রয়াসী হন। এ-বিষয়ে প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন নাথমুনি, যমুনাচার্য প্রমুখ আলোয়ারপন্থী। আলোয়ার সম্প্রদায় রচিত প্রায় চার হাজার 'প্রবন্ধম্' সংগ্রহ করে নাথমুনি প্রথম আবেগবহুল কৃষ্ণভক্তিকে দার্শনিক প্রত্যয়ে রূপদান করার চেষ্টা করেন। বস্তুত এঁদের প্রচেষ্টায় 'ভক্তিতত্ত্ব' ক্রমেই পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। এই ভক্তিতত্ত্বকে রামানুজাচার্য অদ্বৈতমত অনুযায়ী বিচার এবং বেদান্ত দর্শনের শ্রীভাষ্য রচনার মধ্য দিয়ে শঙ্করভাষ্যের বিরোধিতা শুরু করেন। আমাদের অভিমত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন নামে যে নব আঙ্গিকে নতুন দর্শন-ধারার সূচনা, তার যাত্রা এখান থেকে শুরু হয়েছিল।

খ. মধ্বাচার্য দ্বাদশ শতাব্দীতে ভক্তি সংক্রান্ত এক দার্শনিক তত্ত্বের প্রচার করেছিলেন যা দ্বৈতবাদী দর্শন নামে পরিচিতি পায়। তিনি ব্রহ্মকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তারূপে নির্ণয় করেছেন। তাঁর ব্রহ্মতত্ত্ব – সর্বনিয়ামকও অচিন্ত্য অনন্ত ঐশ্বর্যময়। তিনি একাধারে পরমস্বতন্ত্র, সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ ও সর্বশক্তিমান। তাঁর শক্তি অচিন্ত্যবিশিষ্ট শক্তি। বস্তুত, মধ্বাচার্যের ভাষ্যে ব্রহ্মস্বরূপ – সাকার এবং এ-ক্ষেত্রে বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণই পরব্রহ্ম। তাঁর দৃষ্টিতে জীব জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ই সত্য, তবে স্বতন্ত্র। মধ্বাচার্যের মত সুস্পষ্টভাবে শঙ্করাচার্যের মতের বিরোধী। তিনি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে আপাত ভেদকেই উল্লেখ করেননি; জীবের সাথে জীবের, জীবের সাথে জড়ের, জড়ের সাথে জড়ের এবং জড়ের সাথে ঈশ্বরের ভেদ ইত্যাদি বিষয়ে ভেদ-নির্ণয় করেছেন। মুক্ত আত্মাও ভেদ থেকে দূরে নয় বলে যে অভিমত তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, সেখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, শুধু মুক্ত আত্মা নয়, সমস্ত জ্ঞানই ভেদমূলক এবং গুণ ও ধর্মানুসারে জীবাত্মায় আনন্দের পার্থক্য সূচিত হয়; দেহকে আশ্রয় করেও তা পৃথকই থাকে। অর্থাৎ, মুক্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মারও ভেদ স্থায়ীরূপেই থাকে। মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদের সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মিল রয়েছে বলে অনেক দার্শনিকই মত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের অভিমত, পরিকাঠামোগত কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও উভয় মতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। 'ব্রহ্ম সম্প্রদায়ী' মত দ্বারা মধ্ব যে পঞ্চভেদ প্রদান করেছেন এবং পরম সাধ্য নির্ধারণ করেছেন, তা থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভেদ ও সাধ্য স্বতন্ত্র এবং ভিন্নমুখী।

১. চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়ে যে প্রেমভক্তিধর্মের প্রচার করেছিলেন, তার শুরুতেছিল আচার্য শঙ্করের মায়াবাদের খণ্ডন এবং ব্রহ্মতত্ত্বের এক নতুন ভাষ্য প্রদান। কাশীতে বেদান্তবাদীদের সাথে বেদান্ত বিচারের মাধ্যমে তাঁর উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। *চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্* নাটকে এ-বিষয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সবিশেষকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; যা চৈতন্যের মতকে সমর্থন করে। যথা :

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবশিেষমেব।
বিচারযোগে যতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, যে যে শ্রুতি নির্বিশেষ বা নিরাকার ব্রহ্মের কথা বলেছে সেগুলিই আবার সবিশেষের কথাও বলেছে। কিন্তু বিচার যদি করা যায়, তাহলে সবিশেষের কথাই প্রবল হয়ে ওঠে।[১]

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯,পৃষ্ঠা-১৮৯

গৌড়ীয় দর্শন মতে, ব্রহ্ম সবিশেষ, সশক্তিসম্পন্ন এবং সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ। তিনি অনন্ত ও অচিন্ত্য শক্তির আধার। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিয়ন্তা, অনন্ত কল্যাণ-গুণময় হলেও প্রাকৃতগুণ বর্জিত এবং তিনি নিয়ত লীলাবিলাসী। এই ব্রহ্মের তিনটি শক্তি প্রধান – চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। পরব্রহ্মের অনন্ত শক্তির উৎস উল্লিখিত তিনটি শক্তির অনন্ত বৈচিত্র্যময় সমষ্টি।

২. উপর্যুক্ত তিন শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তিই প্রধান, কারণ তা ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থান করে এবং এই শক্তি সহায়তায় পরব্রহ্মের অন্তরঙ্গ লীলা সংগঠিত হয়। এই শক্তির অন্যনাম অন্তরঙ্গা শক্তি। জীবশক্তির অংশই অনন্তকোটি জীব। যেহেতু মায়াশক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না, তাই এই শক্তির অন্যনাম বহিরঙ্গা শক্তি। এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই বহিরঙ্গা শক্তিরূপী মায়ার স্থান। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি যেহেতু ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থান করেনা, তাই চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তিই এক্ষেত্রে প্রধান।

৩. শ্রুতি নির্ধারিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম পরব্রহ্মেরই একান্ত প্রকাশ এবং এই প্রকাশের নিমিত্তও ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি। যেহেতু স্বরূপশক্তি হচ্ছে ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি, সুতরাং তার বহিঃপ্রকাশ সবক্ষেত্রেই।

৪. শক্তির অধিক বিকাশ জীবান্তর্যামী পরমাত্মার মধ্যে; নির্বিশেষ ব্রহ্ম এখানে শক্তির দিক দিয়ে গৌণ; পরমাত্মাই মূর্ত। কিন্তু এই পরমাত্মাতে ঐশ্বর্য বা ভগবত্তার বিকাশ নেই। *শ্রীমদ্ভাগবত*-অনুযায়ী পরমাত্মা মূর্ত চতুর্ভুজ এবং তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী।

৫. জীবান্তর্যামী পরমাত্মা হতে অধিক শক্তির বিকাশ ঐশ্বর্য বা ভগবত্তায়। সুতরাং পরব্রহ্মের যে সমস্ত প্রকাশের মধ্যে ঐশ্বর্য বা ভগবত্ত বিরাজমান, তাই ভগবান। যেহেতু ভগবত্তা বিকাশের প্রবহমাণতার অনন্ত বৈচিত্র্য, সুতরাং ভগবানও তাঁর স্বরূপ বিকাশে অনন্ত। অতএব, পরব্রহ্মই স্বয়ং ভগবান এবং তাঁর মধ্যেই ভগবত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

৬. শ্রুতি অনুযায়ী পরব্রহ্ম 'রসো বৈ সঃ' – অর্থাৎরসস্বরূপ; আবার তিনি 'সর্বরসঃ' রূপেও বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পরব্রহ্ম একটিমাত্র রস নয়, অনন্ত রসবৈচিত্র্যে বিরাজমান। অনন্ত ভগবৎস্বরূপ মূলত পরব্রহ্মের অনন্ত রসবৈচিত্র্যের মূর্তরূপ এবং অনন্ত ভগবৎস্বরূপে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম আলাদাভাবে তাঁর অনন্তবৈচিত্র্য আস্বাদন করে থাকেন। প্রত্যেক ভগবৎস্বরূপেরই আলাদা ধাম, লীলা ও লীলা পরিকর আছে। রসত্ব ও মূর্ত – এই অভিধায় তিনি রসাস্বাদন করে থাকেন। স্বরূপ শক্তির বিলাস হচ্ছে ভগবৎ-বিষয়ক প্রেম। লীলা পরিকর তাঁকে আশ্রয় করেই প্রেম আস্বাদন করেন। এই প্রেমের গাঢ়তাও অনন্তবৈচিত্র্যপূর্ণ; লীলাবিলাসে পরিকর-চিত্ত হতে উপর্যুক্ত প্রেমরসের নির্যাস উৎসারিত হয়ে যা উৎপাদন করে তা আনন্দ। আস্বাদনের আনন্দই হয় অনন্ত মাধুর্যপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

৭. স্বয়ং ভগবানের ধাম গোলক বা ব্রজ। বাসুদেব কৃষ্ণের ধাম – মথুরা, দ্বারকা। নারায়ণ, নৃসিংহ প্রভৃতির ধাম–পরব্যোম বা মহাবৈকুণ্ঠ। পরব্যোমের মধ্যে যত ভগবৎ স্বরূপ আছেন তাঁদের মধ্যে চতুর্ভুজ নারায়ণেই শক্তির সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে। প্রত্যেক ভগবৎস্বরূপই তাঁর স্বীয় ধামে পরিকরসহ লীলা সংগঠিত করেন। বিকাশে বহুমাত্রিকতা থাকলেও এই লীলা স্বরূপত পরব্রহ্মেরই লীলা; বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপে তিনি লীলারস ও আনন্দ আস্বাদন করে থাকেন।

৮. লীলাবিলাসকালে পরব্রহ্মের লীলার দুটি ভাগ থাকে, যথা : প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা। যখন পরব্রহ্মের লীলা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয় এবং মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় তা প্রকট লীলা। প্রকট লীলায় পরব্রহ্মের ধামও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হয়। পরিকরবৃন্দও প্রকটলীলায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হন। অপ্রকট লীলা হচ্ছে দৃষ্টিগোচরের বাইরের লীলা। পরব্রহ্ম প্রকট এবং অপ্রকট লীলার মধ্য দিয়ে বহুমাত্রিক আনন্দ আস্বাদন করে থাকেন।

৯. গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্বয়ংভগবান রসস্বরূপ পরব্রহ্মের নানাবিধ গুণের বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে তাঁরা এক অভিনব গুণের পরিচয় দিয়েছেন, তাহলো – স্বয়ং ভগবানের 'করুণা'; যা পূর্বাপর যে কোনো দার্শনিক তত্ত্ব থেকে ভিন্ন ও অনন্য এবং তা মাধুর্যময় বিষয়। ভগবানের যে অনন্ত গুণাবলি রয়েছে তার মধ্যে করুণাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। করুণার দ্বারাই জীবের পক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তি ও তাঁর উপলব্ধি হয়ে থাকে। করুণা না থাকলে উল্লিখিত বিষয় কখনোই সংগঠিত হতো না। বস্তুত বৈষ্ণব দার্শনিকগণ দেখিয়েছেন যে, পরব্রহ্ম ভগবান এতই করুণাময় যে, তাঁর সমস্ত ক্রিয়া-সম্পাদন ভক্ত-নিমিত্তে। এই নিমিত্ত প্রীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ ভক্ত-ভগবান উভয়ই প্রীতির নিমিত্তে কার্য করে থাকেন। যদিও ভগবান আপ্তকাম, তবুও তিনি সমুদয় লীলা ও কর্ম করে থাকেন একান্ত ভক্তের চিত্তবিনোদনের জন্য। বস্তুত ভক্তের প্রীতিময়ী সেবাতেই ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়।

১০. উপর্যুক্ত করুণার দ্বারাই পরব্রহ্ম অনাদিকাল থেকে নানান ঐশীবাণীতে বহির্মুখ জীবকে উদ্ধারের হেতু স্থির করে দিয়েছেন এবং বহির্মুখী জীবকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি যুগে যুগে যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলা অবতাররূপে, কখনো কখনো স্বয়ং অবতার হয়ে তাঁকে পাওয়ার উপায়ের কথা জগজ্জীবকে জানান। যেমন :

> তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
> অর্থাৎ, আমাতে সতত আসক্ত চিত্ত যারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনাকারী, তাদের সেরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যা দ্বারা তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।[১]

উপর্যুক্ত বিষয়ই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ব্রহ্মতত্ত্বের বিষয়। বস্তুত শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুগামী দার্শনিকদের ভাষ্য খণ্ডন করেই উপর্যুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে তত্ত্ব প্রদান করেন তার এক অভিনব দার্শনিক মত – অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। বস্তুত, এই মতই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূলভিত্তি।

Dhaka University Institutional Repository

১. জগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, *শ্রীগীতা*, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩৪৩

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে দার্শনিকগণ বস্তু-বিশ্বের অস্তিত্বকে, বাস্তবতাকে, সত্তাকে মায়াবাদী দার্শনিকদের মতো অস্বীকার করেননি। বস্তুত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-বিরোধী (যা সূত্রাকারে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। এই বিরোধের মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় চৈতন্যের কাশীতে অবস্থানকালে মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সাথে যে কথোপকথন হয়, তার মধ্যে। এই কথোপকথনের মধ্যে চৈতন্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই আলোচনার চুম্বক অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

> যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
> শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাহা হৈতে ॥
> মীমাংসক কহে ঈশ্বর কর্মের অঙ্গ হন।
> সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥
> ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
> মায়াবাদী নির্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয় ॥
> পাতঞ্জল কহে ঈশ্বরে স্বরূপ জ্ঞান।
> অতএব, বেদমতে কহে স্বয়ং ভগবান ॥ ...
> বেদান্ত মতে ব্রহ্মসাকার নিরূপণ।
> নির্গুণ ব্যাতিরেকে তেহোঁ হয়ত সগুণ ॥
> পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
> স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥[১]

চৈতন্য-জবানীতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন তার মূল বিষয় হলো বেদান্তের মুখ্য অর্থ জানাই শ্রেয় অথবা তা জানতেই হবে। বস্তুত গৌণ ও ভাষ্যকারের অর্থ নানাক্ষেত্রে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন দেখিয়েছে, জীব স্বরূপে অণু, নিত্য এবং মোক্ষপ্রাপ্তিতেও জীবের অস্তিত্ব পৃথকই থাকে – রামানুজাচার্যের এই মত খণ্ডিত; বস্তুত জীবের স্বরূপ হচ্ছে পরব্রহ্মের জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তির অংশ। জীবের সংখ্যা অনন্ত এবং তার কর্তৃত্ব পরমেশ্বরের হাতে। জীবব্রহ্মের ভেদাভেদ-প্রকাশ ঘটে কিন্তু স্বরূপ বিচারে জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। ব্যাসসূত্র যেমন জানিয়েছিল, মুখ্য অর্থে জগৎ ও জীবন – উভয়ই জীবের পরিণাম। গৌড়ীয়দার্শনিকগণও এই পরিণামবাদ স্বীকার করেন। ব্রহ্ম নিজে জগৎ-রূপে পরিণত হন না, তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই পরিণতি লাভ করে থাকে। মায়ার পরিণামই এক অর্থে ব্রহ্মের পরিণাম; এজন্য পরবর্তীকালে চৈতন্যের মত হিসেবে 'পরিণামবাদ' যৌক্তিক অর্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে যুক্ত হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে – ব্যাসসূত্র 'পরিণামবাদ' আচার্য শঙ্কর স্বীকার করেননি, তিনি পরিণামবাদের বিপরীতে 'বিবর্তনবাদ' প্রবর্তন করেন। চৈতন্যদেব সঙ্গত কারণে পরিণামবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পূর্ব মত খণ্ডন করে। পরবর্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামী পরিণামবাদের তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা দেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্মের সাথে জীবজগতের সম্বন্ধের বিচারই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূলতত্ত্ব–অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সৃষ্টি হয়েছে এবং বৃন্দাবনের দার্শনিক গোস্বামীগণ তত্ত্বের সামূহিক দিক পর্যালোচনা করে তা উপস্থাপন করেছেন।

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৪৫৭-৪৫৮

বিভিন্ন দার্শনিক ব্রহ্মের সাথে জীবজগতের সম্বন্ধ তাঁদের স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করেছেন। যেমন :

ক. যেহেতু আচার্য শঙ্কর জীবজগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাই তাঁর মতবাদের মধ্যে সম্বন্ধ বিচার নেই।

খ. আচার্য মধ্ব বস্তুত কেবলভেদবাদী। তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, ব্রহ্মের সাথে জীবজগতের আত্যন্তিক ভেদ বিদ্যমান।

গ. আচার্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর ভাষ্য মতে, জীব- জগৎ ব্রহ্মের আবরণ বা শরীর এবং ব্রহ্ম হচ্ছেন স্বয়ং শরীরী।

ঘ. আচার্য ভাস্কর ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ দ্বারা জীবজগৎ ও ব্রহ্মের সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন।

ঙ. আচার্য নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সম্পর্কের হেতু নির্ধারণ করেছেন।

চ. আচার্য বল্লভ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে, জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য, কেউই মায়া বা মিথ্যা নয়; উভয়ই ব্রহ্মময়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে পরব্রহ্মই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মূল হেতু। সুতরাং জগৎ মিথ্যা নয়, সত্য; এবং তার স্বরূপ অনিত্য। ব্রহ্মের মায়াশক্তিই পরিণত রূপপ্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম হন না, কারণ তিনি স্থির। মায়া ব্রহ্মের শক্তি হবার কারণে মায়ার পরিণাম ও ব্রহ্মের পরিণাম অভিন্ন।[১] উপর্যুক্ত মত খণ্ডন করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা।

শ্রীজীব গোস্বামী অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই প্রস্থানত্রয়ের অভিপ্রেত বলে মন্তব্য করেছেন।[১] শ্রীজীবের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ যে মত প্রদর্শন করেছিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের সাথে জীব-জগতের সম্বন্ধের বিষয়ই ছিল সেখানে মুখ্য; শ্রীজীব গোস্বামী উপর্যুক্ত তত্ত্বে কেবল জীব-জগতের কথাই নয়, ভগবদধাম, ভগবদধামে অবস্থিত দ্রব্যসমূহ,পরিকরবৃন্দ, ভগবৎস্বরূপ-গণ ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। বস্তুত, ব্রহ্মের সাথে উল্লিখিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ, তাই-ই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সম্বন্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের যে সম্বন্ধ বিরাজ করে, ব্রহ্ম ও জীব জগতের মধ্যেও রয়েছে তদ্রূপ সম্বন্ধ।

বস্তুত প্রাচ্যে যে-সকল দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল, তার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক নিরূপণ। 'আমি' এবং 'তিনি' প্রশ্নবাচক 'কে' দিয়ে যে উত্তর পাওয়া যায় তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। দার্শনিকেরাও চিরন্তন এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন। অনুসন্ধানের ফল বহুমুখী হয়েছে এবং বহু মতবাদের জন্ম হয়েছে; ভেদাভেদবাদী হয়েছে সবাই, তার মধ্যে ভেদ-অভেদ, দ্বৈত-অদ্বৈত নানান সিদ্ধান্ত অনুসন্ধানকে বহুমুখী করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ভেদ এবং অভেদ – এই দুই সিদ্ধান্তকে

Dhaka University Institutional Repository

মান্যতা দিয়ে সমন্বয়মূলক যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে এই মতবাদের ভিত্তিতে অনুধাবন করেছেন বৈষ্ণব দার্শনিকগণ এবং *বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের* যে নিগূঢ়বার্তা তাই তত্ত্বরূপে উপস্থাপন এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধুর সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১. শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-১*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১২৩-১২৪

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

অচিন্ত্য অপ্রাকৃত তত্ত্ব, কারণ চিন্তায়, তর্কে, বিতর্কে এর সন্ধান মেলে না, শুধু অনুভব ও কার্যফলের প্রমাণেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত চিন্তার ক্ষেত্র সীমিত এবং তা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। অভেদকে ভেদে রূপায়ণ না করলে বা স্বীকার না করলে লীলা-আস্বাদন করা যায় না। দ্বৈতভাবে দর্শন করা যায় কিন্তু সেখানে মিলন অসম্ভব। একেই বহু (Diversity in unity) এবং বহু এক হওয়া (Unity of diversity)–এই অদ্বয় তত্ত্ব, যা *শ্রুতিশাস্ত্রের* অন্যতম বিষয়, তারই অনুসন্ধান ভেদ ও অভেদের মধ্য দিয়ে। যথা:

ক. পরব্রহ্মরূপী কৃষ্ণই জীবের একমাত্র প্রিয়বস্তু। শ্রুতি অনুযায়ী পঞ্চবিধা মুক্তি বা এর পরমার্থিকতা গৌড়ীয় দর্শন অনুযায়ী স্বীকৃত। মুক্ত অবস্থায় মুক্তজীবের অবস্থানভেদেই পঞ্চবিধা মুক্তি সম্ভব হয়।[১] কিন্তু এক্ষেত্রে মুক্তির মধ্যে পারমার্থিকতা থাকলেও পরম পুরুষার্থতা নেই। একমাত্র কৃষ্ণের প্রেমসেবাপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ।

খ. পরম পুরুষার্থের ক্ষেত্র ব্রজ এবং ব্রজের প্রেম বস্তুত কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম। এই প্রেম মোক্ষ বাসনামুক্ত। ব্রজে কৃষ্ণের প্রেমসেবাকামীদের অবস্থান একরকম নয়। ব্রজে কৃষ্ণ – সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর – এই চাররসে লীলা আস্বাদন করেন। কিন্তু এ-সবের মধ্যে মধুর ভাবকে পরমতম পুরুষার্থ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

গ. কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ বৈষ্ণবাচার্যগণ স্বীকার করলেও ভক্তিবিহীন সকল কর্মই বৃথা। অর্থাৎ ভক্তিই মুখ্য। সাধ্য ও সাধনভক্তি কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তি। স্বরূপশক্তি ছাড়া মায়া অপসারিত হয় না। বৈধীভক্তি সাধনে চতুর্বিধ মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠে ভাগবৎপার্ষদত্ব লাভ করা যায় কিন্তু ব্রজের যে নির্মল প্রেম তার সেবা-অধিকার লাভ করা যায় না। একমাত্র রাগানুগামার্গের ভক্তি দ্বারাই তা লাভ করা যায়।

ঘ. প্রেমতত্ত্বের উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য দণ্ডায়মান। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে যা পাওয়া যায় তা যদিও ভক্তি, তবে তা প্রেমলক্ষণা ভক্তি। সাধ্যাভক্তির ফলই প্রেম। প্রেম, ভাব, রতি ভিন্নার্থক হলেও তিনটি শব্দই কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকে বোঝায়। কেবল রাগানুগামার্গের নির্মল ভজন দ্বারা প্রেমলাভ হয়। এই প্রেমেই আকুতি, প্রেমেই বিরহ। রাধাতত্ত্ব এখানে প্রধান আধেয়। বস্তুত, রাধাকৃষ্ণ একই সত্তার ভিন্নরূপ এবং শক্তির বহিঃপ্রকাশ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ ...
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিত ধরে দুইরূপ ॥[২]

১. শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*-১, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৩০
২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৩৭

একই রূপ যখন এক হয় তখন তা হয় অচিন্ত্য, যা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। ভেদ, অভেদ, অর্থাৎ সংযোগ, বিয়োগ এক সাথে হলেও তা মূলত অচিন্ত্য। এ-বিষয়ে একজন গবেষকের মন্তব্য :

> The introduction of the mystic formula of incomprehensibility seems to discharge the Vaisnava of this school from all responsibility of logically explaining their dogmas and creeda and, thus uncontrolled, they descend from the domain of reason to the domain of Puranic faith of a mythological character.[১]

উপর্যুক্ত মন্তব্যে গবেষক কান্তিবিদ্যার বহিরঙ্গ রূপকেই অবলোকন করেছেন। অচিন্ত্যের যে মহিমা ও তাৎপর্য তা প্রকাশ পায়নি। এই তত্ত্বের মুখ্য বিষয়ই হলো জগৎ-জীব ও ব্রহ্ম একটি বিশেষ রেখায় এসে মিলিত হয়েছে।

ঙ. রসতত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, বিশেষভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদেরসাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। কারণ, পরব্রহ্ম কৃষ্ণ রসস্বরূপ এবং তিনি পরম আস্বাদ্যতম রস এবং তিনি রসের নিবিড় আস্বাদক। কৃষ্ণে প্রীতি ভক্তের স্থায়ীভাব। এই প্রীতি থেকেই ভক্তিরস প্রবাহিত হয়। রতি, প্রেমভক্তি, স্নেহ, মান, প্রণয়, অনুরাগ ও মহাভাব – এই পর্যায়েই মধুর রস এবং মধুর রতি পূর্ণভাবে বিকশিত হয়। রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, যা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিতে নিহিত। এই স্বরূপশক্তিতেই রসের সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণ রসের আকর এবং রাধা ভক্তিমিশ্রিত রসের জীবন্ত প্রতীক।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের যে তত্ত্ব তা নিঃসন্দেহে অভিনব, তবে নানা কারণে তা (তত্ত্ব-ব্যাখ্যা-মীমাংসা) সমালোচিতও হয়েছে। অচিন্ত্যভেদাভেদ-আশ্রয়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে চৈতন্যের স্থান স্পষ্ট নয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে তাঁর মতাদর্শকেই বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীগণ প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* উল্লেখ করেছেন। এ-কথা স্বীকার্য যে, এই দর্শনতত্ত্বের উদ্গাতা চৈতন্যদেব হলেও (সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়) এর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ বৃন্দাবনের সাত গোস্বামী, বিশেষভাবে রূপ, সনাতন, শ্রীজীব এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজই তাঁদের গ্রন্থে বিশেষভূমিকা রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণলীলার অনুরূপ গৌরাঙ্গকেও চিহ্নিত করতে। এর সম্ভাব্য কারণ, চৈতন্যদেব ও তাঁর কর্মের প্রামাণ্য বিষয় যাতে প্রশ্নের সম্মুখীন না হয় – এ-বিষয়ে এটিই আমাদের অভিমত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে আর একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো চৈতন্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, গৌরপারম্যবাদ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই তত্ত্বে কৃষ্ণ এবং চৈতন্য ভেদাভেদ রূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অর্থাৎ চৈতন্যাদর্শহীন রাধাকৃষ্ণবাদের যে পক্ষ তা স্বীকার না করা। চৈতন্য-সম্মন্ধে তিনটি সিদ্ধান্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের আবহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যথা :

১. Dr. Surendranath Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Voll-111, Cambridge University Press, PP-16.

ক. চৈতন্য রাধারই জীবন্ত বিগ্রহ – এই রূপে বিবেচনা করা।

খ. নবদ্বীপে বৃন্দাবন দাস, মুরারি গুপ্ত প্রমুখ কর্তৃক চৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

গ. চৈতন্য রাধাভাবে ভাবিত অবতার। অর্থাৎ, তিনি রাধার ভাবকান্তি ধারণ করেছেন, অন্তর কৃষ্ণময়। রাধাপ্রেমের মহিমা ও তাৎপর্য অনুধাবনে তাঁর এই অবতার ধারণ।

বাংলার বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব কবিরা উপর্যুক্ত তত্ত্বকেই তাঁদের ক্রিয়া-কর্মে ও সাহিত্যে প্রেমভক্তি সহযোগে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভক্তিধর্ম ও বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রয়

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভক্তিধর্ম ও বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রয়

প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রাক-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ

ঐতিহাসিক তথ্য-অনুসারে বৈষ্ণব ধর্ম আবর্তিত হয়েছে নারায়ণ-বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে। *মহাভারত* ও অষ্টাদশ *পুরাণে* নারায়ণ ও বিষ্ণুর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। নারায়ণ ও বিষ্ণুর উপাসকেরা পঞ্চরাত্র, ভাগবত, একান্তিন, সাত্বত, বৈষ্ণব নামে পরিচিত ছিল। যদিও 'বৈষ্ণব' শব্দটি *মহাভারতে*র বহু পরবর্তী একটি অনুচ্ছেদে পাওয়া যায়, তবে *মহাভারতের*সমসাময়িক অন্যান্য পুরাণে অসংখ্যবার শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এবং এ-ক্ষেত্রে তাদের উপাস্য দেবতা হচ্ছেন নারায়ণ। 'বিষ্ণু' শব্দটির ব্যবহার উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহে একেবারেই কম পরিলক্ষিত হয়।[১] সুতরাং, বৈষ্ণব ধর্মের উপাস্য হিসেবে শুরুতে নারায়ণ থাকলেও পরবর্তীকালে বিষ্ণু-সম্পর্কিত উপাদান যুক্ত হয় এবং সময়ের আবর্তে নারায়ণ-স্থলে বিষ্ণু হয়ে ওঠেন বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম আশ্রয়।

প্রকৃত অর্থে ঠিক কবে থেকে ভারতবর্ষে অজস্র ধর্ম, উপধর্ম, সাধনপদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠানকে একটি সাধারণ ভৌগোলিক নামের দ্বারা অঙ্কিত এবং চিহ্নিত করা হয়েছিল তা বলা কঠিন, তবে ঐতিহাসিক বিবেচনায় আমরা অনুমান করতে পারি, ভৌগোলিক পরিচয় এবং তার পরিভাষার ব্যবহার ইরানের শাসানীয় সম্রাট প্রথম শা'পুরের (২৬২ খ্রিষ্টাব্দে) শাসনামলের কিছু পূর্ব হতে শুরু হয়। পরবর্তীকালে প্রচার-প্রসারের মধ্য দিয়ে পরিভাষাটি নানান শাখায়, কাণ্ডে বিকশিত হতে থাকে দীর্ঘকাল ধরে। বিবর্তনের সময়ে গড়ে ওঠে 'পঞ্চোপাসনা'। গুপ্ত শাসনামল থেকেই এই পঞ্চ-উপাসক যথাক্রমে– শাক্ত, সৌর, শৈব. গাণপত্য ও বৈষ্ণব পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল। পঞ্চোপাসকের কাছে নিজ সম্প্রদায়ের নিজস্ব উপাস্য মুখ্য থাকলেও বাকিগুলি পরিত্যাজ্য ছিল না। দেখা যায়, বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হলেও নিজ নিজ ধর্মকর্মে অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতারাও বিশেষ স্থানে থাকতেন। প্রাক্ বৈদিক ও বৈদিক দেবতাদের অবলম্বন করে গড়ে ওঠা পঞ্চোপাসকেরা একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং তাঁদের আরাধনার পথ ছিল 'ভক্তিবাদ'। বিকাশের বিশেষ পর্যায়ে উপর্যুক্ত ধর্মমতগুলো বেদান্তের ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তার মধ্যে ধর্মীয় পরিভাষা ও বিচারপদ্ধতি একই রকম ছিল। ফলে, শুরুতেই একটা সমন্বয়মূলক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এ-সময়ের যে দেববিগ্রহ অর্থাৎ, হরি-হর, শিব-শক্তি, বিষ্ণু-সূর্য, শিব-সূর্য প্রভৃতিকে সমন্বয়বাদী বিগ্রহরূপে দেখা যায়। পঞ্চোপাসকেরা প্রথম দিকেই সাংখ্য দর্শনকে তাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছিল। পরবর্তীকালে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে বেদান্তের ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যার উপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। বেদান্ত অনুসারে ত্রিতত্ত্বের আশ্রয় ছিল উপর্যুক্ত উপাসকদের অনন্য স্তম্ভ। ত্রিতত্ত্ব হচ্ছে–ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ। অর্থাৎ ব্রহ্ম হচ্ছে ঈশ্বর বা পরমাত্মা, যিনি সম্প্রদায়গণের উপাস্য; চিৎ হচ্ছে জীবাত্মা বা চেতন জীব বা সত্তা এবং অচিৎ হচ্ছে অচেতন বস্তু বাবস্তুজগৎ। পাঁচ সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল চিৎ ও অচিৎ-এর সাথে ব্রহ্মের সম্পর্ক এবং তার যথার্থতা নিরূপণ করা। পঞ্চোপাসনায় আচরণিক বিষয় হিসেবে চর্যা, ক্রিয়া, যোগ ও জ্ঞান সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছিল এবং সম্প্রদায়গত সমন্বয় সাধিত হয়েছিল উপর্যুক্ত দার্শনিক ধারাকে কেন্দ্র করে।

---

১. দ্রষ্টব্য: *মহাভারত*, শ্লোক নং- ১৮/৬/৯৭, ১৮/৬/৯৮, ১৮/৬/১০৩

'বৈষ্ণব ধর্ম' শব্দটি তুলনামূলক আধুনিক; যার মূলরূপ ছিল 'ভাগবতধর্ম' নামে। মৌর্য-উত্তর যুগ ও গুপ্ত যুগের সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বসম্পর্কিত প্রাপ্ত লিপিতে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।[১] উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক সূত্রানুসারে ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদী ধর্মকে শুরুর দিকে 'ভাগবতধর্ম'ই বলা হতো এবং এই নামটির সাথে শৈব ও বৈষ্ণব শব্দদুটিকে বিশেষণ হিসেবে যুক্ত করা হতো। পতঞ্জলির গ্রন্থে শৈব সম্প্রদায়কে 'শিবভাগবত' নামে অভিহিত হতে দেখা যায়।[২] কিন্তু পরবর্তীকালে 'ভাগবত' শব্দটি বিষ্ণুভাগবতের ক্ষেত্রে অধিক প্রযুক্ত হয় এবং বৈষ্ণবধর্মের সমার্থক শব্দ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে প্রাচীন ভাগবতের মধ্যে বিষ্ণু ভাগবতের অধিক প্রাধান্য থাকায় এই বিশেষণটি বৈষ্ণবদের বা ভাগবত ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে।

প্রাক্-চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা

ক. বৈষ্ণবধর্ম মূলত ভাগবত ধর্মেরই নব রূপায়ণ এবং বৈষ্ণবধর্ম ভাগবতধর্মের অর্থাৎ ভগবান নারায়ণের উপাসনারই পরিণত রূপ।[৩] নারায়ণের উপাসনা অতি প্রাচীন এবং এই উপাসনা-পদ্ধতি অতীতেরই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, যা বৈষ্ণবধর্মমতের মধ্যে বিবর্তিত বিষ্ণুর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যাদব উপজাতির ভাঙনের যুগের মানুষ বৈষ্ণব ধর্মের আদি প্রবক্তা বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৪] কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ-সিদ্ধান্ত পর্যাপ্ত তথ্যের ওপরপ্রতিষ্ঠিত নয়। তবে, বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় কৃষ্ণবাসুদেব এবং তাঁর পরিজন দেবত্বে উপনীত হয় এবং নানা তৎপরতায় বৈদিক দেবতা বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে অভিন্ন রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এর কারণ, বৈদিক দেবগোষ্ঠীতে নারায়ণ বা বিষ্ণু ছিলেন সর্বশক্তিমান একেশ্বর। *মনুস্মৃতির* ১/১০-১১ শ্লোকে দেখা যায়, জগৎ সৃষ্টির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে নারায়ণকে। যদিও *মনুস্মৃতি* অতিপ্রাচীন গ্রন্থ নয়, তবে পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্মের হেতু বুঝতে কিছুটা সহায়তা করে। বৈষ্ণবধর্মের আচার ও উপাসনার প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় কাঠক সম্প্রদায়ের *বিষ্ণুস্মৃতি* গ্রন্থে। এটি ছিল এই সম্প্রদায়ের ধর্মসূত্র যা তৃতীয় খ্রিস্টাব্দে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের দ্বারা নতুনভাবে সংকলিত হয়। এখানেও বিষ্ণুর প্রাধান্য এবং এককত্ব প্রতিষ্ঠিত। *বৌধায়নগৃহ্যসূত্র* সম্ভবত চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের রচনা। এই গ্রন্থের বৌধায়ন গৃহ্যপরিভাষাসূত্র এবং গৃহ্যশেষসূত্র যদিও উপর্যুক্ত শতকের পরবর্তী সংযোজন, তবে এই সূত্রে আরাধ্য দেবতাকে 'মহাপুরুষ' বা 'মহাবিষ্ণু' নামে আবাহন জানানো হয়েছে।[৫] *শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়* আরাধ্য দেবতাকে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু পুরুষ বা বিষ্ণু নামে। তবে প্রাচীন মতের মধ্যে যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস হিসেবে ত্রিত্ববাদের ধারণা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) তা আমরা মনে করি কুষাণযুগের মধ্যবর্তী সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর সময়কাল ছিল সম্ভবত পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো শতক। অভিমতের কারণ, ভাগবতধর্মের পঞ্চরাত্র উপাসকদের বিপুল গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছিল গুপ্তযুগ এবং তার-ও পরে বেশকিছু সময় ধরে। *মহাভারতের* প্রভাবপুষ্ট

১.D.C. Sircar, *Select Inscriptions bearing of Indian History and Civilization,* Vol-1, Calcutta, 1942, PP-36-37

২.Patanjali, Keilhorn Ed. *Vyakarara Mahabhasyas,* Vol-1, Bombay, 1978, PP-186-187

৩.সুবীরা জায়সবাল, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায় অনুদিত, *বৈষ্ণবধর্মেরউৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী,কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২৪৮

৪. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ধর্ম ও সংস্কৃতি*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৩০

৫. R. Shama Sastri Ed. *Baudhayana Grhya Sutra,* Mysore, India, 1920, PP-6

উপর্যুক্ত সংহিতাগুলিতে (১০৮টি) সমন্বয়বাদী চেতনার বাস্তবরূপ প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। প্রাচীন সংহিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম *অহির্বুধ্ন্য সংহিতা*, পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে (কাশ্মীর ?) উদ্ভব ঘটেছিল। এই প্রাচীনসংহিতাতেও আচার-উপাসনা-অনুষ্ঠান, মতবাদ (স্রষ্টা-সৃষ্টি) এবং পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের সমন্বয়বাদী চিন্তার একরকম অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। এক্ষেত্রে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তাহলো, *পঞ্চরাত্র সংহিতা*গুলো তান্ত্রিক উপাদানে ভরপুর ছিল, যা মহাভারতীয় যুগেও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ধারাবাহিকতা রক্ষা করে উপর্যুক্ত উপাদানের বাইরে এসে সংহিতাকারগণ পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের 'মানসজপ' বা 'মানস উপাসনার' গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। *জয়াখ্য সংহিতা* গ্রন্থে উপর্যুক্ত অনুষ্ঠান ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।[১] এছাড়াও 'পাঁচ প্রকার উপাসনা কর্ম' এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। *মহাভারতের* অনুশাসন পর্বে (১৩/১৪৯-৫২) বিষ্ণুর সহস্র নাম বর্ণিত হয়েছে এবং উপর্যুক্ত দেবতাকে 'সময়জ্ঞ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। *পঞ্চরাত্র সংহিতায়* আমরা দেখতে পাই (৫ম অধ্যায়) এই সময়জ্ঞ হচ্ছে 'দীক্ষিত ব্যক্তির নাম' বিশেষ। অর্থাৎ বৈদিক এবং মহাভারতীয় যুগে যে গুরু-শিষ্য পরম্পরা পদ্ধতি ছিল তার একটি স্থায়ী ও শাস্ত্রীয় কাঠামো এই সময়ে বা তার কিছু পূর্বে দাঁড় করানো হয়েছিল। চতুর্থ থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে রাম ও বাসুদেবের নানান উপাখ্যান জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। জৈন সম্প্রদায়ের *বিমলসূরি*র পৌমচরিয়-এ, রামচন্দ্রের কাহিনির প্রাচীনরূপ দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে বৌদ্ধদের *দশরথ জাতক* ও *ঘটজাতকের* মধ্যেও রাম-কাহিনির প্রাচীনরূপ বিদ্যমান। জৈন সূত্রাবলির গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'উত্তরাধ্যয়নসূত্র', যার মধ্যে বৃষ্ণিদের (বিষ্ণুর উপাসক) উপাখ্যান পাওয়া যায়।[২] নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত পৌরাণিক রীতির বৌদ্ধগ্রন্থ *ললিতবিস্তর*-এ বুদ্ধের নারায়ণ-বিষ্ণুর অবতারে রূপান্তরীকরণের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে[৩] এবং এর মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবদের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের দিক উৎসাহিত হয়েছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বিষ্ণু-বাসুদেব সম্পর্কে এবং উপাসনা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। আচার্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে নারায়ণের বিবর্তিত রূপ 'বিষ্ণু প্রহরণ' পূজার উল্লেখ রয়েছে। কবি ভাস, কালিদাস, বিশাখ দত্ত এবং মৌর্য-উত্তর ও গুপ্তযুগের অনেক কবি ও নাট্যকারের রচনায় বৈষ্ণব ধর্ম এবং এ-সংক্রান্ত নানান বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন, কবি ভাস-এর *বালচরিত* নাটকটির বিষয়বস্তু বাসুদেব কৃষ্ণের বাল্যজীবন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, গুপ্ত যুগ থেকেই শৈবধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম সমন্বয়ের পথে হাঁটতে শুরু করে এবং শৈবধর্মের শিব বৈষ্ণবধর্মে মান্যতা পেতে শুরু করে। অবশ্য পরবর্তীকালে উপর্যুক্ত বিষয়ে নানা মতানৈক্যও দেখা দিয়েছিল।

প্রকৃত অর্থে বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভবের প্রকৃত সময়কাল নির্ধারণকরা দুরূহ। মূল উৎসের অনুসন্ধানে যে মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া তা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এই ধর্মমতের উদ্ভব সম্পর্কে আমাদের ধারণা – খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই এই ধর্মমতের পরিমার্জিত রূপ যাত্রা শুরু করেছিল। এই মন্তব্যের পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত 'বেসনগর শিলালিপি'।[৪] এই শিলালিপি থেকে আরো জানা যায় ভাগবত বা বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয়তা ভারতবর্ষের

১. দ্রষ্টব্যঃ কৃষ্ণমাচার্য এম্বার সম্পাদিত, *জয়াখ্য সংহিতা*, শ্লোক-২২/৬৪-৭৪, বরোদা, ১৯৮১

২. M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, Voll-1, New Delhi, 1971, PP-432

৩. A. B Keith, *A History ofSanskrit Literature*, Oxford, 1928, PP-492-493

৪. D. C. Sircar, *Slect Inscriptions bearing on Indian History and civilization,* Vol-1, Calcutta, 1942, PP-90-92

বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতবর্ষের সাহিতিক সূত্রগুলো প্রধানত ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংক্রান্ত হওয়ায় আমাদের মত হলো, পৌরাণিক আখ্যানে যে বৈষ্ণব ধর্মমতের আলোচনা রয়েছে তার বিকাশ হয়েছিল পুরোহিতশ্রেণিরই হাত ধরে। ক্রমবিকাশের স্তরে সবই যে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন তা নয়, লোকায়ত উৎপত্তির বিষয়ও প্রবহমান মতবাদে এসে যুক্ত হয়েছিল। তবে ক্রমবিকাশের প্রথম দিকে এটি ব্রাহ্মণ্য বৈষ্ণবধর্মই ছিল এবং কৃষিজীবী সমাজের সাথে এই মতবাদ সম্পর্কিত হওয়ারফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বৈষ্ণবধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল।

খ. বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রমূলে ছিল দেবতা **নারায়ণ বা বিষ্ণু** এবং তাঁর অসংখ্য মূর্তির পূজাপদ্ধতি। বৈষ্ণব ধর্মটিতে বিষ্ণু-সম্পর্কিত উপাদানের প্রাধান্য থাকলেও প্রথমদিকে নারায়ণই ছিল মুখ্য। যে গ্রন্থে 'নারায়ণ' শব্দটি সচেতনভাবে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে সেটি *শতপথ ব্রাহ্মণ*। অবৈদিক দেবতা হলেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে ভিন্ন মতও প্রচলিত রয়েছে। যেমন :

> সম্ভবত আদিতে নারায়ণ কোন উপজাতীয় মানুষ ছিলেন। যাঁর কুল বা গোত্রের নাম ছিল নর, যেমন কাত্যকুলের কাত্যায়ণবা কণ্ঠকুলের কণ্বায়ন।[১]

উপর্যুক্ত বিষয়ে যে মত প্রচলিত রয়েছে তার কোনো উৎসভিত্তি নেই। যেহেতু *শতপথ ব্রাহ্মণ* গ্রন্থে আমরা সচেতনভাবে নারায়ণ শব্দটি পাই এবং তিনি এখানে দেবতা পদবাচ্যেই ভূষিত হয়েছেন। শুধু শব্দ বিশ্লেষণ বা প্রচলিত মতকে প্রাধান্য দিয়ে উপর্যুক্ত গবেষকের মতকে কোনোভাবেই গ্রহণ করা যায় না। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এর নারায়ণ পুরুষ এবং স্বর্গীয়। নারায়ণ শব্দের অর্থ 'নার' অর্থাৎ নরসমূহের 'অয়ন' অর্থাৎ চরমলক্ষ্য বা আশ্রয়স্থল–এই অর্থই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে আমরা মনে করি।। এর অধিকতর প্রমাণ রয়েছে *শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়*। এই গ্রন্থ 'নারায়ণী গীতা' নামেও পরিচিত। এখানে 'ভগবৎ' অর্থে নারায়ণকেই বোঝানো হয়েছে এবং নারায়ণের গুণ আরোপিত হয়েছে বাসুদেব কৃষ্ণের উপর। *মহাভারত*-পরবর্তী যেসব বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তার উপলক্ষ্যই ছিল বাসুদেব-কৃষ্ণ ও নারায়ণ বা বিষ্ণুর মধ্যে অভিন্নতা প্রতিপাদন করা। 'ভগবৎ' শব্দটি নিয়েও নানান ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলিত আছে। তবে শব্দের বুৎপত্তি অনুসারে এবং বিবর্তিত পথে যে শব্দের অর্থের প্রয়োগগত পরিবর্তন ঘটে তাকে অস্বীকার করা চলে না। বিষ্ণুর আদি স্বরূপ যাই হোক না কেন, বৈদিক সমাজ ও অনার্য সমাজেও তাঁর বিস্তার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। *শতপথ ব্রাহ্মণ* (১/৯/৩/৯), বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে তাঁকে যজ্ঞের সাথে অভিন্ন কল্পনা করা হয়েছে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদানের প্রসঙ্গ এসেছে। বিষ্ণু বা নারায়ণের উপাসক হিসেবে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশে বৈষ্ণবেরা শুধু বিষ্ণু নয়. সংকর্ষণ বলদেব, বাসুদেব কৃষ্ণ, শ্রীলক্ষ্মী ও অন্যান্য দেবদেবীকে গ্রহণ করেছিল এবং উল্লিখিত দেবদেবীকে অবলম্বন করে যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির (Point of view) উদ্ভব হয়েছিল তা ছিল পরিপূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত। বলা যেতে পারে, বৈদিক সমাজেরই ধর্মাচরণের এক বিবর্তিত রূপ ছিল বৈষ্ণব ধর্ম।

সঙ্কর্ষণ বলদেব-কে ক্রমবিকাশের প্রথম যুগেই বৈষ্ণব ধর্মে স্থান দেওয়া হয়েছিল। *মহাভারতে* তিনি ছিলেন বৃষ্ণি বংশের একজন বীরযোদ্ধা এবং বসুদেব ও রোহিণীর পুত্র। পৌরাণিক আখ্যানে তাঁর

---

১. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ধর্ম ও সংস্কৃতি*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা-১৩২,

ক্রিয়াকলাপ তেমন ব্যাপকতা পায়নি, কেবল ভ্রাতা কৃষ্ণের অনুসঙ্গেই তাঁর কর্মপ্রবাহ ধাবিত হয়েছে। সঙ্কর্ষণ বলদেবের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় *অর্থশাস্ত্রে*।[১] সঙ্কর্ষণ বলদেবের উপাসনার মধ্যে নাগপূজার অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। *বৃহৎ সংহিতায়* (৫৭/৩৬) উল্লখ করা হয়েছে, তাঁর গায়ের রং সাদা, পরিধানে রয়েছেকালো বা নীল বস্ত্র এবং মাথায় সর্পাঙ্কিত চন্দ্রাতপ। এ-বিষয়ে আমাদের অভিমত, সঙ্কর্ষণ বলদেবের উদ্ভব পৌরাণিক যুগেই ঘটেছিল এবং তা হয়েছিল পূর্বের কোনো নাগ দেবতার বিবর্তন থেকে। কৃষ্ণের প্রাধান্য বেড়ে গেলে বলদেবের উপাসনাও কৃষ্ণ-উপাসনার সাথে মিশে যায়। যার কারণে বৈষ্ণব ধর্মে তাঁকে অনন্ত বা শেষ নাগের অবতার হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর সাথেও নাগের (মুখ থেকে বেরিয়ে সাগরে মিশে গিয়েছিল) সম্পর্ক রয়েছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মে তিনি বলদেব বা বলরাম-রূপে বাসুদেব কৃষ্ণের সাথে মিশে গিয়েছে এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা হিসেবে অগ্রগণ্য শ্রদ্ধায় ভূষিত হয়েছে। এ-বিষয়ে একজন গবেষকের মন্তব্য:

> ... আদিতে সঙ্কর্ষণ ছিলেন একজন অব্রাহ্মণ্য কৃষি-সম্পর্কিত দেবতা এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁর প্রভাবশালী অনুচর ছিল। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই তাঁকে বৃষ্ণিকুলের বলদেবের সঙ্গে এক করে ফেলা হয় এবং এর ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য দেবতা নারায়ণ-বিষ্ণুর সম্প্রদায়ের মৈত্রী ঘটে। কালক্রমে এই নারায়ণ-বিষ্ণু সম্প্রদায়ই সম্পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ঐ সম্প্রদায়কে তাঁর ক্রমপ্রসার্যমান পরিধির মধ্যে গ্রাস করে নেয়।[২]

বাসুদেব-কৃষ্ণ বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণ পুরুষ। ভারতীয় পুরাণ কহিনিতে তিনি সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র। বাসুদেব কৃষ্ণ ছিলেন যাদবকুলের অন্তর্গত সাত্বত সম্প্রদায়ের একজন বীর। তাঁর গোষ্ঠীর লোকেরাই প্রথম তাঁর ওপর দেবত্ব আরোপ করে এবং অন্যান্যদের মধ্যে তাঁর উপাসনা-প্রথার প্রচলন করে। কোনো কোনো গবেষক বাসুদেব ও কৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য দেখেছেন। এ. গোবিন্দাচার্য স্বামী তাঁর The Translation of the term Bhagavah', Journal of Royal Asiatic Society of Great Briten and Ierland-এ প্রথম এই প্রশ্নের অবতারণা করেন।[৩]গবেষক উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রমাণ হিসেবে পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের *পদ্মতন্ত্র*গ্রন্থের শ্লোককে প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের অভিমত হলো, *পদ্মতন্ত্রের* চেয়েও অধিকতর প্রাচীন গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা*। সেখানে বাসুদেব ও কৃষ্ণ এক, আলাদা কোনো চরিত্র নয়। উল্লেখ্য, বৃষ্ণিকুলের তরুণ নায়ক হিসেবে এবং ভাগবত ধর্মের প্রচারক হিসেবে অর্জুনের কাছে বাসুদেব কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন একক সত্তা হিসেবে। সুতরাং, বাসুদেব ও কৃষ্ণকে আলাদা করে ভাবার কোনো অবকাশ নেই। বাসুদেব শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করলে উপর্যুক্ত মন্তব্যের একটি সারবত্তা নির্ণয় করা যেতে পারে। বাসুদেব শব্দটির উৎপত্তি √বস্– ধাতু থেকে, যার অর্থ বাস করা। প্রয়োগগত অর্থ করলে দাঁড়ায়, যিনি সকল বস্তুর মধ্যে বাস করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সাত্বত বংশের বীর ছিলেন। সাত্বত শব্দটির আভিধানিক অর্থ সত্ত্ব গুণময়। তবে বাসুদেব কৃষ্ণের সমসাময়িক বহু জাতি গোষ্ঠীতে বাসুদেব নামধারী ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থে। ফলে বাসুদেব ও কৃষ্ণকে

১. সুবীরা জায়সবাল, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায় অনুদিত, *বৈষ্ণবধর্মেরউৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৬১

২. সুবীরা জায়সবাল, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায় অনুদিত, *বৈষ্ণবধর্মেরউৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী,কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৭৩

৩. A Govindacharya, The Translation of the term Bhagavan', *Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ierland*, 1911, PP. 936

নিয়ে এক প্রকার ধোয়াশা শুরু থেকেই ছিল। যাদবকুলের বৃষ্ণি বংশজাত বাসুদেব কৃষ্ণ বিষ্ণু ও নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন রূপে ঘোষিত হয়েছিলবৈদিক যুগ থেকেই। আমাদের এই অভিমতের পক্ষে যুক্তি হলো, ঋগ্বেদের কয়েকটি অনুচ্ছেদে (৮/৯৬/১৩-৫) ইন্দ্র ও কৃষ্ণ নামের এক অনার্যের সাথে তাঁর প্রিয় পাণীয় 'দ্রপস্'-এর জন্য যুদ্ধ হয়েছিল অংশমতী নদীর তীরে। এই যুদ্ধে অনার্য গোষ্ঠীনেতা কৃষ্ণ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন ;যা থেকে উপর্যুক্ত গোষ্ঠীর সাথে ইন্দ্রের দ্বন্দ্ব চলমান ছিল। সায়নাচার্য এই কৃষ্ণকে 'অসুর' বলে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু 'অসুর' শব্দটি সম্ভবত তিনি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করেননি।দেবতার বিপরীতে মানুষ হিসেবেই বোধকরি ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু একপর্যায়ে ইন্দ্র-উৎসবের বিরোধিতা করে অনার্য বাসুদেব কৃষ্ণের গোষ্ঠী ইন্দ্রগোষ্ঠীকে পরাজিত করে এবং সেই থেকে কৃষ্ণের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বকৃষ্ণের উপাসনার প্রাচীনতাই প্রমাণ করে। বস্তুত কৃষ্ণ উপ্যাখ্যানগুলোতে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাদানের এক অভূতপূর্ব সন্নিবেশ ঘটেছে এবং ইতিহাসকে এক অখণ্ডতায় পরিণত করেছে।বাসুদেব কৃষ্ণের পরিচয়*মহাভারতে* কিছু পাওয়া গেলেও তাঁর পল্লবিত জীবনী *হরিবংশ* এবং তার পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায়।

এছাড়াও পাওয়া যায় *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা*, পতঞ্জলির *মহাভাষ্য*, *ঘটজাতক* প্রভৃতি গ্রন্থে। বাসুদেব কৃষ্ণের মূল চরিত্র দেবতা পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার পরেও আরও দুটি চরিত্র তাঁর উপরে আরোপিত হয়। একজন হচ্ছেন *ছান্দোগ্যউপনিষদের*[১] কৃষ্ণ, যিনি দেবকীপুত্র এবং ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য। দ্বিতীয় আর একটি চরিত্র আরোপিত হলো,তিনি হলেন গোপাল কৃষ্ণ। *হরিবংশ* এবং পরবর্তী বৈষ্ণব সম্পর্কিত রচনায় গোপাল কৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরের বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়াও আর একটি চরিত্র বাসুদেব কৃষ্ণে আরোপিত হতে দেখা যায়–পশ্চিম ভারতের পশুপালক দেবতার; যার বিকাশ ঘটেছিল আভীর এবং গোপালক উপজাতির মধ্যে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ও সাধনায় যে শৃঙ্গার রসাত্মক উপাদান সন্নিবেশিত হয়েছিল, তা-ও ছিল কৃষ্ণের সাথে আভীর দেবতার একীকরণ হওয়ার ফলে। *হরিবংশ* এবং *বিষ্ণুপুরাণে* কৃষ্ণ এবং গোপীদের মধ্যে মিলনআনন্দপ্রিয় মুহূর্ত, আক্ষেপ, মান প্রভৃতি লীলাবিলাসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। *ভাগবত পুরাণ*-এ কৃষ্ণলীলা গভীরভাবে ও দার্শনিকতায় অঙ্কিত হয়েছে। সুতরাং, যাদব উপজাতির বাসুদেব কৃষ্ণ, *ছান্দোগ্য উপনিষদের*কৃষ্ণদেবকীপুত্র, গোপালক উপজাতির আভীর দেবতা, *হরিবংশের* গোপাল কৃষ্ণ – এই ধারাগুলো একত্র হয়ে দেবতারূপে কৃষ্ণের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে। এই সম্মিলিত কৃষ্ণ প্রথমে নারায়ণের সাথে এবং পরবর্তী সময়ে বৈদিক বিষ্ণুর সাথে একাত্ম হন।[২] সুতরাং, উপর্যুক্ত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আমাদের অভিমত হলো, সমন্বয় ও আত্মসাৎকরণের মধ্য দিয়ে এক জনপ্রিয় অনার্য দেবতা স্বীকৃত হলেন নারায়ণ-বিষ্ণুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী মনুষ্য-অবতার কৃষ্ণরূপে। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে তিনিই ঈশ্বর ও সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ।

প্রাক্-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিকাশের প্রাক-পর্যায়েই রাধাবাদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এই রাধাবাদের বীজ ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদেই প্রোথিত ছিল। বিশুদ্ধ শক্তিরূপা থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরমপ্রেমরূপা হিসেবে তাঁর স্থিতি ঘটেছে। বস্তুত শক্তিবাদের প্রভাব ভারতবর্ষের সকল

১. গীতা প্রেস, *উপনিষদ*, (শ্লোক নং-৩/১৭/৬), গোরক্ষপুর, ২০০৮

২. দ্রষ্টব্য : কৃষ্ণমাচার্য এম্বার সম্পাদিত, *জয়াখ্য সংহিতা*, বরোদা, ১৯৮১, শ্লোক নং-২/১৪

ধর্মমতের উপরেই পড়েছিল। বৈষ্ণব ধর্ম ও তার প্রবহমান ধারায় এই শক্তিকে গ্রহণ করেছে যেমন, বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, রামের শক্তি সীতা, তেমনি কৃষ্ণের শক্তি হিসেবে রাধাপ্রেমআসলে মূল প্রকৃতিরই আদ্যাশক্তির রূপবিন্যাস।

বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়াতত্ত্ব তা মূলত ব্রহ্মশক্তিরই রূপান্তর। *পুরাণেও* এই আদ্যাশক্তির রূপান্তর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উত্থাপিত হয়েছে। যা পরবর্তীসময়ে সাংখ্যদর্শনে পুরুষ-প্রকৃতি, শিব-শক্তি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। শক্তিবাদের মূল উৎস হিসেবে *ঋগ্বেদের* ১০ম মণ্ডলের 'দেবীসূক্ত'কে (১২৫ সূক্ত) ধরা হয়ে থাকে। ঋষিকন্যা ব্রহ্মবাদিনী বাক্ তাঁর 'ব্রহ্মতদাত্ম্য' লাভে যে উপলব্ধি হয়েছিল তাহলো আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মের মহিমা এবং তাঁর সর্বব্যাপী শক্তি। এই জ্ঞান ক্রিয়াত্মিকা বিশ্বব্যাপী শক্তিই দেবী এবং তিনিই মহামায়া। অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তিই সর্বক্রিয়ার মূল কারণ, সর্বজ্ঞানের একমাত্র আধার। ভারতীয় শক্তিবাদ এই ব্রহ্মশক্তির মহিমায় উদ্ভাসিত। এই শক্তির বিস্তৃত বিবরণ নানান প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য, *অথর্ব বেদ* (রাত্রি-সূক্ত), *নারায়ণোপনিষদ*, *শ্রীশ্রীচণ্ডী*, *কেনোপনিষদ* (৩/১২ নং শ্লোক), *বৃহদারণ্যক উপনিষদ* (৬/৩/৮/১-৪ নং শ্লোক), *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ* (৬/৮, ৪/১, ৪/৫, ৪/৯, ৪/১০ নং শ্লোক) প্রভৃতি। পরম সত্যের যে একরূপে অবস্থান তা মিথুনেরই অদ্বয়াবস্থা। এই অদ্বয়ের মূলে রয়েছে আত্মরতি। এই আত্মরতির আনন্দ-উদ্‌বোধনের হেতুই বৈষ্ণব ধর্মে রাধাতত্ত্বের বিষয়; যা বৈষ্ণব ধর্মেরক্রমবিকাশের প্রথম দিকে শক্তি বা দেবী লক্ষ্মীরূপেই প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিষ্ণুর শক্তিরূপে শ্রীলক্ষ্মীর কল্পনা হলো বৈষ্ণব ও শক্তির ধর্মীয় উপাদান-সংমিশ্রণের দার্শনিক পরিণতি। কুষাণযুগের শেষদিকে এবংগুপ্তযুগের প্রথম শতাব্দীতেই শক্তি ও তান্ত্রিকের সাথে পৌরাণিক নানান মতের সংমিশ্রণ ঘটে।

*বৃহৎসংহিতার*৫০/৫৬ নং শ্লোকে দেখা যায়, শক্তির মাতৃকাদেবীর মূর্তিতে রূপায়ণের প্রক্রিয়াকে। পরবর্তীসময়ে *বিষ্ণুপুরাণ* (১/৯/১৩৪) ও *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ* (৩/৯৪/৩৮, ৩/১২৫)-এ প্রক্রিয়াটির পরিপূরক একটি স্থিতি লাভ করে। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণেই* আমরা প্রথম বৈষ্ণবী শক্তির পরিচয় পাই যেখানে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে বিষ্ণুর সম্মোহনী শক্তি 'গান্ধারী' রূপে। সুতরাং, চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বে জয়দেব এবং বিদ্যাপতির যে রাধাতত্ত্ব দেখতে পাই তা মূলত শ্রীলক্ষ্মীরই বিবর্তিত রূপ বলে আমাদের অভিমত। কারণ—

> শ্রীলক্ষ্মী ছিলেন প্রাগার্য উর্বরতার দেবী এবং কালক্রমে আর্য ও অনার্য দেবীদের সঙ্গে জড়িত নানা ধারণা তাঁর মধ্যে মিশে যায়। আদিতে তিনি ছিলেন একজন পৃথক মাতৃকাদেবী। কিন্তু তাঁকে নানান উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে হয় এবং গুপ্ত যুগে তাঁকে বিষ্ণুর সাথে জড়িত করে ফেলা হয়। কুষাণযুগের শেষভাগে বা গুপ্তযুগের প্রথমদিকে তান্ত্রিক ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কল্পনা করা হয় বিষ্ণুর শক্তিরূপে এবং গুপ্তোত্তর যুগে পঞ্চরাত্র বৈষ্ণবদের ধর্মীয় জল্পনা-কল্পনায় এই ভূমিকায় তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন।[১]

---

১. সুবীরা জায়সবাল, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায় অনুদিত, *বৈষ্ণবধর্মেরউৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১৩২

বস্তুত রাধাতত্ত্বের রয়েছে সুস্পষ্ট দুটি দিক :

ক. তত্ত্বের দিক এবং
খ. ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবর্তিত দিক।

রাধাকে তত্ত্বরূপে উপস্থাপন নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত হয়েছিল বলে আমাদের অভিমত। ইতিহাস ও ধর্মীয় দিকে রাধার স্থান ও বিকাশ হয়েছিল সম্ভবত একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই। তবে কাব্যে, উপাখ্যানে রাধার উল্লেখ বহুপূর্ব হতেই পাওয়া যায়।[১] বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মধ্যে রুদ্র ও সনক সম্প্রদায়ে রাধার পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় এবং তত্ত্বরূপে পরিপূর্ণতা ঘটে পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধ্যানে ও মননে।

গ. আদি বৈষ্ণবশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ *পঞ্চরাত্র সংহিতা* নামে পরিচিত। তবে সুপ্রাচীন সাহিত্য ও লেখসমূহে সুনির্দিষ্ট করে 'বৈষ্ণব' শব্দটি পাওয়া যায় না। কিন্তু ভাগবত ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নাম ও পরিধির পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীনকাল থেকেই। *পদ্মতন্ত্রসংহিতায়*(৪/২/৮৮ নং শ্লোকে) সুস্পষ্ট করে ভাগবত সম্প্রদায়ের নামসমূহের তালিকা রয়েছে । সেই সময় একেশ্বরবাদী ভক্তিমূলক যে-কোনো মতই *পঞ্চরাত্র সংহিতার* মতে আখ্যা দেওয়া যেত। শুধু আখ্যা দেওয়াই নয়, *পুরুষোত্তম সংহিতার* মতে তা মূলবেদ, সাত্বত ও আগমের সাথে সমার্থক হিসেবে বিবেচিত হতো। তাত্ত্বিক যে পাঁচটি বিষয়, যথা: তত্ত্ব, মুক্তি, ভক্তি, যোগ ও বৈশেষিক *পাঞ্চরাত্রে* বর্ণিত হয়েছে তা গোড়ার দিকে বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিকাশের সাথে সম্পর্কিত ছিল, যা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব মতবাদের চারটি ধারার সাথে সন্নিবেশিত হয়। এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় *সাত্বতসংহিতা, পৌষ্কর সংহিতা, জয়াখ্যসংহিতা* ও *হয়গ্রীবসংহিতায়*। আদি বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছিল পঞ্চরাত্র দর্শনের এক উল্লেখযোগ্য পরিণতি 'বূহ্যবাদ'। 'বূহ্যবাদ'-এ বিশুদ্ধ সৃষ্টি ও তার প্রবহমান ধারায় ছয়টি বিশেষ গুণকেগুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে – জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ। এদের মধ্যে জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও শক্তি স্থিতির দ্যোতক এবং বল, বীর্য ও তেজ গতির দ্যোতক। এইগুণগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে বূহ্যের সৃষ্টি করে। এদের প্রতীক সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ– এই তিনের উৎসমূল স্বয়ং বাসুদেব এবং এই তিনের সংমিশ্রণ ও বিবর্তনই ব্রহ্মাণ্ডের হেতু। সঙ্কর্ষণ + প্রকৃতি = মন বা বুদ্ধির উৎপত্তি; প্রদ্যুম্ন + মনঃসংযোগ = অহংকারের উৎপত্তি; অনিরুদ্ধ + অহংকার = পঞ্চ মহাভূতের উপত্তি। এসবই বিষ্ণুর শক্তি থেকে উদ্ভূত এবং তিনি স্বয়ং চতুর্ব্যূহরূপে বিরাজমান। অর্থাৎ, বিষ্ণুর স্থিতি ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্যে।

বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিকাশের প্রথম দিকেই বিষ্ণু উপাসনার ছয়টি পদ্ধতি যথাক্রমে : বৈদিক, তান্ত্রিক, স্মার্ত, মিশ্র, পৌরাণিক ও ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পাঞ্চরাত্র ধর্মবিধিতে উপাস্য দেবতা পাঁচটি রূপে যথাক্রমে: পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চা হিসেবে কল্পিত হয়েছেন। 'পর' শব্দের অর্থ পরমেশ্বর যাতে সবকিছু লীন হয় এবং তিনি সবকিছুরই কারণ। এই সত্ত্বাই 'পর-বাসুদেব' নামে পরিচিতি পান এবং সময়-প্রবাহে কৃষ্ণে বিবর্তিত হয়েছেন। বৈষ্ণবধর্মে অবতারবাদ ধারণার উৎস 'বিভব' থেকে।

১. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ-দর্শনে ও সাহিত্যে,* এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১০৩

'বিভব' অর্থ বিশিষ্টরূপে আবির্ভাব। তাই বিভব শব্দের অন্য অর্থ অবতার। 'অন্তর্যামী' রূপ 'পর' শব্দের ধারণার ব্যাপ্তি বোঝায়। 'অর্চা'র অর্থ আরাধনা বা পূজার যোগ্য প্রতিমা।এক্ষেত্রে আমাদের অভিমত, পাঞ্চরাত্র দর্শন ও তার বিন্যাসকে কেন্দ্র করে আদি বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ অনেকাংশে প্রকাশিত হয়েছিল এবং গুপ্তবংশীয় রাজাদের আমল থেকেই বৈষ্ণবধর্মের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে, যার সূচনা হয়েছিল মৌর্যযুগের শেষ শতাব্দীতে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বাইরেও বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল।

প্রাক-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ

জগতের ইতিহাসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, এক জাতির নব অভ্যুত্থানে অন্য প্রাচীনতর জাতির পতন ঘটে এবং অতঃপর দুই জাতির মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠে নতুন জাতিসত্তা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাও সরলপথে অগ্রসর হয়নি। নানা সময় রাজনৈতিক সংঘাত, মতভেদ, শাসন ও শোষণ জাতিসত্তার মননে গভীর রেখাপাত করেছে। ভারতবর্ষে আর্য আগমন তেমনি এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সমাগত আর্যগণ সনাতন জ্ঞান-ধর্মী ছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুসন্ধানকারী নৃতত্ত্ববিদদের মতে, এই আর্যসম্প্রদায় ছিল বৈদিক জ্ঞান-গরিমায় অলঙ্কৃত গৌরবর্ণ, সুনাসিক ও উন্নত দেহবিশিষ্ট। আর্যগণ 'দেব' পদবাচ্যে ভূষিত হয়েছিলেন। লক্ষণীয়, তাদের এই পদ আজও ব্রাহ্মণগণ প্রাত্যহিক ধর্মকার্যে 'দেবশর্মণঃ' শব্দটির মাধ্যমে ব্যবহার করেন। আর্যদের গায়ত্রীমন্ত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, একদা আদিম জনগোষ্ঠীকে আয়ত্তে এনে 'ব্রাত্যষ্টোম' নামক সংস্কার পদ্ধতি দ্বারা আর্যীকরণ করা হতো; যদিও অনার্যদের হীনমন্য জ্ঞান করা হতো কিন্তু পরবর্তীকালে শাস্ত্রীয় বিধান মতেই সংস্কার করা হয়। 'জন্মনা, জায়তে বিপ্র, সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে'- শাস্ত্রীয় এই বিধানই আর্যসংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বিশেষত, আর্যপক্ষের ঋষি বশিষ্ঠ এবং অনার্যদের পক্ষে ঋষি বিশ্বামিত্রের সংস্কার বিষয়ক তুমুল তর্ক অনুষ্ঠিত হয়, অবশেষে গায়ত্রীমন্ত্রে বিশ্বামিত্র কর্তৃক 'সাবিত্রী' সংযোগ হয়। এই ব্রাত্যসংস্কার পদ্ধতি ও পরিবর্তিত গায়ত্রীমন্ত্র; যেখানে দেবগণ ছিলেন ঋষি, সেখানে সাবিত্রী সংযোগে সাম্য, মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীকরূপে দেখা যায়। লক্ষণীয়, অধুনা দেবকার্যে যে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হয়, যথা: ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং পরমং ধীমহি– এই গায়ত্রীর উদগাতা-ঋষি ও দেবগণ কিন্তু তখনই নাম ও নামী অভেদ হয়ে উঠল যখন মর্ত্যের ঋষি বিশ্বামিত্রও দেবগণের সাথে একত্রিত হলেন, 'তৎ সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ঃ যো নঃ প্রচোদয়াৎ' – সাবিত্রী সংযোগ করে। ভক্তিধর্মের বীজও এই সূত্র থেকেই অনুমান করা যায় যে, জাতির নব-রূপায়ণের সাথে তা সম্পর্কিত ছিল। আবার '*ঋগ্বেদের*' ১০/১৯১ মন্ত্রেও উল্লিখিত বিষয়টি আরও গভীরভাবে উচ্চারিত হয়েছে–

> সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
> দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।
> সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্
> সমানং মন্ত্রং অভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।
> সমানী বঃ আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।

সমানমস্ত বো মনো যথাবঃ সুসহাসতি।

অর্থাৎ তোমরা সকলে একত্র হও, একত্রে মিলিত কণ্ঠে বল, তোমাদের মন পরস্পর একমত হোক অর্থাৎ সকলে একমন হও, দেবগণের যজ্ঞভাগ যেমন পূর্বকালে উপাসিত ফলপ্রসূ হতো, বর্তমানেও তদ্রুপ ফলদান করুক। মন্ত্রসমূহ সকলের পক্ষে এক হোক, সকলের মন চিত্রসহ একীভূত হোক। তোমাদের সকলকেএকমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করছি, তোমরা সকলে একভাবে ভাবিত হয়ে 'হবি' দ্বারা যজ্ঞাগ্নিতে হোম কর।তোমাদের সকলের কামনা এক হোক, তোমাদের মনস্কামনা এক হোক, তোমরা সর্বপ্রকারে পরস্পর এক হও।[১]

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার অব্দে মধ্য এশিয়ায় প্রবল তুষারপাতে যে মহাপ্লাবন ঘটেছিল এবং মধ্য-এশিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে আর্যগণ হিন্দুকুশ পার্বত্য অঞ্চলে এসে নেগ্রিটো, কোলরিড বা কোলিড, ভেলিড, আসিরীয়, নর্ডিক প্রভৃতি শ্রেণির জনগণ একত্র হয়ে যে 'ব্রহ্মাবর্ত' গড়ে তুলেছিলেন এবং তথাকথিত ব্রাত্যজনের (?) (যদিও বিষয়টির উৎস শাস্ত্রগত নয়) সাথে মিলে যে বৃহত্তর বৈদিক সমাজ গড়ে উঠেছিল; তা ছিল-বিশ্বাস-আচার-অনুষ্ঠানে সজ্জিত এক অভিনব জাতিসত্তা।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে বৈদিকভাষা সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়। অনুমান করা যায়, এই সময়েই সম্ভবত *ব্রাহ্মণ*, *আরণ্যক* ও *উপনিষদ* রচিত হয়। যেহেতু পাণিনির ব্যাকরণশাস্ত্র *অষ্টাধ্যায়ী*ও এই সময়ের রচনা এবং এই গ্রন্থে রূপান্তরিত ভাষাতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে আঞ্চলিকসীমা ও প্রাদুর্ভূত ধর্মাচরণেরও পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্মতর্ব্য, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এসে ব্রাহ্মণ্যধর্মের যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-অনুষ্ঠান ও আচার-বিচারে জটিলতর অবস্থা ও দুর্বোধ্য পরিস্থিতির জন্ম হয়। ফলে আর্যীকৃত আর্যগণ এই ধর্মের প্রতি আগ্রহহীন হয়ে পড়ে। এই পরিসরেই জন্ম নেয় *উপনিষদ* ও লোকায়ত ধর্মের এবং গভীরভাবে লক্ষ করা যায় পূজিত দেবতার সাথে অনুরাগ স্থাপনের আন্তরিক প্রয়াস। এই প্রয়াসই চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণবীয় রসপ্রকাশের ধারাকে একটি নির্ধারিত গতিপথে ধাবিত করেছে। *উপনিষদেই* তার ভুক্তি, যথা – 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

ব্রাহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিক রূপেই ভারতবর্ষে প্রেম-ভক্তির আরম্ভ হয়।[২]

চৈতন্য-পূর্ব যুগে ভক্তিধর্মের যে প্রাবল্য অনুভূত হয় তার গভীরে প্রোথিত রয়েছে 'ব্রাহ্মবাদের' আবির্ভাব এবং লোকায়ত ধর্মের প্রবক্তা মহাবীর জিন ও গৌতমবুদ্ধ প্রভৃতি মহামানবের আবির্ভাব। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাবে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষা করতেই সংকলিত হলো *শ্রীমদ্ভাগবতগীতার*। উল্লেখ্য, এইগ্রন্থেই ভক্ত ও ভগবানের মাঝে প্রীতিপূর্ণ রসময় সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো। ধারাবাহিকতার পথ ধরে এই প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায় *শ্রীমদ্ভাগবত* পুরাণে। অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম এই পুরাণেই ভক্তি-সাধনার মূল উৎস উৎকীর্ণ করা হয়েছে। ফলে, বৈষ্ণবধর্মকে অন্যরূপে ভাগবতীয়ধর্ম বলা হয় এবং কৃষ্ণ-বাসুদেব এই ভাগবতধর্মের উপাস্য দেবতা। ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

১. রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদকৃত, *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-

১০৭, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩
২. সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত), *রবীন্দ্র-রচনাবলি*, ষোড়শ খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা-২০১৬, পৃষ্ঠা-৫৪৫

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কাছাকাছি সময়ে এই ভাগবতধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু বৈষ্ণবধর্মরূপে এটি পরিচিতি লাভ করে আরও অনেক পরে মহাভারতের যুগে, যখন নারায়ণ-বিষ্ণুর সঙ্গে বাসুদেব-কৃষ্ণের ঐক্য স্থাপিত হয়।বৈদিক সম্প্রদায় ভাগবত-ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সামঞ্জস্য স্থাপনে আগ্রহী হলে কৃষ্ণকে পরম পুরুষ বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করে নেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণ প্রবর্তিত ভাগবতধর্মকে মূল বিষ্ণুর ধর্ম বলেই গ্রহণ করেন এবং তদনুসারেই ভাগবতধর্মের নাম হয় বৈষ্ণবধর্ম। বাসুদেব কৃষ্ণ এই ধর্মের পরম দেবতা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই নারায়ণ, তিনিই হরি, তিনিই ভগবান।[১]

চৈতন্যপূর্ব যুগে বৈষ্ণবধর্ম বা ভক্তিধর্মের দিগ্‌দর্শন হচ্ছে ভক্তি সূত্র থেকে আরম্ভ করে সুপরিস্ফুট ভক্তিপ্রকাশ এবং উপাস্যদেবতা হিসেবে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে গ্রহণ। প্রাক-চৈতন্যযুগে বৈষ্ণবধর্মাশ্রয়ের কার্যকারণ অনুসন্ধানে প্রথমেই পরিলক্ষিত হয় ভক্তি প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভক্তি-সাধকগণের নানাভাবে পরীক্ষণলব্ধ ও বিচিত্র সাধনোপযোগী ভাষ্য প্রণয়ন। বক্তব্য বিচারে বা ক্রমপরকালীন উপস্থাপনে ‘চতুঃসম’ বা চার শাখায় এরা বিভাজিত হয়।দক্ষিণ ভারতের আড়বার সম্প্রদায় যে ভক্তির নবপল্লবিত ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তা অবলম্বন করে পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মমত গড়ে ওঠে। যার প্রবক্তা বঙ্গনাথাচার্যও নাথমুনি। নাথমুনির পৌত্র যমুনাচার্য এই মতের তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেন। আড়বার সাধকেরা ষষ্ঠ থেকে নবম শতকের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্মকে জনমুখী করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মূলত বারোজন আড়বার তাঁদের চার হাজার সংগীতের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবধর্মের যাত্রাপথকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। পোইগাই-আড়বার বা সরযোগী, ভূতাত্তাড়বার বা ভূতযোগী, পেই-আড়বার বা মহদ্‌যোগী – এঁরা বিষ্ণুর অবতার হিসেবে ঘোষিত হয়েছিলেন। এই তিনজন ধর্মমতকে জনমুখী করতে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীকালে আরও নয়জন আড়বার বৈষ্ণব ধর্মের যাত্রাপথকে বেগবান করে তোলেন। এঁরা হলেন: তিরুমড়িশাই বা ভক্তিসার, নম্মাড়বার বা শটকোপ, মধুরকবি, কুলশেখর, পেরিয়াড়বার বা বিষ্ণুচিত্ত, পেরিয়াড়বার কন্যা আণ্ডাল বা গোদা, তোণ্ডরপ্পোরি, তিরুপ্পন বা যোগিবাহন এবং তিরুমঙ্গই।

নাথমুনির পৌত্র যমুনাচার্য তাঁর *সিদ্ধিত্রয়, আগমপ্রামাণ্য, গীতার্থসংগ্রহ, মহাপুরুষনির্ণয়* এবং *স্তোত্ররত্ন* গ্রন্থে বৈষ্ণব ধর্মের রূপ-পরিধি ও প্রণালি লিপিবদ্ধ করেন। যমুনাচার্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্ট্য দ্বৈতবাদী ভাষ্য বা শ্রীভাষ্য রচনা করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূলতত্ত্ব বলে বিবেচিত।এই তত্ত্বের সারকথা হলো – এই জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণস্বরূপ এবং ব্রহ্ম চিৎ ও অচিৎ সর্ববস্তুরই উৎপত্তিস্থল। একই সঙ্গে ব্রহ্ম বিশ্বাতীত এবং তিনি সর্বান্তর্যামীরূপে সর্বভূতেও বিরাজমান বাবর্তমান। শ্রীভাষ্যে রামানুজব্রহ্মের তিনপ্রকার রূপভেদ করেছেন, যথা: ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা। যদিও তাঁর মতানুসারে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। মুখ্যত এই তিন সত্তা হচ্ছে – জীবাত্মা (চিৎ), জড়জগৎ (অচিৎ) এবং ঈশ্বর। এখানে জীব ভোক্তা, জড়জগৎ ভোগ্য এবং স্বয়ং প্রেরিতা। ঈশ্বর একই সঙ্গে

জগতের নিমিত্ত ও উপাদানের কারণ। যেহেতু তিনি পরামাত্মারূপে সৃষ্টির পূর্বে সূক্ষ্ম অবস্থায় বিরাজমান থাকেন এবং সৃষ্টির সময়ে নিজেকে

১. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলিকাতা, ১৯১৭, পৃষ্ঠা-৫

সর্বভূতে ব্যক্ত করেন।তিনি সর্বদোষমুক্ত এবং মনোবাঞ্ছাপূরণকারী। ভক্তের মানসপটে তিনি পাঁচটি রূপে যথা: পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও প্রতিমারূপে প্রকটিত হন।

নিম্বার্কাচার্য কর্তৃক প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম সনকাদি সম্প্রদায় এবং তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সৃজন করেন। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু ব্রাহ্মণ নিম্বার্ক *ব্রহ্মসূত্রের* যে-ভাষ্য প্রণয়ন করেন তার নাম *বেদান্তপারিজাতসৌরভ*। এছাড়াও তিনি *সিদ্ধান্তরত্ন* নামক গ্রন্থে দশটি শ্লোক সৃষ্টি করেন যা বৈষ্ণব সমাজে *দশশ্লোকী* নামে খ্যাত। দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদের মূল কথা হচ্ছে – ঈশ্বর, জীব ও জড়জগৎএকই সময়ে পরস্পর থেকে অভিন্ন, আবার একই সময়ে পরস্পর থেকে ভিন্ন। জীব ও জড় ঈশ্বর–অভিন্ন নয়, কারণ এরা সবই ঈশ্বরে নির্ভরশীল। সুতরাং ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ সমভাবে সত্য ও নিত্য। এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হলো স্বয়ং ঈশ্বর বা কৃষ্ণ। মূলত এই ব্রহ্মই চিদ্ চিদ্ বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্তি কারণ। নিম্বার্ক বা সনকাদি সম্প্রদায়ের মূল আশ্রয় প্রপত্তিমার্গ। এই মার্গের মূল বিষয় হলো, ঈশ্বর সর্ববিধ করুণাময় এবং তিনি স্বয়ং করুণায় ও মহিমায় ভক্তকে দেখেন। এই সম্প্রদায়ের মূল উপাস্য গোপীজনবল্লভ গোপালকৃষ্ণ, তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা এবং তাঁদের ত্রিশক্তি – শ্রী, ভূ ও লীলা।

মহীশুরের কল্লিয়ানপুর অঞ্চলের মধ্ব ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রবক্তা এবং তিনি দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তাঁর *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, অনুব্যাখ্যান, বিষ্ণুতত্ত্বাবিনির্ণয়, ভাগবততাৎপর্য, উপনিষদভাষ্য* প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেন। দ্বৈতবাদের মূল বিষয় হলো– ঈশ্বর ও চেতনাসম্পন্ন জীব, ঈশ্বর ও জড়জগৎ, জীব ও জড়জগৎ, এক জীবসত্তা ও অন্যজীবসত্তা এবং এক জড়পদার্থ ও অপর জড়পদার্থের মধ্যে চিরন্তন পার্থক্য বিদ্যমান। ব্রহ্ম নিত্য ও অপরিহার্য এবং ব্রহ্মকে সর্বকারণের কারণ অনুভব হলেই তিনি বোধগম্য হয়ে ওঠেন। জগতের মূল আধার চেতন আত্মা ও বস্তুজগৎ। জীবাত্মা অস্তিত্ব, ধ্বংস, সাপেক্ষ, অবস্থিতি, জ্ঞান, অজ্ঞান, বন্ধন ও মুক্তির মধ্য দিয়ে গমন করে। যেহেতু জীবাত্মা ও বস্তুজগত পরতন্ত্র, তাই তারা স্বাধীনরূপে কিছুই করতে পারে না বা ঘটাতে পারে না। একমাত্র ব্রহ্মই সর্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র, পূর্ণ বলেই তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিষয় এবং সকলের গম্য। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের উপাস্য বিষ্ণু এবং তাঁর শক্তি লক্ষ্মী।

কণকরব নামক তেলেগুভাষী অঞ্চলের বাসিন্দা বল্লভাচার্য বৈষ্ণব ধর্মের রুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, সিদ্ধান্তরহস্য, ভাগবতটীকা সুবোধিনী* প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। শুদ্ধদ্বৈতবাদের মূল বিষয় হলো–ব্রহ্ম অংশী এবং জীব, জড়জগৎ তাঁর অন্তর্যামী রূপ এবং তাঁরই অংশ। এই ব্রহ্মই স্বয়ং কৃষ্ণ; তিনি চরমসত্তা ও পরমাত্মা, যা *শ্রীমদ্ভাগবতে* ও *উপনিষদে* পরিকীর্তিত হয়েছে। তাঁর স্বরূপ – তিনি এক ও অদ্বিতীয়, নিত্য ও শাশ্বত, অপরিণামী ও সর্বজ্ঞ, জগতের সমগ্র উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সমস্ত জীবাত্মা তাঁর থেকেই উদ্ভূত এবং তিনিও তাদের থেকে ভিন্ন নন। জগৎ ও জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অভিন্ন স্বরূপ। ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আবদ্ধ হন না এবং তিনি সম্পূর্ণ শুদ্ধ। বল্লভাচার্য মনে

করেন, ভগবান কৃষ্ণ ব্রহ্মস্বরূপ এবং তিনি রস, আনন্দ ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ আধার, যার আশ্রয়রস শৃঙ্গার পর্যায়। মূলত জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিবিড়তম সংযোগ-আধার ঐকান্তিক প্রেম। রাধা এই ঐকান্তিক প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি।

উপর্যুক্ত চার সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব মতবাদ গড়ে উঠেছিল, যা বৈষ্ণব ধর্মকে একটি পরিণতি প্রদান করতে পেরেছিল।

ভক্তিবাদ

বস্তুত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বিষ্ণু উপাসনার যে নবরূপ সৃষ্টি হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল 'ভক্তিবাদ'। মূলত এই ভক্তিবাদের দ্বারাই বৈদিক স্তরের উপাসনার সঙ্গে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়। *ঋগ্বেদের*[১]ভাষ্য অনুযায়ী ভক্তি মূলত Materialবা ভৌত এবং Concreteবা বাহ্যবস্তুকেই কল্পনা করা হয়েছিল দেবতার অনুগ্রহ হিসেবে এবং জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। এছাড়া পানিনির *অষ্ট্যাধ্যায়ী*, শ্লোক নং-৪/৩/৯৫-তে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।[১]

ভক্তি ও ভগবতের গভীরতার সূত্রে 'প্রেম' ও 'মাধুর্যের' উৎপত্তি। সপ্রেমযুক্ত সেবা থেকেই জন্ম হয় আনুগত্যের। দেবতাদের প্রতি গভীর প্রেমের অনুভূতি ও ঘনিষ্ঠতা আদিমযুগের সংঘবদ্ধজীবনকেই প্রকাশ করে। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে বৈদিক উপাসনা যখন অনুষ্ঠান-সর্বস্বতায় পর্যবসিত হলো এবং পুরোহিতদের হাতে সমস্ত নিয়ন্ত্রণভার এসে পড়ল বা তারা নিয়ে নিল, তখন থেকেই ধারণার ক্ষেত্রে নানান পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। যেহেতু দৈব অনুগ্রহ ও ব্যক্তিগত দেবতার যোগ রয়েছে ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গে, সুতরাং এই তত্ত্বের সার্বিক অনুষ্ঠান তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল[২]।বিশ্বাসই হলো ধর্মীয় আনুগত্যের ভিত্তি। সুতরাং ভক্তি হলো এমন এক আনুগত্য যার উদ্ভব ঐকান্তিক বিশ্বাস থেকে। বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তিবাদের স্থিতিসামাজিক বিবর্তনের ফসল। বস্তুত আড়বার সম্প্রদায়ের হাতেই প্রেমের যোগ্য প্রতিদান স্বরূপ গভীর প্রেমে পূর্ণ অনুভূতিপ্রবণ ভক্তির যথাযোগ্য প্রকাশ দেখা যায়। বৈষ্ণবীয় ভক্তিসূত্র রচনা করেছিলেন নারদ ও শাণ্ডিল্য। শ্রীরূপ গোস্বামী রচনা করেন *শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, শ্রীজীব গোস্বামী রচনা করেন *ভক্তিসন্দর্ভ*, শাণ্ডিল্যসূত্র-এর বল্লভচারী বৈষ্ণব ব্যাখ্যা *ভক্তিমার্তণ্ড সন্দর্ভে* পাওয়া যায়। বাঙালি লেখক মধুসূদন সরস্বতী রচনা করেন *ভগবদ্ভক্তিরসায়ণ*। শ্রী-সম্প্রদায় *নারদভক্তিসূত্র* এবং সনকাদি সম্প্রদায়*শাণ্ডিল্যসূত্র*-কে অনুসরণ করলেও পরবর্তী সময়ে দুইসূত্রে বিবৃত ভক্তিতত্ত্বে একটি সমন্বয় প্রক্রিয়া সাধিত হয়েছিল। উপর্যুক্ত সুত্রদ্বয়ে ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পরের বিপরীত বিষয় হিসেবে উত্থাপন করা হয়েছে। ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত এবং পরম প্রেমরূপা। ভক্তির তত্ত্বে দয়া, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, মঙ্গলবোধ, অহিংসা, সত্য, নৈতিক শৃঙ্খলাগভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। ভক্তি বস্তুত কর্মকাণ্ড বিরোধী তবে তাতে সৎক্রিয়া পরিত্যাজ্য বিষয় নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভক্তিবাদকে জাতীয় সংহতির নীতিরূপে বিবেচিত হয়েছে। ভক্তিতত্ত্বের সিদ্ধান্তে মনুষ্যত্ব ও জীবনের মূল্য গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হয়েছে।

১. টীকা: তমস্য পৃক্ষমুপরাসু ধীমহি নক্তং যঃ সুদর্শচরো দিবাতরাদপ্রায়ুষে দিবাতরাৎ। আদস্যায়ুর্গ্র ভণবদ্বীলু শর্ম ন সূনবে। ভক্তমভক্তমবো ব্যন্তো অজরা অগ্নয়ো ব্যন্তো অজরাঃ ॥ অর্থাৎ, বিদ্বান ব্যক্তিকে অর্থদান করা যায় সেরূপ অগ্নিকে সারবান বা হব্য মন্ত্রানুসারে বা ক্রম অনুযায়ী প্রদান করেছে। অগ্নি তেজোযুক্ত প্রজ্ঞাদি দ্বারা আমাদের

রক্ষার্থ ধন প্রদান করেন। যজমানও রক্ষার্থে অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন। ... রমেশচন্দ্র দত্ত অনুদিত, *ঋগ্বেদ-সংহিতা*, ১ম খণ্ড, শ্লোক নং-১/১২৭/৫ হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-২৫৪-২৫৫।
২. দ্রষ্টব্য : *কঠোপনিষদ*, শ্লোক নং-২/২৩, *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, শ্লোক নং-৩/৪, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৮, পৃষ্ঠা-১২১ ও ৪৪৭;B. K. Goswami, *The Bhakti Cutt in Ancient India, Calcutta,* 1st edition, 1922 – 1978, PP-47, 111;জগদীশচন্দ্র ঘোষ, *শ্রীগীতা*, শ্লোক নং-১১/৪৪, প্রেন্সিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩৭৮

অবতারবাদ

অবতারবাদ বৈষ্ণবধর্মের একটি মৌলিক মতবাদ এবং খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে অহিংসাশ্রিত ধর্মীয় আন্দোলনের সাথে অবতারবাদও এসে যুক্ত হয়। অবশ্য অবতারবাদ যুক্ত হবার আর একটি কারণ ছিল, তাহলো নারায়ণ বিষ্ণুর সাথে বাসুদেব কৃষ্ণের একাত্মতা হওয়া এবং শুরুর দিকেই দেখা যায় নারায়ণ বিষ্ণুর মনুষ্য-অবতার হিসেবে বাসুদেব কৃষ্ণ গণ্য হয়েছেন। বৈষ্ণবীয় অবতারবাদের সূত্র হিসেবে কোনো কোনো গবেষক এর প্রাচীনত্ব নিরূপণে ঋগ্বেদ এবং (শ্লোক নং-৭/১০০-৬), *নিরুক্ত* (শ্লোক নং-৭, ৬-৭) থেকে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু *ঋগ্বেদ* ও *নিরুক্ত*-তেযে রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে বা দেবতাদের মনুষ্য ও অ-মনুষ্য রূপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে বৈষ্ণবধর্মের অবতারতত্ত্বের ন্যূনতম সাদৃশ্যও নেই। এক্ষেত্রে আমাদের অভিমত, বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে অবতারবাদ কোনো দেবতার বিশেষ বা বিভিন্ন রূপধারণকে বোঝায় না। এই তত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও ব্যাখ্যা *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা*-তেই সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং এটিই অবতারবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা বলে আমাদের অভিমত। শ্লোকটি উদ্ধৃত করছি:

> অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
> প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥
> যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমর্ধস্য তদাত্মানং সৃজামহ্যম্ ॥
> পরিত্রানীয় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (*শ্রীমদ্ভাবগতগীতা*, শ্লোক নং-৪/৬-৮)

> অর্থাৎ, আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে আত্মমায়ায় আবির্ভূতহই। হে ভারত, যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়। আমি সেই সময়ে নিজেকে সৃষ্টি করি।সাধুগণের পরিত্রাণ,দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।[১]

অবতার শব্দটি নিষ্পন্ন অবপূর্বক √তৃ থেকে, যার অর্থ নেমে পড়া বা নেমে আসা। অবতার শব্দটি প্রথম দিকের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা* ও *মহাভারত*-এর নারায়ণী খণ্ডে অবতার শব্দের সাথে যুক্ত হতে দেখা যায় জন্ম, সম্ভব, সৃজন ও প্রাদুর্ভাব এবং ভগবানের এই আকার ধারণের কথা সুস্পষ্ট বলা হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মে অবতারবাদ প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে গবেষক সুবীরা জায়সবাল যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ :

আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীর বিভেদ দূর করার ক্ষেত্রে ও অর্ধ-সভ্য দেশীয় নানা উপজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসারের ক্ষেত্রে অবতারবাদ এক প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। এই মতবাদের মাধ্যমে যে সমন্বয়ের ধারা উদ্ভূত হয়েছিল তা কখনো ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংক্রান্ত, কখনো লোকপ্রিয় চরিত্রের। কিন্তুসমগ্র দেশে যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার

১. জগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত *শ্রীগীতা*,প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী,কলিকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা-১৩৫-১৩৮

মূলে ছিল বৈষ্ণব ধর্মেও সব কিছু মানিয়ে চলার মনোবৃত্তি এবং এই মনোবৃত্তিই সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে একই ধরনের সামাজিক গঠনরীতি প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল।[১]

অবতারবাদের সাথে আর একটি মতবাদ বৈষ্ণব ধর্মে গুরুত্ব পেয়েছিল তা হলো অহিংসাবাদ। অহিংসবাদী আন্দোলনটি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এসে এক বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছিল, তা হলো প্রায় প্রতিটি ধর্মীয় আন্দোলনেই বৈদিক যাগযজ্ঞের সার্থকতা সমন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। সার্থকতার প্রশ্নে পশুবলি, পশুহত্যা, প্রধান উপজাতির মধ্যে অন্তর্কোন্দল, মালিকানা-জটিলতা প্রভৃতি বিষয় নানাবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। ফলে সমন্বয়ের প্রয়োজনেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম অহিংস মতবাদ গ্রহণ করেছিল। এর ফলে সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বৈষ্ণবধর্মও সচেতনভাবে এই মতবাদ গ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে অহিংসবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

প্রাক-চৈতন্য যুগে বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণব বর্ণের একাধিক স্তর ছিল।[২] বস্তুত গুপ্ত শাসনামলে বাংলা অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে জনমনে বেশি প্রভাব ফেলেছিল এর মতবাদ–বিশেষকরে সহনশীলতা এবং ভিন্নমতের সাথে আপসের চেষ্টা। অবতারপূজনপদ্ধতি গুপ্ত যুগ থেকে শুরু করে সেনযুগ পর্যন্ত যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে শুরু করে। সে সময়ে পরিবেশ হয়ে উঠেছিল –

> বৈষ্ণব ধর্ম উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ঐতিহ্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বুদ্ধকে অবতাররূপে গ্রহণ করলেও, বৈষ্ণবেরা কখনো বৌদ্ধধর্মের নামে দৈত্যপূজা মানেননি। ওদিকে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের নাথসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত শৈব-শাক্তধর্মকে 'পাষণ্ড' মতবাদরূপে বিচার করেন, কিন্তু বৈষ্ণবধর্মকে মেনে নেন।[৩]

রামানুজের অক্লান্ত চেষ্টায় উপর্যুক্ত পরিবেশে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার পেতে থাকে। বেদান্তের এই বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যা উচ্চবর্গীয় ব্রহ্মণদের কাছে গ্রাহ্য হতে শুরু করে। বিশেষভাবে বৈষ্ণবদের অহিংসা ও সদাচার আকৃষ্ট করেছিল। সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণবদের মধ্যে সম্মিলিতভাবে পুরাণ রচিত হয়েছিল যথা: *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ*। আবার এ-সময়ে বৈষ্ণবেরাও স্বতন্ত্রভাবে পুরাণ

রচনা করেছিলেন, যথা:*ভাগবত পুরাণ*। প্রাক্-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ চিহ্নিত করতে গেলে মোটাদাগে দুটি বিষয়কে সামনে আনতে হয়।

---

১. সুধীরা জায়সবাল, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায় অনুদিত, *বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ওক্রমবিকাশ(The Orgin and Development of Vaishnavism)*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১৫৯

২. এস. সি. মুখার্জি, *এ স্টাডি অফ বৈষ্ণব বিজম ইন এনশিয়েন্ট অ্যাণ্ড মিডিয়াভাল বেঙ্গল*, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-২৩৭

৩. বল্লাল সেন, ভবতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *দানসাগর*, কলিকাতা, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা-৬-৭

ক. সমন্বয়বাদী আদর্শের কারণে বৈষ্ণবধর্ম পূর্বশাস্ত্র বিরোধী ছিল না।

খ. বৈষ্ণব মতবাদ – যা গড়ে উঠেছে কৃষ্ণপ্রেমকে কেন্দ্র করে, তার ভক্তিময় ব্যাখ্যা দেওয়া।

যেহেতু বৈষ্ণবধর্ম শাস্ত্রানুমোদিত এবং কর্মকাণ্ড প্রধান, সেহেতু যাদের কাছে যৌনতা অশ্রদ্ধেয় ছিল, তারাই ভক্তিতত্ত্বে নিজেদের নতুনভাবে উপস্থাপন করলেন। অর্থাৎ, চৈতন্য-পূর্ব যুগে বৈষ্ণবধর্মে দুটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। তাহলোঃ

ক. পঞ্চোপাসনার সঙ্গে বৈষ্ণবীয় কর্মকাণ্ড এবং

খ. বৈষ্ণব আদর্শের কবিতা ও গান।

যার ফলে পরবর্তীকালে আমরা পঞ্চোপাসনার সঙ্গে বৈষ্ণবীয় কর্মকাণ্ডকে সুসংহত রূপ দিতে মাধবেন্দ্র পুরীকে এবং জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, কৃত্তিবাসকে তাঁদের অমর রচনার মধ্যে নতুনরূপে দেখি। চৈতন্য-পূর্ব যুগে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে নিঃসন্দেহে তাঁরা ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

জয়দেব

জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ* কাব্যের মধ্য দিয়েই বৈষ্ণব পদাবলির সূচনা ধরা হয়। অর্থাৎ, *গীতগোবিন্দের* ভাব, ছন্দ ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্যময় মহিমা পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনেরা অনুসরণ করেন। 'কীর্তনের সূচনাও জয়দেব হতে শুরু হয়েছিল'।'*শ্রীগীতগোবিন্দ*ভুক্ত পদাবলি কোমলকান্ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সংগীত। জয়দেব তাঁর প্রতিটি গানে তাল ও রাগের নির্দেশ দিয়েছেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে গোপাল বাঙালি জনসাধারণের রাজা হলেন। এই রাজবংশের স্বনামধন্য পুত্র ধর্মপাল শুধু রাজ্যবিস্তারই নয়, সংস্কৃতির প্রবহমানতার পথকেও সুগম করেছিলেন। এ-সময় স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, অঙ্কনে পারদর্শী শিল্পীরা তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতাঅর্জন করেন। ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনায় এই সময়েই শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কাব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় শৌরসেনী অপভ্রংশের সাথে স্থানীয় মাগধী অপভ্রংশের মিশ্রণে বাংলা ভাষা অধিকতর ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন আবহের সৃষ্টি হলো। বাঙালি, জৈন, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও সহজিয়াপন্থী সাধকগণ, নাথ ও শৈব যোগীগণ যেন সামষ্টিক উদ্যোগে গ্রন্থ ও কাব্যাদি রচনা করতে লাগলেন। এই সময়েরই অন্যতম সাধক

কবি জয়দেব। বৌদ্ধগান ও দোঁহাবলির মধ্যে যেমন গোপন সাধন সঙ্কেত আছে, অন্ধকারের মধ্যে সুতীব্র আলোক প্রক্ষেপ; অনুরূপ, *গীতগোবিন্দে*ও সহজ আচারের মতো অনেক গূঢ় রহস্য আছে। চৈতন্যদেবও এসব কারণে জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করতেন। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ-বিষয়ে আমাদের জানাচ্ছেন :

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

---

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৯৯০, পৃষ্ঠা-১

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥[১]

সুতরাং অনুমেয়, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বৈষ্ণবীয় ধর্মাচরণ ও পদাবলির চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

জয়দেব লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় পঞ্চরত্নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। তাঁর সময়কাল অধিকাংশ গবেষকই দ্বাদশ শতক বলে উল্লেখ করেছেন। বীরভূম জেলার অজয় নদের তীরে কেঁদুলি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভোজদেব ও বামাদেবী তাঁর পিতা-মাতা এবং পদ্মাবতী তাঁর পত্নী। কবি জয়দেব তাঁর *গীতগোবিন্দ* কাব্যে নিজেকে 'পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তী' ও 'পদ্মাবতী রমণ জয়দেব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। জানা যায়, পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে দেবদাসীরা নৃত্য-গীতে দেবতার বন্দনায় ব্রতী ছিলেন। কবি জয়দেব তাদের নৃত্য-গীতে তালরক্ষা করতেন।

অধিকাংশ জয়দেব-গবেষক একমত পোষণ করেছেন যে, তিনি পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে কিছু গবেষক তাকে নবরসিক ধর্মজাত আদ্যরসিক ও বৈষ্ণবীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এই মতটি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। বৈষ্ণব ধর্মাচরণে *ভাগবতপুরাণ* হলো বৈষ্ণব ধর্মমতের ভিত্তি এবং *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা* হলো ঐ মতের সূত্র গ্রন্থ ; কিন্তু জয়দেব *গীতগোবিন্দ*কাব্য *ভাগবতপুরাণ*কে অনুসরণ করে রচনা করেননি। উক্ত গ্রন্থের উৎসভূমি *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*। *ভাবগতপুরাণে* শ্রীশ্রীমহারাসের বর্ণনা পাওয়া যায় শারদীয় রাস হিসেবে। অর্থাৎ, শরৎকালীন পূর্ণিমা রাতে কৃষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করে রাসক্রীড়ায় মিলিত হয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত আছে :

'ভগবানপি তা রাত্রিঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগ মায়া মুপাশ্রিতঃ ॥
অর্থাৎ ভগবান হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালীন প্রস্ফুটিত-মল্লিকা-কুসুম শোভিত সেই সকল রজনী সমাগত দেখিয়া যোগ মায়া-শক্তিকে আশ্রয় করতঃ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন।[২]

কিন্তু জয়দেবের কাব্যে লক্ষণীয়, তিনি বসন্তকালীন রাসলীলার বর্ণনায় কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব সৃষ্টি করেছেন, যার উৎস হিসেবে নিয়েছেন *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের* অনুরূপ কাহিনী। এর কারণ – সম্ভবত জয়দেবের সময়ে

বাংলায় *ভাগবতপুরাণের* যথেষ্ট প্রচার ছিল না। মঙ্গলাচরণ থেকে দ্বাদশ সর্গের সমাপ্তি পর্যন্ত *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের* মত অবলম্বনেই গ্রন্থসূত্র স্থায়ী রূপলাভ করেছে। তাঁর কাব্যের ভাবচিত্রণে ভারতীয় প্রাকৃত প্রেমরস এবং রাধার চিত্রাঙ্কনে বাৎসায়ন প্রণীত *কামসূত্রের*, *অমরুশতকের* এবং কালিদাসের *কাব্যাবলীর* দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

---

১. শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেবসাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা-১৫৬

২. ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী (সম্পাদিত), *শ্রীমদ্ভাগবত*, রাস পঞ্চ অধ্যায়, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মহানামঅঙ্গন, কলিকাতা-৫৯, ১৪০০ সাল, পৃষ্ঠা-৮

গীতগোবিন্দের কাহিনি পরিসর দ্বাদশসর্গে বিস্তৃত। এই অল্প পরিসরে কবি উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা বর্ণনায় শৃঙ্গাররসকে অবলম্বন করেছে। আলোচ্য কাব্যের রচনাকৌশল, রস প্রকাশ ও ভক্তির দ্যোতনা অদ্যাবধি সমগ্র ভারতবর্ষে আদরণীয় হয়ে রয়েছে। কারণ :

> খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর এই উদাত্ত আহ্বান, প্রেমিক কবি জয়দেবের রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আদি রসাত্মক প্রেমলীলার ভাবধারাস্নাত গীতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমগ্র বাংলায় এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ... 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন ঘটিয়েছিল। ... গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগণ গীতগোবিন্দে বর্ণিত শৃঙ্গার 'রসাত্মক প্রেমকেই রাধারানীর' 'মহাভাবে' রূপান্তরিত করে সর্বজনস্বীকৃত এক মহতী বৈষ্ণবধর্মের সৃষ্টি করে অপাপবিদ্ধ দিব্যলোকে উন্নীত করেছেন। জয়দেবই রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা।[১]

গীতগোবিন্দে দেখা যায়, রাধা কৃষ্ণের বড় অর্থাৎ কৃষ্ণ কনিষ্ঠ বয়সী বালক। ভীরু স্বভাব তার। কবি যেন এক অসাধারণ চিত্রকল্পে রাধা ও কৃষ্ণের মনোভাব প্রকাশ করেছেন – আকাশে ঘন মেঘ সঞ্চার হচ্ছে, বন পথ অন্ধকারে ছেয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণ বালক তাতে ভীরু স্বভাব – হে রাধে ! তুমি একে অচিরে গোকুলে নিয়ে যাও।নন্দ মহারাজের এই নির্দেশ পেয়ে রাধা কৃষ্ণকে সাথে নিয়ে যমুনার তীর ধরে চলতে লাগলেন। ক্রমে তারা গভীর বনে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে রাসস্থলীতে এসে প্রবেশ করলেন। সেখানে প্রতীক্ষা করছিল ব্রজগোপযুবতীবৃন্দ; তারা রাধারই স্বভাবপুষ্ট। কৃষ্ণবিরহে যে অন্তর তাদের বিরহকাতর ছিল, সহসা পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল। কৃষ্ণদর্শন পেয়ে তাদের মানসভূমি রসে প্লাবিত হয়ে উঠল। গোপী দর্শনেও কৃষ্ণের অন্তর ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। যেন তাঁর অন্তর রাধা অপেক্ষা গোপীগণের প্রতি অধিকতর প্রেমোচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন। কৃষ্ণের এই ভাবগতি দেখে রাধা বেঁকে বসলেন। অভিমানের জোয়ারে ভাসতে লাগলেন। এই অন্তঃলীন প্রেম-প্রবাহ বামাগতি লাভ করল। গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কৃষ্ণ তা বুঝে নিলেন এবং এতক্ষণ যে ভাব প্রদর্শন করছিলেন তা সম্বরণ করলেন। অভিমানিনী রাধার মান ভাঙাতে তিনি তাঁর পদযুগল তলে বসে মধুর কথা বলতে লাগলেন। পদপ্রান্তে পতিত কৃষ্ণের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হলো, 'দেহিপদপল্লবমুদারম্। গোপললনাগণও অবস্থা বুঝে রাধার মান ভাঙাতে চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে রাধার মানভঞ্জন হলো। নবকিশোর নটবর কৃষ্ণ নিবিড় মিলন-সুখ লাভ করলেন। উল্লেখ্য, *গীতগোবিন্দের* উল্লিখিত কাহিনি রচিত হয়েছে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রচলিত লোককথার ভিত্তিতে কিন্তু কাহিনির বহিরঙ্গ *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের*। তাহলেও তাঁর কাব্যকলায় বিভিন্ন কারুকার্যের অন্তরালে ফল্গুধারার মতো নিঃসৃত হয়েছে সংকেতধর্মী সাধনার আবহ। তাঁর কাব্যপাঠে সহজেই অনুমেয় হয়, রাধা-কৃষ্ণ নিয়ে লোককথার সৃষ্টি বহুকাল আগেই ছিল এবং দশম ও একাদশ

শতাব্দীতে জনসমাজে রাধা-কৃষ্ণ প্রণয় নিয়ে উপকথা ও কথার সৃষ্টি হয়। জয়দেবে এসে আমরা লক্ষ করি. 'বাঙলায় জয়দেবই রাধা প্রেমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠান। কারণ, *শ্রীমদ্ভাগবতে* সচেতনভাবে 'রাধা' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে* এসে রাধা-কৃষ্ণ প্রণয় পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। *গীতগোবিন্দের* আঙ্গিক বিন্যাস ও রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়লীলা কারুকার্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে প্রেম, মান ও বৈচিত্র্য। এ যেন প্রচ্ছন্ন সংকেত প্রকাশ, কবি তার উৎস সন্ধান করেছেন লোককথা ও পুরাণে। ড. ক্ষুদিরাম দাস এ-বিষয়ে যে মত প্রদান করেছেন তা স্মরণীয়:

---

১. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৬ - ২৭

> *ব্রহ্মবৈবর্তের* সাথে *গীতগোবিন্দের* শ্লোকের মিল দেখা যায়। তা ছাড়া বর্ণনারীতিতে এবং ভাষাভঙ্গির দিক থেকে লীলাশুকের *কৃষ্ণকর্ণামৃতের* গীতাত্মক রচনাগুলির সঙ্গে *গীতগোবিন্দের* আত্মীয়তা স্পষ্ট।[১]

কবির মানসভাবনা যে উৎসধারা হতেই আত্মপ্রকাশ করুক, তাঁর রচনায় কাব্য এবং ধর্ম পরস্পরকে অবলম্বন করে উপস্থাপিত হয়েছে। বৈষ্ণবধর্ম হৃদয়ভাব ও অনুরাগমিশ্রিত ধর্ম বলেই *গীতগোবিন্দ* রোমান্টিক কাব্যলক্ষণাক্রান্ত এবং কবির উচ্চ কবিপ্রতিভা এবং তিনি সাধক ছিলেন বলেই প্রেমধর্ম ও রম্যকাব্যের লক্ষণ যুগপৎ তাঁর মানসভূমিকে তৈরি করেছিল। এখানে জয়দেব সার্থক, নমস্য। হরেকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায় এ-বিষয়ে জানিয়েছেন :

> গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন বিচারে শ্রীমন্ মহাপ্রভু *শ্রীগীতগোবিন্দ* গ্রন্থখানিকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* সঙ্গে সমান মর্যাদায় একই আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই গ্রন্থখানিকে প্রেম - ধর্মের সূত্রগ্রন্থরূপে পূজা করিয়া থাকেন।[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বৈষ্ণব কবির গান' প্রবন্ধে একে স্বর্গের গানের সাথে তুলনা করেছেন। সৌন্দর্যের বাতায়নে বসে যেন তিনি সাধক কবির বেণুবাদন শুনেছেন। জয়দেব সম্পর্কে লৌকিক কিংবদন্তিটি এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য :

> জয়দেবের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিল। জয়দেব পরম শ্রদ্ধায় তাঁর পূজা করতেন। তিনি ভক্তিমান প্রেমিক কবি। জয়দেবের এই *গীতগোবিন্দ* গ্রন্থখানি সেই দেবমন্দিরে বসেই রচিত হয়েছিল। একদিন তিনি 'মানভঞ্জন' পদটি রচনার শেষে দেহিপদপল্লবমুদারম্'- শব্দ কয়টি লিখতে ইতস্তত করে না লিখে তৎপরিবর্তে অন্য কোন শব্দ, প্রয়োগ করা যায় কিনা তা ভাবতে ভাবতে নদীতে স্নান করতে গেলেন, কিন্তু কোন উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেলেন না। কেবলি ঐ 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' কথাটিই তাঁর মনে পড়তে লাগল। তিনি যেন তা জপ করে চলতে লাগলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের মূর্তিতে গৃহে প্রবিষ্ট হয়ে পদ্মাবতীকে আহ্বানপূর্বক গ্রন্থখানি আনিয়ে 'দেহিপদপল্লবমুদারম্'– শব্দ কয়টি স্বয়ং লিখে, ভোগ-রাগ সমাপ্ত করে প্রসাদ গ্রহণপূর্বক বিশ্রামার্থে শয্যা গ্রহণ করলেন। পদ্মাবতীও প্রসাদ পেতে বসলেন। এমন সময় জয়দেব নদী থেকে স্নানান্তে আগমন করে পদ্মাবতীকে প্রসাদ পেতে দেখে বিস্মিত হলেন। পদ্মাবতীও বিস্মিত হন এবং পূর্বকথা প্রকাশ করেন। জয়দেব অগ্রে গ্রন্থখানি উন্মুক্ত অবস্থায় 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' বাক্যটি লেখা দেখেন। তারপর তিনি বিগ্রহকে পরম আবেগে দর্শন ও প্রণাম প্রদর্শন করতে-করতে বিগ্রহের সন্নিধানে গমন করলেন।[৩]

উদ্ধৃত বক্তব্যের হয়তো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, কিন্তু চৈতন্য সমসাময়িক এবং পরবর্তী অনুসারীবৃন্দ যে ভাবে জয়দেবকে সম্মান করেছেন তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও পদাবলির বিবর্তনধারায় অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা। পদাবলির রসোচ্ছ্বাসের উৎসে 'দেহিপদপল্লবমুদারাম্' শব্দটিকেই স্থাপন করলে বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের যেমন মূল বিগ্রহের স্বরূপ প্রকটিত হয়, অনুরূপ 'রাগানুগা' ভক্তির উৎকর্ষের মূল

---

১. ক্ষুদিরাম দাস, *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৩১

২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৬

৩. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয়বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৫ - ২৬

সূত্রেরও সন্ধানলাভ সহজতর হয়। স্বরূপলীলার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই উভয়দিকের তত্ত্ব স্পষ্ট হয়। বৈষ্ণব দর্শনের যে পরম আবেগ, বিবর্তিত ধারায় চৈতন্য-উত্তর যুগে যুগল-মূর্তিতে আস্বাদিত হয়, বলা যেতেই পারে যে, এর মূলসূত্রে অবস্থানকারী কবি জয়দেব এবং পদাবলির বিচিত্র মাধুর্যে তিনি অগ্রে ভক্তি, শ্রদ্ধায় প্রণম্য হয়ে রয়েছেন। তাঁর 'যদি হরিস্মরণে সরসংমনো'– বাক্যটিই বিবর্তনের পথ ধরে বৈষ্ণবীয় ভক্তিধারায় নব ফল্গুধারা সৃষ্টি করেছে। বাংলার বৈষ্ণব সমাজে জয়দেবের অবস্থান *গোপাল-চম্পূ*গ্রন্থের উত্তর ১২/৮৪/এ উল্লেখিত ব্রজবার্তা জানাতে রাধা ভক্ত উদ্ধবের হাতে যে পত্র দিয়েছিলেন তার অনুরূপ :

> ব্রজশশধরতা ব্রজগান্ত্যাজ্যা
> ন কলঙ্কশঙ্কয়া ভবতা।
> ন শশী কলঙ্কতনুম প্যুজ্মতি
> শশকং স্বমাশ্রিতং জাতুঃ ॥

> অর্থাৎ হে ব্রজচন্দ্র, তুমি অন্ধকার করিয়া বর্তমানে মথুরার আকাশে উদিত হইয়াছ, তথাপি কলঙ্ক আশঙ্কায় ব্রজাঙ্গনাগণকে পরিত্যাগ করিও না। শশধর তাহার অঙ্কাশ্রিত, কলঙ্কমূর্তি শশককে কখনও পরিত্যাগ করে না, বুকে লইয়াই গগনপথে বিচরণ করে। তাহাতে কেহ তাহার উপর দোষারোপ করে না। আমরাও তোমার অঙ্কাশ্রিত, বক্ষে রাখিলে কলঙ্ক হইবে না।[১]

সমালোচক যতই বলুন *গীতগোবিন্দে* গীত আছে মাত্র, গোবিন্দ নাই, তবুও বৈষ্ণব সম্প্রদায় উল্লিখিত উদ্ধৃতির ন্যায় কবি জয়দেবকে আপন অঙ্কাশ্রয়েই রেখেছেন আপনাপন সম্পদ হিসেবে, ভাব-তত্ত্বের উৎস হিসেবে।

বিদ্যাপতি

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের রসধারায় বিদ্যাপতির স্থান সুউচ্চে। যদিও তিনি ছিলেন পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ–কুলধর্মে পরম শৈব। কিন্তু সহজিয়া বৈষ্ণব সাধকগণ বিদ্যাপতিকে স্থান দিয়েছেন 'নবরসিকের' অন্যতম রসিক মহাজন হিসেবে। মিথিলার আবাল্য কবি-স্বভাবী ও শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যাপতি বাংলায় 'মৈথিল

কোকিল', 'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। মিথিলায় তাঁর উপাধি ছিল 'কবিসার্বভৌম'। তাঁর জীবনের প্রধানতম ঘটনাগুলি পর্যালোচনায় জানা যায় :

> তিনি একাধারে কবি, শিক্ষক, কাহিনীকার, ঐতিহাসিক, ভূবৃত্তান্তলেখক ও স্মার্ত নিবন্ধকার হিসাবে ধর্মকর্মের ব্যবস্থাদাতা ও আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক ছিলেন।[২]

---

১. শ্রীজীব গোস্বামী, *গোপাল-চম্পূ*, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী কর্তৃক গ্রন্থকৃত *উদ্ধব-সন্দেশ* থেকে উদ্ধৃত, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মহানাম অঙ্গন, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-২০৪

২. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়: নব পর্যায়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৭

বিচিত্র জীবন ও কর্মপ্রবাহে সজ্জিত বিদ্যাপতির আত্মপরিচয়। মিথিলার কবি হলেও তাঁর প্রতিষ্ঠা হয় বাংলায়। বাংলার ভক্তজীবন ও আদর্শ রূপায়ণে বিশেষ করে বৈষ্ণবীয় রসধারায় তাঁর প্রেমাভিব্যক্তিমূলক ভাবকে গ্রহণ করা হয়েছিল। বিশেষভাবে চৈতন্যদেবই তাঁর কবিত্বকে বাংলায় এবং ক্রমান্বয়ে বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল, আসামে বিস্তৃত করতে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাংলার বৈষ্ণব সমাজে পরম আদরণীয় হয়ে উঠেছিলেন চৈতন্যের জন্যই। চৈতন্য-উত্তর যুগে বিদ্যাপতিকে দেখা যায় রসিক মহাজন কবি হিসেবে। অথচ, বৈষ্ণবীয় মার্গধারায় তিনি প্রেমোন্মাদ বৈষ্ণব ছিলেন না। তবে, তাঁর জন্মের বহুকাল পূর্বেই বৈষ্ণব-রসধারা পল্লবগ্রাহী হয়ে উঠেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে তা প্রমাণিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রাঢ়বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যের একটি বিশেষমাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত লোকধর্মের বিন্যাস ও আত্তীকরণের ধারাবাহিকতায় ব্রাহ্মণেরাই বৈষ্ণব উপাসনাকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত করেছিলেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সম্প্রসারণে বিভিন্ন মতের সহাবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতিকে বহু পণ্ডিত, গবেষক 'পঞ্চোপাসক' স্মার্ত ব্রাহ্মণ উল্লেখ করেছেন এবং বৈষ্ণব অর্থে তাৎপর্যমণ্ডিত নয় উল্লেখ করেছেন।

সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বোঝা যায়, রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কবিতায় তিনি যেভাবে পদবিন্যাস করেছেন, আত্মনিবেদনের চরম উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তা অন্যত্র এতটা ভাবাবেগ প্রাপ্ত হয়নি। 'পঞ্চোপাসনা' বিদ্যাপতির বহুকাল পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। উল্লেখ্য, বাংলায় পঞ্চোপাসনার শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য ও বহমানতায় বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ স্থান ছিল। এই 'পঞ্চোপাসনা' এখনও বৈষ্ণবীয় মার্গ বিধিতে দুর্লক্ষ্যণীয় নয়। পঞ্চম শতক হতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যে সব বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কিত উপপুরাণ - (*আদি পুরাণ*, *কল্কিপুরাণ*, *ক্রিয়াযোগসার*, *নরসিংহ পুরাণ*, *সাম্ব পুরাণ*, *ভবিষ্যোত্তর পুরাণ*, *বৃহদ্ধর্ম পুরাণ*, *বৃহন্নারদীয় পুরাণ*, *বিষ্ণু পুরাণ*) রচিত হয়েছে তাতে লক্ষ করা যায় বৈষ্ণব ধর্মের সাথে 'পঞ্চোপাসনার' মিশ্রণ। এসব বৈষ্ণব উপ-পুরাণে পূজা, ব্রত, আচার-অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎ মেলে। একাধিক গ্রন্থে 'দাস্যভাব' উপলক্ষ্য হয়েছে। *আদিপুরাণে* রয়েছে 'মধুরভাব'-এর বহিঃপ্রকাশ, যার উৎসে রয়েছে *ভাগবত পুরাণ*। *স্মৃতিশাস্ত্রেও* বৈষ্ণবীয় ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচার লক্ষ করা যায়। অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং হলায়ুধ 'বৈষ্ণব পূজন পদ্ধতি' সম্বন্ধে স্মৃতিনিবন্ধ রচনা করেন। ভট্ট রচিত *ভাগবততত্ত্ব* এবং হলায়ুধ রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ও *বৈষ্ণবসর্বস্ব* গ্রন্থে এর যথেষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক ধর্মের সাথে বৈষ্ণব ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের যে প্রয়াস সেখানে ছিল তা ধর্ম সমন্বয়ের ভাবনা আবার বহির্ভাগে ছিল সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা। 'পঞ্চোপাসনা' ধর্মীয় সহাবস্থানকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ধারায় নিয়ে এসেছিল।

এখানে মূল বিষয় ছিল লোককল্যাণমূলক কর্মপন্থার অবলম্বন। এই সাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজ-বিধায়কদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে। R. S Sarmaএ-বিষয়ে জানাচ্ছেন :

> শৈবরা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য লোককল্যাণমূলক কর্মপন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধি পৃষ্ঠপোষকতার উপরে নির্ভরশীল ছিল; পৃষ্ঠপোষকতার আঞ্চলিক চরিত্রও ছিল। ধনী জমিদারগণ শৈব-শাক্ত ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের সমর্থক। বৈশ্যরা বৌদ্ধ ধর্মকে সমর্থন করেন। লোক সংস্কৃতিতে কৃষ্ণ, শিব, চণ্ডী সমানভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ ছিলেন। পঞ্চোপাসনার ঐতিহ্য ধর্মীয় সহাবস্থানকে অর্থপূর্ণ করে। একটি মত অনুসারে শাক্ত তন্ত্র থেকেই বৈষ্ণব ধর্মে মাতৃদেবতা রাধার কল্পনা আসে।[১]

---

১. R. S. Sarma, *Materia-Milieu of Tantricism, Indian Society : Historical Probings : Essay's in Honour of D. D. Kosambi*, R. S. Sarmaed. New Delhi, people's publishing House, 1974. P.-188-189.উদ্ধৃতি, রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ, কলকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-১৫

বিদ্যাপতির মানসগঠন প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত আলোচনাটি বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ গবেষকগণ যে ভাবে তাঁকে বৈষ্ণব আখ্যা দিতে নারাজ; সেক্ষেত্রে আমাদের অভিমত, বিদ্যাপতি হয়তো বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন পঞ্চোপাসক। কিন্তু তাঁর মানসভূমি সজ্জিত হয়েছিল ঐতিহ্যের সহাবস্থানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। ফলে, তিনি একাধারে লিখলেন ঐতিহাসিক কাব্য *কীর্তিলতা*, নীতিকথামূলক *পুরুষ পরীক্ষা*, রণ-নৈপুণ্য ও প্রেম-নৈপুণ্য বিষয়ক *কীর্তিপতাকা*।

১৪০২ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উল্লিখিত রচনাগুলোর সময়কাল। ১৪৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কবি রচনা করেন *শৈবসর্বস্বহার*, *গঙ্গাবাক্যাবলী*। ১৪৪০-৬০ এর মধ্যে রচনা করেন *বিভাগসার*, *দানবাক্যাবলী*, *দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী*। অধিকাংশ বিদ্যাপতি গবেষক ১৪১০-১৪১৪ খ্রিস্টাব্দকে সুবর্ণ যুগ বলেছেন। ১৩৮০ (আনুমানিক) খ্রিস্টাব্দে দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তঃপাতী বিস্‌ফী গ্রামে গণপতি ঠক্কুর (ঠাকুর) এর সন্তানরূপে যে সুযোগ্য পুত্র সন্তানটি জন্ম নিয়েছিল তাঁর মানসভূমি তৈরি হয়েছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে। রাধাকৃষ্ণ প্রেম-বিষয়ক *কৃষ্ণলীলারস* তাঁর সুবর্ণ সময়ের সৃষ্টি। অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার বিদ্যাপতির অকৃত্রিম পদরূপে ৭৯৯টি পদের উল্লেখ করেছেন। সেখানে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলো বিদ্যাপতিকে দিয়েছে সম্মান, অমরত্ব এবং পরম বৈষ্ণবের মর্যাদা। আত্মনিবেদনে বিদ্যাপতি যেভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তাতে তাঁকে পরম বৈষ্ণব না বলে উপায় থাকে না। আত্মনিবেদনের একটি পদ এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য:

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল দেহ সমপিলুঁ।
দয়া জনি ছোড়বি মোয় ॥
গনইতে দোস গুনলেস না পাওবি
জর তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥
কি এ মানস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে

অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাক গতাগত পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভনই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুআ পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥[১]

বিদ্যাপতি রচিত পদাবলির ভাষা ব্রজবুলি। চৈতন্যদেবের অনুগ্রহে যেমন বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিলেন তেমনি তাঁর রচিত ব্রজবুলিকেও বঙ্গীয় ভাষা হিসেবে বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রদ্ধায় স্থান দিয়েছেন এবং কেউ কেউ এই ভাষায় উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলির বিবর্তিত রসধারায়ও বিদ্যাপতি গৌরবোজ্জ্বল আসনে আসীন হয়ে রয়েছেন।

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১১১

জয়দেবে আমরা দেখেছি কৃষ্ণ কনিষ্ঠ বয়সী বালক, রাধা জ্যেষ্ঠা। মান, বিরহ, আক্ষেপ অবশেষে মিলন। বিদ্যাপতির পদাবলিতে রাধাকৃষ্ণের উপস্থাপন ঘটেছে প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের নায়ক-নায়িকার প্রকরণ অনুযায়ী। রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিহারে পরিলক্ষিত হয় পূর্বরাগ, দূতী সংবাদ, সখিশিক্ষা, অভিসার, মিলন, রসোদ্গার, মান, মিলন, প্রেমবৈচিত্ত্য, মাথুর ও ভাবসম্মিলন প্রভৃতিরূপ। পদকর্তার ব্যক্তিগত বিরহ[১] ও বেদনাসক্ত জীবনকে মিলনরঙ্গ অপেক্ষা মাথুর লীলার অভিব্যক্তিতে অশ্রুসজল করে মূর্ত করে তুলেছিলেন তিনি।

বিদ্যাপতির রাধা জয়দেব থেকে কিছুটা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর পদাবলি রাধা চরিত্রে তিনটি স্তর:

ক) বয়ঃসন্ধি বা মুগ্ধাভাব
খ) অভিসার মিলন, সম্ভোগ, মান এবং
গ) মাথুর বা বিরহ।

বিদ্যাপতির পদাবলিতে রাধা বালিকা। বয়ঃসন্ধিতে চলচ্চিত্ত, মানসিক চিত্তবৃত্তির দোলাচলবৃত্তিতে সংশয়াবিষ্ট হয়ে স্বাভাবিক স্থিরতা ও ধীরতাকে হারিয়ে কৃষ্ণের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে রাধা। কৃষ্ণকেই অবলম্বন করেলালসার লীলাতরঙ্গে ভাসতে থাকে সে। সম্ভোগ শেষে মাধববিহীন জীবনে নিপতিত হয়ে মনোমন্দিওে নিঃসহায় রাধা বিরহতাপানলে দগ্ধ হতে থাকে। নিরবধি অশ্রুবর্ষণে অন্তরের বিরহ-জ্বালা নির্বাপিত হয়ে পূত চরিত্র রূপে নবজন্ম লাভ করে সে। চিরন্তন এই রসরূপটি বিদ্যাপতি পরমনৈপুণ্যে উপভোগ্য করে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ-প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষকের মত স্মরণযোগ্য:

> বিদ্যাপতি রাধা কৃষ্ণের গোপলীলাকে কেন্দ্র করে হালের আমল থেকে যে সকল পদ আদিরসাত্মকতায় বিক্ষিপ্তভাবে বিন্যস্ত ছিল, তাদের প্রয়োজনানুরূপ চয়ন করে, ভাগবতীয় ভক্তি রসোজ্জ্বল ভাবধারায় বিধৌত করে গীতিসাহিত্যে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২]

বিদ্যাপতির গবেষকগণ তাঁর পদাবলিতে কৃষ্ণ ও মাধব শব্দের উল্লেখ পেয়েছেন যথাক্রমে ১ ও ১৭৫টি পদে। দুইটি পদে দেখা যায় রাধা তার প্রেমিককে 'সামি' ও 'পতি' বলে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় – বৈষ্ণবীয় রীতিতে 'পরকীয়া রসাস্বাদনে'র যে রীতি তা তাত্ত্বিকভাবে বিদ্যাপতির সময়ের নয়। বিষয়টি উপস্থিত থাকলেও বিষয়ভাব হিসেবে আরও পরে অর্থাৎ চৈতন্য-আবির্ভাবের পরে বৈষ্ণবীয় মার্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে কাম ও প্রেমের যে লক্ষণ প্রকাশিত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণ করেছেন তা বিদ্যাপতিতেও দেখা যায়। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*কারএ-বিষয়ে জানাচ্ছেন :

---

১. ১৪১৫ খ্রি. শিবসিংহের মৃত্যুতুল্য নিরুদ্দেশে বিদ্যাপতি শুধু বিয়োগ ব্যথায় ব্যাথিত হননি, ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে নানা অঞ্চলে ঘুরতে হয়েছিল। বিরহ বিষয়ক পদ এই সময়েরই রচনা।
দ্রষ্টব্য : ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০
২. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৯

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা-ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেমত প্রবল ॥[১]

উদ্ধৃত এই তত্ত্বের প্রয়োগ বিদ্যাপতিতেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ, চৈতন্য-আবির্ভাবের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে ভক্তির স্তর ও তার আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় তার উৎস প্রাচীন। বিদ্যাপতিতে এসে এই প্রাচীন উৎস ধারার বিবর্তিত রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; যা জয়দেব থেকে ভিন্ন।

এ ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির পদাবলির কিছু অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য :

১. কাম প্রেম দুহু একমত ভএ, রহু কখন কন করাবে।[২]
২. কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
না বুঝাল কৈসন কাল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তেও হিয় জুড়ন না গেল ॥[৩]

বিদ্যাপতির পদাবলি আলোচনা প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ যে মন্তব্য করেছেন তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ :

> সত্যবটে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ শ্লোকে-আর্যায়-গাথায় রাধাকৃষ্ণের কাম-প্রেম লীলা আগে অনেক রচিতহয়েছিল, জয়দেবও প্রিয়বটে, কিন্তু নারী-পুরুষের কাম-প্রেম সম্পৃক্ত এমন সূক্ষ্ম, বহুধা ওবিচিত্র অনুভব জগতের আর কোন সাহিত্যে মেলে না। রূপ-কাম-প্রেম সম্পর্কিত যত গভীর ও যতপ্রকার অনুভব, উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি মানুষের পক্ষে সম্ভব, পদাবলীতে বিভিন্ন কবি সার্থকভাবে তা প্রকট করেছেন। বিশেষ ছাঁচের ও বিশেষ উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতা নিয়ে পৌনঃপুনিকতা দুষ্ট হয়েও তা

> বিশ্বসাহিত্যে অনন্য। সীমিত অর্থে গীতিকবিতা হয়েও তা মানব বৃত্তি-প্রবৃত্তির, বাসনা-কামনার, আনন্দ-বেদনার, রূপ-অপরূপের অভিব্যক্তি আধার ও আকররূপে চির-সৌন্দর্যের ও চির-মাধুর্যের উৎস হয়ে রয়েছে। ... বিদ্যাপতিই এক অর্থে এই কাম-প্রেমরসের বিচিত্র বর্ণালী-জগতের প্রথম ও প্রধান স্রষ্টা। ... কাম প্রেমানুভূতির জগতে বোধে, অনুভবে, উপায়ে, উপকরণে, ভাষায়, ছন্দে, রূপে, রসে ও চাওয়া-পাওয়ায় বিদ্যাপতিই ছিলেন আদর্শ ও দিশারী।[৪]

বিদ্যাপতি রাধা চরিত্র সৃষ্টিতে আলংকারিক চিত্রশিল্পীর ন্যায় উপস্থিত হয়েছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য তথাবাংলা সাহিত্যে রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশের পর্যায় তাঁর থেকে ধরা যেতে পারে। 'বয়ঃসন্ধি' পর্যায়ে রাধার দেহ-মন উভয়েরই পরিবর্তন ও বিকাশ কবি অপরূপ কৌশলে উপস্থাপন করেছেন। প্রেমকলায় অনভিজ্ঞা রাধাকৃষ্ণ মিলনাশঙ্কায় ভীত, সন্ত্রস্ত। কিন্তু অজ্ঞাতযৌবনা রাধা সখী ও কৃষ্ণের চেষ্টায় পূর্বরাগের যোগ্য নায়িকা হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণের সাথে মিলনভীতি ও কামনার লজ্জা গ্রাস করার পূর্বেই সুখস্বপ্নের বিকাশে তাঁর অন্তরলোক বিকশিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধে এই রাধার রূপ ও মনোলোকের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি বিদ্যাপতির রাধাকে আবিষ্কার করলেন অনন্য মহিমায়ঃ

> রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢলঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকেএকটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি। একটু ব্যাকুলতা, একটু আশানৈরাশ্যের আন্দোলনও আছে। ... বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভালো করিয়া জানে না, দূরে সহাস্য সতৃষ্ণ লীলাময়ী নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক-অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়াঅতিসাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটু মাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।[১]

'অভিসারিকা ও মান' পর্যায়ে বিদ্যাপতির বৈচিত্র্য অসাধারণ। মানের শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব *গীতগোবিন্দে* কুঞ্জ সজ্জায় অপেক্ষারতা রাধার বিলাপের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা অত্যন্ত করুণ। বিদ্যাপতি জয়দেবের এই ধারা অনুসরণ করলেও করুণ আবহ সৃষ্টিতে বাস্তব ও পরিমিত বোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'কলহান্তরিতা'য় মান-বিরহে অনুতপ্তা রাধার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা অনবদ্য। উল্লেখ্য, চৈতন্য-উত্তর যুগে মানিনী কলহান্তরিতা রাধার স্নিগ্ধ-কোমল, অভিমানসুন্দর রূপ আরও সার্থক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বিদ্যাপতিরই সৃষ্টিপথে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্য-পরবর্তী সাধকগণ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কিছু কিছু পদকে চৈতন্য-আবির্ভাবের সংকেত হিসেবে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। বিদ্যাপতি সম্ভবত চৈতন্য-পরবর্তী এবং বর্তমানকালেও যে শ্রদ্ধারআসনে আসীন তার একটি কারণ – তাঁর পদে প্রেম-বেদনার গভীরতা বোঝাতে তিনি যে

---

১. শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪২

২. উদ্ধৃতি, সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩০

৩. উদ্ধৃতি, রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ, কলকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-১৬

৪. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড), নিজ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৩০২

আত্মবিলাপ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে চৈতন্য-অবতারের সংকেত তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের অভিমত একই। যেমন :

> শূন্য গোকুলে যমুনার গোপ-গোপীরা আর কেলি করে না। পিঞ্জরেশুক পাখী কাঁদছে। রাধা আত্মবিসর্জনের সংকল্প নিচ্ছেন-
> সাগরে তেজিব পরাণ।
> আন জনমে হেরব কান ॥
> কাহ্নু হোয়ব যব রাধা।
> তব জানব বিরহক রাধা ॥
> অন্য জন্মে রাধা কৃষ্ণকেই রাধা রূপে দেখতে চান। কানু রাধা হয়ে এলে রাধার বিরহ উপলব্ধি করতে পারবেন।[২]

---

১. সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত), *রবীন্দ্র-রচনাবলি* (দশম খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা-২০১৬, পৃষ্ঠা-৫৮৯
২. উদ্ধৃতি, নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়: নবপর্যায়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৮৭

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে বিদ্যাপতি প্রেম-বেদনার গভীরতার চিত্র এক চিত্তাকর্ষক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করেছেন। চৈতন্যদেবের মহাআবির্ভাবের সূত্র বা সংকেত থেকেও পদকর্তার রাধা বিরহের আর্তি গভীর ভাবে বিকশিত হয়েছে এবং পদাবলির বিবর্তিত বিষয়ভাবে উল্লিখিত স্তরটি আমাদের কাছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলিতে 'রাধাতত্ত্ব' এক অনির্বচনীয় বিষয়। ভাবে ও বিষয়ে, নাম ও নামীতে, সর্বোপরি বৈষ্ণবের যুগলভজনে রাধাঠাকুরাণীই আলোকশতদল মেলে বিকশিত হয়েছে।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক-পদাবলির পদে বৈষ্ণবীয় ধারা এবং দর্শনের বৈশিষ্ট্য স্থাপনে তাঁর অবস্থান চিহ্নিত করতে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

বয়ঃসন্ধি

১. মাধব কি কহব সুন্দরি রূপে।
কতেক জতন বিহি আনি সমারল
দেখলি নয়ন সরূপে।

২. অধর বিম্ব সম দসন দাড়িমবিজু
রবি সসি উগথিক পাসে।
রাহু দূরি বসু নিয়রো না আবথি
তেঁ নহি করথি গরাসে।

পূর্বরাগ (কৃষ্ণ)

৩. গেলি কামিনি গজুও গামিনি
বিহসি পলটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকি ডেলি বর নারি।

গিরিবর গরুঅ পয়োধর পরসিত
গিম সজযোতিক হারা।

৪. কাম কম্বু ভরি কনয় সম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনি ধারা ৷৷

পূর্বরাগ (রাধা)

৫. মাধবে বোললি মধুরম বাণী
সে সুনি মোঞে কান;
তাহি অবসর ঠাম বাম ভেল
ধরি ফুল ধনু পঁচবান।

উৎকণ্ঠিতা

৬. হরি বিসরল বাহর গেহ।
বসুহ মিলন সুন্দর দেহ ৷৷

বিপ্রলব্ধা

৭. সাজি অভিসারা পড়ি আঁধিয়ারা
উগি জনু জা বোরা।
আরতি বেরা জঞো হো মেরা
লাখ গুণ সুঅ থোরা ৷৷

প্রার্থনা

৮. তোহে বিসরি মন তাঁহে সমাপলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে ৷৷
মাধব হম পরিণাম নিরাসা
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতত্র তোহরি বিশোযালা।[১]

বিদ্যাপতির উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে বিষয়ভাবের বিন্যাসকৃত রূপ-মাধুর্য, বৈষ্ণব রসধারার সূত্র এবং ভাবালুতাজ্ঞাপন সর্বোপরি রাধা ও কৃষ্ণের অবস্থার বহুরৈখিক বিবরণ পাওয়া যায়। জয়দেবের রাধার অবস্থান থেকে বিদ্যাপতির রাধা হয়ে উঠেছে আরও পরিণত ও সুবিন্যস্ত :

> জয়দেব শ্রীরাধার কতগুলো বিশেষ অবস্থার বিবরণ দিয়েছিলেন। ব্রজবুলি পদাবলী শ্রীরাধার অবস্থার এবং অবস্থা অনুসারে প্রকৃতির বৈচিত্র্য অসীম সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল। তাতে নিশ্চয় অভিজাত কান্তিবিদ্যার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, রাধাকৃষ্ণের একটি কাব্যিক 'আর্কিটাইপ', আদিমরূপ বিদ্যাপতির পদাবলীতে সুস্পষ্ট হল।[২]

বিদ্যাপতির ভাব, ভাষা, চিত্ররূপ, ছন্দ ও অলঙ্কার চৈতন্য-উত্তরযুগে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে উঠেছিল। নরলীলাসুখ বিহাররত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের শাশ্বত চিত্র উপস্থাপনকারী বিদ্যাপতিই বাংলা

বৈষ্ণব কাব্যে ও পদাবলিতে আদিগুরুর মর্যাদায় আসীন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, কীর্তনীয়াগণ বিদ্যাপতিকে আদিগুরু মেনেই গুরু-মণ্ডল ভ্রমণ করে থাকেন।

বড়ু চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব যুগে নানা কারণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং বৈষ্ণবীয় ভাব ও রস-প্রকাশে তাঁর কাব্যের ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য যতখানি, গভীরতা প্রকাশে ততখানি নয়। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ববর্তী সময়ে রচিত এ-কাব্যের বিষয়ভাব চৈতন্য-পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণব আদর্শের ঐতিহ্যশাসিত পথের যাত্রী হয়নি। বড়ু চণ্ডীদাস শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য দিয়ে যে আখ্যান রচনা করেছেন তাতে তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতার বা বৈষ্ণবীয় রাগাশ্রয়ী পথের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু বৈষ্ণবীয় ধারা ও বিষয়ভাবের রেখাচিত্র বিন্যাসকল্পে বড়ু চণ্ডীদাস স্বতন্ত্র, ব্যতিক্রমী এবং আলোচিত কবি। জয়দেব, বিদ্যাপতির মতোই তাঁর কাব্যের জগৎ 'কাম' দ্বারা পরিবেষ্টিত; লৌকিকতায় পরিপূর্ণ। বৈষ্ণব পদাবলির মতো তাঁর চিন্তা প্রসারিত নয় এবং বৈষ্ণবীয় বিশ্বাস দ্বারাও তাঁর কাব্যচিত্ত নিয়ন্ত্রিত হয়নি। সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি বড়ু চণ্ডীদাস নামে খ্যাত হয়েছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* নামে যে পুঁথিটি প্রকাশ করেন তা বড়ু চণ্ডীদাসের লিখিত বলে অধিকাংশ পণ্ডিত সহমত জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগে চণ্ডীদাস নামে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। তবে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত এ-কাব্যটিকে সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগের আদি নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। *ভাগবত* প্রভৃতি পুরাণের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাহিনিকে উপলক্ষ্য করে এবং জনসাধারণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অমার্জিত গ্রাম্য গাল-গল্পের সন্নিবেশে কাব্যখানি রচিত। অবশ্য এতে জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্যের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। তেরোটি খণ্ড বা অধ্যায়ের সমন্বয়ে কাব্যটি রচিত হয়েছে। খণ্ডগুলো হচ্ছে জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, যমুনান্তর্গত কালীয়দমনখণ্ড, যমুনান্তর্গত বস্ত্রহরণখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহ। গোলকের বিষ্ণুর ভূ-ভার হরণের জন্য কৃষ্ণরূপে ও লক্ষ্মীর রাধাচন্দ্রাবলী রূপে জন্মগ্রহণ এবং মর্ত্যধামে তাঁদের লীলাকথাই *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের কাহিনি। লক্ষ্মীর মানবীরূপ রাধার যেবিষ্ণুরূপী কৃষ্ণই স্বামী তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। মর্ত্যলীলায় তিনি আইহন বা আয়ান-ঘোষের স্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু বড়াইরাধার পরিচয়ের স্বরূপ প্রকাশ করলে রাধার মাঝে পূর্ব স্বরূপের স্মৃতি জাগরিত হয়। কিন্তু তিনি কিছুতেই কৃষ্ণকে গুরুত্ব দেন না এবং তাঁর কোনো কথা বিশ্বাসও করেন না। সময়ের আবর্তনে রাধা নিজের ও কৃষ্ণের স্বরূপ বুঝতে পারলেন। তাদের মহানন্দে মিলন সংঘটিত হলো। কিন্তু কংসবধের নিমিত্তে কৃষ্ণ রাধাকে ফেলে মথুরায় চলে গেলে রাধা নিতান্ত বিরহকাতর হয়ে পড়লেন। বিয়োগব্যথায় জর্জরিত রাধার আত্মবিলাপে কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছে। এতে বৈষ্ণব আরাধিত প্রেমের স্বরূপচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। চৈতন্যোত্তর পদাবলিতে যে অপ্রাকৃত প্রেমের

---

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী* : সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮২, ৯৮, ও ১১০

২. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ, কলকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-১৬

ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে তা একেবারেই অনুপস্থিত। এ-বিষয়ে আহমদ শরীফের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী, ভাব ও ভাষা কোনটাই চৈতন্যোত্তর যুগের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রচনার মতোনয়। এতে বৈষ্ণব তত্ত্ব নেই, প্রেম নেই, চৈতন্যোত্তর যুগের ভাষাও নেই ...। এটি লোকগীতিনাট্যভিত্তিকরচনা — বড়ুজোর 'রতি সম্ভোগ কাব্য'।[১]

প্রাকৃতজনের মনোউদ্দীপক শৃঙ্গার রসের আতিশয্যে ও গ্রাম্য ধামালির প্রভাবে এটি প্রাকৃত জনের বিশেষ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণবীয় বিষয়ভাবের প্রাচুর্যে এই কাব্যটির স্থান নেই বললেই চলে। তবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এর ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। জয়দেব, বিদ্যাপতির প্রভাবপুষ্ট এই কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে আদিরসভাব। তিনি রাধাকৃষ্ণের যে কাহিনি বর্ণনা করেছেন তা *শ্রীমদ্ভাগবত* পুরাণ বহির্ভূত। ফলে তাঁর কাব্যের আদর্শ হয়ে উঠেছে কৃষ্ণকথার গ্রামীণ কাহিনি।

---

১. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৯৯

এ-বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত :

> ভাগবত প্রভৃতিপুরাণের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাহিনীকে সামান্য অনুসরণ করে, জয়দেবেরগীতগোবিন্দের বিশেষ প্রভাব শিরোধার্য করে এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অমার্জিত গ্রাম্য গালগল্পের ওপর ভিত্তি করে বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন।[১]

ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় এ-বিষয়ে জানাচ্ছেন :

> বড়ু চণ্ডীদাসের ভাব ও ভাষা অনেকটা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। তাঁর কৃষ্ণ একাদশবর্ষীয়া মাতুলানী রাধাকে 'শ্যালী', 'এখনি পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচরে', 'পোঁটলি বান্ধিয়া রাখ নহুলী যৌবন' এই সকল সম্মোধন করেছেন।বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণপ্রেম দেহলোলুপ রিরংসা এবং স্থুল দাম্ভিকতা-সহ অপমান কল্পিত প্রতিশোধ গ্রহণেরকোপযুক্ত কুটিল স্বভাবের দ্যোতক, বিন্দুমাত্র সদগুণালঙ্কৃত নয়।[২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রসাভাস প্রযুক্ত হলেও অথবা বৈষ্ণব স্বীকৃতি না পেলেও মানবিক চিত্তাকর্ষক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাক-চৈতন্য যুগের কবি বাশুলী (শাক্ত মতাদর্শের দেবী) ভক্ত বড়ু চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবি নন। তাঁর কৃতিত্বও পদকার হিসেবে নয়। প্রকৃতঅর্থে তিনি চরিত্রকার ও কাহিনিকার। বৈষ্ণবীয় ধারায় অপ্রাকৃত প্রেম-মাধুর্যে অথবা জীবাত্মা-পরমাত্মার পরম কাঙ্ক্ষিত মিলনে, বিরহে পদাবলির রসময়তায় যে মাধুর্য ভাবজগতে ফুটে ওঠে, বড়ুর কাব্যে তা প্রায় সর্বাংশে অনুপস্থিত। কিন্তু সহস্র কপটতার মধ্যেও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* কৃষ্ণ কোথাও কোথাও পরম প্রেমিক হয়ে উঠেছেন, হয়েছেন মধুর-লীলা-বিলাসী শ্যামরায়। কবির কীর্তন শুধুমাত্র বৈকুণ্ঠের তরে নয় বা আধ্যাত্মিকতায় নয় ; রাধা-কৃষ্ণ হয়ে উঠেছে রক্ত-মাংসে গড়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিনিধি। গোপাল হালদারের অভিমত :

জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক নয়, বরং সেদিনের প্রাকৃত জীবনে যে শত শত লম্পটের প্রণয়-জাল-বিস্তার ও প্রণয়-বিলাস কবি প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, আর যেমন দেখে থাকবেন বহু বহু সরলা গ্রাম্যবধূর প্রণয় প্রবঞ্চিত জীবনের দুর্দশা ও বেদনা, অতি সহজভাবে বড়ু চণ্ডীদাস তাই চিত্রিত করেছেন।[৩]

কবি জয়দেবের মতোই বড়ু চণ্ডীদাস মানবীয় রতি-সম্ভোগসুখ, অভিসার, বিরহকে দেখিয়েছেন জৈবিক জীবনের পরম্পরায়। যেমন :

১.রতি সুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়বেশম্ ॥
অর্থাৎ-মদনমনোহর বেশে কৃষ্ণ রতিসুখ সারভূত অভিসারে গমন করিয়াছেন। নিতম্বিনি ! গমনে বিলম্ব করিও না, তাহার অনুসরণ কর। [৪]

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৬
২. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলকাতা-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩৭
৩. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা(১ম খণ্ড)*, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৫০
৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-১১

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডে দেখা যায় একই সুর। যেমন :

তোররতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোমার শঙ্কেতবেণু বাজাএ যতনে ॥
অর্থাৎ -সর্বাঙ্গে মনোহর বেশ ধারণপূর্বক কৃষ্ণ অভিসারে গিয়াছে। রাধা, তুমি আর বিলম্ব করিও না।[১]

বিরহ বর্ণনায় জয়দেব ও বিদ্যাপতি যে পথ অবলম্বন করেছেন, বড়ু চণ্ডীদাসও বিষয়ভাবের উপস্থাপনে একই পথ অনুসরণ করেছেন। রাধা-বিরহ যেন বড়ু কবির কাব্যে নতুন মাত্রায়, ভাবেও বিন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। নীলরতন সেন এ-বিষয়ে জানাচ্ছেন :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি নাগরিক প্রেমলীলায় বিদগ্ধ নন। তাঁর নায়ক-নায়িকা নাগর-নাগরী হয়ে উঠতে পারেনি। গ্রাম্য 'গমার' গোপ কিশোর-কিশোরী রয়ে গেছে। এই কিশোরীই ধীরে ধীরে দেহশৃঙ্গারের মাধ্যমে পরকীয়া প্রেমকে উপলব্ধি করেছে এবং বংশী ও বিরহ খণ্ডে এসে কৃষ্ণ বিরহে আকুল হয়ে উঠেছে।[২]

তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে বিরহ বা আর্তবিলাপ উপস্থাপনে বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন; কোথাও কোথাও অনুকরণে বা অনুবাদে পর্যভূষিত হয়েছে। যেমন :

২.ক.নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়াতি মলয়সমীরম্ ॥
খ.i) বিধুমিব বিকট বিধুন্তুদদন্তদলন গলিতামৃতধারম্ ॥
ii) বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্ ॥

অর্থাৎ – ক. রাধাচন্দন এবং চন্দ্রকিরণের নিন্দা করিতেছেন; যাহারা স্বভাবশীতল, তাহারা অগ্নিবৎজ্বালা বিস্তার করিতেছে। তিনি এই দুর্দৈবে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। মলয় পবনকে চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পগণের সঙ্গহেতু বিষময় বলিয়া মনে করিতেছেন।

খ. i) তাঁহার নয়ন-মেঘ হইতে মনোহর বদনকমলে অবিরল জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে ; যেন বিকট রাহুর দন্ত-দলন ঘটিতেছে।

ii) সাক্ষাত কন্দর্পবোধে নির্জনে মৃগমদ দিয়া রাধা, কৃষ্ণেরই মূর্তি অঙ্কিত করিতেছেন।[৩]

---

১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩০২

২. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা-২০০৭, পৃষ্ঠা-৭১

৩. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-৯

বড়ু চণ্ডীদাসও রাধার আর্তবিলাপে একই ধ্বনি করলেন :

ক. দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি চখুত নাইসে নিন্দে ॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি লুকাওঁ তাহার পেটে।
খ. মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ।
এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞ সেজা বিছাইয়াঁ কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ ॥
আল হের। কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে।(রাধাবিরহ)

অর্থাৎ–ক. বড়াই, দিবসে সূর্যের উত্তাপ, রাত্রেও চন্দ্র অনল বর্ষণ করে। এত দুঃখ কি করিয়া সহিব? চোখ আমার নিদ্রা নাই। শীতল চন্দন অঙ্গে মাখিতেছি তবু বিরহজ্বালা শান্ত হয় না।মেদিনী বিদীর্ণহউক, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাঁচি।

খ. বড়াই, মথুরা পথে এই কদম্বের তলে ধীরে ধীরে বসন্ত বায়ু বহিতেছে। এখন বিবিধ ফুলে সজ্জা রচনা করিয়া আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছি। বড়াই গো, কৃষ্ণকে আমার কাছে আনিয়া দাও। ওগো প্রাণের বড়াই, কৃষ্ণকে আনিয়া দাও।[১]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে প্রাচীন কাব্যসমূহের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও অনুকরণ পরিলক্ষিত হলেও একটি সুস্পষ্ট রেখা চিহ্নিত করা যায়। তত্ত্বের উৎস সন্ধানে ধারাটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং কালানুক্রমিক উপাত্তে সজ্জিত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানাচ্ছেন চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদশুনে আত্মহারা হতেন। শুধু চণ্ডীদাসই নয়; জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*, বিদ্যাপতির পদ, রামানন্দের *নাট্যগীতি*, বিল্বমঙ্গলের *কৃষ্ণকর্ণামৃত*-গ্রন্থের নামও তিনি করেছেন। কবি জয়ানন্দও তাঁর *চৈতন্যমঙ্গল* কাব্যে চণ্ডীদাসের বর্ণনা করেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, চৈতন্য কোন চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন? উল্লেখ্য, চৈতন্যের আবির্ভাবেরপূর্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে পদকর্তা হিসেবে পাওয়া যায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, গুণরাজ খান, মাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখকে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর *বৈষ্ণব পদাবলী* গ্রন্থে বাঙালি বিদ্যাপতি নামে পদকর্তার উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের জনপ্রিয়তার কারণে একাধিক ব্যক্তি ভণিতায় তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। ফলে প্রাক-চৈতন্যযুগের বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। চৈতন্যযুগ এবং চৈতন্য-উত্তর যুগে চণ্ডীদাস পদাবলি সাহিত্যে এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্বে বিবেচিত হয়েছেন। ড. আহমদ শরীফ পাঁচজন চণ্ডীদাসের সন্ধান পেয়েছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণও একাধিক নামে চণ্ডীদাসের পদ তাঁদের সংকলনে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত প্রশ্নটির গুরুত্ব সর্বাধিক। বাঙালি সংস্কৃতিতে যেমন. 'কানু বিনে গীত নাই', তেমনি পদাবলির রসময়তায় চণ্ডীদাসও তাঁর পদগভীর-গভীরতর বিষয়। চৈতন্যদেবের আস্বাদনীয় চণ্ডীদাস তাই হয়ে উঠেছে পূজনীয়, আরাধিত।

---

১. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩৯৪, ৩৯৫

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চারবার খুব গুরুত্বের সঙ্গে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করেছেন :

ক. বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত।
খ. চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥
গ. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত গোবিন্দ
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ।
ঘ. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ
ভাবানুরূপে শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ।[১]

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে কবি জয়ানন্দ জানাচ্ছেন—
জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণচরিত তারা করিল প্রকাশ।[২]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সর্বত্র তিনি চণ্ডীদাস নামে উল্লিখিত হয়েছেন। কোথাও বড়ু, দ্বিজ, দীন, আদি নামে হননি।

১. যে চণ্ডীদাসের পদ এখানে উদ্ধৃত হইল তিনি বিশেষণহীন চণ্ডীদাস। একজন চণ্ডীদাস এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে অন্যান্য চণ্ডীদাস তাঁহাদের নামের সহিত বড়ু, দ্বিজ, আদি, দীন প্রভৃতি বিশেষণ যোগ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বিশেষণহীন চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন।[৩]

২. পদাবলী আস্বাদনে আমরা চণ্ডীদাস-সমস্যার কথা মনে রাখব না, আমরা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ওসহজিয়া পদকার ছদ্ম চণ্ডীদাসকে বাদ দিয়ে চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় প্রাপ্ত লোকপ্রিয় ও প্রখ্যাতপদাবলীর ভিত্তিতে আমাদের আনন্দিত আবেগপ্রকাশ করব।[৪]

অধিকাংশ পণ্ডিত উপর্যুক্ত মতের সাথে প্রায় সহমত জ্ঞাপন করেছেন। আমাদের অভিমতও অনুরূপ। চৈতন্যদেব বড়ু, দ্বিজ, দীন, আদি প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত চণ্ডীদাসের পদ নয় ; বিশেষণহীন চণ্ডীদাস, যিনি পদাবলিতে প্রেমের ফল্গুধারা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর পদই আস্বাদন করতেন। সুতরাং, উল্লিখিত কারণে বৈষ্ণবীয় আদর্শ ও রসময়তারবিচারে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য বৈষ্ণব সমাজে অনাদৃত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় বিষয়-আশ্রয়ে উক্ত কাব্য তাৎপর্যহীন হয়ে রয়েছে।

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২৬

২. উদ্ধৃতি, আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*(২য় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৯৯

৩. শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-১৩৯৮ বাংলা, পৃষ্ঠা-৩১

৪. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*(২য় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯, পৃষ্ঠা-২১১

ড. বিমানবিহারী মজুমদার ও আহমদ শরীফের এ-প্রসঙ্গে মতামত :

জয়দেব, বিদ্যাপতি তাঁদের কাব্যের আদিরসের মধ্যেও রাধাকৃষ্ণকে প্রেমিক-প্রেমিকারূপে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণকে কেবলই লাম্পট্যদুষ্ট কামুকরূপে, গ্রাম্য আদিরসাত্মক চটুলতায় ভরিয়ে উপস্থাপন করেছেন। তাই কালের নিরিখে এই কাব্য চৈতন্যদেব আস্বাদন করেননি; বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও তার মর্যাদা দেয়নি। সুখময় মুখোপাধ্যায় এ-বিষয়ে জানিয়েছেন :

> চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করেননি, করলে, এই কাব্যকে ভক্ত বৈষ্ণবরা মাথায় করে রাখতেন ... শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এমনভাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত না। [১]

সুতরাং বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ, বৈষ্ণবীয় দর্শন ও আদর্শে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য, কবি বড়ু চন্ডীদাস শুধু পরম্পরার সূত্র, কিন্তু আদর্শিক বা আদরণীয় নন; এ কথা নিদ্বির্ধায় বলা যায়। এছাড়াও মাধবেন্দ্র পুরী, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, ঈশ্বর পুরী চৈতন্য-পূর্ব যুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং তাত্ত্বিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন।

১. সুখময় মুখ্যোপাধ্যায়, *প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়*, (?) কলকাতা-১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ

জগতের সব ধর্মই, কমবেশি অনুভূতি-প্রধান, আবার কোনো কোনো ধর্ম একেবারেই অনুভূতি-প্রাণ। ভারত বর্ষের ভক্তিবাদী ধর্মসাধনা ও তার ধারা অনুরূপ অনুভূতি-প্রাণ। বৈষ্ণব ধর্ম চৈতন্যের আবির্ভাবেরই মধ্য দিয়ে একেবারেই হয়ে উঠেছিল অনুভূতি-সর্বস্ব। চৈতন্যদেব তাঁর কর্মমুখর জীবনে যে প্রবল অনুভূতি, যে ভাব-তন্ময়তার জন্ম দিলেন, ধর্ম-ভক্তি-জীবনধারণের ক্ষেত্রে তা তুলনারহিত। ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ভক্তিধর্ম তথা বৈষ্ণব ধর্মের যে নবপর্যায় শুরু হয়েছিল তা চৈতন্যের পাবনী-স্পর্শে। বস্তুত সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের সাথে চৈতন্যদেব ভক্তির যোগসূত্র স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। যদিও ভক্তিতত্ত্ব বা ভক্তিবাদ ছিল একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক তত্ত্ব, যা সমাজে প্রচলিত ভোগবাদ, প্রবহমান কর্মকাণ্ড, ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির চর্চার বিপক্ষে সমালোচনার মধ্য দিয়ে এক নতুন পথ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সমাজে নিষ্ঠুর জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে চৈতন্যের আন্দোলন সমাজ-মানসকে এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। চৈতন্যের সময়ে তাঁর ৪৯০ জন পরিকর ছিল। যাদের মধ্যে ২৩৯ জন ব্রাহ্মণ, ৩৭ জন বৈদ্য, ২৯ জন কায়স্থ, ২ জন মুসলমান এবং ১৬ জন নারী ছিলেন।[১] এ-থেকেই অনুমান করা যায় নব্যন্যায়ের শুষ্কচর্চা থেকে বের হয়ে চৈতন্যদেব ভক্তির নব রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন। *শ্রীচৈতন্যভাগবতে* বৃন্দাবন দাস জানাচ্ছেন :

> যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
> স্ত্রী-শূদ্র আদিতে অধম রাখাল ॥
> হেন ভক্তিযোগ দিমু এ-যুগে সবারে।

সুর-মুনি সিদ্ধ যে নির্মিত কাম্য করে ॥[২]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের নিরসনে ভক্তিকে কেন্দ্র করে মৌলিক নীতি গ্রহণের পথ সুগম হয়। এক্ষেত্রে *শ্রীমদ্ভাগবতে* ব্যাখ্যাত ভক্তিই জাতীয় সংহতির নীতিরূপে বিবেচিত হয়েছিল। ফলে মুষ্টিমেয় লোকছাড়া বেশির ভাগ সনাতনী হিন্দু চৈতন্যের দলভুক্ত হয়েছিল। অবশ্য দলভুক্ত হবার আর একটি কারণও ছিল, তাহলো ভক্তি-উপাস্য দেবতার সঙ্গে ভক্তের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হবার পথ সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল বা প্রচারিত হয়েছিল, ফলে অনুশীলনে তথা ক্রিয়াকাণ্ডে পৌরহিত্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। গুরুকে আশ্রয় করেই সকল সাধনকর্ম এগিয়ে নেওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিকূলে ভক্তিবাদ এজন্য অধিকাংশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গবেষক বিপিনচন্দ্র পালের একটি মন্তব্য এ-ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করছি :

> This general Vaishnava up heaval created a continental mass movement in India … The movement of Sri Chaitanya helped also very largely to emancipate the so-called lower classes or castes of Bengali Hindus from the many social evils under which they had been living in the old Brahmanical society … All these had a tremendous influence in woeking the uplift of the Bengali masses.[৩]

১. বিমানবিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা-৫৬৭

২. বৃন্দাবন দাস, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগত*, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা-৯, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ,পৃষ্ঠা-১০৭

৩. B. C pal (Bipinchndra pal), *Bengal Vaishnavism*, Calcutta, 1933, PP-119-120

চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণব ধর্মের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাধবেন্দ্রপুরী এবং বাংলায় বৈষ্ণবদের নেতা ছিলেন শ্রীহট্টের লাউড় থেকে আগত, শান্তিপুরে বসবাসরত শ্রীঅদ্বৈত। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের হাতে বৈষ্ণব ধর্ম বা ভক্তি ধর্ম এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে।

চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ

মৌর্য ও গুপ্ত শাসনামলে ভাগবত ধর্ম বিষয়ক কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হলেও শক এবং কুষাণ অধিকারকালে ভাগবতধর্ম প্রায় মৃতাবস্থায় ছিল। কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধ মতবাদ ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এই সময় ভাগবতীয় ধর্মমত ভারতের দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে প্রচারিত হতে থাকে। দক্ষিণ ভারতের প্রান্তিক সীমায় এই মতাবলম্বীগণ একটি ভক্ত সম্প্রদায় গঠন করে, যারা 'আড়বার সম্প্রদায়' নামে পরিচিত হন। এঁরাই দেশি ভাষায় কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক আদিরসাত্মক কবিতা বা গাথা রচনা করেন এবং বৈষ্ণব ভক্তিবাদের এক নতুন আবহ সৃষ্টি করেন। 'আড়বার' শব্দটির অর্থ 'ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা'। অর্থাৎ নামকরণের মধ্যেই এঁদের সাধন প্রণালীর ধারাটি বোঝা যায়। চৈতন্য প্রবর্তিত তত্ত্বে আড়বার সম্প্রদায়ের আদর্শ ও দর্শন ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণবীয় রীতি ও সাধনায়ও খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে অনুসৃত আড়বার সম্প্রদায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই সম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধন প্রণালীতে বৈষ্ণবতত্ত্বের এবং অধুনা বৈষ্ণব দর্শনের একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বিষয়ভাবের প্রাচুর্যে বৈষ্ণব পদাবলির উৎকর্ষের উৎস নির্ণয়েরও একটি সূত্র পাওয়া যায়। সুফি মতাদর্শের অনুরূপ প্রেমাদর্শের চেতনায় উদীপ্ত আড়বার সম্প্রদায় প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। উচ্চ-নীচ বিচার নেই, নেই স্ত্রী-পুরুষভেদ; তাদের অন্তর পরিপূর্ণ থাকতো শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও ভালোবাসায়। নামতত্ত্বই প্রধান কেন্দ্র,

আর অন্তর বাসুদেব কৃষ্ণে সমর্পিত। তাদের হৃদয়বৃত্তি অবগাহন করেছে শুদ্ধ প্রেমের সলিলে। প্রাণের এই আবেগ উপস্থাপিত হয়েছে অগণিত কবিতায়, নৃত্যে ও গীতে। মূলত এর মধ্য দিয়েই বৈষ্ণব ভক্তিবাদের একটি আদর্শ স্থাপিত হয়; তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনে উল্লিখিত বিষয়ের উপস্থিতি থাকলেও তা অন্ধভাবে অনুসৃত হয়নি। বৈষ্ণবীয় আদর্শের উপাত্তের ভিত্তিভূমি আড়বার সম্প্রদায়ের প্রেমাদর্শ। আড়বারগণ নিজেকে নায়িকা ও বাসুদেব কৃষ্ণ বিগ্রহকে নায়ক কল্পনা করে অনুরাগাশ্রিত মিলন, বিরহ, প্রতীক্ষা, অভিমান, প্রার্থনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সখীভাব ছিল এদের আশ্রয় আর মর্মমূলের বিষয় বাসুদেব কৃষ্ণ।

আড়বার-সুফি-বৈষ্ণব ভাবাদর্শে বাঙালি চেতনায় যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছে তা অবিস্মরণীয়। সুফি - বৈষ্ণবের পথ অনুরাগাশ্রিত প্রেমের পথ ; এই পথের আশ্রয় শুদ্ধভক্তি। বৈষ্ণব-তত্ত্বের প্রেমবাদ এবং সুফি মতাদর্শের প্রেমবাদ একসূত্রে গ্রন্থিত। বাংলায় চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবীয় আচারে, সাধনায় যে রূপ পাওয়া যায় তা সুফি-বৈষ্ণব সংমিশ্রণে ঘটেছে কিন্তু তা প্রভাববিস্তারকারী ধারায় নয়। চৈতন্য-পূর্ববর্তী সময়েই এর যথার্থ বিকাশ ঘটেছিল। সুফিমতবাদ ভাববাদী মানসিকতার ফসল এবং মর্মমূলে রয়েছে প্রেমবাদ। এই প্রেমের মূল উৎস স্রষ্টাপ্রেম। সাধ্য ও সাধনাও তাদের প্রেমেই পরিণতি লাভ করেছে। কারণ, সাধ্যই তো স্রষ্টা আর মানবিকতাই প্রেম-সাধনার নিবিড় পাঠ। স্রষ্টা আনন্দময় আর সৃষ্টি আনন্দজাত। স্রষ্টার ইচ্ছানুক্রমে যে 'কুনফায়াকুন' ; তা অনুরোধে বা গরজে হয়নি; আনন্দে, আনন্দসহচর হিসেবেই তা হয়েছে। সুফি ভাবাদর্শ তুলে ধরলো স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক। তাঁদের অনুভবে আসলো – স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্পর্ক বান্দা-মনিবের সম্পর্ক হতে পারে না। তাহলে তো সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও সার্থকতা ব্যাহত হয়। প্রণয়ের গতিতে অহেতুক বাধায় যেমন হৃদয়বৃত্তিতে ক্ষরণ হয়, তেমনি স্রষ্টা-সৃষ্টির প্রণয়রূপ সম্পর্কে কোন নিয়ম-শৃঙ্খলাই বাধা হতে পারেনি। অনুরাগেই তো প্রণয়ের উন্মেষ, বিরহভাবে বিকাশ এবং মিলনে ঘটে সার্থকতা। এই প্রেম জীবাত্মা-পরমাত্মার। তাই সুফিবাদে 'আশেক-মাশুক' এত তাৎপর্যপূর্ণ। জীবাত্মা তো পরমাত্মার খণ্ডিতাংশ অর্থাৎ বিন্দু রূপ। তার তো একক শক্তি নেই। তাই মিলনের এই আকুলতা। এই আকুলতার পরিণতি একাত্মতায়; এর রূপ 'আনাল হক'। সুফিদর্শনে ব্যাকুলতার চরমপর্যায়ে বিন্দুর সিন্ধুতে মিলন বা 'ফানাফিল্লাহ্' অথবা 'বাকাবিল্লাহ্'। বৈষ্ণবদের ভাষায় অভেদতত্ত্ব বা রূপ। যেমন :

> সূফীরা Pantheismএবং পরিণামবাদে বিশ্বাসী। ঈশ্বরের শুদ্ধসত্তা সম্বন্ধেও অবশ্য তাঁরা আস্থাবান। তাঁদের তমজ্জুলাৎ, হুবিয়াৎ, অনীয়াৎ, গুয়াদিয়াৎ প্রভৃতিতত্ত্ব ঈশ্বরের নানাত্বের মধ্যে একত্বের নির্দেশক। 'লতাইফ' বা যোগাবস্থা অবলম্বন করে এবং 'ঝিকর' বা স্মরণ-মননের যোগে তাঁরা 'তজল্লী' অর্থাৎ ব্রহ্মবোধ অনুভব করেন। পরমসত্তার বিশ্বাস লাভই সূফীদের উদ্দেশ্য। কিন্তু কেবল 'ফানা' অর্থাৎ অদ্বৈতানুভবজনিত মুক্তি বা নির্বাণই তাঁদের কাম্য নয়। 'ফিল্লাহ' অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে নিজ অস্তিত্বের অনুভব 'বজদ' ভাব সম্মেলনজাত আনন্দ-আবেগময় অবস্থা এবং 'বকা' অর্থাৎ দিব্যরসাবস্থাই তাঁদের সাধনার অভিপ্রেত শেষ অধ্যায়।[১]

সাধ্য-সাধনায় এই পর্যায়ে 'কুনফায়াকুন' বা দ্বৈতবাদ এবং 'একোহম বহুস্যাম' বা অদ্বৈতবাদ, মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। ভাব ও ব্যাহিক দশা তখন একবিন্দুতে এলে পরমের কাঙাল সুফি ও বৈষ্ণবের হৃদয়বিন্দু মানবাত্মার সুপ্ত বিরহানলে দগ্ধ হয়। তাইতো বিরহতাপে দগ্ধ ব্যাকুলচিত্ত বলে ওঠে :

ক. দানা চুঁ অন্দর জমিন পেন্‌হা শওয়াদ।
বাদ আজোঁ সারে সবজি বস্তা শওয়াদ ॥[২] (রুমী)
খ. রূপ লাগি আখি ঝুরে গুনে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ - পিরীতি লাগি থির নাহি বান্দে ॥[৩]
গ. সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥[৪]

---

১. ক্ষুদিরাম দাস, *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৩৩
২. উদ্ধৃতি, আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*(২য় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৪
৩. মুহম্মদ আবদুল হাই ও ড. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্যযুগের বাঙলা কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৩৮
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭

ঘ.সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সোই পিরীতি অনু - রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ ...
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলু
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে লাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল ॥[১]

এ যেন মিলন-পিপাসু বিরহী আত্মার করুণ ক্রন্দনধ্বনি। সুফি-বৈষ্ণব গানে, গজলে মানবাত্মার চিরন্তন বিরহবোধ বা Tragedy বহন করেছে বেদনায়, শঙ্কায়। চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙালি সমাজে ভাববাদী আদর্শের ক্ষেত্রে সু-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্যদেবের জীবনকালে এই ভাব এক মহাতরঙ্গের সৃষ্টি করে। এই তরঙ্গ বাঙালির ইতিহাসে এক অভিনব সংযোজন। এই সময় বাঙালির পুনর্জাগরণের সময়। আহমদ শরীফ মনে করেন :

ষোল শতকে বৈষ্ণব মতের উদ্ভবে যে ভাববিপ্লব দেখা দিল, তার প্রভাব গণমনের সংকীর্ণতা ও ক্রুর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করেছিল। উদার মানবিক বোধে বাঙালীর চিত্তের প্রসার, এবং রুচির বিকাশ ঘটেছিল, ... । এ সময়ে নিশ্চিতই রাধা-কৃষ্ণ লীলামহিমা বাঙালীর চিত্তহরণ করেছিল। নরে নারায়ণ

দর্শন কিংবাজীবে ব্রহ্মের স্থিতি অনুভব করা যুগের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ... তাইষোল শতক বাঙালী জীবনে ছোটখাট রেনেসাঁসের যুগ।[২]

প্রকৃতপক্ষে এই রেনেসাঁসের প্রস্তুতি চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। কারণ, অষ্টম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে অদ্বৈতবাদী সাধক শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের সাথে জ্ঞানবাদ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু এই সময়েই দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় উদ্ভূত মায়াবাদ বিরোধী উত্তরসাধক ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্কাচার্য, মধ্ব প্রমুখ তাত্ত্বিক-বেত্তা-দার্শনিক দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে প্রায় সবখানেই ভক্তিবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যায়, অদ্বৈতবাদ, তাঁদের ভক্তিবাদমানসপ্রবণতাপ্রসূত হলেও একে দার্শনিক তত্ত্বে ও প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভারতে মুসলিম আগমনের পরে লক্ষণীয় বিষয় – অদ্বৈতবাদ, ভক্তিবাদ, সুফিবাদ প্রায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যার প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় – চৈতন্য-উত্তর কালে বাংলায় বৈষ্ণব সুফি-বাউল প্রত্যেকের আচরণীয় পথ প্রায় একদিকেই ধাবিত হয়েছে। সুফি মতাদর্শের বাইরে প্রেমিক মুসলমানেরাও ভক্তিধর্মকে অন্তরে জাগিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সুফিপন্থী। এ বিষয়ে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিমত :

> সূফীমতে প্রেমই হল ভগবানের পরমস্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার এই জগৎ সৃষ্টি। নিজের অনন্তপ্রেম আস্বাদনের জন্যই এক পরম স্বরূপের বহুরূপে লীলা-ইহাই হইল সৃষ্টির তাৎপর্য। জীব হইল এই 'একে'র সৃষ্টি লীলার প্রধান শরীক-লীলা দোসর্। ... সূফী প্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেমধর্ম জনগণের

১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও ড. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্যযুগের বাঙলা কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮,পৃষ্ঠা- ১৮২

২. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৮২

> মধ্যেযে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে, বাংলাদেশের মুসলমান কবিগণ সেইসমন্বয়জাত প্রেম-ধর্মের আদর্শের সহিত অনেক স্থলে মিলাইয়া লইয়াছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তি তাহাকবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্য নিখিল প্রেম সাধকগণেরপূর্বরাগ বিরহের আর্তিতেই পরিণতিলাভ করিয়াছে এবং সেই আর্তির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধুদর্শক বা আস্বাদক রূপে খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আর্তির সহিত নিজের চিত্তেরআর্তিকেমিলাইয়া দিয়াছেন।[১]

সুতরাং ভাববাদী আদর্শের ঐক্যসূত্রে বাঙালির জাতীয় জীবনে চৈতন্য এক অপরিহার্য সত্তা হিসেবেই আবির্ভূত হলো রেনেসাঁসের আলোকবর্তিকা নিয়ে। তাঁর মহাআবির্ভাবে প্রেম-ভক্তির যে প্লাবন সৃষ্টি হয়েছিল তার ধারা-প্রবাহ বইতে শুরু করেছিল চৈতন্যপূর্ব ঈশ্বরপুরী এবং চৈতন্যযুগে, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দের মধ্য দিয়ে। এই ভক্তিবাদের মর্মমূলে যেমন রয়েছে 'সর্বজীবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'-চেতনা, তেমনি বিবর্তিত ঐতিহাসিক পটভূমি। চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের একটি সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যার মর্মমূলে প্রোথিত ছিল ধর্ম-মত-বর্ণের সমন্বিত এক ধারা। চৈতন্যযুগে আমরা বাংলায় বৈষ্ণব-সুফি-বাউলদের একটি সমন্বিত রূপ দেখি, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কোনো কোনো তাত্ত্বিক সমালোচক এই ধারণা পোষণ করেন যে, বঙ্গে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মমত বিশেষ করে তাদের আনুষ্ঠানিক ধারার বেশ কিছু বিষয় সুফিবাদ থেকে ধার করে নেওয়া। মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন :

> The message of eliminating cast, and creed, so loudly preached by Chaitanya Deva … is another important vaisnava dogma that betrays the influence of Islam and its Sufis on Chaitanya Deva and the movement he launched.[২]

তাঁর মতে বৈষ্ণব ধর্মে বা মতবাদে 'প্রেম'-সম্পর্কিত ধারণা, বৈষ্ণব কীর্তন এবং 'রাধাতত্ত্ব' ও মহাভাবগ্রস্ত 'দশা' এ সবই সুফি ধর্ম থেকে বের করে আনা। প্রমথ চৌধুরীও এ-বিষয়ে বলেছেন :

> (বৈষ্ণব ধর্মের) নবত্বের কারণ মুসলমান ধর্মের প্রভাব। মুসলমান ধর্ম যে প্রধানতঃ ঐকান্তিক ভক্তির ধর্ম, এ কথা কেনা জানে?[৩]

আহমদ শরীফের এ-প্রসঙ্গে বলেছেন :

> বৈষ্ণবদের নামকীর্তন, জীবে দয়া, বর্ণভেদ - প্রথার বিলোপ সাধন, বিনয়, নামে রুচি, দশা সখীভাব, ঐশ্বর্য প্রদর্শন, রাগানুগা ভক্তি, তালাক প্রথা, পুণর্বিবাহ প্রভৃতি সূফীদের যিকর, খিদমতসামা, হাল, সদাসোহাগ, কেরামতি, তরিকত, হরিকত, মারফত প্রভৃতির অনুকরণ মাত্র। ফানাফিল্লাহ বা বাকাবিল্লাহ রাধা-কৃষ্ণেরঅভেদতত্ত্ব বা যুগল রূপ পরিকল্পনার উৎস স্বরূপ। এমনকি অদ্বৈতবাদী হিন্দু দ্বৈতাদ্বৈতবাদও সূফীর দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভূত।[৪]

---

১. ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ; দর্শনে ও সাহিত্যে,* এ মুখার্জি এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৩২১ ও ৩০

২. Muhammad Enamul Haq, *A history of Sufism In Bengal,* Asiatic Society of Bangladesh, Dacca,1975, PP-268-281.

৩. পূর্বোক্ত, উদ্ধৃতি,পৃষ্ঠা - ২৭২ - ২৭৩

৪. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (২য় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৫

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির আলোকে আমরা মনে করি, ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মাচারের মধ্যে সাদৃশ্য থাকার অর্থ এই নয় যে, এক ধর্ম অন্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বিশেষত, চৈতন্যদেবের সঙ্গে কোনো সুফি সাধকের পরিচয় বা অন্তরঙ্গতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। চৈতন্যজীবনীর কোন গ্রন্থেই বিষয়টির উল্লেখ নেই। এছাড়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হতেই নবদ্বীপ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। হিন্দু সমাজ এবং বহু দেবত্ববাদে বিশ্বাসও নিয়ন্ত্রিত হতো তাদের দ্বারা। সুতরাং চৈতন্যদেবের পক্ষে কঠোর নিয়ন্ত্রিত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে থেকে বা সন্ন্যাস গ্রহণের পরে নীলাচল বা দক্ষিণ ভারতে গিয়ে সুফিবাদ জানা কিংবা শোনা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে মুসলিম আগমনের বহু পূর্ব হতেই ভক্তির মতবাদ বহুলাংশে প্রচলিত ছিল; যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *চৈতন্যচরিতামৃতে* 'কাল বস্ত্র' পরিধান করা এক পীরের সাথে ধর্ম সমন্ধে যে বিতর্কের বিবরণ দিয়েছেন তাতে কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেম-ভক্তির আন্দোলন সুফি মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আমাদের অভিমত : চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে এবং তাঁর জীবদ্দশায় বাংলায় এসব মতাদর্শের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল; যার অন্তর্মূলে ছিল অনুরাগ মিশ্রিত আত্মদর্শনের জিজ্ঞাসা; ধার করে নেওয়া কোন বিষয় নয়। চৈতন্যযুগের শেষ পর্যায়ে মুসলমান পদকর্তাদের পদে এর বিস্তৃত প্রমাণ পাওয়া যায়। M. R. Tarafder - এর মত এক্ষেত্রে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করতে পারি:

Thus the influence of sufi-ism on the vaisnavism of Shri Chaitanya is a point which is yet to be investigated. [১]

কিন্তু সার্বিক পরিবেশ বিচার করলে এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সরল পথে আবর্তিত হয়নি। চৈতন্যদেবের জন্মের সময় গৌড়েশ্বর ছিলেন ফতেশাহ (১৪৮৩-১৪৯৩)। তাঁর শাসনামলে নবদ্বীপকে অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে হিন্দুদের উৎখাতের এক মহাযজ্ঞ শুরু করেছিলেন তিনি। *চৈতন্যভাগবত*, *চৈতন্যচরিতামৃত* প্রভৃতি গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ পরিলক্ষিত হয়। এই মুসলিম শাসকের হাতে বাংলার সংস্কৃতিকেন্দ্রের (তৎকালীন নবদ্বীপকে বাংলার সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে মনে করা হতো) চরম দুর্দশা নেমে আসে। এই চরম দুর্দশার জন্য নদীয়ার ব্রাহ্মণেরা কম দায়ী ছিলেন না। তারা অনাচারী এবং সমাজের মধ্যে ভেদ-বৈষম্য চরমভাবে সৃষ্টি করেছিল। ফলে স্বাভাবিক জনজীবনে ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা বিরাজ করছিল। সনাতনশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে এইসব পাষণ্ডেরা সমাজে শুধু বিভেদই সৃষ্টি করেনি; ছুঁৎমার্গের এমন এক ধারা প্রচলিত হলো যে, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা স্বাভাবিক ধর্মাচারণ থেকে বঞ্চিত হতে লাগলো এবং অনেকে ধর্মান্তরিত হলো। *চৈতন্যমঙ্গল* ও *চৈতন্যভাগবতে*জয়ানন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন দাস সমাজের চরম দুর্দশার যে চিত্র এঁকেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

ক. আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজ ভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বাঁধে ॥

১. M. R. Tarafdar, *Hussain Shahi Bengal :A Socio-Political Study*, Asiatic Society of Pakistan. 1965. P-228.

দেউল দেহরা ভাঙ্গে ওপারে তুলসী।
প্রাণভয়ে - স্থির নহে নবদ্বীপবাসী ॥ [১]
খ.i) কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য - আচার ॥
'ধর্ম্ম কর্ম্ম' লোক সভে এই মাত্রজানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে ॥
ii) সকল সংসার মত্ত ব্যবহার - রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কেহো নাহি বাসে ॥
বাঙালি পূজয়ে কেহো নানা - উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্য - গীত - বাদ্য - কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥[২]

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই সময়টিতে এক চরম অরাজক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। হিন্দু সমাজে লৌকিক দেব-দেবী এত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে, তাদের অনুসারীদের দ্বারা বৈষ্ণব সমাজের দুর্দশা এক চরম মাত্রায় পৌঁছেছিল এবং এর সাথে ছিল শাসকের তীব্র শাসন ও শোষণ। যে নবদ্বীপ সমগ্র বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল তা ক্রমশ তার ঐতিহ্য হারাতে থাকলো। ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়ের এই যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বাঙালি মানসে রেনেসাঁসের আলোকবর্তিকা, যুগধর্মপ্রবর্তক চৈতন্যদেব (১৪৮৬ - ১৫৩৩)। তাঁর আচরিত ও প্রদর্শিত ভক্তির দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম এক নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করে; সৃষ্টি হয় এক নতুন পরিবেশ। ভক্তির বহুবিন্যাসকৃত স্তর, সামাজিক ভিত্তিকে সম্প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এমন একটি স্থানে নিয়ে গিয়েছিল যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে তুলনা করা হয় চন্দ্রোদয়ের সাথে, অর্থাৎ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' অভিধায়। অবশ্য এই অভিধার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণের ভিত্তিভূমিতে ছিল ঐতিহাসিক পটভূমির সাথে অধ্যাত্মবাদী চেতনার এক নিগূঢ় সমন্বয় সাধন।

বৈষ্ণব ভক্তচূড়ামণি মহাজনেরা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের যে অলৌকিক সুন্দর তত্ত্বব্যাখ্যা করেছেন তা বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলিকে একটি বিশিষ্ট আসন দিয়েছে। গৌরাঙ্গ আবির্ভাব তত্ত্ব বিষয়ক প্রখ্যাত দুটি শ্লোক পাওয়া যায় স্বরূপ দামোদর কর্তৃক রচিত কড়চায়। যদিও শ্লোক দুটি তাঁর রচিত কিনা তা নিয়ে সংশয় থাকলেও বৈষ্ণব ধর্মের মূলভিত্তি হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং কবিকর্ণপুর যথাক্রমে *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* ও *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা* গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। শ্লোক দুটি নিম্নরূপ :

---

২. জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল*, বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি - ১৯৭১, পৃষ্ঠা - ২৭

১. *বৃন্দাবন দাস*, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৪ ও ১৫

১. শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
২. সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কী দৃশং বেতি লোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী-গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দু ॥

অর্থাৎ চন্দ্র যেমন সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রও তেমনি শচীর সন্তান হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে চৈতন্য রূপে জন্ম নিয়েছেন তিনটি সাধ পূরণের জন্য – প্রথম সাধ, রাধা প্রেমের মহিমা কতখানি তা তিনি জানবেন, দ্বিতীয় সাধ – সেই প্রেমের আলোকপাতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের চমৎকারিতা কতখানি তা তিনি জানবেন, তৃতীয় সাধ – সেই চমৎকারিতা অনুভব করে রাধার আনন্দ কতখানি তাও তিনি জানবেন।[১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে এই 'তিনবাঞ্ছা' খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রাচীন আচার্যেরা আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে তিনটি ঋণকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন – ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ এবং দেব-ঋণ। আমাদের যাপিত জীবনে শিক্ষাগ্রহণ এবং বিস্তারের দ্বারা ঋষি-ঋণ শোধ করতে হয়।

দশবিধ সংস্কার সাধন এবং বিবাহাদি গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিপালনে পিতৃ-ঋণ শোধ হয়। আর দেব-ঋণ যজ্ঞের দ্বারা, জনকল্যাণে অর্থ ব্যয় করে, সমাজে হিতার্থের দ্বারা শোধ হয়। কিন্তু চৈতন্যদেব এই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ঋণমুক্তি বলে মানেননি। মানুষ স্বীয় জীবনে আরব্ধ কর্মফল ভোগ করে। কিন্তু তার জন্ম-উৎস 'আনন্দ'। এই আনন্দ থেকেই সর্বভূতের উদ্ভব এবং আনন্দেই ঘটে স্থিতি ও লয়। কালচক্রে পরিভ্রমণরত জীবের এই আনন্দের উৎস অনুসন্ধানই উদ্দিষ্ট ধর্ম। উপনিষদের যে আপ্তবাক্য—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দেন প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"– তা মেনে নিয়ে চৈতন্য দেখালেন, সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ বিগ্রহ ভগবান কৃষ্ণের প্রতি রয়েছে ঋণ। তাহলো 'আনন্দ-ঋণ'। কালচক্রে এই আনন্দ-ঋণ যতদিন শোধ না হবে ততদিন সবকিছুই বৃথা, অন্তঃসারশূন্য। *শ্রীমদ্ভাগবতগীতার* কর্মযোগে যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য নিষ্কাম কর্ম তা শুধু নিষ্কাম হলেই চলবেনা, হতে হবে আনন্দযুক্ত। এই আনন্দের রয়েছে উৎস, রয়েছে পরিণতি, উৎসমূলে রয়েছে 'রস' আর 'আস্বাদনে' রয়েছে পরিণতি। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের আস্বাদনই মুখ্য এবং আনন্দ-ঋণ পরিশোধের মোক্ষম উপায়। কারণ :

> ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
> অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ *(ব্রহ্মসংহিতা)*
> অর্থাৎ কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি অনাদি ও আদি কেননা সর্ব কারণের কারণ তিনিই গোবিন্দ।[২]

দ্বাপর যুগে ব্রজলীলায় নন্দ-দুলাল কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ব্রজগোপীরা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের রূপ আস্বাদন করেছিলেন। ব্রজলীলায় কৃষ্ণ সর্বাকর্ষক আকর্ষণকারী কিন্তু তাঁর প্রেমঘনরূপের মর্মমূলে রয়েছে আনন্দ

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২ ও ৩
২. উদ্ধৃতি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২১

শক্তি – যা 'হ্লাদিনী শক্তি' হিসেবে আখ্যা পেয়েছে। 'সৎ, চিৎ, আনন্দ' – এই ত্রয়ী শব্দের মিশ্রণে যে পূর্ণ প্রেমের আধার, তার কেন্দ্রমূলেই রয়েছে অনন্ত আনন্দের উৎসধারা – হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপা 'শ্রীরাধা'। আস্বাদনীয় বিষয় হচ্ছে কৃষ্ণ আর আস্বাদক আশ্রয় হচ্ছে শ্রীমতী রাধা। বৈষ্ণব ধর্মে চির আরাধ্য যে 'যুগল-ভজন' তার নিগূঢ় সারবস্তু রাধার কান্তারূপে ভজন। বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেছেন, রাধা ব্রজলীলায় সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেছেন, বিরহানলে দগ্ধ হয়েছেন। তাঁর এই অপূর্ব ভালোবাসায় ঋণী হয়ে আনন্দময় ভগবান স্বয়ং রাধাঋণ স্বীকার করেছেন। এই আনন্দঋণেরই চূড়ান্ত রূপ প্রেমঘনমুরতি চৈতন্য। যাঁর অন্তরে কৃষ্ণ আর বাইরে রাধাভাব। শ্রীরাধার ভাবকান্তি নিয়েই নবদ্বীপবিহারী গৌরসুন্দরের মর্ত্যে আবির্ভাব। শ্রীরূপ গোস্বামী জানালেন তাঁর কড়চায় :

> রাধা কৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরাস্মা-
> দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
> চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
> রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

অর্থাৎ রাধা স্বরূপতঃ কৃষ্ণ প্রেমই, তিনি, কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধা ও কৃষ্ণের সত্তা ভিন্ন নয়, কিন্তু লীলার জন্যই তাঁরা ভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন আবার তাঁরা চৈতন্যের মধ্যেই এক হয়েছেন, প্রকট হয়েছেন চৈতন্যরূপে। রাধার গৌরকান্তি ও কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে যে কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন – সেই চৈতন্যকে নমস্কার করি।[১]

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানালেন :

ক.ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অনুবাদ তিন।
অঙ্গ প্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন ॥ ...
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি যারে, ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ॥
প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণভগবান ॥[২]
খ. রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
যেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাঞি!
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥

---

১. শ্রীরূপ গোস্বামী, কড়চা, উদ্ধৃতি, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২

২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১৪ ও ১৫

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি-হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥[১]

বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণ প্রেমের বিষয় আর রাধা প্রেমের আশ্রয়। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ কলেবরে কৃষ্ণের প্রথম সাধ – রাধা প্রেমের মহিমা কতখানি তা জানার জন্য একাধারে প্রেম-বিষয় ও প্রেম-আশ্রয়কে একত্রকরে আনন্দলীলাস্বাদ গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় সাধ – প্রেমের আলোকপাতে কৃষ্ণের মাধুর্যের চমৎকারিতা অনুভবকরলেন স্বীয় দর্শনে। অর্থাৎ আপন রসমাধুরী আপনিই অনুভব করছেন রাধাপ্রেমে বিভোর হয়ে। আস্বাদক হিসেবে শিরে রাখলেন কান্তপ্রেম শিরোমণি রাধার স্বরূপ। তৃতীয় সাধ – রাধার আনন্দাস্বাদনের প্রকৃতি। ব্রজপ্রেমে রাধার নিজস্বতা বলে কিছু ছিল না; ছিল না নিজস্ব সুখ-কামনা। প্রেমের যে নিগূঢ় বিষয়, ‘কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা’ – তাই ছিল রাধার আরাধ্য। কৃষ্ণমিলনজনিত সর্বসুখ যে রাধা আস্বাদন করতেন তার মর্মমূলে ছিল নিবিড় আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদনেই উদ্ভূত হতো অপূর্ব সুখচেতনা।

চৈতন্য তাঁর দিব্য জন্ম ও কর্মে এই লীলাসুখ আস্বাদন করলেন। এই গভীর অনুভবই চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মের ও দর্শনের অন্যতম বিষয়। নব-অনুরাগ, ভাব-অনুভবের বিষয়ই চৈতন্য যুগে ভক্তিধর্মে প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের বিষয়ভাবের প্রাচুর্যে নবরসধারা সংযোজিত হলো। যেমন :

হেম সঞে অতি গোরা সুমধুর হাস থোরা-
জগ - জন - নয়ন - আনন্দ।
পিরীত মুরতি কিয়ে রূপ স্বরূপ - ধর
ঐছন প্রতি অঙ্গ - বন্ধ ॥
আজু কিয়ে নবদ্বীপ চন্দ।
কামিনিকাম - কলিত তছু মানস
গতি অছু গজ জিতি মন্দ ॥ ...
কম্প পুলক ঘাম স্বরভঙ্গ অনুপাম।
নয়নহি জলে পরিপূর ॥
বামভূজহি বসনে মুখ ঝাঁপই
বাম নয়নে ঘন চায়।
রাধামোহন দাস চিতে অভিলাষই
সোই চরণ জনু পায় ॥[২]

অথবা,
অপরূপ গোরাচন্দে।
বিভোর হইয়া, রাধার প্রেমে, তারগুণ কহি কান্দে ॥
নয়নে গলয়ে, প্রেমের ধারা, পুলকে পূরল অঙ্গ।

---

২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৩৫

১. হরেকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-৯৩২

খেনে গরজয়ে, খেনে সে কাঁপয়ে, উথলে ভাব তরঙ্গ ॥
পারিষদ গণে, কহয়ে যতনে, রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরাঙ্গ নাগর, যে লাগি আইলা হেথা।[১]

মূলত, চৈতন্য-আবির্ভাবের এই রস-প্লাবিত ব্যাখ্যার আলোকেই বৈষ্ণব ধর্মসাহিত্য-সাধনায়, প্রেমে - সৌন্দর্যে, রসাস্বাদনে এবং দিব্য প্রেমানুভূতির মিশ্রণে এক অপূর্ব ভক্তি ও আত্মনিবেদনে আস্বাদনের উপভোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। যার উপলক্ষ্য ভাব-মহাভাবেরসম্মিলন।

চৈতন্য জীবনী

শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসেচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কোনো এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে জাতীয় ইতিহাসে, জীবনাচরণে, সর্বোপরি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় যে কী আলোড়ন তুলতে পারে তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত চৈতন্যের আবির্ভাব। সমালোচকের মন্তব্য :

> পৃথিবীর কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এত ভক্তির উচ্ছ্বাস, এত ভালোবাসার আত্মীয়তাবোধ, দেবত্বেরএত নিকট স্পর্শ,অন্তরের এত আলোড়ন, কবিত্বের এত অফুরন্ত নির্ঝর, অলঙ্কার দর্শন ও বিবিধ রচনার এমন আশ্চর্য মননশক্তি, ধর্মচেতনার এত প্রগাঢ় অনুভূতি ও ধর্মানুষ্ঠানের এমন আন্তরিক সাধনার আত্মপ্রকাশকরিয়াছে কিনা সন্দেহ।[২]

এ কথা সত্য যে, প্রাক-চৈতন্য যুগে ভক্তি-আন্দোলনের প্রধান উৎস যেমন *শ্রীমদ্ভাগবত*, চৈতন্যোত্তর যুগে ভক্তিধর্মের উৎস তেমনি চৈতন্যজীবনী এবং তাঁর বাণী। চৈতন্যজীবনের কালক্রমকে এভাবে সাজাতে যায়:

জন্ম : ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৪৮৬ খ্রি.
প্রথম বিবাহ : ১৫০১ - ১৫০২
দ্বিতীয় বিবাহ : ১৫০৭
বৈষ্ণবীয় ভাবের উন্মেষ : ১৫০৯
সন্ন্যাস গ্রহণ : ২৫ - ২৬ জানুয়ারি ১৫১০
পুরী গমন : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৫১০
দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ : এপ্রিল ১৫১০-এ শুরু
পুরীতে প্রত্যাগমন : ১৫১২
বৃন্দাবনে গমন : ১৫১৫
এলাহাবাদে আগমন : জানুয়ারি ১৫১৬
বারাণসীতে আগমন : ১৫১৬
পুরীতে প্রত্যাবর্তন : মে ১৫১৬
মহা-প্রস্থান : ২৯ জুন ১৫৩৩।[৩]

---

১. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীপদামৃত-তরঙ্গিণী*, (?) কলকাতা, ১ম সংস্করণ ১৩২৩ বাংলা, পৃষ্ঠা-৪১
২. উদ্ধৃতি, ড.সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়,*গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*,সোনারতরী, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৪০
৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*, জি ভট্টাচার্য এণ্ড কোং, কলকাতা-১৯৭৪, পৃষ্ঠা- ২৭ - ২৯

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-আবির্ভাবের তথ্য যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা স্মরণযোগ্য:

চৌদ্দশত সাত শকে মাস সে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চগ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব সুলক্ষণ ॥[৩]

পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে, চন্দ্রগ্রহণের সময় বিপুল হরিধ্বনিযোগে বিদ্যার্থে নবদ্বীপে বাসস্থাপনকারী শ্রীহট্টবাসী (সিলেটবাসী) জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর সর্বশেষ সন্তান ভূমিষ্ট হয়। নবদ্বীপবাসী পুরনর-নারীর আগমনে ভরপুর হলো মিশ্রআলয়। অদ্বৈতাচার্যের পত্নী সীতাদেবী উন্নতোজ্জ্বল বর্ণ শিশুটিকে 'নিমাই' নামে ডাকলেন এবং সমবেত সবাইকে ডাকতে বললেন। নিমাই নামেই পরিচিতি লাভ করলো শিশুটি। যথাযথ নিয়মেই সম্পন্ন হলো জাতকরণ, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি বৈদিক সংস্কার। নামকরণে

দিব্যকান্তিধর শিশুটির নামকরণ করা হলো 'বিশ্বম্ভর'। ইনিই যুগধর্ম প্রবর্তক, দিব্যপ্রেমমুরতি গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণচৈতন্য বা চৈতন্য; হীন ও পতিতের ভগবান হয়ে মাত্র সাতচল্লিশ বছর প্রকট থেকে লীলাসুখ গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব সমাজ সংস্কারে ও ভক্তির প্রচারে যে সব কাজ করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করা হলো :

১. শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপে শান্তিপুরে প্রভাবশালী বৈষ্ণব গোষ্ঠী সংগঠিত হয়েছিল। তাতে জাত বিচার ছিল না।চৈতন্যদেবই সম্ভবত মোহান্তদের ও কীর্তনগায়কদের সংগঠিত করেন।

২. তিনি "ঘরে ঘরে নাম" প্রচারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

৩. আগে 'পাষণ্ডীদের ভয়ে বদ্ধগৃহে কীর্তন চলত। চৈতন্য বিশাল শোভাযাত্রাসহ নগরকীর্তন পরিচালনা করেন। তাতেও জাতবিচারের কোনও প্রশ্ন ছিল না।

৪. চৈতন্য উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ হলেও স্বর্ণকার, মালাকার,শঙ্খকার, গোয়ালা প্রভৃতি শূদ্র এবং পেশাভিত্তিক জাতিসমূহের লোকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করলেন।

৫. চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ ভক্তি-প্রচারের কৌশলরূপে কোনও প্রচলিত লোকধর্মের বিরোধিতা করেননি। বৃন্দাবন দাসের সুন্দর বিবরণ অনুসারে ধর্মরাজ, যম, শঙ্কর, গনেশ, ইন্দ্র, ব্রহ্মদৈত্য সংকীর্তন শুনে বড়ই আনন্দিত হয়েছিলেন।

৬. নবদ্বীপে প্রভাবশালী জগাই ও মাধাই নামক দুই জন কুক্রিয়াসক্ত দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকে চৈতন্যদেব 'উদ্ধার' করে ভক্তির মাহাত্ম্য স্পর্শ করলেন।

৭. বিশাল শোভাযাত্রা ও নগরকীর্তনের সংগঠন করে চৈতন্য 'হিন্দুয়ানি' এবং কীর্তনবিরোধী নবদ্বীপের কাজিকে দমন করলেন।

৮. চৈতন্য বৈষ্ণবীয় নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এবং নিজেও তাতে অভিনয় করেন।

৯. ভক্তি-প্রচারের মাধ্যম ছিল বাংলা ভাষা।[২]

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-

২.রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ, কলকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৬ ও ৩৭

চৈতন্যের প্রামাণিক জীবনীসমূহে অতিপ্রাকৃত কাহিনি কমই আছে। তাঁর নামকীর্তনেও বিশেষ আচার - অনুষ্ঠানের ব্যাপার ছিল না। কারণ, ভক্তিই হচ্ছে সর্বেসর্বা। মনে ভক্তি নিয়ে শুধু হরিনাম কীর্তন করলেই কলিজীবের পরমার্থ লাভ ঘটে। স্বল্পায়ু কলিজীবের একমাত্র 'নাম'ই হচ্ছে সম্বল; পরমার্থের পাথেয়। যথা:

হরোর্নাম হরোর্নাম
হরোর্নামৈব কেবলম্ ॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। (*বৃহন্নারদীয় পুরাণ*, ৩৮/১২৬)

অর্থাৎ হরিনাম শ্রবণ কর, হরিনাম জপ কর, হরিনাম কীর্তন কর। কলিতে জ্ঞানযোগ নয়, কলিতে কর্মযোগ নয়, কলিতে ভক্তিযোগ ছাড়া আর কোন পথই নেই।[১]

চৈতন্য-আবির্ভাবে ভারতবর্ষে প্রেম-ভক্তির প্লাবনে সবাই ভেসে গিয়েছিল এবং হিন্দুধর্মে যে বর্ণপ্রথার বাগাড়ম্বর তা অনেকাংশে দূর হয়েছিল। এ-বিষয়ে গবেষক রমাকান্ত চক্রবর্তীর অভিমত :

শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবে এই ভক্তির রসময়তায় সব এক হয়ে গিয়েছিল। প্রেম ধর্মের জোয়ারে নাম ও নামী অভেদ হয়ে উঠেছিল। ভক্তির দ্বারা বিশিষ্ট বৈষ্ণব ধর্ম এক নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে এক নূতন সামাজিক পরিবেশ। ভক্তির সামাজিক ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করার জন্য চৈতন্যের প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তর।[২]

*চৈতন্যভাগবত*কার শ্রীবৃন্দাবন দাসও আমাদের জানালেন একই কথা –

১. দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ নাম।
সর্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র মর্ম নাহি জানে ॥[৩]
২. কলিযুগে ধর্ম্ম হয়ে 'হরি সংকীর্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রী শচীনন্দন ॥
এই কহে ভাগবতে 'সর্ব্ব-তত্ত্ব-সার'।
কীর্ত্তন - নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার ॥[৪]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত রসতত্ত্বে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেমধর্মের যে কতটা প্রভাব তা সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। ভারতীয় বৈষ্ণব মতের প্রধান চারটি শাখা বেদান্ত - আশ্রিত। অর্থাৎ, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের ওপর তার তত্ত্ব অধিক কর্তৃত্ব আরোপ করেছে। শ্রী, ব্রহ্ম,

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৭৪

২.রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ, কলকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৮

৩. বৃন্দাবন দাস, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১২

সনকাদি, রুদ্র সম্প্রদায় তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠায় যে ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন তার সঙ্গে চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেম-তত্ত্বের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন – আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নে 'কলাকৈবল্যবাদ' প্রচার করেছিলেন, যেখানে মূল তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো – ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব-জগৎ মিথ্যা; মায়ার খেলা। সুস্পষ্ট মায়াবাদী আচার্য শঙ্কর প্রদর্শিত মতবাদের সাথে বৈষ্ণব তথা চৈতন্যদেবের প্রদর্শিত প্রেমধর্মের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অন্য চারজন ভাষ্যকার যথাক্রমে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভ; এরা বৈষ্ণব ধর্মের নানা তত্ত্বের প্রবক্তা। রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ,' নিম্বার্কের ~~'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ', মধ্বের 'দ্বৈতবাদ', বল্লভের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিকেই প্রশস্ত করেছে।~~ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে – আচার্য শঙ্কর বিশুদ্ধ দার্শনিক বিচারের পথ ধরে এগিয়েছেন। তাঁর তত্ত্বে ভাবাবেগের কোন প্রশ্রয় নেই। রামানুজ বিষ্ণু-ভক্তিকথা প্রচার করলেও ভাবাবেগবিহীন দর্শন বিচারের মধ্য দিয়েই মূলতত্ত্বে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর ভক্তিপথ জ্ঞানমার্গীয়। আচার্য মধ্ব-এর ভাষ্যে ভক্তি-মাধুর্যের স্থান নেই। বলা যেতে পারে, তাঁরা বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গচারী, এখানে প্রেমাবেগের স্থান গৌণ। আচার্য বল্লভ তাঁর ভাষ্যে জ্ঞানমার্গকে পরিত্যাগ করলেন। তাঁর প্রদর্শনে স্থাপিত হলো মাধুর্য ও অনুরাগের পথ। তাঁর ধর্মপথ হয়ে উঠলো প্রেমাবেগোচ্ছ্বসিত। অনেকে মনে করেন, চৈতন্যদেব এই মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত।[১]কিন্তু

এ-বিষয়ে আমাদের অভিমত, চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেম ধর্মে, মধ্ব সম্প্রদায়ের প্রভাব থাকলেও সাধ্য-সাধনায় বাংলার বৈষ্ণবীয় রীতি ও ধর্ম অনেক বেশি মানবীয়। কারণ, মানবরূপে গোলকেশ্বর কৃষ্ণের যে অবতার রূপ, প্রেমলীলায় যে চিত্র বাঙালি হৃদয়ে চৈতন্য-স্পর্শে অঙ্কিত হয়েছিলো তা পূর্বোক্ত মত হতে স্বতন্ত্র এবং ভারতীয় অপরাপর বৈষ্ণব ধর্ম থেকে পৃথক। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম বাংলাদেশের হৃদয়-উদ্ভুত বস্তু।

এর পূর্ণাঙ্গ বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই চৈতন্যদেবের জীবনলীলায়। তাঁর 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব' এবং নিত্য বৃন্দাবনলীলার শুদ্ধভক্তি প্রেম-চেতনা তাঁর একান্ত বস্তু ! প্রেমধন ! কৃষ্ণের লীলা বিহার যেমন-অপূর্ব, আরও অপূর্বতর হয়ে উঠল চৈতন্য-স্পর্শে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানালেন :

> কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
> নরবপু তাহার স্বরূপ।
> গোপবেশে বেণুকর নবকিশোর নটবর
> নরলীলা হয় অনুরূপ।[১]

এই মহৎ প্রেমাস্বাদিত নরলীলা শুদ্ধ প্রেম, ভক্তি ও মানবিক আচরণে হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ। চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মে তত্ত্বত মূল আবেগের জায়গা এটি – লীলাস্মরণ ও অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের অনুশীলন। লীলাস্মরণে প্রকৃত অর্থে বৈষ্ণব হয়ে ওঠা। সাধনার লক্ষ্যবস্তুতে থাকে মানবীয় সদাচার। যথা :

> যাহার দর্শনে হয় মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
> তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান।[২]

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৩৯০
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৮

চৈতন্যের আবির্ভাবের চরম সার্থকতা এখানেই। প্রেম, শুদ্ধভক্তি, আচরণ, স্মরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে 'যুগলতত্ত্বের' ভজনই যুগ-যুগান্তরের বৈষ্ণব মতাদর্শের একমাত্র দর্শন। যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ চৈতন্যজীবনী, গোস্বামীগণ প্রণীত আকর গ্রন্থ এবং ভক্তহৃদয়-প্লাবিত বৈষ্ণব পদাবলি।

এ-প্রসঙ্গে নীলরতন সেনের মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

> এই সহজ মানবীয় প্রেমসাধনায় শ্রীচেতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে যে নবপ্রাণ সঞ্চার করেছিলেন তারইসুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, নদীয়া প্রেমের বন্যায় ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তারই ফলে একাধারে যবনরাজের অত্যাচার থেকে এবং পাষণ্ডী অধঃপতিত হিন্দুদের অত্যাচার থেকে গৌড়বাসী রক্ষা পেয়েছিল। – তারই ফলে নীলাচলভূমি নবপ্রেম-চেতনায় উল্লসিত হয়েছিল। –বৃন্দাবনে ষট্‌গোস্বামীরপ্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-প্রেমধর্মের এক নব দার্শনিকবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সর্বোপরি সেই মধ্যযুগের, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্য এমন এক সর্বজনীন প্রেমকীর্তন-গীতির অপূর্ব সমৃদ্ধি ঘটেছিল বিশ্বসাহিত্যে যার তুলনা মেলে না। বাংলাদেশে দীর্ঘদিনের ক্ষীণ প্রবাহিত

বৈষ্ণবচেতনাজয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের মাধ্যমে যে উৎকর্ষ লাভ করেছিল তারই রসমূর্তিরূপে সহজ প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটল। – আর শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন লীলার প্রেমরূপ অবলম্বনে গড়ে উঠল এক বিপুল সমৃদ্ধবৈষ্ণব সম্প্রদায়। – তাঁদেরই ভক্তিমনের অর্ঘ্য নিবেদিত হল শতসহস্র পদাবলী কীর্তন গীতির মাধ্যমে।[১]

সুতরাং, চৈতন্যজীবনী এবং তার অবস্থান বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন-বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের উৎকর্ষ সাধন এবং বহুমাত্রিক বিন্যাসে চৈতন্য-পর্ষদগণের অবদানও কম নয়। চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ ও তত্ত্বের প্রাচুর্যে চৈতন্যপর্ষদগণের অবস্থান তুলে ধরে বাংলাদেশে ভক্তিবাদ প্রসারে তাঁদের অবদান এবং প্রেমধর্মের তত্ত্বটি যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ধারাটি সংক্ষেপে আলোচনা করতে সচেষ্ট হব।

পঞ্চতত্ত্ব

প্রবোধানন্দ যে মহান সিদ্ধান্তকে রূপদান করে তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা করেন তা বৈষ্ণব-প্রেমধর্মে, চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল তা হলো 'গৌরপারম্যবাদ', যার উদগাতা স্বরূপ দামোদর। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। দর্শনটি হলো – মহাপ্রভুর কৃপা না হলে ব্রজবিহারী কৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যাবে না। এই মতবাদের প্রচারণায় পঞ্চতত্ত্বের ভূমিকাই ছিল প্রধান। 'পঞ্চতত্ত্ব' অভিধাটি বৈষ্ণব ধর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ বলয়। চৈতন্য রয়েছেন কেন্দ্রে, আর তাঁকে কেন্দ্র করে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর এবং শ্রীবাসের সমন্বয়ে যে মণ্ডল প্রস্তুত হয়েছে তাই 'পঞ্চতত্ত্ব' নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এরা সকলেই ভক্তস্বরূপ এবং চৈতন্যলীলা সহায়ক সূক্ষ্ম অনুঘটক।

অর্থাৎ, বৈষ্ণবদের প্রেমধর্মে এঁরা এক একটি স্তম্ভ। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস চৈতন্যভগবান, আর পঞ্চতত্ত্ব লীলাবিহারীর সাহায্যকারী হিসাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কল্পনা করা হয়েছে।যথা:

---

১. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা-২০০৭, পৃষ্ঠা-৪৯

শ্রীচৈতন্য	: রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু।
শ্রীঅদ্বৈত	: মহাদেবের অবতার।
শ্রীনিত্যানন্দ	: বলরাম বা সঙ্কর্ষণের অবতার।
শ্রীগদাধর	: শ্রীরাধার বিশেষ অংশের অবতার।
শ্রীশ্রীবাস	: মহর্ষি নারদের অবতার।[১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজও *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* গ্রন্থসূচনায় শ্রদ্ধাভরে পঞ্চতত্ত্বের স্মরণ করেছেন। এছাড়া বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত প্রতিটি আকরগ্রন্থে 'পঞ্চতত্ত্ব' বিশেষ তত্ত্বে ও ভক্তিতে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন :

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং
ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তা খ্যং
নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

অর্থাৎ আমি কৃষ্ণকে প্রণাম করি, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত্যাচার্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাসাদী পঞ্চতত্ত্বেরস্বরূপভূত ইনি শ্রীচৈতন্যেভক্তরূপে, নিত্যানন্দে ভক্ত স্বরূপে অদ্বৈতাচার্যে ভক্তাবতাররূপে, গদাধরে ভক্তশক্তিরূপে এবং শ্রীবাসাদিতে ভক্তনামধারীরূপে বিরাজিত আছেন।[২]

কবি কর্ণপুরের *শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা* গ্রন্থেই মূলত পঞ্চতত্ত্ব সিদ্ধান্তের প্রচার প্রথম শুরু হয়। কারণ, তিনি যে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন, তা থেকেই পঞ্চতত্ত্বের তাত্ত্বিক স্বরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাঁর ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, পূর্বে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হবার সময়ে তিনি যেভাবে পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকাশ পেয়েছিলেন, এখন গৌরাঙ্গ অবতারেও তিনি সেরূপ পঞ্চতত্ত্বে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীঅদ্বৈত : শ্রীহট্ট (বর্তমান সিলেট) জেলার লাউর পরগণায় নবগ্রামে ১৪৩৫ খ্রিষ্টাব্দে অদ্বৈত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতা যথাক্রমে শ্রীকুবের তর্কপঞ্চানন এবং লাভাদেবী। বাল্যকালে অদ্বৈতের নাম ছিল কমলাক্ষ। বারো বছর বয়সে কমলাক্ষ শ্রীহট্ট ত্যাগ করে বিদ্যার্থে শান্তিপুরে আসেন। তিনি মধ্বাচার্যভুক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। এই মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী এবং চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর মন্ত্রপ্রাপ্ত শিষ্য। পরম্পরাটি নিম্নরূপ :

মাধবেন্দ্রপুরী

↓

↓↓↓

অদ্বৈত　　নিত্যানন্দ　　ঈশ্বরপুরী

↓

চৈতন্য

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই অদ্বৈত বৈষ্ণব ধর্মের আচার ও প্রসারে সর্বাত্মক ভূমিকা রেখেছিলেন। সর্বমানবতাবাদী চেতনায় অদ্বৈত উদ্ভাসিত ছিলেন। হিন্দু-মুসলিম ও অন্যান্য মতাবলম্বীদেরও তিনি সমান

১. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫

২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৪

মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। হরিদাস মুসলমান হলেও অদ্বৈত কৃপায় 'ব্রহ্ম হরিদাস' নামে ভুবন-বিখ্যাত হয়েছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই স্ত্রী যথাক্রমে সীতা ও শ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* হতে তাঁর চার পুত্রের নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন – অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল এবং বলরাম। বৈষ্ণবেরা মনে করেন, তাঁর প্রেম-হুঙ্কারেই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাঁর প্রেরিত বার্তায়-ই চৈতন্যলীলার অবসান ঘটে। বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মাশ্রয়ী মানুষেরা তাঁকে 'গৌর আনা গোঁসাই' নামে অভিহিত করে থাকেন। নীলাচলে বাসরত চৈতন্যদেবকে যে তরজা তিনি পাঠিয়েছিলেন তা-বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। চৈতন্য-তিরোধানে তরজাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
বাউলকে কহিও লোকে হৈল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥[১]

অদ্বৈত ও সীতাদেবী আমৃত্যু শান্তিপুরে বৈষ্ণবদের নেতৃত্বদান করেন এবং ইনিই প্রথম চৈতন্যদেবকে নারায়ণের অবতার বলে পূজা করেছিলেন। চৈতন্য তিরোভাবের পর ১৭ বা ১৮ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর তিরোধানের পরে তাঁর সন্তানেরা বৈষ্ণব-গুরু হন এবং 'অদ্বৈতপন্থী' শাখার বিস্তার হয়।

শ্রীনিত্যানন্দ : নিত্যানন্দের জন্ম ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি বীরভূম জেলার একচাকা বা একচক্র গ্রামে। তাঁর পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ওরফে মুকুন্দ পণ্ডিত – যিনি ছিলেন তৈর্থিক সন্ন্যাসী এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দের বাল্য নাম ছিল কুবের। তিনি চৈতন্য থেকে তেরো বছরের বড় ছিলেন। ১৫ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি পরে 'অবধূত' নামেও পরিচিতি পেয়েছিলেন। নবদ্বীপে চৈতন্যের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। চৈতন্যমাতা শচীদেবীকে তিনি মাতৃজ্ঞানেই সেবা করতেন। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর আদেশে তিনি গার্হস্থ্য ধর্মে ফিরে আসেন এবং সূর্য সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। জাহ্নবীদেবীর পুত্র বীরভদ্র সহজিয়া বৈষ্ণবমতের প্রবর্তক ও প্রচারক হিসেবে প্রখ্যাত হয়েছেন। বসুধাদেবীর পুত্র জয়ানন্দও বৈষ্ণব-মত প্রচারে ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশে নিত্যানন্দই অদ্বৈতের সহযোগিতায় চৈতন্য-প্রতিনিধি হিসেবে চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্ম প্রচার করেন। চৈতন্যদেবকে তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল-অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পূজার ব্যবস্থা করেন। নিত্যানন্দ ছিলেন উদার, ক্ষমাশীল, অবধূত এবং সর্বসংস্কারমুক্ত পরম দয়ালু। উল্লেখ্য, পাণিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ভবনে নিত্যানন্দের অভিষেক অনুষ্ঠানে তুমুল সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয় এবং শেষ হয় মহোৎসবে; যেখানে ছত্রিশ জাতি একসারিতে বসে খেয়েছিলেন। নিত্যানন্দ ও তাঁর মানসভূমিতে ছিল সংস্কারমুক্ত মানবতাবাদী প্রেমধর্মে উদ্ভাসিত সমাজ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে যে উপাস্য ভজন-পূজন রীতি, তা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনেও দেখা যায়। মূলত গৃহী

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৬১২

বৈষ্ণবের গার্হস্থ্য আদর্শ নিত্যানন্দ স্থাপন করলেন। তাঁর আদর্শই ছিল, 'জাতিভেদ না করিমু ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে'। এই উদার অবধূত প্রেমধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে লোকান্তরিত হন। বাঙালি বৈষ্ণব মানসে নিত্যানন্দ দয়ার অবতার, কাঙালের আশ্রয়স্থল। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* অনুসারে :

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
নিত্যানন্দো সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্প বন্তৌ
চিত্রোঁ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

অর্থাৎ গৌড়দেশে একইকালে আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ। উদয়গিরিতে একইকালে উদিত সূর্য-চন্দ্রের মতনই আশ্চর্য এঁদের আবির্ভাব। সূর্য-চন্দ্রের মতনই এঁরা কল্যাণকে এনেছেন, অন্ধকারকে নাশকরেছেন।[১]

শ্রীগদাধর : পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শক্তিতত্ত্ব গদাধর পণ্ডিত। জন্ম আনুমানিক ১৪০৮ শকাব্দের বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে। বারেন্দ্র শ্রেণিভুক্ত এই ব্রাহ্মণের পিতা-মাতা যথাক্রমে মাধব মিত্র এবং রত্নাবতী দেবী। কিশোর বয়সে তিনি বিদ্যার্থে মাতুলালয় নবদ্বীপে আসেন। গদাধর ছিলেন আকৌমার ব্রহ্মচারী। তিনি বিখ্যাত বৈষ্ণব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য ছিলেন। একমাত্র গদাধরই ছিলেন চৈতন্যের চিরসঙ্গী। কারণ, চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নীলাচলে অবস্থান নেন, গদাধরই এই সময় নীলাচলে এসে গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন এবং ক্ষেত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গদাধর চৈতন্যদেবকে নিয়মিত ভাগবত শোনাতেন। চৈতন্যের তিরোধানের কয়েকমাস পরেই(অথবা একই সময়ে) তিনি তিরোহিত হন। ভক্তির অপূর্ব পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি বৈষ্ণবীয় প্রেমানুরাগের ধারায় এক অপূর্ব কীর্তি স্থাপন করেছেন এবং বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ীদের কাছে আরাধ্য হয়েছেন।

শ্রীবাস :শ্রীবাস পণ্ডিতের জন্ম শ্রীহট্টে বা সিলেটে। পরে নবদ্বীপে এসে তিনি বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতার নাম জলধর পণ্ডিত। বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। শ্রীবাস পণ্ডিতের চার ভাই নলিন পণ্ডিত, শ্রীরাম, শ্রীপতি এবং শ্রীনিধি। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসপূর্ব ক্রিয়াকলাপ এই শ্রীবাস অঙ্গনে সংঘটিত হয়েছিল। সংকীর্তন, পূজন, নৃত্য এবং নাটকের সূত্রপাতও এঁর গৃহেই সম্পন্ন হয়েছিল। *চৈতন্যভাগবত*কার শ্রীবৃন্দাবন দাস ছিলেন শ্রীবাসের পরলোকগত ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণীর পুত্র। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করে কুমারহট্টে চলে যান। চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রচারে তাঁর ভূমিকা অনন্য; বিশেষ করে চৈতন্য-উত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলির পদকর্তাদের মনে শ্রীবাসের গৃহের চৈতন্যলীলার বিস্তৃত ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

'পঞ্চতত্ত্ব' বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম বিকাশে যেমন স্তম্ভের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত তেমনি বৈষ্ণব পদাবলির রসসিঞ্চনে গুরুত্বপূর্ণ আধার হিসেবে বিবেচিত। ভক্তিরসের প্রাবল্যে চৈতন্য যেমন আলোকিত মানুষ থেকে অবতারে পরিণত হয়েছেন, পঞ্চতত্ত্বও ভক্তি, প্রেমের প্লাবনে অবতরীর অংশ হিসেবে সাধনার বস্তুতে পরিণত হয়েছেন।

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২

চৈতন্য পার্ষদ ও ভক্তগণের নামলিপি

আকর গ্রন্থসমূহে চৈতন্যদেবের পার্ষদ ও আশ্রয়ী ভক্ত যাঁরা বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্ম প্রতিষ্ঠায় এবং বৈষ্ণবপদাবলির উৎকর্ষে যাঁদের অবদান অবিস্মরণীয় তাঁদের সংক্ষিপ্ত নামলিপি। (বর্ণক্রম অনুসারে)

সর্বশ্রী – অচ্যুতানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, অনুপম বল্লভ, অমোঘ, অভিরাম ঠাকুর, আচার্যনিধি, আচর্যরত্ন, ঈশান, ঈশ্বরপুরী, উদ্ধারণ দত্ত, কমলাকর পিপ্পলাই, কমলাকান্ত বিশ্বাস, কর্ণপুর (কবি), কানু ঠাকুর, কাশীমিশ্র, কাশীশ্বর গোঁসাই, কৃষ্ণদাস রাজপুত, কেশব ভারতী, গদাধর দাস, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, গরুড় পণ্ডিত, গোপাল, গোপাল ভট্ট, গোপীনাথ আচার্য, গোবিন্দ, গোবিন্দ কবিরাজ, গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, গৌরীদাস পণ্ডিত, ছোট হরিদাস, জগদানন্দ পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, জগাই-মাধাই, তপন মিশ্র, দময়ন্তী, দামোদর পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, নন্দন আচার্য, নরহরিদাস, নারায়ণী, নিত্যানন্দ প্রভু, নীলাম্বর চক্রবর্তী, পরমানন্দ পুরী, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, পুরন্দর আচার্য, পুরুষোত্তম দাস, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, প্রতাপরুদ্র,

বক্রেশ্বর পণ্ডিত, বল্লভ ভট্ট, বাসুদেব ঘোষ, বিদ্যাবাচস্পতি, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, বীরভদ্র গোস্বামী, বুদ্ধিমন্ত খান, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, ভগবান আচার্য, সাধ্ব ঘোষ, মাধবী দেবী, মাধবেন্দ্রপুরী, মালিনী, মীনকেতন রামদাস, মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত, যদুনন্দন আচার্য, রঘুনন্দন, রঘুনাথ গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, রাঘব পণ্ডিত, রামচন্দ্র কবিরাজ, রামদাস অভিরাম, রামাই, রামানন্দ, রায়, লক্ষ্মী দেবী, লোকনাথ গোস্বামী, শচীদেবী, শিখি মাহিতী, শিবানন্দ সেন, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীধর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, সঞ্জয়, সত্যরাজ খান, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, সুন্দরানন্দ ঠাকুর, সুবুদ্ধি রায়, সূর্যদাস সরখেল, স্বরূপ দামোদর, হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ। নামোল্লিখিত সবাই বৈষ্ণব ধর্মে পূজনীয় এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবধর্ম বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও বৈষ্ণব পদাবলিতে যে নবপ্রাণ সঞ্চার হয়েছিল তাতে উল্লিখিত বৈষ্ণব ও পদকর্তা ভক্তমহাজনদের অবদান অতুলনীয়। তাঁদের অন্তরস্থিত চেতনা এবং তার বহিঃপ্রকাশে যেমন ভক্তির প্লাবন বয়ে গিয়েছিল তেমনি উন্মেষিত হয়েছিল মানবতাবাদী চেতনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে নবপ্রাণ সঞ্চারে তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। শিশির কুমার ঘোষের *অমিয়নিমাইচরিত* গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে কীর্তন, বৈষ্ণবীয় ভজন-সাধন প্রণালীতে উল্লিখিত জন শ্রেষ্ঠবৈষ্ণবের পদমর্যাদায় ভূষিত হয়ে রয়েছেন।

চৈতন্যযুগে বৈষ্ণবধর্মে রসতত্ত্ব এবং তার বিষয় বৈচিত্র্য

চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবধর্মের বিষয়-বৈচিত্র্যের সবচেয়ে বড় বিষয় রসতত্ত্বের প্রকাশ। এই রসতত্ত্ব বৈষ্ণবীয়, রাগমার্গের দ্বাদশতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। এই দ্বাদশতত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই মূল স্বরূপের রসমাধুর্য উপস্থাপিত হয়েছে। চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্মে ভগবান : রসো বৈ সঃ। বৈষ্ণব ভক্তগণও এই রসের আধারকে অনুভব করেছেন বিভিন্ন মাত্রায় ও তাৎপর্যে। বৈষ্ণবের দ্বাদশতত্ত্বের স্বরূপ নিম্নরূপ :

১. যুগলরূপ তত্ত্ব : বৈষ্ণবীর সাধনার মুখ্য বিষয় এই যুগলরূপ তত্ত্ব। এখানে রসস্বরূপ কৃষ্ণ এবং মহাভাব স্বরূপিনী রাধা তত্ত্বত এক ও অভিন্ন। রাধা হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা। প্রেমের পরম সার মহাভাবরূপ মুরতিই রাধাঠাকুরাণী। হ্লাদিনী শক্তির সার অংশই প্রেম নামে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, প্রেমের চরমতম বা ঘনীভূত রূপই যুগলতত্ত্ব।

২. প্রকাশ ও বিলাস তত্ত্ব : লীলা বিলাসের মুখ্য কারণ আনন্দ আস্বাদন। এই আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্তে ভগবান তাঁর বিলাস-ইচ্ছায় 'একোহম বহুস্যাম' অর্থাৎ বিচিত্র-সৃষ্টি রূপে প্রকটিত হয়েছেন। রসের পূর্ণ আধার রূপে এই অনন্ত লীলাময় তাঁর অনন্ত-অনন্তাময় লীলাবিলাস করছেন। তিনিই নাম ও নামী, তিনিই একাধারে বস্তু ও ভোক্তা। সাধ্য-সাধনার এক অপূর্ব লীলা-সংগমকারী তত্ত্ব হচ্ছে প্রকাশ ও বিলাস তত্ত্ব।

৩. রসাস্বাদন তত্ত্ব : লীলাবিলাসকারী কৃষ্ণ, রাধাতেই পরম কারণ বা স্থিতি জেনেছেন। এই রসসম্ভোগের জন্যই গোকুলেশ্বর কৃষ্ণ রাধাতে পরমস্থিতি স্থাপন করেছেন। কারণ, ভগবান এক ও

অদ্বিতীয় ছিলেন। লীলা-রস উপযোগের জন্যেই বিভক্ত হয়ে রাধাকে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির বহুরূপময়তার এক অপূর্ব আনন্দ-রস আস্বাদন করলেন।

৪. পরস্পর ভজনা : সৃষ্টির আকুলতা স্রষ্টার জন্য, তাঁকে পাবার জন্য। এই আকুলতায় সৃষ্টি গভীর উন্মনা হয়, বিরহানলে দগ্ধ হয়। অনুরূপ, স্রষ্টাও অনুভব করেন সৃষ্টির প্রতি তীব্র আকর্ষণ। লীলা বৈচিত্র্যের পরস্পরায় এই যে স্রষ্টা-সৃষ্টি বা সৃষ্টি-স্রষ্টার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ তাই পরস্পর ভজনা তত্ত্ব।

৫. ভগবান ও মানুষ তত্ত্ব : স্রষ্টার পরাপ্রকৃতি হচ্ছে মানুষ। অর্থাৎ সে অনন্ত শক্তির অংশ। ভগবানের এই পরাপ্রকৃতি বা অংশী যেন অংশ-এর সাথে মিলে যায়। তাই অনন্তশক্তির আধার ভগবানও নররূপে লীলাবিহার করেন। তখন অংশ-অংশী একসূত্রে গাঁথা হয়ে যায়।

৬. মানবের সাধ্যবস্তু তত্ত্ব : সাধ্যবস্তুর মর্মমূলে রয়েছে অচিন্ত্য প্রেমতত্ত্ব। এই প্রেম অনির্বচনীয়, সাধ্যবস্তুর আধার স্বরূপ। একমাত্র প্রেম দিয়েই অনন্তবিভূতিকে ধরা যায়, হৃদয়ে আবদ্ধ করা যায়। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যরূপ অনন্ত। ভক্ত প্রেমের রজ্জু দিয়ে অনন্ত রূপকে আবদ্ধ করেন, এবং প্রসন্ন প্রসাদ প্রাপ্ত হন।

৭. মানবের সাধন তত্ত্ব : স্রষ্টার কৃপালাভ মানবের একান্ত সাধনার বিষয়। একমাত্র গোপীভাবের সাধনা দ্বারাই ভগবানের নিরন্তর কৃপালাভ করা সম্ভব। এই তত্ত্বের অন্তস্তলে রয়েছে সখী-অনুগত হওয়া। গোপীভাব হলো নিষ্কামব্রতী হয়ে রাধাকৃষ্ণকে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ভালোবাসা। এই সাধনাই রাগানুগাভজন। গোপীভাবাপন্ন সাধক বৈষ্ণব লীলা-সহচর রূপেই সিদ্ধি পান। এই সিদ্ধির পথ বৈষ্ণবব্রত।অর্থাৎ,হৃদয়রূপ বৃন্দাবনে রাধারূপ জীবাত্মার সাথে কৃষ্ণরূপ পরমাত্মার প্রণয়লীলার অনুধ্যান।

৮. পূর্বরাগ-অনুরাগ তত্ত্ব : স্রষ্টা-সৃষ্টির মিলনের পূর্বে দর্শনের দ্বারা চিত্তকমলে উদ্বুদ্ধ রতি যখন বিভাবাদি সংযোগে আস্বাদনীয় হয়, তাই পূর্বরাগ। পূর্বরাগে প্রেমের উন্মেষ ঘটে। এই উন্মেষে থাকে মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা। পূর্বরাগের অপ্রাপ্তিতে দেখা দেয় ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লান্তি, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বৈয়াগ্র্য, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু। পূর্বরাগাশ্রিত রূপ ও গুণমুগ্ধতাই অনুরাগ।

৯. অভিসার তত্ত্ব : বৈষ্ণব রসতত্ত্বে অভিসার গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। মিলন সাধনার শুরুই অভিসার। অর্থাৎ, ভক্ত রাধা ও ভগবান কৃষ্ণের এক অপূর্ব মিলন; প্রাকৃত লোকদৃষ্টির আড়ালে অলৌকিক ভাবমিলন-কুঞ্জে পরস্পরের মানসবিহার। এখানে ভগবান নিজেই আহ্বান করেন। অনিত্যের বন্ধন কাটিয়ে ভক্তকে আপন প্রেমের ক্ষেত্রে টেনে আনাই অভিসার তত্ত্বের লক্ষ্য।

১০. বাসকসজ্জা তত্ত্ব : বিলাস-কুঞ্জে ভগবানের আবির্ভাবের প্রতীক্ষাই বাসকসজ্জা। জীবাত্মার হৃদয়-মন্দিরে অবসর অনুসারে পরমাত্মারূপ প্রিয়তম আসবেন ভেবে নিজের দেহ, বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন।

এটি আট প্রকারের। যথা – মোহিনী, জাগ্রতা, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, সুপ্তিকা, প্রগল্ভা, সুরসা ও উদ্দেশা।

১১. মিলন তত্ত্ব :হৃদয় মন্দিরে কান্তারূপ ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধিই মিলন। অর্থাৎ ভগবানের দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আনুকূল্যহেতু জীবাত্মা-পরমাত্মার যে ভাবোল্লাস তাই মিলন। মিলনতত্ত্ব বৈষ্ণবীয় রাগমার্গে অন্ত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। কারণ, বৈষ্ণব পদাবলির 'পরকীয়া তত্ত্ব' এই মিলন তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

১২. গৌরাঙ্গ তত্ত্ব : বৈষ্ণব ভাষ্যানুসারে, গৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনুর অবতার। অর্থাৎ, রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে নিজ রূপ আস্বাদন করতে কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হয়েছেন। তাঁর শরণ গ্রহণেই রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদন করা যায়। সর্বান্তঃকরণে তিনিই হচ্ছেন বিষয় আর সব আশ্রয়। সুতরাং, দ্বাদশতত্ত্বের অন্যতম সারতত্ত্ব হচ্ছে গৌরাঙ্গ তত্ত্ব।

চৈতন্য যুগে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠায় পদাবলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ধর্মের অনন্য অনুষঙ্গ হিসেবে বৈষ্ণব পদ ও তার কীর্তন গৌড়ীয় দর্শন ও তার বহিঃ প্রকাশের তাৎপর্যপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। আমাদের অভিমত চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ অনুধাবনে বৈষ্ণব পদ সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং, উপযুক্ত বিষয় প্রমাণে আমরা চৈতন্য যুগের কয়েকজন বিখ্যাত পদকর্তা ও তঁদের পদ উপস্থাপন করছি।

চণ্ডীদাস

বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* পদগুলি বাদ দিলে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত সহস্রাধিক পদের সন্ধান পাওয়া যায়। এই চণ্ডীদাস মানবীয় প্রেমরস-সিক্ত। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি চৈতন্যদেবের রসাস্বাদনের বিষয় যে পদাবলি ছিল তার অন্যতম রূপকার আমাদের এই পর্বে আলোচিত চণ্ডীদাস। কারণ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব সমগ্র পদাবলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। এঁদের যুক্তবেণী সঙ্গমেই সেই পদাবলি প্রেমামৃত ধারা সিঞ্চনের অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষত চণ্ডীদাস ও তাঁর পদাবলি। এ-বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য :

> ...বিদ্যাপতির মতো চণ্ডীদাসের পদাবলীর সুরও মানবীয় প্রেমরস-সিক্ত। তবে বিদ্যাপতির সঙ্গে এই প্রেমচিত্রণের পার্থক্যও অনেকখানি। তাঁর নিজের জীবনে রজকিনী প্রেম কামগন্ধহীন নিকষিত হেম হয়ে উঠেছিল কিনা তা লোকশ্রুতির বিষয়, - কিন্তু পদাবলীর রাধা-চিত্র আঁকতে গিয়ে সেখানে যে একটি কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমারতির দেহদীপ বিরহাগ্নির প্রজ্বলনে অনির্বাণ জ্বালিয়ে রেখেছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।[১]

বাস্তবিকই চণ্ডীদাসের পদ কামগন্ধহীন নিকষিত হেম-সদৃশ প্রেমামৃতের সন্ধান দিয়েছে। কৃষ্ণবল্লভা রাধার চরিত্রাঙ্কণে তিনি যেন স্বীয় প্রেমসাধনার বিষয়বস্তুই ফুটিয়ে তুলেছেন।

চণ্ডীদাস তাঁর পদাবলিতে যে রাধারূপ এঁকেছেন তা কামাসক্তিবিহীন প্রগাঢ় প্রেমের মূর্ত প্রতিমাস্বরূপ হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির মতো তাঁর রাধা দেহজ বর্ণশতদলে বিকশিত নয় বা তার চমকও নেই। চণ্ডীদাসপ্রেম-চিত্রণে যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছেন তা কবির নিরাভরণ তন্ময় চিত্ররূপ। এই চিত্ররূপে রাধা প্রেমে বিভোর, বাইরেতার যোগিনীর সাজ, বাহ্যিক অবয়বে অত বেশি বর্ণবৈচিত্র্য নেই, কিন্তু অন্তর গাঢ় রঙের আলপনায় সজ্জিত। সেই আলপনার প্রতিটি ধাপ কৃষ্ণ-শ্যাম রঙে আচ্ছাদিত। বিদ্যাপতির রাধা নয়ন-মুগ্ধকর বর্ণিল ছটায় উদ্ভাসিত, চণ্ডীদাসের রাধা শ্যামল বাংলার কোমলতায় গড়া যেন এক অপূর্বমোহময়ী প্রতিমা, যার অন্তর যেমন বিশুদ্ধ প্রেমে বিভোর তেমনি বিরহানলে দগ্ধ হতে হতে অঙ্গার প্রায়; যোগিনীর মতো। কৃষ্ণও বিদ্যাপতি হতে স্বতন্ত্র যথার্থ প্রেমিক এবং প্রেমে উদ্ভাসিত। যেমন :

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নতারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্রপানে
কি কহে দু হাত তুলি ॥
একদিঠি করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥[২]

---

১. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা - ২০০৭, পৃ.-৯৭

২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪৯

চণ্ডীদাস যেন নিজেই রাধাপ্রেমে বিহ্বল। প্রেমের উত্তাপে, ভাব-বিগলনে যেন সব কিছু একাকার হয়ে গেছে। রাধার ভাবতন্ময়তার নানান দিক চণ্ডীদাস অপূর্ব ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন। ভাবাকুল কৃষ্ণ-রাধিকা-চিত্রে রসিক শ্রোতার মন যেমন বিগলিত করে প্রেমবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমন তন্ময় হয়ে অনুরাগের সুদীপ্ত লীলা স্মরণ অনুভূত হয়। যেমন :

১. তন্ময় প্রেমাকুলতা

ক) সেই কেবা শুনাইলে শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়ামরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধুশ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে বা পাসরিব তারে ॥[১]

খ)সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজ-কুল-নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাড়াঞা তরুমূলে ॥[২]

২. পূর্ব রাগ

ক) i) নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
ততহি উদয় ভেল ॥[৩]
ii) বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে
পথেতে যাইছে সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে ॥
সই সেরূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বসনের শোভা
পাসরিতে নারি তারে ॥[৪]

৩. রূপানুরাগ ও আক্ষেপ

ক) এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি।
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥[৫]

---

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৫০
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫১
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫২
৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৫৪
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩

খ) কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু দিবস দিবস কৈনু পর ॥[১]

৪. খণ্ডিতা চিত্র

ক) কি হৈল কি হৈল কালা কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি ॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবিধ ঝুরে ॥[২]

খ)সই কেমনে ধবির হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
সে বধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক সে ॥[৩]

৫. রসোদ্গার

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
দু খানি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা ॥[৪]

চণ্ডীদাস পদাবলিতে আক্ষেপানুরাগের যে চিত্র এঁকেছেন তা অসাধারণ। তবে মাথুর পর্বে তাঁর প্রকাশ ততখানি উজ্জ্বল নয়। আত্মনিবেদন পর্যায়ে তাঁর কৃতিত্ব তুলনারহিত। এক অর্থে বলা যেতে পারে – চণ্ডীদাসের পদাবলি আক্ষেপানুরাগ ও আত্মনিবেদনের সংমিশ্রণে গড়া এক অপূর্ব ভাবসম্পদ। এই সংমিশ্রণে রাধা যেমন প্রেমের সুরের ঝংকার তুলেছেন তেমনি সে-সুর প্রাণস্পর্শী মধুর আবার প্রাণস্পর্শী করুণ। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর নিরিখে আমরা আরও কিছু প্রাসঙ্গিক পদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

১. রাই কহে শুন জে জানে পিরীতি
আরতি রসের লেহ।
আনে কি জানয়ে   এ রস-মাধুরী
রসিক বুঝয়ে কেহ ॥

---

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪৩
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬
৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৭২

পিরীতি আঁখরে   যেজন পূরিত
কিছু কিছু জানে সেহ
রসের রসিক   রসে আরোপিত
সেই সে জানয়ে লেহ ॥ ...
চণ্ডীদাস কহে   এমন পিরীতি

শুনিতে জগত রশ।
দুঁহে সে জানএ দুঁহাকার তত্ত্ব
আনে কি জান এ রস ॥[১]

২. বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহমন আদি তোঁহারি সপেঁছি
কুলশীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পড়িতে সুখ ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল-মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্য সম
তোমারি চরণ খানি ॥[২]

উল্লিখিত পদে যে আবেশ, যে অনুভূতি তা অনন্য-সাধারণ। এই অনন্যতার জন্যেই চণ্ডীদাস বাঙালির মন অধিকার করে আছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস যে আলোড়ন তুলেছিলেন তা তাঁর রাধা চরিত্রের জন্য। রাধা চরিত্রসৃষ্টিতে কবি ও সাধক চণ্ডীদাস যে অপার্থিব উপাদান অবলম্বন ও প্রয়োগ করেছেন তা সমস্ত স্থূলতাকে ঢেকে দিয়েছে। তাঁর বর্ণনা Mystic আবরণে আবৃত। চণ্ডীদাসের রাধায় রয়েছে অপার্থিব লাবণ্য, অশরীরী ব্যঞ্জনা, অতৃষ্ণ আবেগ ও অচঞ্চল আর্তি। তিনি তাঁর আরাধ্য রাধাকে স্থাপন করলেন মর্ত্য থেকে বহুদূরে, এক নিরুপম অধ্যাত্মতীর্থে। যেখানে অবিরাম প্রেমের উৎপ্রেক্ষা,

১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও ড. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৭৯
২. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ১৯৩

আক্ষেপ, অভিসার, মিলন ও সুতীব্রবিরহ। বৈষ্ণব পদাবলিতে তিনি এক অভিনব বিষয় সংযোজন করলেন, তাহলো – রাধা কৃষ্ণের প্রতি সমর্পিত শুধুমাত্র প্রেমের আকর্ষণেই নয়, তাঁর, আকর্ষণ হয়েছে অনন্ত প্রসারী যা দেশ-কাল-সীমানার ঊর্ধ্বে। তার সাথে সংযুক্ত হয়েছে অধ্যাত্ম জীবনের সাথে এক গভীর অন্বিত বিষয়। এখানে প্রেমসাধনা ও অধ্যাত্ম সাধনা মিলে মিশে যেন এক হয়ে গেছে। রাধার

প্রেম এক বৃহত্তর জীবন-উপলব্ধির সাধনা; অন্তর্ব্যথাই যেন 'ভাগবতী' উপলব্ধিতে উৎসারিত হয়েছে। চণ্ডীদাসের রাধার যে ব্যঞ্জনা তা তো জগতে দুর্লভ ! কামগন্ধহীন এক অপার্থিব চেতনা। চণ্ডীদাসের পদগুলি পড়তে পড়তে কবি ও পাঠক যেন এক সূত্রে গ্রন্থিত হয়ে যান। সেই মুহূর্তে তাঁরা একে অপরের আত্মার দোসর; দুঃখ- শোক ও আক্ষেপের সহযাত্রী। এ এক পরম সজীব আশ্রয়স্থল। কবির আত্মনিবেদনের পদে সুশীতল হয়ে ওঠে হৃদয়।আত্মনিবেদনের চরম পরাকাষ্ঠা দেখা যায় নিম্নবর্ণিত পদটিতে :

২. বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
এ কূলে ও কূলে মোর কেবা আছে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায় ॥
আঁখির নিমিখে যদি না দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥[১]

চৈতন্যদেব সম্ভবত চণ্ডীদাসের পদ থেকে তৃপ্তি লাভ করতেন একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। চণ্ডীদাসের পদ বস্তুত বাংলার খাঁটি নিজস্ব সম্পদ। কারণ তাঁর পদে রসিক শ্রোতার সাথে কবির সরাসরি আত্ম-যোগাযোগ ঘটে। প্রকাশের সরলতা ও বিষয়ভাবের প্রাচুর্যে এক ভাবোন্মাদ পরিবেশ তৈরি করে বৈ কি? চৈতন্য-পরবর্তী পদকাররা তাঁর থেকেই নিয়েছেন বেদনামধুর প্রেমের কল্পলোক সৃষ্টির কৌশল। চণ্ডীদাসে উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলার স্বকীয় স্নেহ-অনুরাগ, অবারিত সৌন্দর্যের ধারাস্নান, দুঃখ-সুখ

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)*বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৬৮

নিঙড়ানো প্রেমের করুণ আর্তি, লোক চেতনার অবিমিশ্র প্রকাশ ও আত্মনিবেদনে জীবনসর্বস্ব উজাড় করে অর্ঘ্যনিবেদন। রাধাকৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনায় আবেগাকুল শব্দ যোজনায় যেন ধ্যানের রাধাকৃষ্ণ আমাদের সামনে প্রস্ফুটিত হয়েছে। সমালোচকের এ-বিষয়ে মন্তব্য :

> বাঙালী প্রেমিক-প্রেমিকা গভীর ভাব-অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে সমাজ শাসনের প্রতিবন্ধকতা যে হৃদয়দ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করতে পারে চণ্ডীদাস আপনার জীবনে প্রত্যক্ষ প্রেমানভূতির আলোকে সেই প্রেমার্তি প্রকাশের কবি ভাষা সৃষ্টি করেছেন।[১]

বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়ভাবের প্রাচুর্যে চণ্ডীদাস অনন্য-প্রেমিক ও আস্বাদনকারী। পদগুলির রসময়তা বিচারে তা বাঙালির প্রাণের সম্পদ। আমরা এবার চৈতন্যযুগের 'বিশিষ্ট' কয়েকজন পদকর্তার পদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

ক. মুরারি গুপ্ত : মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেব হতে বয়সে বেশ বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁরা একই টোলে পড়াশুনা করতেন। চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ অনুযায়ী তাঁদের দুজনের মধ্যে খুব প্রীতি-অনুরাগের সম্পর্ক ছিল। মুরারিগুপ্তই সর্বপ্রথম সংস্কৃতে চৈতন্যজীবনীকাব্য লিখেছিলেন; যা মুরারি গুপ্তের কড়চা নামে পরিচিত। তাঁর রচিত চৈতন্যের বাল্য ও কৈশোর লীলার পদগুলি সুখপাঠ্য এবং এখনও ভক্তজনহৃদয় দ্রবীভূত করতে সক্ষম। মুরারি গুপ্তই প্রথম গৌরাঙ্গের ভাবময় জীবনের অপূর্ব আলেখ্য রচনা করেন; যেখানে ভাবরসের উচ্ছ্বাস যেমন রয়েছে তেমনি গৌর-গদাধরের উপাসনার বিষয়টিও রয়েছে। তেমনি গৌর-গদাধর উপাসনার সূত্রপাতও তাঁর পদে পরিলক্ষিত হয়। যেমন :

গদাধর অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া,
বৃন্দাবনগুণ গান বিভোর হইয়া ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখ খানি ॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥[২]

চৈতন্যপ্রিয়সখা মুরারি গুপ্ত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কিছুপদ লিখেছিলেন। দুষ্প্রাপ্য সেই পদগুলির একটি উদ্ধৃত করছি:

কি ছার পিরিতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই
সফরি সলিল বিন গোয়াইব কতদিন

---

১. শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-১৩৯৮ বাংলা, পৃষ্ঠা-৫৭
২. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা - ২০০৭, পৃষ্ঠা-১১১

শুন শুন নিঠুর মাধাই
ঘৃত দিয়া এক রতিজ্বালি আইলা যুগবাতি
সে কেমনে রহে অযোগানে।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসো হেন

ঝাট আসি রাখহ পরাণে ॥
বুঝিলাম উদ্দেশে   সাক্ষাতে পিরিতি তোষে
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু   জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরিতি না রয় ॥
যত সুখে বাড়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদবন্ধু ভাতি।
গুপ্ত কহে এক মাসে   দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহুরাতি ॥[১]

খ. নরহরি সরকার ঠাকুর : নরহরি সরকার ঠাকুর চৈতন্যদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত। শ্রীখণ্ড গ্রামের প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম। তবে চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে এঁর বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক গবেষক মনে করেন, তিনিই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের আদি রূপকার ও প্রবর্তক। তাঁর পদের যে বিশেষভাব পরিলক্ষিত হয় তা হলো – 'গৌরনাগর ভাব'। স্বরূপ দামোদর এবং কবি কর্ণপুর রাধার ভাবকান্তি নিয়ে গৌরাঙ্গ আবির্ভূত হয়েছিলেন – এই তত্ত্ব প্রদান করেন, কিন্তু নরহরি সরকার ঠাকুরের পদে তাঁদের পূর্বেই এই তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তিনি প্রকাশ করলেন –গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ, এবং তিনি ব্রজের নিগূঢ় নিকুঞ্জ-রস বিতরণের জন্য রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে গৌরাঙ্গ হয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত 'গৌরনাগর ভাব'-এর মত হচ্ছে গৌরাঙ্গ যেন কৃষ্ণের মতো নাগর, আর ভক্তের দল যেন গোপীদের মতো নাগরী। তাঁর রসাল পদগুলি হয়েছে দীর্ঘ। ফলে, পদাবলির কীর্তনে তাঁর পদ খুব একটা গাওয়া হয় না। শুধুমাত্র চৈতন্যমঙ্গল গানে গাওয়া হয়ে থাকে। তাঁর এতদ্বিষয়ক পদে লক্ষ করা যায় আদিরসের আতিশয্যে বিষয়বস্তুর রসোদ্‌গার করেছেন তিনি। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবভক্ত তাঁর প্রকাশিত বিষয়টিকে পছন্দ করেননি। এজন্যে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে তিনি প্রায় অগ্রন্থিত হয়ে রয়েছেন। নরহরি চক্রবর্তী প্রণিত *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে এবং দীনবন্ধু দাসের পদাবলি সংকলনে তাঁর এবং তাঁরপদের পরিচয় পাওয়া যায়। *শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব* গ্রন্থে তাঁর সমস্ত পদ মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত ভক্তি গ্রন্থ *ভক্তিচন্দ্রিকা পটল* ও *ভক্তামৃত অষ্টক*। তাঁর পদে যে ভক্তি এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। যেমন :

গৌরাঙ্গ নহিত   কে মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা   প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে ॥
মধুর বৃন্দা   বিপিন-মাধুরী

১. ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৮০-৮১

প্রবেশ চাতুরি সার।
বরজ যুবতী   ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥

গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ ভব সাগরে এমন দয়াল
না দেখি একজন ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া
কেমনে ধবিনু দে।
নরহরি হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে।[১]

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস বিষয়ক একটি পদ এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

সোনা শতবান যেন গৌরাঙ্গ আমার।
সুন্দর চাঁচর মাথে কুন্তলের ভার ॥[২]

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস বিষয়ক একটি পদ এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

কি লাগি মুড়ায়ে মাথা গেলা কোন দেশে।
কার ঘরে রহিলেক এই চতুর্মাসে ॥
সোঙারি সোঙারি হিয়া বিদরিয়া যায়।
কোথা গেল পরাণ পুতলি গোরা রায় ॥
কাঁদয়ে ভকতগণ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরজ ধরিতে নারে নরহরি দাস ॥[৩]

গ. শিবানন্দ সেন :*গৌরগণদ্দেশদীপিকা*-র লেখক কবি কর্ণপুরের পিতা শিবানন্দ সেন। বৈদ্যকুলোদ্ভব এই পদকারের বাসস্থান ছিল কুমারহট্টে, বর্তমানে হালিশহরে। তিনি ছিলেন চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। গৌর-গদাধর লীলার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপের প্রকাশ তাঁর পদে পাওয়া যায়। বিশেষ করে মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবের আবেশ, রাধাভাবের আবেশ এবং তাঁর স্বীয় দর্শন মহাপ্রভুকে কৃষ্ণরূপে এবং গদাধরকে রাধারূপে দেখার প্রয়াস। শিবানন্দ সেনের গৌর-গদাধর প্রেমের একটি অপূর্ব সুন্দর পদ উদ্ধৃত করছি :

---

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১৫১
২. পূর্বোক্ত. পৃষ্ঠা-১৫৬
৩. পূর্বোক্ত. পৃষ্ঠা-১৫৬

হোলি খেলত গৌর কিশোর।

রসবতী নারী গদাধর কোর ॥
স্বেদবিন্দু মুখ পুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি লোচনে নীর ॥
ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে ॥
খেনে খেনে মরুছই পণ্ডিত কোর।
হেরইতে সহচর সুখে ভেল ভোর ॥
নিকুঞ্জ মন্দির পাই কয়ল বিথার।
ভূমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার ॥
কাঁহা গোবর্ধন যমুনাকো কূল।
কাঁহা মালতী যুথী চম্পক ফুল ॥
শিবানন্দ কহে পহুঁ শুনি রসবাণী ॥
যাহা পহুঁ গদাধর তাহা রস খানি ॥[১]

উল্লিখিত পদ কীর্তন ও নৃত্যের অনুষঙ্গে চমৎকারভাবে গ্রন্থিত। মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে তৎকালীন ভক্ত পরিকরেরা যে আনুষ্ঠানিক কীর্তন ও নৃত্য করতেন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপর্যুক্ত পদটি।

চৈতন্যযুগের পদাবলিতে তিনজন ঘোষভ্রাতা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ; এঁরা তিনজনই চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ অনুচর, ভক্ত ও সুদক্ষ পদকর্তা ছিলেন। এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ বাসুদেব ঘোষের বৈষ্ণবপদ অধিকতর খ্যাতিলাভ করেছে। এঁরা তিনজনই ছিলেন চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। ফলে সরল বাংলায় লেখা চৈতন্য-সন্ন্যাস-বিষয়ক পদ ঐতিহাসিক ও কাব্যমূল্যের বিচারে বৈষ্ণব সাহিত্যে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। বিষয় বৈচিত্র্য অনুধাবনে আমরা উল্লিখিত তিন ভাইয়ের পদ উল্লেখ করছি।

গোবিন্দ ঘোষ : গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্যদেবের সেবক ছিলেন। কথিত আছে, চৈতন্যদেবের আদেশে অগ্রদ্বীপে এসে তিনি বিবাহ করেন এবং 'গোপীনাথ-বিগ্রহ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কীর্তনীয়া হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনায় তাঁর অপূর্ব একটি পদ :

কনয়া কষিল মুখশোভা
হেরইতে জগমন লোভা ॥
জিনি চাঁদে গোরা মুখ হাস।
পরিধান পীত পট্টবাস ॥
অঙ্গের সৌরভ লোভ পাইয়া।
নীবন ভ্রমরী আইল ধাইয়া ॥
ঘুরি ঘুরি বুলে পদতলে।
গুন গুন শবদ রসালে ॥

---

১. শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-১৩৯৮ বাংলা, পৃষ্ঠা-৫৯

গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে।

গোরা না দেখিলে বিষ লাগে।[১]

মাধব ঘোষ :মাধব ঘোষ একাধারে পদকর্তা ও প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ছিলেন। তাঁর মাথুর পর্যায়ের একটি পদ:

শকতি ক্ষীণ অতি উঠই না পারই
কাতরে সখী মুখে চাই।
পরশি ললাট করহি মুখ ঝাঁপল
তুয়া মুখ হৃদি অবগাহ ॥
মাধব করুণা কি লব তোহে নাই
এক বেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এ দুহুঁ পদ দরশাই ॥
রাইক পেখি ধরণী পর লুঠই
কত কত সারঙ্গ নয়নি।
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত
জীবইতে সংশয় জানি ॥
এতদিনে নবমী দশা পরিপূরল
কাস বহই উধমন্দ।
মাধব ঘোষ কালিদহে পেঠব
বুঝিও বেয়াধিক অন্ত ॥[২]

বাসুদেব ঘোষ : চৈতন্য সমসাময়িক গৌরপদরচয়িতা বাসুদেব ঘোষ ছিলেন এই যুগের বিষয়ভাব-প্রাচুর্যে অন্যতম পদকর্তা। চৈতন্যআশীর্বাদপুষ্ঠ তিন ভাই-ই ছিলেন চৈতন্যঅন্তঃপ্রাণ। বাসুদেব ঘোষের রচনা সবই গৌর-বিষয়ক বলে মনে করা হয়। গৌরাঙ্গের রূপ দেখে তাঁর যে নবানুরাগ হয়েছিল সেই অনুভূতির বিচিত্র বর্ণনা আমরা তাঁর পদে পাই। যেমন:

১. নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে
বল সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ বিদরিয়া যায় বুক
পরাণি বাহির হৈতে চায় ॥[৩]
২. গোরা অনুরাগে মোর পরাণ বিদরে।
নিরবধি ছল ছল আঁখিজল ঝরে ॥[৪]

---

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১৫৭
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬১
৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১৬৮
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৫

৩. মরমে লাগিল গোরা না যায় পাসরা।
নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগি বৈল পারা ॥
জলের ভিতরে ডুবি যেথা দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হৈলা পারা ॥ ...
বাসুদেব ঘোষ কহে নব অনুরাগে।
সোনার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে ॥[১]

যেন গৌররূপ নয়নের অঞ্জনের মতো হয়ে গেছে। চোখ মেলেও গৌর, চোখ বুজেও গৌর, স্থানত্যাগে গৌর, জলে প্রবেশ করলেও গৌর! এমন অপূর্ব অনুভূতি বাসু ঘোষের পদাবলির অন্যতম উপজীব্য। লীলা বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা-ই নিখুঁতভাবে আতিশয্যমুক্ত হয়ে সরল বাংলায় উপস্থাপন করেছেন। গোষ্ঠ্যলীলা, দানলীলা, রাসলীলা, মাথুর, কৃষ্ণের পূর্বরাগ, রূপানুরাগ প্রভৃতি বিষয়ের গৌরচন্দ্রিকায় অপূর্ব রসময়তা সৃষ্টি করেছেন; যা এখনও কীর্তন আসরে রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ স্মরণের পূর্বে গাওয়া হয়। গৌরচন্দ্রিকার উল্লিখিত বিষয়ভাবে বাসুদেব ঘোষ নিপুণ, সাবলীল ও ভক্তরসিক। তাঁর গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক কিছু পদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

১. গোষ্ঠ লীলা বিষয়ক	:	গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল। ধ্বলি সাঙলি বলি সঘনে ডাকিল ॥[২]
২. শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ	:	আরে আরে মোর গোরা দ্বিজমনি। রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায়ে ধরণী।[৩]
৩. মাথুর	:	কহ সখী জীবন উপায়। ছাড়ি গেলো গোরা নটরায়॥[৪]
৪. রূপানুরাগ	:	কাঁচা কাঞ্চন মণি গোরারূপ তাহে জিনি ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ। ও নবকুসুমদাম গলে দোলে অনুপাম হিলন নরহরি সঙ্গ ॥[৫]
৫. দানলীলা	:	আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কিভাব পড়িল। সুরধনী তীরে গোরা দান সিরজিল ॥[৭]
৬. রাস লীলা	:	বৃন্দবন লীলা গোরার মনেতে পড়িল। যমুনার ভাব সুরধনীরেকরিল ॥[৮]

---

১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও ড. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ১
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৩
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৫
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৭
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৬
৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬
৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৬

৭. পাশা খেলা : গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব হইল।
পাশা সারি লৈয়া প্রভু খেলা আরম্ভিল ॥[১]

৮. কুঞ্জভঙ্গ : উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া উঠিল ॥[২]

৯. বিরহ : আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কে আইল কে আইল করি ঝরয়ে নয়ান ॥[৩]

বংশীবদন :বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় চৈতন্যদেবের বয়ঃকনিষ্ঠ ভক্ত এবং প্রতিবেশী ছিলেন। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি চৈতন্যমাতা শচীদেবী এবং স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধান করতেন। বংশীবদনের পদের সংখ্যা অনেক। তাঁর পদে ভণিতায় 'বংশীবদন', 'বংশীদাস', 'বংশী' নামের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তাঁর পদাবলির বিষয়ভাব প্রাচুর্যে ভরপুর। কারণ, তাঁর গৌর-পদাবলিতে প্রত্যক্ষদর্শিতার গভীর প্রত্যয় পরিলক্ষিত হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কোনো কোনো বিষয়ে ধারাবাহিক পদ রচনা করেছিলেন। চৈতন্যযুগের পদাবলিতে বংশীবদন এক অনন্য পদকার। তাঁর পুত্র চৈতন্যদাস এবং পৌত্র শচীনন্দন দাসও বিখ্যাত পদকার ছিলেন। আমরা বংশীবদনের তাৎপর্যমণ্ডিত কিছু পদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

১.গোষ্ঠলীলা (গৌরাঙ্গ বিষয়ক) :
ক.ভাবাবেশে গোরাচাঁদ, বিভোর হইয়া।
ক্ষণে ক্ষণে ডাকে ভাইয়া কানাই বলিয়া ॥
ক্ষণে ডাকে সুবলেরে ক্ষণে বসুদাম।
ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদা বলরাম ॥[৪]
খ. শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদবয়ানে
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে বনে ঘনে ॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙ্গার শব্দ করি বদন বাজায় ॥[৫]

পূর্বরাগ :
আলো সই কি হইল মোরে প্রেমজ্বালা।
মো মেনে আপনা খাঁইলু ॥
কেনে বা যমুনা গেঁলু ।
শয়নে স্বপনে দেখোঁ কালা ॥[৬]

---

১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও ড. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ১৭৫
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭২
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৬
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৫
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭১
৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭১

চৈতন্যের সন্ন্যাস বিষয়ক একটি পদে পদকার শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার যে বিরহ ও বিলাপের চিত্র এঁকেছেন তা অসাধারণ। যথা :

আর না হেরিব   প্রসর কপালে
      আলকাতিলকা কাচ।
আর না হেরিব   সোনার কমলে
      নয়ন খঞ্জন নাচ ॥
আর না নাচিবে   শ্রীবাস মন্দিরে
সকল ভক্ত লৈয়া।
আর না নাচিবে   আপনার ঘরে
      আর না দেখিব চাঞা ॥
আর কি দুভাই   নিমাই নিতাই
নাজিবেন এক ঠাঞি।
নিমাই বলিয়া   ফুকরি সদাই
নিমাই কোথাও নাই ॥
নিদয় কেশব   ভারতী আসিয়া
মাথায় পড়ল বাজ।
গৌরাঙ্গঁসুন্দর না   দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ ॥
কেবা হেন জন   আনিবে এখন
      আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর   রোদন শুনিয়া
      বংশী গড়াগড়ি যায় ॥[১]

রামানন্দ বসু, যদুনন্দন, গোবিন্দ আচার্য, বাসুদেব দত্ত - এঁরাও চৈতন্যযুগের প্রখ্যাত পদকার। গৌরাঙ্গ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদে এঁদের কবিত্বও প্রশংসনীয়।

---

১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও ড. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণবধর্ম বিকাশের অন্যতম সময় চৈতন্যোত্তর যুগ। এ-সময়ে অর্থাৎ, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঙালি বৈষ্ণব-সমাজের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ধীরে ধীরে বাংলা থেকে ব্রজভূমিতে চলে যায়। চৈতন্যদেবের জীবনাবস্থায় বাঙালি বৈষ্ণবদের মূল লক্ষ্য ছিল পুরীর শ্রীক্ষেত্র। কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোভাবের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবদের লক্ষ্য স্থির করতে সচেষ্ট হন বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ। চৈতন্য-পরবর্তী সময়ে অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ বৈষ্ণব-সমাজের নেতা বলে সম্মানিত ছিলেন। গৃহস্থ হওয়ায় অদ্বৈতের অধ্যাত্ম চেষ্টা অনেকাংশে সংযত ছিল এবং অবধূত নিত্যানন্দ বিবাহ করে সংসারী হলেও তাঁর চৌম্বকীয় আকর্ষণ অটুট ছিল। বস্তুত এঁরা সংস্কৃত বিদ্যা ও প্রাচীন শাস্ত্রের ধার ধারতেন না। তাঁদের মূল পথ ছিল হৃদয়াবেগমিশ্রিত ভক্তিপথ। লুপ্ত তীর্থ বৃন্দাবনকে চৈতন্যদেবই জাগ্রত করেছিলেন, যদিও মাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণব-সাধনার পীঠ হিসেবে তীর্থপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীর প্রশিষ্য চৈতন্যদেবের নির্দেশেই সুবুদ্ধি মিশ্র, রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে বাস শুরু করেন। চৈতন্য, অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের তিরোভারের পরে ব্রজমণ্ডল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মহাস্থানে পরিণত হয়। পর্যায়ক্রমে রূপ-সনাতনের সাথে এসে যুক্ত হয় শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, লোকনাথ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ। চৈতন্য-উত্তর যুগে এঁরাই বৈষ্ণব ধর্মের নবরূপায়ণ করে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব এক নতুন মাত্রায় পর্যবসিত হলো যা এই সময়েই ভক্তিধর্মের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. দ্বাপর যুগে, ব্রজলীলায় হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা রাধার সঙ্গে প্রেমলীলা আস্বাদনের নিমিত্তে পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধর গোপবেশ ধারণ করেছিলেন।

২.অভীষ্ট প্রিয় ব্যক্তিতে স্বাভাবিক এবং গাঢ় যে আবিষ্টতা তাই রাগ এবং রাগময়ী যে কৃষ্ণভক্তি তাই রাগাত্মিকা ভক্তি। ব্রজবাসীজনের কৃষ্ণের প্রতি যে আকর্ষণ তা রাগাত্মিক। সুতরাং ব্রজগোপীদের রাগাত্মিক এবং অনুসারী ভক্তদের রাগানুগমার্গের কৃষ্ণভজনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা পদ্ধতি।

৩.গোপীশ্রেষ্ঠা রাধার প্রণয়জনিত অনুরাগ চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং লৌকিক সাহিত্যে বর্ণিত হলেও তা যে এত লোকোত্তীর্ণ বিষয় এবং গতাগতির পর্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ তা চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে ধারণা করা যায়নি। চৈতন্যের ভাবজীবন নিরীক্ষণের মধ্য দিয়েই রাধাভাবের শ্রেষ্ঠতার বিষয় ভক্তদের হৃদয়ে উদিত হয়।

৪.গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে প্রচলিত শাস্ত্র এবং লোকধর্মকে চরম উপেক্ষা করে নতুন ধর্মমত বা প্রেমধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তার উপলক্ষ্য—মধুররসে পরকীয়া রতির উপাসনা এবং তার শ্রেষ্ঠতার কীর্তন।

৫.উপাসনাজনিত অনুরাগে কৃষ্ণকীর্তন চিত্তরূপ দর্পণে প্রতিফলিত কামনা-বাসনারূপ মালিন্য দূর করে,অশেষ কল্যাণগুণচন্দ্রিকার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। অর্থাৎ, সাধকের এই নাম নিতে কালাকালের বিচারের প্রয়োজন হয় না। তাঁর অনন্ত নাম অনন্তভক্তের রুচি অনুসারে বিহিত রয়েছে। যার যে নামে রুচি সে সেই নামই নিতে পারে, কারণ সবনামেই কৃষ্ণের সর্বশক্তি নিহিত।

চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ

চৈতন্য-উত্তর যুগে বৈষ্ণব ধর্ম একটি নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ধর্মমতটির বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছিল –

১. বৃন্দাবনের সর্বস্ব রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা। এই তত্ত্বে রাধা প্রেমের আশ্রয় আর কৃষ্ণ প্রেমের বিষয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্মের বর্ণনা প্রদর্শিত হয়েছে, যথা: কৌমার, পৌগণ্ড এবং কিশোর। এই তিন বায়োধর্মই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ইষ্টস্বরূপ।

২. উপর্যুক্ত তিনরূপের অন্তর্নিহিত রসধারা বা আনন্দধারাই পরম প্রেম এবং তা অনুশীলন করাই প্রকৃত বৈষ্ণবদের সাধ্য সাধন বলে বিবেচিত।

৩. পার্থিব নায়ক-নায়িকার প্রেমের ক্ষেত্রে উভয়ই আশ্রয় ও বিষয়। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমে কৃষ্ণই প্রকৃত বিষয়। কারণ, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'। রাধাতত্ত্ব এখানে প্রেমের আশ্রয়। বস্তুত কাম ও প্রেম এক হয়েও পরস্পর বিপরীতধর্মী। কারণ, কাম আত্মসুখ কামনা করে এবং এক্ষেত্রে উভয়ই উভয়ের মুখীন হয়ে থাকে। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে আত্মমুখের কোনো বাসনা নেই; উভয়মুখীন ভাবও থাকে না। সুতরাং, রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বিরহ-মিলন-মান-প্রেম বৈচিত্ত্য প্রভৃতিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সর্বোচ্চ বিন্দুতে অবস্থান করছে।

৪. কৃষ্ণের মাধুর্য অপূর্ব এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কৃষ্ণরূপ দর্শন, কৃষ্ণনাম শ্রবণ নরনারী মাত্রই মনকে আকর্ষণ করে, চঞ্চল করে। সুতরাং নিজভক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে আস্বাদন করাই পরম শ্রেয়।

৫. যে ভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে যোগ হওয়া যায় তাই ভক্তিযোগ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য–এ-ও ভক্তিযোগ এবং ভক্তিই সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা। তাহলে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যে তো ভগবানের সেবাই হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি মৌলিক প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়, তাহলো–তার নিজভক্তিযোগ কোনটি? এক্ষেত্রে একমাত্র মধুর রসে বা উজ্জ্বলরসে ভগবানকে ভজনের যে স্বাদ, তাই নিজস্ব ভক্তিযোগ।

৬. মূলত ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রীতির কোনো হেতু নেই। কারণ, যোগতত্ত্বানুসারে আত্মা ঈশ্বরে লীন হয়ে যায় – এই তত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে অর্থহীন। নাম এবং নামী অভেদ; ভগবানের প্রতি যে সুগভীর প্রীতি তা মোক্ষ হতেও শ্রেয়। মুক্তির চেয়েও ভক্তির স্থান সুউচ্চে। সুতরাং বৈষ্ণবদের ঈশ্বরপ্রেমে, কৃষ্ণপ্রেমে, গৌরাঙ্গপ্রেমে স্বার্থের নাম গন্ধও নেই।

৭. কৃষ্ণ চিরকিশোর নটবর এবং চিরপ্রেমিক। কৃষ্ণপ্রেম কামগন্ধহীন। রাধা এবং গোপীগণও কামগন্ধহীন। এঁদের সম্পর্ক অপ্রাকৃত এবং সম্পর্কের হেতু মহাভাব। এই মহাভাব উপভোগ, রতি, প্রেমচিন্তা, আনন্দ, প্রক্ষোভ, তরল প্রভৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। একমাত্র কৃষ্ণপ্রীতিই স্থায়িভাব এবং মহাভাবের হেতু। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় :

গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।

কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় মহাবল ॥ ...
অতএব কামপ্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥[১]

৮. কৃষ্ণের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয়ই অখণ্ড ও নিত্য আনন্দময়। মানুষরূপে বৃন্দাবনে তাঁর নিত্যআনন্দের ঘনীভূত রূপের প্রকাশ ঘটেছে। কৃষ্ণ-সহচররূপে যাঁরা আছেন তাঁরা তাঁর আনন্দচেতনারই মূর্তি। কৃষ্ণের পূর্ণ অবয়ব অব্যয় এবং আধ্যাত্মিক; বস্তু দিয়ে বিচার্য নয়। তিনি সচ্চিদানন্দ, অর্থাৎ তিনি সৎবা পরম অস্তিত্ব; চিৎ বা পরম চৈতন্য, আনন্দ বা পরমানন্দ। পরমানন্দই কৃষ্ণতত্ত্বের আসল স্বরূপ এবং সৎ ও চিৎ পরমানন্দস্বরূপের দুটি লক্ষণ বা গুণ। ত্রিশক্তিতে তিনি আনন্দ আস্বাদন করে থাকেন। স্বরূপ শক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি দিয়েই তিনি সচ্চিদানন্দময়বিগ্রহ। আনন্দাংশ, সদংশ এবং চিদংশ – এই তিনটি হচ্ছে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তির রূপ। আনন্দাংশে থকে হ্লাদিনী শক্তি, সদংশে বিরাজমান সন্ধিনী শক্তি এবং চিদংশে থাকে সম্বিৎ শক্তি। স্বরূপ শক্তিতে তিনি লীলা বিহার করেন, মায়াশক্তিতে থাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তিতে থাকে জীবনধারা। সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ জুড়ে থাকে রাধা ও গোপীগণ। স্বরূপশক্তিতেই তিনি পরকীয়া লীলাবিলাস করতে থাকেন।

৯. রাধা এবং কৃষ্ণ একই, কিন্তু আনন্দআস্বাদনহেতু দুই হয়েছেন। এই বিষয় অচিন্ত্য এবং তা বুদ্ধির অগোচর। দৃশ্যমান ভেদ, অভেদ; সংযোগ, বিয়োগ থাকাও অচিন্ত্য স্তরভুক্ত। যেহেতু, ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ম্’, তাই তাঁর সমুদয় ক্ষমতা অচিন্ত্য। যথাঃ

> The introduction of the mystic formula of incomprehensibility seems to discharge the Vaisnavas of this school from all responsibility of logically explaining their dogmes and creeds and, thus uncontrolled, they descend from the domain of reason to the domain of Puranic faith of a mythological chcracter.[২]

১০. চৈতন্যদেব হলো রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ। অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণ কিন্তু বাইরে রাধার আস্তরণে মোড়ানো।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হেল এক ঠাঁই ॥[৩]

১০. চৈতন্য-নির্দেশেই বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে কান্তিবিদ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বস্তুত কান্তিবিদ্যার ভিত্তি ছিল কাব্য, নাটক, চিত্রকলা, সংগীত, ভাস্কর্য ইত্যাদি। শ্রীরূপ গোস্বামীর *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি* এই তত্ত্বের ভিত্তি গ্রন্থ এবং এক্ষেত্রে মধুর রসের ভজনই মুখ্য।

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৫

২.Surendranath Dasgupta, *A History of Indian Philosophy,* IV (Cambridge) Cambridge University press, 1961, PP-400-401

৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজ ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৫৫

ঈশ্বরের পরমকারণত্ব হলো চৈতন্য-উত্তরকালে বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম স্বরূপ এবং চৈতন্যবাদীদের ভক্তিবাদের সারমর্মও তাই। তবে নবদ্বীপে চৈতন্য যে ভক্তির প্রচার করেছিলেন তা ছিল জটিলতা মুক্ত এবং তিনি প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মে পৌরাণিক ক্রিয়াকাণ্ডমূলক তত্ত্বে ভক্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর পরিকরবৃন্দও তাঁকে যোগ্য অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈষ্ণব তত্ত্বে ভক্তি অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে। ভক্তির সঙ্গে এসে যুক্ত হয় শৃঙ্গার রস। একদিকে কৃষ্ণের উজ্জ্বল রসাত্মক রতি স্মরণ-মনন অন্যদিকে শুদ্ধ জীবনাদর্শ, তপশ্চর্যা–সবকিছুই এক জটিল পর্যায়ে এসে উপনীত হয়। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* উপর্যুক্ত বিষয়ের সমাধান দিয়ে স্থির স্বরূপ চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যথা :

মীমাংসক কহে ঈশ্বর কর্মের অঙ্গ হন।
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী, নির্বিশেষে ব্রহ্মা হেতু কয় ॥
পাতঞ্জল কহে কৃষ্ণ স্বরূপ আখ্যান।
অতএব বেদমতে স্বয়ং ভগবান ॥
পরমকারণ ঈশ্বর কহে নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিঁহ যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার ॥[১]

চৈতন্য-উত্তর যুগে বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ নিহিত রয়েছে সমসাময়িক গ্রন্থসমূহে। বিশেষভাবে সনাতন, রূপ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট গোস্বামীগণের গ্রন্থে। এই সময়ই চৈতন্যপূজনবিধি নিষ্পন্ন হয় এবং গোস্বামীগণের প্রচেষ্টায় নানান মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। রাধা-মদনমোহন, রাধাগোবিন্দ, বাধাবল্লভ, রাধাদামোদর, গোপীনাথ প্রভৃতি নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক সেবাবিধি ও তর্পনবিধি নির্ধারিত হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলাস্মরণ, সেবা ও মধুররসের ভজনপদ্ধতি চৈতন্য-উত্তরকালের পদাবলি সাহিত্যে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমরা চৈতন্য-উত্তর যুগের বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ চিহ্নিত ও স্পষ্ট করতে বিখ্যাত কয়েকজন পদকর্তার জীবন ও পদাবলি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ে আলোচনার প্রয়াসী হব।

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির পদকারবৃন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকরেছিলেন। নিম্নে আমরা উপর্যুক্ত যুগের কয়েকজন পদকর্তার পদাবলি স্বরূপ চিহ্নিত করার প্রয়োজনে উপস্থাপন করছি :

বৃন্দাবন দাস

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পদ রচয়িতাদের মধ্যেই ছিলেন। কিন্তু তাঁর পদের ধরন, বৈষ্ণব-বন্দনা, চৈতন্যানুরাগ এবং তত্ত্ব-দর্শন প্রয়োগে আমরা তাঁকে তত্ত্বসমৃদ্ধ পদাবলির পদকার হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই।

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৩১৫

চৈতন্যের জীবিতকালেই বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতৃ পরিচয়ের হদিশ মেলে না। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস। তাঁর জন্মসাল নিয়ে নানান মতামত আছে। ড. আহমদ শরীফ তাঁর জন্মসাল নির্ণয় করতে গিয়ে ১৪৪১-৪৫ শকাব্দ উল্লেখ করেছেন। মনে-প্রাণে চৈতন্যানুরাগী বৃন্দাবন দাসই প্রথম বাংলায় চৈতন্যবন্দনা কাব্য *চৈতন্যমঙ্গল* লেখেন। কিন্তু তাঁর মাতার আদেশে কাব্যটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় *চৈতন্যভাগবত*। চৈতন্যজীবনকথা হলেও উৎকৃষ্ট এই কাব্যে তিনি বেশ কিছু পদের সৃষ্টি করেছিলেন। এই পদগুলোতে আবার তালের নির্দেশও দেখতে পাওয়া যায়। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর *বৈষ্ণব পদাবলী* সংকলনে দুইজন বৃন্দাবন দাসের পদ উল্লেখ করেছেন। তাঁর পদে বিচিত্র লীলাকথন যেমন উঠে এসেছে তেমনি চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের স্বরূপও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন :

১. গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক

ক. ক্ষীরনিধি জলমাঝে আছিলা শয়ন শেজে
অনন্ত শ্রীনিত্যানন্দ অঙ্গে।
অদ্বৈত পিরীতি বশে আইলা কীর্তন রসে
হরিভক্তি বিলাইতে রঙ্গে ॥[১]

খ.গৌর গোবিন্দগুণ শুনহে রসিকজন
বিষ্ণু মহাবিষ্ণুপর পঁহু। (পৃ-৪৮৭)

২. গৌরাঙ্গ রূপ বিষয়ক

ক.মদনমোহন তনু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ললাটে তিলকশোভা উর্ধ্বে মনোহর ॥ (পৃ-৪৮৮)

খ.জানুলম্বিত বাহুযুগল
কনকপুতলী দেহা।
অরুণ অম্বর শোভিত কলেবর
উপমা দেয়ব কাঁহা ॥ (পৃ-৪৮৮)

গ. গমন মন্থর গতি জিনি ময়মত্ত হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণবসনছবি জিনিপ্রভাতের রবি
গোরাঅঙ্গে লহরী খেলায় ॥ (পৃ-৪৮৮)

৩. গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস বিষয়ক

ক.শুষ্ক হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি।
আচণ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি ॥
অফুরন্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়।
কলসে কলসে সেঁচে তবু না ফুরায়॥ (পৃ-৪৯১)

খ.না যাইহ ওরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।

১. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫
দ্রষ্টব্য : উদ্ধৃত পদগুলো *বৈষ্ণব পদাবলী* থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।

পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ চাইয়া। (পৃ-৪৯২)
গ. কাঁদে সবে ভক্তগণ হইয়া অচেতন
হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে।
কিবা মোর ধন জন কিবা মোর জীবন
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে ॥ (পৃ-৪৯২)

এছাড়াও বৃন্দাবন দাস তাঁর পদাবলিতে নিত্যানন্দের গুণবর্ণনা, গৌরাঙ্গের বিবাহ, প্রার্থনা, রূপানুরাগ, জগাই-মাধাই উদ্ধার, নিত্যানন্দের অভিষেক, নাম সংকীর্তনের অধিবাস, অদ্বৈত বন্দনা, বাসন্তী রাসলীলা, খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা প্রভৃতি বিষয়কে বিষয়বস্তু হিসেবে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। লক্ষনীয়, চর্যাপদের পদগুলিতে আমরা রাগলহরীর নানাভাবে সন্ধান পাই। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যেও যেমন ছন্দ উল্লিখিত হয়েছে তেমনি পদাবলিতেও সচেতনভাবে পদকর্তা প্রতিটি পদের শুরুতে তাল নির্দেশ করে দিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলির আঙ্গিক বিচারে বিষয়টির তাৎপর্য গভীরে প্রোথিত। উল্লিখিত তালগুলি রস-প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

জ্ঞানদাস

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রথম শতকের মধ্যেই দেখা যায় পাঁচটি স্থানকে মূল কেন্দ্র করে কীর্তন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের নানাবিধ বিকাশ হতে শুরু করে। স্থানগুলোর ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশেষত কীর্তন প্রচারের ক্ষেত্রে অপরিসীম। স্থানগুলো হচ্ছে: ১. বর্ধমানের শ্রীখণ্ড; ২. মুর্শিদাবাদের কাঁদরা; ৩. মুর্শিদাবাদের বুধুরি; ৪. নদীয়ার নবদ্বীপ এবং ৫. রাজশাহীর খেতুরী। জ্ঞানদাস কাঁদরা কেন্দ্রের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

গণ্ডিবদ্ধ ভক্তি-প্রেমের জগতে বিচরণ করতে গিয়েও অল্প কয়েকজন পদকার তাঁদের অপূর্ব কবিত্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, রায়শেখর বা কবিশেখর, বলরাম দাস অগ্রগণ্য।

অনুমান করা যায় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বর্ধমান জেলার কাঁদড়া-মাদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। ১৬০১-১৬০২ খ্রিস্টাব্দে খেতুরী মহোৎসবে জ্ঞানদাস নিত্যানন্দগোষ্ঠীর অন্যতম হিসেবে দেখা যায়। নরহরি চক্রবর্তী তাঁর *ভক্তিরত্নাকর*-এ গুরুত্বের সাথে জ্ঞানদাসের বন্দনা করেছেন। উল্লেখ্য, সতেরো শতকের শেষে সংকলিত পীতাম্বর দাসের *রসমঞ্জরী* ছাড়া সমস্ত পদসংকলনে জ্ঞানদাস গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর *জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী* গ্রন্থে কবির ৪৭৪টি অসন্দিগ্ধ ও ৩০টি সন্দিগ্ধ, মোট ৫০৪টি পদ সংগ্রহ করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত *বৈষ্ণব পদাবলী*-তে জ্ঞানদাসের ৩১১টি পদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব দাসের *পদকল্পতরু*তে জ্ঞানদাসের ১৮৬টি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিত্বের উৎকর্ষ বিচারে জ্ঞানদাস

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অনুসরণ করলেও ক্রমান্বয়ে তাঁর কবিত্বসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। চণ্ডীদাসের কাব্যাদর্শকে শিরোধার্য করেও আপন মহিমায় জ্ঞানদাস প্রেমানুভূতির কবি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির তুলনায় চৈতন্য-পরবর্তী কবিদের পদে বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক বেশি। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও রসতত্ত্বের প্রভাব। জ্ঞানদাসের পদেও তার সর্বাত্মক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তা সত্ত্বেও জ্ঞানদাস অন্য কবিদের তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র। তাঁর পদে আমরা মানবীয় প্রেম-রোমান্টিকতার অনুভূতির প্রকাশ দেখি। জ্ঞানদাসের অপূর্ব সৃষ্টিভাণ্ডারকে আমরা নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাঁর সৃষ্টির বিষয় ভাবের প্রাচুর্যকে অনুধাবন করতে পারি।

১. গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ

ক.শচীগর্ভসিন্ধু মাঝেগৌরাঙ্গরতন রাজে
প্রকট হইলা অবনীতে।
হেরি সে রতন আভা জগত হইল লোভা
পাপ তম লুকাল তুরিতে ॥ (পৃ-৩৮৩)

খ. কষিল কাঞ্চন মণি গৌর কলেবর
অজানুলম্বিতভুজ পুলক উজর ॥ (পৃ-৩৮৫)

গ. কলধৌত কলেবর গৌর তনু।
তছু সঙ্গ ও রঙ্গ নিতাই জনু ॥
কোটি কাম জিনে কিয়ে অঙ্গছটা।
অবধৌত বিরাজিত চন্দ্রঘটা ॥ (পৃ-৩৮৮)

ঘ. যেজন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়।
সে শরণ লউক নিতাই চাঁদের
অরুণ দুখানি পায় ॥ ...
যে নিতাই বলিয়া কাঁদে
জ্ঞানদাসে কহে গৌরাঙ্গ সেই
হিয়ার মাঝারে বাঁধে ॥ (পৃ-৩৮৮)

২. গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক পদ

ক. অপরূপ গোরাচান্দে।
বিভোর হইয়া রাধার প্রেমে
তার গুণ কহি কান্দে ॥[১]

খ. লাখ বাণ কাঞ্চন জিনি।
প্রেমে অঙ্গ ঢর ঢর মুঞি যঙে নিছনি ॥
কি ছার শরদ কোটি শশী।
জগত করিল আলো গোরা-মুখের হাসি ॥[২]

গ. সহচর অঙ্গে গৌর অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া ॥[৩]

১. বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, *জ্ঞানদাসও তাহার পদাবলী*, শতাব্দী গ্রন্থভবন, কলকাতা, ১৩৭২, ১১৫ সংখ্যক পদ

২. মুহম্মদ আবদুল হাই ও ডঃ আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), *মধ্যযুগের বাঙলা কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৬

৩. বিমানবিহারী মজুমদার (সম্পাদিত), *জ্ঞানদাসও তাহার পদাবলী*, শতাব্দী গ্রন্থভবন, কলকাতা, ১৩৭২, ৪২৫ সংখ্যক পদ

৩. রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, সখিশিক্ষা ও নবোঢ়ামিলন বিষয়কপদঃ

ক.এ তোর বালিকা চান্দের কলিকা
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে সদাই হৃদয়ে
পসরা করিয়া রাখি ॥[১](পৃ-৩৮৯)

খ.মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা
শুন শুন পরাণের সই। (পৃ-৩৯১)

গ.কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কূলে।
অপরূপ রূপ কদম্ব মূলে ॥
অচলা চপলা মেঘেরি গায়।
মৃগাঙ্করহিত শশাঙ্ক ভায় ॥ (পৃ-৩৯২)

ঘ.শারদ পূর্ণিমা ইন্দু মুখমন্ডল
তনু ঘনশ্যামর কাঁতি।
নয়ন কমল অলি ভুরুযুগ ভঙ্গিম
লাগি রহল মধুমাতি ॥ (পৃ-৩৯৭)

ঙ. পহিলহি দরশনে সোঁপবি সেবা
পুছইতে কুশল উতর নাহি দেবা ॥ (পৃ-৪০৪)

অথবা,

... মাধব তুয়া পায়ে সোঁপলুঁ গোরি।
তুহুঁ বিদগ্ধবর এহ রস থোরি ॥ (পৃ-৪০৫)

এ ছাড়াও জ্ঞানদাসের পদের বিষয়-ভাব প্রাচুর্যে দান ও নৌকালীলা, রূপ ও অনুরাগ বিষয়ক, অভিসার, মান-পর্যায়ে বাসকসজ্জিকা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা নায়িকা বিষয়ক পদ, বংশীশিক্ষা, অনুরাগ, রসোদ্গার, আক্ষেপ-অনুরাগ বিষয়ক পদ, মিলন ও রাস বিষয়ক, মাথুর ও ভাবসম্মেলন বিষয়ক এবং আত্মনিবেদন বিষয়ক পদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষণীয়। ব্রজবুলি ভাষায় তাঁর সৃষ্ট পদ অনন্য এবং অলঙ্কার-উপমা-ছন্দে উত্তর যুগে সত্যই জ্ঞানদাস এক অপূর্ব কবিসত্তার পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর আত্মনিবেদন বিষয়ক একটি পদ উল্লেখ করছি:

তোমার গরবে গরবিনি হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা লয্যা রাখি বুকে ॥
অন্যের আছয়ে অনেক জন
আমার কেবলি তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে

প্রিয়তম করি মানি ॥

শিশুকাল হৈতে   মায়ের সোহাগে

৪. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৫

দ্রষ্টব্য : উদ্ধৃত পদগুলো *বৈষ্ণব পদাবলী* থেকে ব্যবহৃত হয়েছে।

সোহাগিনী বড় আমি।

সখীগণ গণে   জীবন অধিক

পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥

নয়ন-অঞ্জন   অঙ্গের ভূষণ

তুমি যে কালিয়া চান্দা।

জ্ঞানদাস কহে   কালার পিরীতি

অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥ (পৃ-৪৬৯)

গোবিন্দদাস

চৈতন্যোত্তর যুগে গীত-সাহিত্যে প্লাবন সৃষ্টিকারী পদকর্তা গোবিন্দদাস। ষোড়শ শতকের সম্ভবত তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে তাঁর জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার কাছে তেলিয়া বুধুরি গ্রামে। শ্রীখণ্ডের দামোদর কলের পরমভক্ত কবি গোবিন্দদাস উত্তর যুগের পদাবলি কাব্যের মধ্যমণিস্বরূপ। চৈতন্য-পরবর্তী দ্বিতীয়কলেবরখ্যাত শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর গুরু। গোবিন্দদাসের কবিত্বে চমৎকৃত হয়ে শ্রীজীব প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দ তাঁকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। নরহরি চক্রবর্তী তাঁর *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে গোবিন্দদাসের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত পদসম্ভার অধিকাংশই ব্রজবুলি ভাষায় এবং কিছু পদ বাংলায় রচিত। তিনি বিদ্যাপতির ন্যায় সুপণ্ডিত কবি ছিলেন এবং এ কথা প্রায় নিশ্চিত হয়েই বলা যায় যে, তিনি শ্রীধর দাসের *সুদুক্তিকর্ণামৃত* এবং রূপ গোস্বামীর *পদাবলী* দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি বন্দনার পদও তিনি রচনা করেছিলেন। অবশ্য তাঁর জয়দেব ও চণ্ডীদাসের বন্দনা-পদও রয়েছে।

গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গলীলার পদ বেশি রচনা করেননি। বাসুদেব ঘোষ উৎকৃষ্ট গৌরলীলা বিষয়ক পদরচনা করাতে তাঁর গুরু শ্রীনিবাস তাঁকে কৃষ্ণলীলার পদ রচনা করতে আদেশ দেন। ড. বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর *গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ* গ্রন্থে গোবিন্দদাস কবিরাজের ৭২৮টি পদের সংকলন করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত *বৈষ্ণব পদাবলী* গ্রন্থে গোবিন্দদাস ও চক্রবর্তী নামে ২৯৬ + ৯৫ = ৩৯১ টি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যাই হোক, গোবিন্দদাসের পদসম্ভার এত সমৃদ্ধ যে অনেক পালা শুধু তাঁর পদ দিয়েই গাওয়া সম্ভব এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ব্যাখ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অলঙ্কারের ঝংকারে, উপমা-অনুপ্রাসে তাঁর পদ অনন্যতায় উদ্ভাসিত। যেমন :

ক.কুবলয় কান্দন কুসুম কলেবর

কালিম কান্তি কলোল।

কোমল কেলিকদম্বকরম্বিত

কুণ্ডল কান্ত কপোল ॥ (পৃ-৬২২)

খ. নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে পুলক-মুকুল অবলম্ব। (পৃ-৫৮৩)

গ. নবনীরদতনু তড়িত লতা জনু

পীত পতনি বনি ভাল। (পৃ-৬২০)
ঘ.অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন
জলদ পুঞ্জ জিনি বরণা। (পৃ-৬১৮)

গোবিন্দদাস তাঁর পদাবলিতে শুদ্ধ ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করেছেন। ছন্দের ধ্বনিস্পন্দন এবং যতিবিন্যাসে তিনি যে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন তা সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলিতে দেখতে পাওয়া দুষ্কর। তিনিও বিদ্যাপতির মতো সচেতন শিল্পী ছিলেন। পরিণত শিল্পবোধের ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস সত্যিকার অর্থেই অগ্রগণ্য। যদিও তাঁরা একটি সম্প্রদায়বিশেষের ভক্তকবি ছিলেন। তবে আশ্চর্য বিষয় এই যে ভক্তির আবেগে শিল্পীর রূপভোক্তার সত্তাকে তাঁরা বিসর্জন দেননি। গোবিন্দদাসের পদাবলিতে তত্ত্বের গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে। তবে, তত্ত্ব কাব্যরসকে তার প্রবহমান ধারাকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি।

বিষয়ভাবের প্রাচুর্যে, তত্ত্বে, বিচিত্র অনুষঙ্গে গোবিন্দদাসের পদাবলি বিন্যস্ত। নিম্নে আমরা তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রকাশে কিছু পদের উল্লেখ করছি :

১. গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ
ক. নীরদ নয়নে নীর ঘণ সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব কদম্ব ॥ (পৃ-৫৮৩)
খ. মবহুঁ গায়ত সবহুঁ নাচত
সবহুঁ আনন্দে মাতিয়া।
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতলে
বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া ॥ (পৃ-৫৮৭)
গ. কাহে পুন গৌর কিশোর।
অবনত সাথে লিখত মহিমণ্ডল
নয়নে গলয়ে ঘন লোর ॥ (পৃ-৫৮৮)

২. বন্দনা বিষয়ক
শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা:
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম।
কলিমদমখন নিত্যানন্দ রাম ॥ (পৃ-৫৮৮)
শ্রীনিবাস বন্দনা
জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীনহীন তারণ প্রেম রসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম ॥ (পৃ-৫৮৯)
শ্রীনরোত্তম বন্দনা
জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম

প্রেমভকতি মহারাজ।
যাকো মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ (পৃ-৫৮৯)

৩. রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক
ক. নিশাস নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব ॥
খ. কাঞ্চনগোরী ভোরি বৃন্দাবনে
খেলই সহচরী মেলি। (রাধার পূর্বরাগ)(পৃ-৫৯৪)
গ. যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥
ঘ. হেরইতে হেরি না হেরি
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি ॥ (কৃষ্ণের পূর্ব রাগ) (পৃ-৫৯৫)

৪. রসোদ্গার
ক. দরশনে লোর নয়নযুগে ঝাঁপি
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপি ॥ (পৃ-৬০২)
খ. এ ধনি পদুমিনি পড়ল অকাজ।
জনি ভেটহ হরি কুঞ্জকমাঝ ॥ (পৃ-৬০৪)

৫. মিলন বিষয়ক
ক. সুন্দরি তুরিতহিঁ করহ পয়ান।
সবহুঁ তিরিথফল স্বামি-সুমঙ্গল
ভানুক কুণ্ডে সিনান ॥ (পৃ-৬১০)
খ. জলদহি জলদ বিজুরি দিঠি তাপক
মরকত কনয় কঠোর।
এ দুহুঁ তনুমন নয়ন রসায়ন
নিরুপম নওল কিশোর ॥ (পৃ-৬১৩)

৬. রূপ ও অনুরাগ
ক. নীল রতন কিরে নব ঘন ঘটা।
লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা ॥ (পৃ-৬১৯)
খ. নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বু কন্দর
নিন্দি সিন্দুর ভঙ্গ ॥ (পৃ-৬২০)
গ. অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ ॥ (পৃ-৬২৭)

৭. রাস বিষয়ক

ক. শারদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথি
মত্ত মধুকর ভোরণি ॥ (পৃ-৬৫২)

খ. কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমাওল
রমণীমণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহামরকত মণি
শ্যামর নটবর রাজ ॥ (৬৫৩)

ঝুহই রাগে বর্ষাকালোচিতবিরহের চমৎকার একটি পদের দৃষ্টান্ত :

ঊয়ল নব নব মেহ।
দুরে রহু শ্যামর দেহ ॥
তহি ঘন বিজুরি উজোর।
হরি রহু নাগরি কোর ॥
চাতক পিউ পিউ বোল।
শুনইতে জিউ উতরোল ॥
দাদুরি উনমত ভাষ।
বিরহিনী জীবন নৈরাশ ॥
দারুণ পাউখ কাল।
জীবন ভেলজনজাল ॥
ঐছন ভেল দুরদিন।
অম্বর রবিশশিহীন ॥
কো কহে কানুক পাশ।
চলতহি গোবিন্দদাস ॥

এছাড়াও খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, গোষ্ঠলীলা, দান, নৌকাবিলাস প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে গোবিন্দদাস যে সৃষ্টি ভাণ্ডার রেখে গেছেন তা বিষয়ভাবে ও প্রাচুর্যে শুধু বৈষ্ণব কাব্যেই নয় বাংলা কাব্যসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

বলরামদাস

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বলরামদাস এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী কবি। তবে বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাগণ একাধিক বলরামদাসের উল্লেখ করেছেন। একজন বলরাম নিত্যানন্দ-শাখার অন্যতম ভক্তকবি এবং তিনি ছিলেন নিত্যানন্দের অনুচর এবং চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। অপর বলরামদাস সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন বৈষ্ণবদাস তাঁর *পদকল্পতরু* সংকলনে। এই বলরামদাস গোবিন্দদাস কবিরাজের

বংশধর এবং তিনি ছিলেন বুধুরী গ্রাম নিবাসী। চৈতন্য-উত্তর যুগের অন্যতম ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনি। সুকুমার সেনের *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*-২ হতে জানা যায়, বাৎসল্যরসের বিশুদ্ধ বাংলা পদগুলি নিত্যানন্দ-অনুচর বলরামদাসের রচনা। আর দৃঢ় বাঁধুনির ব্রজবুলি ভাষায় রচিত যে পদগুলি পাওয়া যায় তা রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য বলরামদাসের। ড. বিমানবিহারী মজুমদারও সুকুমার সেনের এই মত সমর্থন করেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও একাধিক বলরামদাসের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তবে গবেষক নীলরতন সেন মূলকবি বলরামকে একজন হিসেবে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করেছেন। আমরাও নীলরতন সেনের মতকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। কারণ পূর্বোক্ত গবেষকগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে কবিকে পৃথক করেছেন (ভণিতার উৎস অনুসারে) তাকে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হিসেবে বলা যায় না। বলরামদাসকে মুখ্যত একজন ধরে নিয়ে কাব্যবিচার করলে তার পূর্ণাঙ্গ রস ও আঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ সম্ভব বলে আমাদের অভিমত এবং অবশ্যই বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে।

যদিও বলরামদাস জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাসের মতো প্রতিভাধর কবি ছিলেন না, তবে তাঁর বাৎসল্য রস এবং রসোদ্‌গার বিষয়ক পদগুলি ভাবে-রসে-মাধুর্যে অতুলনীয়। বাসুদেব ঘোষের মতোই তাঁর চৈতন্যের সন্ন্যাস বিষয়ক পদে এক বিশেষ তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা, সন্ন্যাস, নিত্যানন্দবিষয়ক পদ, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ, রসোদ্‌গার, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, দানলীলা, নৌকাবিলাস লীলা, কৃষ্ণের দ্বাদশ মাসিক বিরহ এবং আত্মনিবেদন বিষয়ভাবের প্রাচুর্যে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন। আমরা তাঁর বহুল ব্যবহৃত কিছু পদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

১. গৌরচান্দ্রিকা বিষয়ক পদ

ক. নাচত গৌর সুনাগর মণিয়া।
খঞ্জন গঞ্জন পদযুগ রঞ্জন
রনিরনি মঞ্জির মঞ্জুল ধ্বনিয়া ॥ (পৃ-৭৩১)

খ. বিহারে আজু রসিকরাজ
গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ।
কঞ্জ কেশরপুঞ্জ উজোর
কনক রুচির কাঁতিয়া ॥ (পৃ-৭৩১)

গ. কোথায় আছিল গোরা ভুবন সুন্দর।
ও রূপে মুগ্ধ কৈল নদীয়া নগর ॥ (পৃ-৭৩৩)

ঘ. নবদ্বীপ-গগনে উয়ল দিন রাতি।
ঘন-রসে সেচল থির চর জাতি ॥
দেখ দেখ গৌর জলদ-অবতার।
বরিখয়ে প্রেম-অমিয়া অনিবার ॥ (পৃ-৭৩৪)

২. গোষ্ঠলীলা বিষয়ক পদে বিচিত্র বিষয়ভাব

ক. গোঠে আমি যা মা গো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাস সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব ॥ (পৃ-৭৪২)

খ. শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম

মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥ (পৃ-৭৪২)

গ. গোপালে সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল
যতনে কনাই এর চূড়া বলাই বান্ধিল ॥ (পৃ-৭৪৩)

ঘ. নটবর নব কিশোর রায়
রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে
ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ বোলত ঘন
মধুর মুরলী বায় গো॥ (পৃ-৭৪৩)

ঙ. আজি কানু হারিল দেখ বিনোদ খেলায়।
শ্রীদামে করিয়া কান্ধে বসন আটিয়া বান্ধে
বংশী বটের তলে লইয়া যায় ॥ (পৃ-৭৪৭)

৩. উত্তর গোষ্ঠবিষয়ক পদ

ক. পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খায় নাম করে মায় ॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মায় পথ পানে চাইয়া ॥ (পৃ-৭৪৪)

খ. চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু উর্ধ্বমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ (পৃ-৭৪৪)

মা যশোদার বাৎসল্য রসের প্রকাশ-নিমিত্ত একটি অপূর্ব পদ:

নন্দদুলাল বাছা যশোদা দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥
রতন প্রদীপ লইয়া আইলা নন্দরাণী।
এক দিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥
নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা ॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে,
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদনকমলে ॥ (পৃ-৭৪৫)

৪. মিলন ও সম্ভোগ

ক. দুহুঁ নবযৌবন নব নব প্রেম।
সজল জলদ কানু রাই কাঁচা হেম॥ (পৃ-৭৫০)
খ. দুহুঁ দুহুঁ নয়নে নয়নে ভেল মেলি।
লখই না পারি কলহ কিয়ে কেলি ॥ (পৃ-৭৫০)
গ. মিটল চন্দন টুটুল আভরণ
ছুটল কুন্তলবন্ধ।
অম্বর খলিত গলিত কুসুমাবলি
ধূসর দুহুঁ মুখচন্দ ॥ (পৃ-৭৫০)

৫. রসোদ্‌গার বিষয়ক

ক. সুন্দরী বুঝিলুঁ তোমার ভাব।
প্রেমরতন গোপতে পাইয়া
ভাঁড়িলে কি হবে লাভ ॥ (পৃ-৭৫১)

খ. নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে ॥ (পৃ-৭৫১)

বলরামদাসের পদগুলি অধিকাংশই অলঙ্কার বাহুল্যবর্জিত এবং আন্তরিক সারল্যের সুরে বাধা। তাঁর অধিকাংশ পদ সহজ সুরে ধ্বনিত এবং আন্তরিক প্রেম-বেদনার সহজ ছবিই তাঁর মূল অবলম্বন। পদকর্তা বলরামদাসের একটি বিখ্যাত প্রার্থনামূলক পদ (গুর্জরী রাগে):

সো লীলা শুনইতে লীলা দারু দরবই
গুণশুনি মুনিমন ভোর।
ও সুখ সায়র মাঝে জগজনে নিগমন
শ্রবণে পরশ নহ মোর ॥
হরি হরি কি শেল রহল মোর চিতে।
না শুনিলুঁ শ্রুতি ভরি নাগর নাগর মিলি
দুহুঁজন মধুরচরিতে ॥
সোই গিরি গোবর্ধন সোই ধাম বৃন্দাবন
সোনবরসময় কুঞ্জে।
সোই যমুনার জল কেলি কলা কুতূহল
হতচিত তাহে নহি রঞ্জে ॥
প্রিয়সহচরিগণ সঙ্গে সুখ আলাপন
খেলন বিবিধ সুবিলাস।
হৃদয়ে না স্ফূরই বিফলে সে জীবই
ধিক ধিক বলরাম দাস ॥ (পৃ-৭৭৭)

জগদানন্দদাস

অনুমান করা যায়, জগদানন্দদাস অষ্টাদশ শতকের সূচনালগ্নে শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে বীরভূমে এসে বসতি স্থাপন করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে একাধিক জগদানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। পদকর্তা জগদানন্দদাসের পদাবলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো – তা যুক্তাক্ষরের অনুপ্রাসবাহুল্যে এবং কাব্যালংকারে পরিপূর্ণ। কৃত্রিম সংস্কৃত-ঘেষাঁ পদকর্তা হিসেবে বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর অবস্থান। তাঁর পদসম্ভারও বিচিত্র বিষয়ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। তিনি গৌরাঙ্গলীলা, বাল্যলীলা, রূপ ও প্রেমানুরাগের পদ, রাধা-কৃষ্ণের রূপ, পূর্বরাগ, অভিসার, বিপ্রলম্ভ, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর প্রভৃতি বিষয়ে পদ রচনা করেছেন। বিষয়ভাবের বৈচিত্র্য প্রকাশে তাঁর কয়েকটি পদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

১. গৌরাঙ্গ বিষয়ক

ক. জননী কোরে গৌর ভগবান।
ঘনঘন গগনে মগনে রজনী কর
কর দরশাই রুদত একতান ॥ (পৃ-৮৭৫)

খ. দামিনীদাম-দমন রুচি দরশনে
দূরে গেও দরপকি দাপ।
শোনকুসুম তাহে কোন গণইরে
প্রাতর অরুণ-সন্তাপ ॥ (পৃ-৮৭৮)

২. রূপ-অনুরাগ বর্ণনা

ক. নবীন নীরদ নীল নীরজ
নীলমণি জিনিঅঙ্গ।
যুবতি-চেতন চোর চুড়হিঁ
মোর পিঞ্জ বিহঙ্গ ॥ (পৃ-৮৮৬)

খ. সজনিগো কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে ॥
দিয়ে হাস্য সুধা চার অঙ্গছটা আঠাতার
আঁখি-পাখি তাহাতে পড়িল।
মনমৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ-পিঞ্জর রহিল ॥ (পৃ-৮৯৮)

৩. অভিসার ও মিলন বিষয়ক

ক. মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ

মধুপ শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতীফুলমালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়ন খঞ্জনগতিহারী ॥ (পৃ-৮৯০)

খ. নিজ অপরাধ মানি যব মাধব
কোরে আগোরল ধাব।
গরস বিরসময়ী ইঙ্গিতে রসবতী
অসমতি সমতি বুঝাব ॥(পৃ-৮৯৪)

লোচনদাস

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে লোচনদাসের পদ সংখ্যা খুব বেশি নয়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত *বৈষ্ণব পদাবলী*তে ৫৮টি পদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। *চৈতন্যমঙ্গল* রচয়িতা লোচনদাস ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য। জন্ম আনুমানিক ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি কোগ্রামবিলাসী কমলাকর দাস এবং সদানন্দীর পুত্র ছিলেন। তাঁর পদাবলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য-ধামালী ছন্দ বা লৌকিক দলবৃত্তে রচিত। *চৈতন্যমঙ্গল* পাঁচালীগানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আর পদগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল ধামালী ছন্দের জন্য।

সমসায়িক অন্যান্য পদকার থেকে লোচনদাসের পদাবলির বিষয়ভাব ও আঙ্গিক ভিন্ন মেজাজে উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ তাঁর পদে সংস্কৃতানুগ বর্ণনভঙ্গির প্রয়োগ খুব একটা নেই, তবে গ্রামীণ শব্দের ব্যবহার এবং কথ্য বাকরীতির বিচিত্র প্রয়োগ রয়েছে। ফলে, তাঁর পদে সজীব গ্রামবাংলার মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়; হতে পারে তা অমার্জিত কিন্তু তাতে প্রাণের স্পর্শ মাখানো। তাঁর পদগুলোর মধ্যে রয়েছে গৌরাঙ্গ বিষয়কপদ, বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বাদশ বিরহ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বন্দনা, রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগ, অভিসার, মান, আক্ষেপানুরাগ, রসোদ্গার প্রভৃতি বিষয়। লোচনদাসের পদগুলিতে হয়তো বা যথোপযুক্ত ছন্দ বা অলংকারের ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু সহজ-সরল বর্ণনায় অকৃত্রিম গ্রামজীবন ও প্রত্যাশার বিষয়টি পাঠক অন্তরে এক ভিন্ন দোলার সৃষ্টি করে। আমরা তাঁর পদের বিষয়ভাবের দৃষ্টান্ত স্থাপনে কয়েকটি পদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

১. গৌরাঙ্গ বিষয়ক

ক. ধবল পাটের জোড় পর্য্যাছে
রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে
চরণ উপর দুল্যা যাইছে কোঁচা। (পৃ-৪৭৩)

খ. অরুণ কমল আঁখি তারক ভ্রমরা পাখী
ডুবুডুবু করুণা মকরন্দে। (পৃ-৪৭৩)

গ. নাচে শচীনন্দন ভকতজীবন ধন
সঙ্গে নাচে প্রিয় নিত্যানন্দ। (পৃ-৪৭৪)

ঘ. ঢর ঢর কাচাঁ সোনার বরণ
আউলাই পড়িছে গায়।

হেরি কুলরতী রসের পাথারে
সাঁতারে থেয় না পায়॥ (পৃ-৪৭৫)
ঙ. এই বার করুণা কর চৈতন্য নিতাই।
মো সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই ॥ (পৃ-৪৭৯)

২. রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক

ক. শ্রীকৃষ্ণভজন লাগি সংসারে আইলুঁ।
মায়াজালে বন্দী হৈয়া বৃক্ষসম হৈলুঁ ॥ (পৃ-৪৮০)
খ. রূপে রহল আঁখি লাগি।
হিয়ায় ভরল প্রেমআগি ॥ (পৃ-৪৮০)
গ. মৃগনয়নী কি আরে ধনী চাঁদবদনী।
রাজহংসী জিনি চলে সখী আগে পাশে।
কনকের লতা যেন দুলিছে বাতাসে ॥ (পৃ-৪৮১)

৩. আক্ষেপানুরাগ

ক. জীব না জীব না সোই জীবার নহো মুঞি
এছার পরাণ কার তরে।
এত পরমাদে সই রাধার মনে আন নাই
প্রাণ কাঁদে সই বিচ্ছেদের ডরে ॥ (৪৮২)
খ. জ্বালার উপর জ্বালা সই
জ্বালার উপর জ্বালা
জলকে তাই পথ না পাই
বসন টানে কালা। (পৃ-৪৮৩)
গ. যে ক্লেশ পথে কেউ নাই সাথে
গিয়াছিলাম জলে।
হেন বেলাতে বিনোদ কালা
কদম্বের তলে ॥ (পৃ-৪৮৩)

বিষয়-ভাব-প্রাচুর্যে লোচনদাসের পদসংখ্যা খুব বেশি না হলেও বৈষ্ণব পদসাহিত্যে তাঁর আবেদন কোনো অংশে কম নয়।

নরোত্তমদাস

বৈষ্ণব পদসাহিত্য তথা চৈতন্যোত্তর যুগের কীর্তনের নবরূপায়ণে নরোত্তম দাস সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। রাজশাহী জেলার খেতুরী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত এবং মাতা নারায়ণী। কৃষ্ণানন্দ দত্তের রাজধানী ছিল খেতুরী। শিশুকাল হতেই গৌরভক্ত ছিলেন তিনি। কথিত আছে, চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পরে নীলাচল থেকে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রার সময়ে রামকেলীতে যান। সেখানে খেতুরী গ্রামের দিকে তাকিয়ে ‘নরোত্তম’, ‘নরোত্তম’ বলে ডেকেছিলেন। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস, চৈতন্যদেবের আকর্ষণেই নরোত্তম দাসের জন্ম। এ-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নরহরি চক্রবর্তীর *নরোত্তমবিলাস* গ্রন্থে। বিশ

বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে যান এবং লোকনাথ গোস্বামী হতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। শ্রীজীব গোস্বামীর যত্নে নরোত্তম বৈষ্ণবশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং সম্রাট আকবরের বিখ্যাত সভাগায়ক তানসেন ও তিনি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য হরিদাস স্বামীর কাছে সংগীতবিদ্যা বিষয়ে তালিম নেন। পরবর্তীকালে দেখা যায়, তানসেন ধ্রুপদের ধারাকে সমৃদ্ধ করেন এবং অন্যজন বাংলার কীর্তনে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রূপান্তর আনেন। বৃন্দাবন কর্তৃক তিনি 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের জন্মতিথি স্মরণে নরোত্তম খেতুরীতে গৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, কৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধামোহন ও রাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে খেতুরীতে এক বৃহৎ বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণব ইতিহাসে এই সম্মেলন 'খেতুরী মহোৎসব' নামে পরিচিত। এই মহোৎসবেই বাংলা কীর্তনের ধারায় এক স্বচ্ছ নবতররূপ সংযোজিত হয় এবং কীর্তনাঙ্গে গড়ের হাটী বা গড়ানহাটীর ধারা সৃষ্টি হয়।

নরোত্তম দাসের পদাবলির বিষয়ভাব পর্যালোচনায় যে বিষয়টি উঠে আসে তা হলো–বৈষ্ণব সাধনার গোড়ার কথাগুলিকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। পদসম্ভারে কাব্যিক অলঙ্করণ তেমন না থাকলেও ভাবপ্রকাশের আধিক্য থাকায় পদগুলো মধুময় হয়ে উঠেছে। সাঙ্গীতিক বিবেচনায় এগুলি যেমন সুগেয় তেমনই সুশ্রাব্য। নরোত্তম দাসের পদাবলি সর্বসাধারণের আস্বাদনযোগ্য। গুরুতত্ত্বকে সুস্পষ্ট করে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর *প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা* গ্রন্থে। সমগ্র বৈষ্ণবসাধনার সারতত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর পদাবলিতে চৈতন্যের সেবালাভ, পরিণত অবস্থায় বৃন্দাবনে রাধাগোবিন্দের সেবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া – এসবই মূল উপলক্ষ্য। ভক্তের অন্তরের নিগূঢ়তম অবস্থাকে তিনি এমন সহজভাবে-ভাষায় প্রকাশ করেছেন যে তাঁর 'ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা' বৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার হয়ে রয়েছে।বৈষ্ণবের দৈন্যবোধ, বৃন্দাবনের লালসা, গুরুবন্দনা, গৌরবন্দনা, বৈষ্ণববন্দনা ইত্যাদি বিষয় তাঁর পদাবলির বিষয়বস্তু। ভাবের অপূর্ব রূপপ্রকাশ তাঁর পদাবলিকে দিয়েছে এক ভিন্নমাত্রা এবং বৈষ্ণব দর্শনের যে দৈন্য বা তার আর্তি প্রসঙ্গ তা তাঁর পদে দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন:

১. প্রার্থনা বিষয়ক

ক. এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞী।
পতিতে তারিতে তোমা বিনা কেহ নাহি ॥ (পৃ-৫৫৭)

খ. ... বৈষ্ণব চরণজল প্রেমভক্তি দিতে বল
আর কেহ নাই বলবন্ত।
বৈষ্ণবচরণরেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভুষণের অন্ত ॥ (পৃ-৫৫৭)

গ. i) গৌরাঙ্গের দুটীপদ যার ধন সম্পদ
যে জানে ভক্তি-রস সার।
ii) নিতাই পদকমল কোটি চন্দ্র সুশীতল
যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
iii)ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণমোর যুগল কিশোর। (পৃ-৫৫৮)

ঘ. গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর
হরি হরি বলিতে নয়নে ঝরে নীর ॥

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥ (পৃ-৫৫৮)

ঙ. কুসুমতি বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে গাইয়া যাইব রঙ্গে
মনোহর নিকুঞ্জকুটীরে ॥ (পৃ-৫৬২)

চ. হরি হেন দিন হইবে আমার
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোহাঁকার ॥ (পৃ-৫৬৪)

২. বিপ্রলব্ধা বিষয়ক

ক. বন্ধুরে লইয়া কোরে রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিলু আশাঘর। (পৃ-৫৬৭)

খ. শুন শুন মাধব বিদগ্ধ রাজ।
ধনি যদি দেখবি না সহে বেয়াজ ॥ (পৃ-৫৬৭)

৩. মিলন বিষয়ক

ক. রাই হেরল যব সো মুখ ইন্দু।
উছলল মন মহা আনন্দ-সিন্ধু ॥ (পৃ-৫৬৭)

খ. মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোহেঁ দোহাঁ পায়ল পরশমনি ॥ (পৃ-৫৬৭)

৪. শরৎকালীয় মহারাস বিষয়ক

ক. কুসুম আসন হেরি বামে কিশোরি গোরি
বৈঠল কুঞ্জকুটীরে।
চিবুকে দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মুখানি নিছিয়া লেই শিরে ॥ (পৃ-৫৭৯)

খ. আজু রসে বাদর নিশি
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী ॥
শ্যামঘন বরিখয়ে কত রস-ধার।
কোরো বঙ্গিণি রাধা বিজুরি সঞ্চার ॥
ভাবে পিছল পথে গমন সুবঙ্ক।
মৃগমদচন্দ পরিমল পঙ্ক ॥
দীগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার। (৫৭১)

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পদরচয়িতা হিসেবে অসংখ্য পদকর্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদকর্তার নাম উল্লেখ করা হলো :কবিরঞ্জন, বায়শেখর, কানুরাম দাস, নয়নানন্দ, উদ্ধবদাস, চৈতন্যদাস, কৃষ্ণদাস, জগন্নাথদাস, বসন্ত রায়, প্রেমদাস, নীলাম্বর, পরশুরাম, গোপালদাস, রাধাবল্লভদাস, ঘনশ্যামদাস কবিরাজ, হরিবল্লভ, নরহরি চক্রবর্তী, পুরষোত্তমদাস, কৃষ্ণকান্ত,

রাধামোহনদাস, হরেকৃষ্ণদাস, যাদবেন্দ্র, দীনবন্ধু, নিমানন্দ দাস, বৈষ্ণবদাস, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, গদাধরদাস প্রমুখ।

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে মুসলমান কবি

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে রসপ্লাবনের ধারা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, বৈষ্ণবতত্ত্ব ও সুফিবাদ যেন একটি স্থানিক রূপলাভ করে। *চর্যাপদ ও নাথসাহিত্য* থেকে দেখা যায়, নাথপন্থ ও সহজিয়া মতের প্রাদুর্ভাব ছিল তখন বাংলায়। এ দুটো সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক পরে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়। মূলত এরই ধারাবাহিকতায় ষোড়শ, সপ্তদশ এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আমরা দেখি মুসলিম কবিরা যেমন সুফি সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, তেমনি বাউলতত্ত্বের উদ্ভবে তারও সাধনা চলছে। সাধনার প্রধান তিনটি স্তর : প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধিকে সামনে রেখেই সুফি, বাউল ও বৈষ্ণবতত্ত্বের সাধনা বেগবান হয়েছে। বৈষ্ণব পদসৃষ্টির ধারায় তাই আমরা অনেক মুসলমান পদকর্তার সাক্ষাৎ পাই। চৈতন্যলালিত অসাম্প্রদায়িকতা যে বাঙালির চিরায়ত সম্পদ তারও একটি সাক্ষাৎ নিদর্শন মুসলিম কবির পদগুলো। বিষয়ে-ভাবে-প্রাচুর্যে তাঁদের পদসম্ভার বৈষ্ণব কবির যথার্থতা নিরূপণ করেছে। এখনও পরম শ্রদ্ধাভরে ঐ সব পদগুলি কীর্তনের আসরে গাওয়া হয়ে থাকে। ভক্ত-অন্তরের পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ পদগুলি বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সম্পদরূপেই বিবেচিত হয়েছে। আহমদ শরীফ তাঁর *মুসলিম কবির পদ সাহিত্য* গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকজন পদকারের পদের বিষয়ভাব ও রূপানুসন্ধানে সচেষ্ট হবো।

চাঁদ কাজী

চাঁদ কাজীর প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত। চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ হতে জানা যায়, ইনি চৈতন্যদেবের সময়ে নদীয়ার কাজী ছিলেন। চৈতন্যদেবের বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত হন তিনি। তাঁর বিখ্যাত একটি পদ নিম্নরূপ:

> বাঁশী বাজান জান না।
> অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না ॥ ....
> চাঁদ কাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
> জীমু না জীমু না আমি দেখিলে হরি॥[১] (পৃ-৬৬)

আলাওল

বৈষ্ণব পদরচনায় আলাওল যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর পদের অনুষঙ্গ বিচিত্র। যেমন:

> ক. শ্যাম অঙ্গে বংশী রব হে অমিয়া তরঙ্গ।
> শুতিছি বন্ধুর সঙ্গে জড়ি যে অঙ্গে অঙ্গ ॥ (পৃ-৬৭)

খ. সইগণ বড় অপরূপ সাজে
একি অপরূপ অপ্সরী তেজি সুরপুরী
আয়ল ভুবন মাঝে। (পৃ-২৬৩)
গ. আজু সুখের নাহিও-র।

---

১. মুহম্মদ আবদুল হাই ও ড. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত), মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা, ১৯৯৮, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা হতে পদগুলি উদ্ধৃত হয়েছে।

আনন্দে মন বিভোর
শ্রীপতি আসে চিত্তের মানসে
নাগর সদন মোর ॥ (পৃ-১১৫)
ঘ. দীনবন্ধু কর পরিত্রাণ
তুমি বিনে দুর্গতের গতি নাহি আন। (পৃ-১৯৭)]

নাসির মুহম্মদ

আহমদ শরীফের মতে কবির পুরোনাম ফাজিল নাসির মুহাম্মদ। *পদকল্পতরু* গ্রন্থে তাঁর পদসংকলিত হতে দেখা যায়। রমনীমোহন মল্লিক সংকলিত *মুসলমান বৈষ্ণব কবি* গ্রন্থে তাঁর পদ প্রথম সংকলিত হয়। তাঁর পদ বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত এবং এখনও কীর্তনীয়ারা গেয়ে থাকেন। গোষ্ঠলীলা বিষয়ক তাঁর অপূর্ব একটি পদ:

ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে
চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গানরি। ...
আগম-নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠ বিহার
নাসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান-রি ॥ (পৃ-১১)

সৈয়দ মর্তুজা

সৈয়দ মর্তুজা সাধক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। মুফতী গোলাম হোসেন সরওয়ার লাহোরীর *খজীনাতুল আফসিয়া* গ্রন্থে সৈয়দ মর্তুজার পরিচিতি পাওয়া যায়। তাঁর রচিত বেশকিছু পদের সাক্ষাৎ মেলে। বিষয়ভাবে তাঁর পদগুলি উৎকৃষ্টমানের এবং অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত। যেমন:

ক. কি কহিব অয়ি সখি কালা গুণবিধি

অনেক পুণ্যের ফলে মিলাইয়াছে বিধি। (পৃ-৪৬)
খ. ভুবন মোহন রূপ অতি মনোহর।
ঝলমল করে রূপ দেখিতে সুন্দর ॥
তরুমূলে করে কেলি ত্রিভঙ্গ হইয়া।
কত কত নাগরী রহে চান্দমুখ চাইয়া ॥ (পৃ-২২)
গ. সজনি গো সই তুমি কি আমারে বোল।
কালিয়া কানুর বাঁশী বোলে কত বোল ॥ (পৃ-৬৬)
ঘ. মুঞি কেনে পিরীতি রে কৈলুঁ নিঠুর কালার সনে।
নিঠুর কালার প্রেম-জ্বালা না সহে পরাণে ॥ (পৃ-৭৫)

সৈয়দ মর্তুজার একটি অপূর্ব অনুরাগ-স্তরের পদঃ

শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোর মনে
পাসরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে ও চান্দ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি ॥
মোরে কর দয়া দেহ পদ ছায়া
শুনহ পরাণ কাণু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু ॥
সৈয়দ মর্তুজা ভণে কাণুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি ॥ (পৃ-৪৬-৪৭)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান হতে **আকবর শাহ** নামাঙ্কিত একটি পদের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক গবেষকই একমত হয়েছেন পদকার সম্পর্কে। গৌরবিষয়ক তাঁর পদটি অপূর্ব। যথাঃ

জীউ জীউ মেরে মন-চোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা ॥
খোল-করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া ॥
পদ দুই-চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতো লিয়া ॥
ঐছন পাহুঁকে যাহু বলিহরি।
কাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী ॥ (পৃ-৬)

এ ছাড়াও সৈয়দ আইনুদ্দিন, নজর মোহাম্মদ, ফকির হবিব, সৈয়দ সুলতান, শেখ কবির, সালেহ বেগ, মীর ফয়জুল্লাহ, নাসিরউদ্দিন, আলি রজা, মীর্জা কাঙ্গালী, মোহাম্মদ হাসিম, শেখ চাঁদ, পীর মোহাম্মদ, আসাউদ্দিন, ওহাব, আফজল, শেখ ভিখন, মর্তুজা গাজী, ফতে খান, আক্মান, কমর আলী, শেখ লাল, আকবর আলী, অনন্ত, আফজাল আলি, আবাল ফকির, আব্বাস, আলিমুদ্দিন, আলি মিয়া, এবাদুল্লাহ, এর্শাদুল্লাহ, খলিল, গেয়াস খান, গোলাম হোসেন, গরীব খান, চামারু, চাম্পাগাজী, জীবন, তাহির মাহমুদ, তুফানুদ্দিন, কাজী দানিশ, নওয়াজিস খান, বকসা আলী, বদিউদ্দিন, বহরাম, মনোহর, মোহসেন আলী প্রমুখ পদকার বৈষ্ণব পদসাহিত্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিরা বৈষ্ণবদর্শন, লীলাতত্ত্ব, বৈষ্ণব আদর্শ ইত্যাদি বিষয় নিষ্ঠার সাথে উপস্থাপন করেছেন। উত্তর যুগের পদাবলিতে সচেতনভাবে পরিলক্ষিত হয় সম্বন্ধ তত্ত্ব, অভিধেয় তত্ত্ব ও প্রয়োজন তত্ত্ব। সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ই সম্বন্ধ তত্ত্ব। কৃষ্ণ অপার ঐশ্বর্যের অধিকারী, তাঁর মাধুর্যও অপার। কৃষ্ণ নিজের রূপমাধুর্য বা স্বসৌভাগ্য দেখে নিজেই বিস্মিত হয়ে তা আস্বাদনের জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন করেন। এই মাধুর্যঘনবিগ্রহ অখিল রসামৃত মূর্তি, পরব্রহ্ম কৃষ্ণই সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য, সমগ্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য; এই মূর্তিই সম্বন্ধতত্ত্ব এবং পরিকররূপে জীবদ্বারা কৃষ্ণের সেবাতেই জীব-কৃষ্ণের সম্বন্ধের চরম সার্থকতা। শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যই অভিধেয় তত্ত্ব। অভীষ্ট লাভের জন্য যে উপায় অবলম্বন করতে হয় তাই অভিধেয়। পার্থিব জীবনে অভীষ্ট বস্তুর অন্ত নেই, আবার সুখলাভের আকাঙ্ক্ষারও অন্ত নেই। তবে এ-সুখ সাংসারিক জীবনের সুখমাত্র নয়–এই সুখের আধার রসস্বরূপ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ। তাঁর সাথে জীবের সম্পর্কের স্মৃতি জাগ্রত করাই অভিধেয় তত্ত্বের মূল আরাধনা। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, এই নিত্যদাসত্বই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু মায়ার ছলনায় জীব বিস্মৃত হয়ে পড়ে। গুরুস্মরণের মধ্য দিয়ে জীবের অন্তরে জাগ্রত হয় কৃষ্ণের চরণে আশ্রয়ের ব্যাকুলতা। 'কৃষ্ণ, জগৎপতি, আরাধ্য শিরোমণি আমি তোমার হলাম'–এই ব্যাকুলতাময় স্মরণে মায়াবন্ধন দূর হয়। সাধুসঙ্গ লাভে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধানুরাগের জন্ম হয়। ভক্তসঙ্গের প্রাবল্যে তখন ভক্তিবীজের অঙ্কুরোদগম হয়। এই ফুল-ফলই সুশোভিত হয় গুরুর আনুগত্যে। জীব ভজনামুখী হয়ে ওঠে। ভজনাঙ্গরূপে তাদের অনুষ্ঠান ভক্তির প্রতিকূলতা বৃদ্ধি করে। ব্রজবাসীগণই প্রত্যক্ষ উপমা, যারা রাগানুগা ভক্তির দ্বারা নিত্য রাধা-কৃষ্ণের সেবাসঙ্গ লাভ করে থাকেন। তাঁদের অনুগত থেকেই রাগানুগা ভক্তির সাধনা করতে হয়। বাহ্য সাধন ও অন্তর সাধন – এই দ্বিবিধ সাধনের মাধ্যমে প্রীতিলাভ হয়। রতি ও ভাব-প্রীতির এই দ্বিস্তর সাধনায় কৃষ্ণ একান্তভাবে বশীভূত হয়ে থাকেন। এই প্রেমভক্তিই অভিধেয় তত্ত্ব। যে উদ্দেশ্যে ভক্তির সাধনা বা উপাসনা করা হয়ে থাকে তাই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনও ভক্তি, কিন্তু সাধন ভক্তির চেয়েও তা উচ্চস্তরের। এই ভক্তির স্বরূপ কেবলা ভক্তি বা প্রেমভক্তি। পরমপ্রীতির সঙ্গে কৃষ্ণের সেবার লালসাই ভক্তের কাম্য, তাই তার একান্ত প্রয়োজন। কারণ প্রেম ছাড়া কৃষ্ণসেবালাভ সম্ভব নয়। এই আকাঙ্ক্ষাজনিত রতি গাঢ় হলে প্রেম হয়। এই নির্মল চিত্তের স্নিগ্ধতা হচ্ছে ভাবের তটস্থা লক্ষণ। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* অনুসারে বলা যায়:

> সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে যাঁদের দোষগুলো দূর হয়েছে, যাঁরা ভগবৎ সম্বন্ধীয় বিষয়ে অনুরক্ত, রসও ভক্তগণের সঙ্গলাভেই যাঁরা আনন্দিত, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ সুখসম্পত্তিকেই যাঁরা জীবনসর্বস্ব

বলে মনে করেন এবং যাঁরা প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনগুলোই অনুশীলন করেন সেই সমস্ত ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত। প্রাক্তন ও বর্তমান সংস্কারবশে উজ্জ্বল আনন্দরূপ রতি অনুভবরূপে শ্রীকৃষ্ণবিভাবে আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হয়ে অপূর্ব আনন্দ লাভ হয়। একমাত্র কৃষ্ণভক্তগণই এই রসের আস্বাদন করতে পারেন।[১]

এই আস্বাদনের হেতুই প্রয়োজন তত্ত্ব। যা চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব ধর্মের স্থায়ী রূপের অন্যতম বিষয়বস্তু।বৈষ্ণব দর্শনের বিষয়ভাব পর্যবেক্ষণে দেখা যায় উল্লিখিত বিষয়সমূহকে তাত্ত্বিকগণ

১. উদ্ধৃতি, সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলিকাতা-৫৭, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা-১৪৪।

সচেতনভাবে তাদের রচনায় এক একটি পর্যায় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে, গ্রন্থগুলির মৌলিক তাৎপর্য রয়েছে ভাবসংস্কারের পরিকল্পনা, যা প্রচারের মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট ভাবকে পরিবহণ করে নিয়ে গেছে ভক্তহৃদয়-মন্দিরে। উপাসনার কাণ্ডারী হিসেবে তত্ত্বগুলি শুধু অন্তরকেই ভাবোন্মাদে পরিণত করেনি, ভক্তের আর্তি ও লীলাস্মরণে এক অপার্থিব দিব্যোন্মাদ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রতিষ্ঠায় বৃন্দাবন ও গোস্বামীগণের ভূমিকা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রতিষ্ঠায় বৃন্দাবন ও গোস্বামীগণের ভূমিকা

বাংলাদেশে চৈতন্যের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলায় এক বিশেষ নবজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোনো জাতির সংস্কৃতিতে-সমাজে কী অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হতে পারে তার প্রমাণ চৈতন্যদেব। একদিকে বিদেশি শাসকের রক্তচক্ষু অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ সমাজে বর্ণ-কোন্দল; ফলে বহুভাগে বিভক্ত সমাজ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিল। ঐক্যহীন সমাজে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির লোকেরা ধর্মান্তরিত হচ্ছিল। চারদিকে জিঘাংসা, জাতিভেদ, যুদ্ধ, অবক্ষয় – এসবের মধ্যেই ভারতপ্রদীপ চৈতন্যের আবির্ভাব। তাঁর প্রবর্তিত ভক্তিকেন্দ্রিক প্রেমধর্ম নিঃসন্দেহে জাতির প্রাণশক্তির জাগরণ ঘটিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

> ইউরোপ সভ্য কত দিনে? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারিশত বৎসর পূর্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিচিত গ্রীক সাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ...আমাদিগের একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্য-চন্দ্রোদয়; তারপর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। একদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামীগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়, সে কোথা হইতে?
> আমাদের এই রেনেসাঁস (Renaissance) কোথা হইতে? কোথা হইতে এই জাতির মানসিক উদ্দীপ্তি হইল?[১]

চৈতন্য-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর্যুক্ত মন্তব্য তত্ত্বমুখী ও ভাবগম্ভীর। বিভিন্ন সভ্যজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাধারণত কোনো অগ্রনায়ক মাহামানবের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে জাতির জীবনে বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে থাকে। একদিকে মননশক্তি যেমন জেগে ওঠে তেমনি নতুন ধারা যুক্ত হয় ধর্মে-দর্শনে, শিল্পে-সাহিত্যে। সর্বোপরি জীবনচর্চায় নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। চৈতন্যের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে সহসা যেন বাংলায় নতুন প্রাণের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। চৈতন্য-ঘোষিত 'সকল মানুষই সমান' অথবা নিত্যানন্দ প্রবর্তিত 'চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ'– সমাজে এক নতুন ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে অসামান্য কৃষ্ণপ্রেমতন্ময় ভাবমূর্তিতে

রাধাস্বরূপা চৈতন্য সকলকে একসূত্রে গাঁথার প্রয়াস করেছিলেন এবং তিনিই কৃষ্ণকে উপাস্য করেছিলেন। নবদ্বীপে চৈতন্যের শেষ কয়েকবছর এবং নীলাচল পর্বের সমগ্র সময় তিনি রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য লীলা বিকাশ করাকেই একমাত্র কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাস্থল বৃন্দাবন তখন ছিল লুপ্ত। লুপ্ত বৃন্দাবন যথাযথ উদ্ধার না হলে লীলামাধুর্যের বিকাশ ব্যহত হবে বিধায় চৈতন্য বৃন্দাবনের মহিমা পুনরুদ্ধার করে তাকে যোগ্য মর্যাদায় আসীন এবং সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি তৎকালীন গৌড়দেশ হয়ে কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি তীর্থস্থান পরিদর্শন করে বৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এক গভীর অন্তঃপ্রেরণার দ্বারা বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থস্থান

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৯৯

উদ্ধার হয়। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন, যমুনা- পুলিন প্রভৃতি তীর্থস্থলী প্রতিষ্ঠা শেষে তিনিনীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। তবে চৈতন্যদেবের ইচ্ছা ছিল স্থায়ীভাবে বৃন্দাবনে বসবাস করার। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। নিজে বৃন্দাবনে বসবাস না করলেও বৃন্দাবনের লুপ্ত মাহাত্ম্য পুনরুত্থানে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং একদল তত্ত্বজ্ঞানী একনিষ্ঠ বৈষ্ণবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। পরবর্তীসময়ে তাঁদেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রধান তীর্থভূমিতে পরিণত হয় এবং চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মমতের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করেছিলেন রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, লোকনাথ গোস্বামী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে লোকনাথ গোস্বামী বাদে বাকিরা 'ষড় গোস্বামী' নামে বৈষ্ণব শাস্ত্রে নন্দিত ও বন্দিত হয়েছেন। উপর্যুক্ত ষড় গোস্বামী এবং অন্য গোস্বামীগণ, যেমন: লোকনাথ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখের প্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় এবং ধাম বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়।

ষড় গোস্বামী

বাংলাদেশে চৈতন্যাবির্ভাব ছিল প্রকৃত অর্থেই এক যুগান্তকারী ঘটনা। চৈতন্যপ্রভাবে বাঙালির সাহিত্যে, সমাজে, সংস্কৃতিতে যে কি এক অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছিল তার রূপ কারও কাছে অবিদিত নয়। তাঁর প্রবর্তিত প্রেম ধর্ম মৃতপ্রায় বাঙালির প্রাণশক্তির জাগরণ ঘটিয়েছিল। চৈতন্যই দেখালেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই সমান আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হতে পারে। চৈতন্য ভক্ত-পরিবার নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন শুরু করলেন। তাঁর অসামান্য কৃষ্ণপ্রেম-ভাবতন্ময়তা দেখে দলে দলে লোকে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। কৃষ্ণকে উপাস্য দেবতা রূপে গণ্য করল। তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা হলো – কৃষ্ণের মাধুর্যময় লীলার বিকাশ ঘটানো। এই লীলাবিকাশের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলো বৃন্দাবন। কিন্তু তখনও কৃষ্ণলীলাস্থল বৃন্দাবন প্রায় সবার কাছেই অগোচরে ছিল; মহিমাও ছিল লুপ্ত। সুতরাং চৈতন্য সেই লুপ্তবৃন্দাবন পুনরুদ্ধারের অভিপ্রায়ে নীলাচল থেকে বৃন্দাবনক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি অলৌকিক অন্তঃপ্রেরণার দ্বারা চালিত হয়ে ব্রজধামের লুপ্ত তীর্থস্থল আবিষ্কার করলেন এবং বৃন্দাবনের লুপ্ত মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য একদল ভক্তগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করলেন। যাঁরা বৃন্দাবনে এসে বসবাস করতে লাগল এবং বৃন্দাবনকে বৈষ্ণব সমাজের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্ররূপে গড়ে তুলল।

চৈতন্যের দিব্যকরস্পর্শে ভারতবর্ষে প্রেমবন্যার জোয়ার আসল। এই গণজোয়ারকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন পড়ল শাস্ত্রীয় ভিত্তির। তিনি তাঁর প্রেমাপ্লুত জীবনের দিব্য ভাবধারায় যাঁদের একান্ত

আপনজন করে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিজশক্তি সঞ্চারিত করে প্রেমধর্মকে শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার আজ্ঞা করেন। এই আজ্ঞারই শ্রেষ্ঠ ফসল বৃন্দাবনের 'ষড় গোস্বামী'।

চৈতন্যচরিতামৃত-এর মঙ্গলাচরণে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ষড় গোস্বামীর বন্দনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
ইহা সভার পদ-আগে করি নমস্কার ॥[১]

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৬

নরোত্তম ঠাকুর তাঁর *গৌর-পদতরঙ্গিণী* গ্রন্থে ষড় গোস্বামীর যে বন্দনা করেছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

জয় জয় গুরু গোসাঞী শ্রীচরণ সার।
যাহা হইতে হব পার এ ভব সংসার ॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পায় মজাইয়া মন ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞীর করু চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥[১]

এই ছয় গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রধান আচার্যরূপে শাস্ত্র-প্রণয়ন, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার এবং বৈষ্ণব সমাজে বৈষ্ণবাচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ছয় গোস্বামীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং যথোপযুক্ত নিয়মের মধ্যে স্থাপিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ষড় গোস্বামীকে নিম্নবর্ণিত অভিধায় অভিষিক্ত করা হয়েছে।

ব্রজলীলায় অষ্ট মঞ্জরী		**গৌরাঙ্গলীলায় অষ্ট মঞ্জরী/গোস্বামী**
ক. শ্রীরূপ মঞ্জরী	→	শ্রীরূপ গোস্বামী
খ. শ্রীণব মঞ্জরী	→	শ্রীসনাতন গোস্বামী
গ. শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী	→	শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী
ঘ. শ্রীরস মঞ্জরী	→	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী
ঙ. শ্রীবিলাস মঞ্জরী	→	শ্রীজীব গোস্বামী
চ. শ্রীপ্রেম মঞ্জরী	→	শ্রীভুগর্ব গোস্বামী
ছ. শ্রীলীলা মঞ্জরী	→	শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী
জ. শ্রীকস্তুরী মঞ্জরী	→	শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী

(সূত্র : *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*)

এই দর্শন অনুযায়ী ব্রজলীলায় অষ্টমঞ্জরী নবদ্বীপে এসে গোস্বামী পদবাচ্যে ভূষিত হয়েছেন এবং নব-কলেবর ধারণ করেছেন। চৈতন্য-উত্তর যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রতিষ্ঠায় মঞ্জরীস্বরূপ গোস্বামীদের প্রভাব বিচিত্র অনুষঙ্গে উঠে এসেছে। বৈষ্ণবীয় রসধারায় উল্লিখিত বিষয়টি অনুধাবন করলে এই যুগের বৈষ্ণবধর্মের বিষয়ভাবের গভীরতা বুঝতে সুবিধা হয়। এ-প্রসঙ্গে ছয় গোস্বামীর অবদান আলোচনার পূর্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে গৌরগণ-মণ্ডলের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার পরিচয় প্রদানে সচেষ্ট হব।

---

১. কাঞ্চন বসু সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৯১

বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়ভাবে গৌরগণ-পরিচয়

পঞ্চতত্ত্ব

চৈতন্য

↓

↓ ↓ ↓ ↓

অদ্বৈত নিত্যানন্দ গদাধর-দামোদর রামানন্দাদি শ্রীবাসাদী

↓

ছয় চক্রবর্তী

↓↓↓↓↓↓

শ্রীবাস গোকুলানন্দ শ্যামদাস শ্রীদাস গোবিন্দ রামচরণ

↓

অষ্টকবিরাজ

↓

↓↓↓↓↓↓↓↓

রামচন্দ্র গোবিন্দ কর্ণপুর নৃসিংহ ভগবান বল্লভদাস গোকুল গোপীরমণ

↓

ছয় গোস্বামী

↓

↓↓↓↓↓↓

রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ ভট্ট গোপালভট্ট রঘুনাথ দাস

উল্লিখিত লতিকার যে নামগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে এঁরা প্রত্যেকেই বিশেষভাবে ছয় চক্রবর্তী, আট কবিরাজ এবং ছয় গোস্বামী।গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের রূপ প্রতিষ্ঠায়, বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়ভাবের প্রাচুর্য সম্পাদনে এঁরা পূজনীয় আসনে আসীন হয়ে রয়েছেন।

‘ষড়গোস্বামী’ শব্দটির উদ্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঘটেছে বলেই আমাদের এবং তা নরোত্তম ঠাকুরের ছয় গোস্বামী বন্দনার মধ্য দিয়ে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ষড় গোস্বামী’ শব্দটির উদ্ভব প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম করেছেন। কিন্তু *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে ‘ষড় বা ছয় গোস্বামী’ শব্দটি প্রযুক্ত না হয়ে গুরু অভিধায় উল্লিখিত হয়েছে; যা আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের ১|৩|৬৫, ১|৪|২২৯, ২|১|২৪৬ অনুচ্ছেদে সনাতন, রূপ ও জীবকে ‘গোঁসাঞি’ সম্বোধন করেছেন, কিন্তু রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্টকে ‘গোঁসাঞি’ অভিধায় অভিষিক্ত করেননি। রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১|৪|২১) গ্রন্থে চারজনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের টীকায় রঘুনাথ ভট্টের কথা উল্লেখ করেননি। মুরারি গুপ্তের কড়চায় জীব, গোপালভট্ট. রঘুনাথ দাসের নাম পাওয়া যায় না। কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যে (*চৈতন্যচরিতামৃত*), জয়ানন্দ ও লোচন দাসের *চৈতন্যমঙ্গল* কাব্যে এবং বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে রূপ, সনাতন ছাড়া অন্যদের নাম নেই। কবি কর্ণপুরের *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা* গ্রন্থে ছয় জনের নাম থাকলেও একত্রে নেই। ষড় বা ছয় গোস্বামী বলতে যে নামগুলোর সমষ্টি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তা নরোত্তম ঠাকুর কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর নাম-সংকীর্তনের পদের উদ্ধৃতিতে আমরা বিষয়টির উল্লেখ করেছি। গোস্বামী শব্দটির অর্থ এক বিশেষ তাৎপর্যকে নির্দেশ করে। গবেষক নরেশচন্দ্র জানা ‘গোস্বামী’ শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে যে তথ্য দিয়েছেন তা স্মর্তব্য:

> গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্যদিগকে গোঁসাইরূপে আখ্যাত করিবার রীতি কিভাবে কখন প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বলা দুষ্কর। গোসাঁই উপাধি বল্লভচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও পরিলক্ষিত হয়। ... গোঁসাই শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি এবং কিভাবে ও কখন ইহার প্রয়োগ হইতেছিল তাহাও বলা কঠিন। – গোসাঁই শব্দটিসংস্কৃত ‘গোস্বামিন’ শব্দজাত, সংস্কৃত - গোস্বামিন্> প্রাকৃত - গোসসাবি > প্রাচীন বাংলা - গোসাঞি-গোসাঁই।[১]

মধ্যযুগের অনেক গ্রন্থে গোসাঁই শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। গোসাঞি বা গোসাঁই বা গোস্বামী নামে তাঁরাই অভিহিত হতেন যাঁরা বৈষ্ণবদের পূজ্য ও সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আলোচ্য ষড়গোস্বামীর হাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই দার্শনিক চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে উত্তর যুগের বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন Chaitanya Renaissance-এর ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন।

ষড় গোস্বামী পরিচিতি

সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী : বৃন্দাবনে ষড় গোস্বামীর অন্যতম প্রধান সনাতন। একই পরিবারের তিনজন যথাক্রমে সনাতন, রূপ এবং শ্রীজীব গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলের প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন। সনাতন এবং রূপ ছিলেন সহোদর এবং জীব ছিলেন তাঁদের ভাই বল্লভের পুত্র। নরেশচন্দ্র জানা বিস্তৃত গবেষণা করে রূপ-সনাতনের বংশলতিকা উপস্থাপন করেছেন :

সর্বজ্ঞ জগদগুরু
|
অনিরুদ্ধ
|
রূপেশ্বর — হরিহর
|
পদ্মনাভ

পুরুষোত্তম জগন্নাথ নারায়ণ মুরারি মুকুন্দ

কুমার

সনাতন রূপ বল্লভ

জীব[২]

১. নরেশচন্দ্র জানা, *বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-১৯৭০, পৃ.-২৩

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০

চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার মূলে সনাতন গোস্বামীর অবদান তুলনারহিত। পাণ্ডিত্যের প্রগাঢ়তা, অসাধারণ দীপ্তিময় মনীষা, তুলনাহীন দার্শনিক প্রজ্ঞার দ্বারা প্রণীত অমূল্যগ্রন্থরাজির সাথে সাক্ষাৎ ঘটলেও এঁদের ব্যক্তিগত জীবনের বিবরণ পাওয়া খুব কঠিন। আনুমানিক ১৪৬৫ থেকে ১৪৬৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সনাতন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন বলে আমাদের অভিমত। সম্ভবত যশোর জেলায় এঁদের পূর্বপুরুষ এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। রামকেলিতে চৈতন্যদেবের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তাঁদের জীবনাচরণের সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ অভিমত প্রদান করেছেন যে, সনাতন ও রূপের বাল্য নাম ছিল অমর ও সন্তোষ। *ভক্তিরত্নাকর* থেকে জানা যায়, সনাতন-রূপ ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। *লঘুতোষণী*র ভাষ্য হতে জানা যায়, সনাতন বাল্যকাল থেকেই *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করতেন। তাঁরা আরবি ও ফার্সি ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। ফলে, হোসেন শাহের রাজদরবারে মন্ত্রিত্ব যথাযোগ্য ভাবেই করেছিলেন। তাঁদের খ্যাতিও অল্পবয়সেই বিস্তার লাভ করে। *ভক্তিরত্নাকরের* (১।৫৮০-৮১) বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় – এই খ্যাতির কারণেই হোসেন শাহ তাঁদের রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু রাজকার্যে নিযুক্ত হলেও, ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত হবার প্রাক্কালে তাঁদের অন্তরে বৈরাগ্যভাব জাগরিত হয়। কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হবার ব্যাকুলতায় এই দুই ভাইয়ের অন্তর বিষাদাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই সময় তাঁদের উদ্ধারের নিমিত্তে চৈতন্যকে বারবার দৈন্যপত্র লেখেন। চৈতন্যদেবও যথাসময়ে মুক্তির আশ্বাস দিয়ে পত্রোত্তর পাঠান। কিছু দিন অতিবাহিত হলে চৈতন্য ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে রামকেলিতে আসলে সনাতন-রূপ যথোপযুক্ত বৈষ্ণবীয় আচার ধারণ করে ছদ্মবেশে চৈতন্য সম্মুখে উপনীত হয়ে হৃদয়ার্তি প্রকাশ করেন। *চৈতন্যচরিতামৃতের* মধ্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদে উপর্যুক্ত বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। রাজ দরবারে রূপ-সনাতনের উপাধি ছিল যথাক্রমে: দবির খাস ও সাকর মল্লিক। এর ফলে অনেক পণ্ডিত সনাতন-রূপের জাতি-ধর্ম নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন। কেউ কেউ তাদেরকে মুসলমান বংশজাত বলেও উল্লেখ করেছেন। হেমচন্দ্র সরকার তাঁর *গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব*-১ম খণ্ড, রামগতি ন্যায়রত্ন *বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, Dr. S. Radhakrishnan*Religion and Society*, Tarachand *Influence of Islam on Indian culture*, Dr. Surendranath Das gupta *A History of Indian Philosophy*, Vol-IV, *Indian Philosophy* – Voll-2গ্রন্থসমূহে বিষয়টির একটি অপ্রামাণিক ব্যাখ্যা দিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে জীব গোস্বামীর *লঘুতোষণীর* অন্ত্যে প্রদত্ত বংশ পরিচয় এবং সনাতন গোস্বামী কর্তৃক

বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকের টীকা নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলে ধোঁয়াশাটি কেটে যায়। তাঁরা উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। দবির খাস-একটি ফার্সি শব্দ। শুদ্ধরূপ 'দবির-ই-খাস'। যার অর্থ – নিজস্ব কর্মসচিব। সাকর মল্লিক উপাধির অর্থ– প্রধান রাজস্ব বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ কর্মচারী।

রামকেলিতে চৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভের পর তাঁরা রাজসভা ত্যাগ করেন, এবং রূপ আগে কাশীতে গিয়ে চৈতন্যের সাথে মিলিত হন। সনাতন তাঁর কিছুদিন পরে সব কিছু ত্যাগ করে ১৫১৬ খ্রি. মাঘ-ফাল্গুন মাসে চৈতন্যের সাথে মিলিত হন। চৈতন্য সাহচর্যে ভক্তি-সিদ্ধান্ত পাঠ গ্রহণ শেষে তাঁরা বৃন্দাবনে আসেন। বৃন্দাবন জীবনে কঠোর সাধনা, দীনতা, বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন শেষে ১৫৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে সনাতন গোস্বামী এবং তাঁর এক বা দুই বছর অর্থাৎ ১৫৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে রূপ গোস্বামীর তিরোভাব ঘটে।

সনাতন গোস্বামীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ

সনাতন গোস্বামীকৃত গ্রন্থ তালিকা শ্রীজীব গোস্বামী *লঘুতোষণীর* উপসংহারে দিয়েছিলেন। সেই সূত্র অনুযায়ী সনাতন গোস্বামীকৃত গ্রন্থরাজি –

ক. *বৃহদ্ভাগবতামৃত*– গ্রন্থটিতে একাধারে সনাতন গোস্বামীর আধ্যাত্মিক আত্মচরিত, মনোরম উপাখ্যান এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

খ. *হরিভক্তিবিলাস*– গ্রন্থটি বৈষ্ণব স্মৃতি বিষয়ক রচনা। অনেকে এটিকে গোপাল ভট্টের রচনা বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীজীব গোস্বামী এই গ্রন্থকে সনাতন গোস্বামীর রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।

গ. *লীলাস্তব*– এই গ্রন্থে নন্দোৎসব থেকে রঙ্গস্থল ক্রীড়া পর্যন্ত ২৩টি লীলা বর্ণনামূলক কবিতা (বা দশম চরিত) রয়েছে।

ঘ. *বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী* – এই গ্রন্থটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের টীকা।

এছাড়াও অনেক গ্রন্থ সনাতন গোস্বামীর নামে দেখা যায়। তবে সেগুলি প্রক্ষিপ্ত বলে আমাদের অভিমত।

রূপ গোস্বামীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ

ছয় গোস্বামীর মধ্যে রূপ গোস্বামী কবিত্বে খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি বহুগ্রন্থ রচনা করেন। জীব গোস্বামী লঘুতোষণীর উপসংহারে রূপ গোস্বামীর গ্রন্থরাজির তালিকাকেও সন্নিবেশন করেন।

১. *হংস দূত, উদ্ধবসন্দেশ*

২. নাটক গ্রন্থ –*বিদগ্ধমধাব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী*

৩. কোষগ্রন্থ – *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি*

৪. *মথুরামহিমা, পদ্যাবলি* (১২৫ জন কবি ও ৩৮৬টি পদসম্বলিত)

৫. নাট্যলক্ষণযুক্ত গ্রন্থ –*নাটকচন্দ্রিকা*

৬. দার্শনিক গ্রন্থ –*সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত, স্তবমালা* (শ্রীজীব কর্তৃক সংগৃহীত), *ছন্দোহষ্টাদশকম্*

কৃষ্ণদাস অধিকারী ও নরহরি চক্রবর্তী আরও ছয়টি গ্রন্থের সংযোজন করেন।
কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, বৃহৎগণোদ্দেশদীপিকা, লঘুগণোদ্দেশদীপিকা, প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা
গোবিন্দবিরুদাবলী, গোবিন্দলীলামৃত (অষ্টকালীয় লীলা-বিষয়ক) ।

শ্রীজীব গোস্বামী

জীব গোস্বামীর দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসসাস্ত্র শ্রীরূপ গোস্বামীর হাতে রসময় হয়ে ওঠে তাঁর সৃজনী প্রতিভার গুণে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ শ্রীজীব গোস্বামীর অমিয়ব্যক্তিত্বে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সনাতন এবং রূপ গোস্বামীর কনিষ্ট ভ্রাতা বল্লভ ছিলেন শ্রীজীবের পিতা। যতদূর জানা যায় বল্লভ রাম উপাসক ছিলেন এবং তিনিও গৌড়ের রাজদরবারে কাজ করতেন। সনাতন-রূপ-বল্লভ একত্রে আনুমানিক ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন এবং প্রয়াগে চৈতন্যদেবের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। বৃন্দাবনে কয়েকমাস অতিবাহিত করার পর নীলাচলে যাবার পথে গঙ্গাতীরে বল্লভের মৃত্যু হয়। অনেকে বল্লভকে অনুপম নামে চিহ্নিত করেছেন। গবেষক নরেশচন্দ্র জানা বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড হতে জমির ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত একটি সরকারি দলির আবিষ্কার করেন। সেখানে দেখা যায় ৯৫৩ হিজরি, ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দের দলিলে জীব গোস্বামী তাঁর বাবার নাম বল্লভ গোসাঁই বলে উল্লেখ করেছেন।

উক্ত দলিল থেকে ফার্সির ইংরেজি অনুবাদের কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> As a piece of land of the above village on the east and north in lieu of rupees thirty good and full weight coins through Raghunath Das to Jee Gossain, son of Ballabha Gossain with our consent and wish and we received the amount in our possession and if any one claims it will be false. (18th September, 1546, 983 Hizei).[১]

এছাড়াও ১৪ অক্টোবর ১৫৪৬; ২৫ জানুয়ারি ১৫৫৩; ২৫ জুলাই ১৫৫৭; ৩০ আগস্ট ১৫৭৭; ২৪ সেপ্টেম্বর ১৫৭৭; ২৫ সেপ্টেম্বর ১৫৭৭ সালের প্রাপ্ত দলিলেও দেখা যায় জীব তাঁর বাবার নাম বল্লভ উল্লেখ করেন। সুতরাং প্রাপ্ত দলিল থেকে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত একটি বিষয়ের সমাধান ঘটলো। মূলত অনুপম মল্লিক বল্লভের উপাধি ছিল।

জীব গোস্বামী ১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র হিসেবে তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। *ভক্তিরত্নাকর* হতে জানা যায়, পিতৃবিয়োগ ঘটলে মায়ের স্নেহ, যত্নে পালিত হন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পিতৃব্যদের ন্যায় সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে আসেন। বৃন্দাবন যাত্রায় তাঁর নিত্যানন্দের সাথে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। ১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দের কিছু পরে তিনি তিরোহিত হন।

শ্রীজীব গোস্বামী বৃন্দাবনকে বৈষ্ণবদের একটি আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছিল। একদিকে তিনি পিতৃব্য সনাতন ও গুরু শ্রীরূপের সাধনার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের গ্রন্থের সংশোধনে সাহায্য করেছেন; অপরদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাথে বিশেষ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। বাংলার বৈষ্ণবগণের মনে যখন যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে তিনি পত্রের মাধ্যমে তার সমাধান দিয়েছেন। বৃন্দাবনবাসী

---

১. নরেশচন্দ্র জানা, *বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী*, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-১৯৭০, পৃষ্ঠা-৩১০

গোস্বামীদের চিন্তা, মত ও আচার যাতে গৌড়মণ্ডলে প্রসার লাভ করে সে-বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মতে দ্বিতীয় কলেবরখ্যাত শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ তাঁর কাছে বিস্তৃত অধ্যয়ন শেষে তাঁর আদেশে গোস্বামীদের গ্রন্থসমূহ বাংলাদেশে নিয়ে এসে তার পঠন-পাঠনের ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বলা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় নেতা ছিলেন তিনি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন যে পল্লবিত হয়েছে, মাধুর্য ছড়িয়েছে, চৈতন্যলীলা ও প্রবর্তিত প্রেমধর্ম যে যথাযথ ভিত্তি পেয়েছে, তার পেছনে শ্রীজীবগোস্বামীর অবদান অবিসংবাদী। আমরা মধ্যযুগের যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনী ও দার্শনিক গ্রন্থ *চৈতন্যচরিতামৃত* পাই এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বুৎপত্তির নিদর্শন দেখি, তাতে দার্শনিক ও তাত্ত্বিক অংশের অবদান শ্রীজীব গোস্বামীর অপূর্ব প্রতিভার। এসব কার্য সমাধা করেও শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছেন বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। ছয় গোস্বামীর মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

শ্রীজীব গোস্বামীর গ্রন্থসমূহ

শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর *লঘুতোষণী*র উপসংহারে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থরাজির উল্লেখ করলেও তিনি কি লিখেছিলেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য দেননি। তবে তাঁর শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী যে তথ্য দিয়েছিলেন, নরহরি চক্রবর্তী তা তাঁর *ভক্তিরত্নাকর*-এ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

১. ব্যাকরণ গ্রন্থ –*হরিনামামৃতব্যাকরণ*, *সূত্রমালিকা* ও *ধাতু সংগ্রহ*।
কেউ কেউ মনে করেন*সূত্রমালিকা* ও *ধাতু সংগ্রহ* পৃথক কোনো গ্রন্থ নয়।

২. কাব্যগ্রন্থ –*সংকল্পকল্পদ্রুম*, *গোপালচম্পূ*, *ভাবার্থসূচকচম্পূ*, *মাধবমহোৎসব*, *কৃষ্ণার্চনদীপিকা*, *গোপালবিরুদাবলী*।

৩. রসগ্রন্থ ও ধর্মতত্ত্ব –*ভক্তিরসামৃতশেষ, গোপালতাপনটীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, দুর্গমসঙ্গমণি, লোচনরোচনী, যোগসারস্তবটীকা, গায়ত্রীব্যাখ্যা বিবৃতি।*

৪. বৈষ্ণব দর্শন – ষট্সন্দর্ভ (অভিসন্দর্ভগুলো হলো – *তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, ভক্তি সন্দর্ভ ও প্রীতি সন্দর্ভ), সর্বসম্বাদিনী, সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণী, লঘুতোষণী, পদ্মপুরাণোক্ত কৃষ্ণ পদাচিহ্ন এবং শ্রীরাধিকার করপদ চিহ্ন* (এখন পর্যন্ত এই গ্রন্থের পুঁথি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি)।

গোপাল ভট্ট গোস্বামী

নরহরি চক্রবর্তী *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে গোপাল ভট্ট সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি প্রকাশ করেছেন। তা হলো – *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর সম্পর্কে একদম নীরবতা প্রদর্শন করেছেন, অর্থাৎ গোপাল ভট্ট সম্পর্কে কোনোরকম তথ্য দেননি। তার কারণ হতে পারে – তাঁর প্রচারবিমুখতা; যা বৈষ্ণবেরা হামেশাই করে থাকতেন। অথবা, তাঁর একান্ত দৈন্য প্রদর্শন। যে কারণই হোক না কেন *চৈতন্যচরিতামৃত*-কার তাঁর গ্রন্থে এই গোস্বামীর নিষেধ অমান্য করেননি। ফলে তাঁর প্রকৃত পরিচয় নির্ণয় করা খুব দুরূহ ব্যাপার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কয়েক জায়গায় শুধুমাত্র তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। মুরারি গুপ্তের কড়চায় গোপাল ভট্ট সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ প্রভৃতি লেখক তাঁর সম্পর্কে কোন তথ্যই লিপিবদ্ধ করেননি। পরবর্তীকালে নরহরি চক্রবর্তীর *ভক্তিরত্নাকর*, মনোহর দাসের *অনুরাগবল্লী*, যদুনন্দন দাসের *কর্ণানন্দ*, নিত্যানন্দ দাসের *প্রেমবিলাস*-এ গোপাল ভট্ট সম্পর্কে স্বল্প বিবরণ পাওয়া যায়।

গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব আনুমানিক ১৪৯৫ হতে ১৪৯৯ এর মধ্যে বলে আমাদের অভিমত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের মধ্যলীলায় নবম পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের যে ভ্রমণ বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, শ্রীরঙ্গবাসী ভেঙ্কট ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। যদিও গ্রন্থে উল্লেখ নেই, তবে অনেকেই মনে করেন এই ভেঙ্কট ভট্টই গোপাল ভট্টের পিতা। কিন্তু মুরারি গুপ্তের *কড়চা*, মনোহর দাসের *অনুরাগবল্লী* হতে জানা যায়, গোপালভট্টের পিতা ছিলেন ত্রিমল্ল ভট্ট। আমরা এই তথ্যকেই যথার্থ বলে ধরে নিতে পারি।

চৈতন্যদেব শৈশবেই গোপাল ভট্টকে কৃপা করেন। সংসারে অকৃতদার থেকে পিতামাতার সেবা এবং তাদের প্রয়াণের পর বৃন্দাবনে যাবার আদেশ প্রদান করেন তিনি। *ভক্তিরত্নাকর*-এর ১/১৬৩-১৬৫ অংশের বিবরণ হতে দেখা যায়, পিতামাতার মৃত্যুর পর গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে গমন করেন। অবশ্য তার পূর্বে তিনি চৈতন্যদেবের স্নেহসান্নিধ্যে কিছুদিন থাকেন। গোপাল ভট্টের কাছে চৈতন্য তাঁর ডোর-

কৌপীন-বহির্বাস প্রদান করেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর *অমিয় নিমাইচরিত* গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে জানা যায় গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রবোধানন্দের শিষ্য ছিলেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদারও তাঁর *চৈতন্যচরিতের উপাদান* গ্রন্থে একই তথ্যই দিয়েছেন। বৃন্দাবনে গোপাল ভট্ট গোস্বামী 'রাধারমণ' বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু তাঁর সেবাভার চালিয়ে যান। সেবা, ত্যাগ ও দৈন্যের যে অনন্য জীবনাচরণ তিনি রেখে গিয়েছেন তা অনন্য এবং এজন্য তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চিরনমস্য হয়েরয়েছেন। সম্ভবত ১৫৮৫-৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি তিরোহিত হন।

গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গ্রন্থসমূহ

ক. *হরিভক্তিবিলাস* খ. *কৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা* গ. *ষট সন্দর্ভের কারিকা* ঘ. *সৎক্রিয়াসারদীপিকা* ঙ. *সংস্কারদীপিকা* প্রভৃতি।

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

এ-পর্যন্ত বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর মধ্যে সবচেয়ে কম তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে রঘুনাথ গোস্বামী সম্পর্কে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর সম্পর্কে কিছুটা বিবরণ দিয়েছেন। মুরারি গুপ্তের কড়চা হতে জানা যায়, চৈতন্য যখন কাশীতে তপন মিশ্রের বাড়ি যান তখন বালক রঘুনাথ ভট্ট তাঁর কৃপা লাভ করেন। তাঁর আবির্ভাব ১৫০৩ থেকে ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দের যে কোনো সময় হয়েছিল বলে আমাদের অভিমত। যৌবনপ্রাপ্ত হলে রঘুনাথ ভট্ট নীলাচলে এসে চৈতন্যদেবের সাথে প্রায় আটমাস অতিবাহিত করেন। পরে তাঁর আদর্শপ্রাপ্ত হয়ে অকৃতদার অবস্থায় পিতামাতার সেবা করতে থাকেন। পরে তাঁদের দেহান্তর ঘটলে পুনরায় নীলাচলে এসে চৈতন্যের সাথে মিলিত হন। নীলাচলে আরও আটমাস কাটিয়ে চৈতন্যের নির্দেশে রঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়, চৈতন্যদেব তরুণ বয়সে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন; পরিবার-পরিজনের যথার্থ সেবা বিশেষত তাঁর মায়ের সেবা করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর পার্ষদদের দিকে তাকালে দেখা যায়, তিনি প্রায় প্রত্যেকের জন্য আগে পিতা-মাতার সেবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যদিও তিনি নিজে মায়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য বৃন্দাবনে না থেকে নীলাচলবাসী হয়েছিলেন।

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি অপূর্ব ভাগবত পাঠ করতেন এবং রান্নায় সুনিপুণ ছিলেন। ভাবতে অবাকই লাগে, সেই সময় অনেক বড় ভক্তমহাজন থাকা সত্ত্বেও রঘুনাথ ভট্ট কীভাবে ষড়গোস্বামীর একজন হলেন। আমাদের অভিমত, তাঁর ভাগবত গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এত উৎকৃষ্ট ছিল যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে রূপ-সনাতনের তুল্য মর্যাদায় আসীন করেছেন এবং অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হিসেবে ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। গ্রন্থ রচনা না করলেও বা এতৎসম্পর্কিত তথ্য পাওয়া না গেলেও তাঁর অমিয় জীবনাচারে গৌরমণ্ডলের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে উপনীত হয়েছেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ১৫৫০-৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তিরোহিত হন বলে আমাদের অনুমান।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত ভূস্বামী গোবর্ধন দাস। এঁদের নিবাস ছিল হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে। বাল্যকাল থেকেই রঘুনাথ দাস বিষয়-সম্পদ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। যদিও বাল্যে তিনি রাজোচিত ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। রঘুনাথ দাসের ছাত্রাবস্থায় চৈতন্যপার্ষদ হরিদাসের সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি চৈতন্যদর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। জীবনীগ্রন্থসমূহে তাঁর যে জীবনাদর্শের ছবি আঁকা হয়েছে তার তুলনা সত্যিই ইতিহাসে দুর্লভ।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব শান্তিপুরে আসলে রঘুনাথ দাসের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ঘটনাটি সম্ভবত ১৫১০-১১ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল। শান্তিপুরে এই সময় অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে থেকে পাগলপ্রায় হয়ে তিনি চৈতন্যচরণ দর্শন করতে লাগলেন। তাঁর আদেশে গৃহে ফিরে আসলেও মন উন্মাদ হয়ে রইলো। নীলাচলে যাবার জন্য তিনি বহুবার চেষ্টা করেন কিন্তু এক পর্যায়ে গোবর্ধনদাস তাঁকে বন্দী করে রাখেন। নীলাচল হতে চৈতন্য গৌড়ে আসলে রঘুনাথ দাসের সাথে তাঁর দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটে। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ সম্ভবত ১৫১৪-এর শেষের দিকে অথবা ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটেছিল। নিত্যানন্দ পাণিহাটিতে আসলে রঘুনাথের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁকে দিয়ে 'চিড়া-দধি-মহোৎসবের' আয়োজন করান। এ ঘটনা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই উৎসবের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা, নিয়মাচার প্রতিষ্ঠা ও বোধকে জাগ্রত করার একটি প্রয়াস লক্ষ করা যায়। চৈতন্য-উত্তর যুগের পদাবলিতে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বহুপদের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে সম্ভবত রঘুনাথ দাস ঐশ্বর্য, বিলাস, বিপুল বিত্ত-বৈভব ত্যাগ করে নীলাচলে এসে উপস্থিত হন এবং চৈতন্যসমীপে আত্মনিবেদন করেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সমর্পণ করেন। রঘুনাথ দাস প্রথমদিকে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে ভিক্ষা করতেন। এরপর তিনি সিংহদ্বার ছেড়ে ছত্রে গিয়ে ভিক্ষা করতেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথ দাসের কৃচ্ছসাধনা ও ঔদার্য দেখে তাঁকে নিজের দুইটি প্রিয়বস্তু – গোবর্ধন শিলা এবং গুঞ্জামালা দিয়েছিলেন। অতঃপর রঘুনাথ সাধন-ভজনের বিষয়ে আরও কঠোর হয়ে উঠলেন। ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে জগন্নাথদেবের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পরিষ্কার করে সঙ্গোপনে তাই গ্রহণ করতে লাগলেন। এ-এক পরম বিস্ময়কর ব্যাপার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ *চৈতন্যচরিতামৃতে* যেভাবে বিষয়টির বর্ণনা করেছেন তা সত্যিই জগতে দুর্লভ ঘটনা। অন্ত্যলীলার ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে:

বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন ॥
প্রাণরক্ষা-লাগি যবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্বেদ বচন ॥
প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত শড়ি যায় ॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
শড়া গন্ধে তৈলাঙ্গা গাই খাইতে না পারে ॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।

ভাতপাখালিয়া ফেলে দিয়া বহু পানি ॥
ভিতরের দৃঢ় যেই মাজি ভাত পায়।
নুন দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায় ॥[১]

চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তির পরাকাষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই বিরল কঠোর বৈরাগ্য প্রদর্শন করেছিলেন।

চৈতন্য তিরোধানের পরে তিনি বৃন্দাবনে আসেন। রাধাকুণ্ডতীরে আনুমানিক ১৫৭৫-৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিরোহিত হন তিনি। উল্লেখ্য, তিনি যখন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন তখন বৃন্দাবনে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে 'রাধে রাধে' বলে রাধারাণীকে খুঁজে বেড়াতেন। সেই থেকে 'রাধে রাধে' শব্দটি বৈষ্ণব সমাজের এক বিশেষ রীতিতে পরিণত হয়; যা আজও পরম শ্রদ্ধার সাথে বৈষ্ণবগণ ব্যবহার করে থাকেন।

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৫৩৭

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থসমূহ

জীব গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারীর তথ্য মতে নরহরি তাঁর *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে (১। ৮৩০-৩২) রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থের তালিকা উল্লেখ করেছেন। সেই তথ্য অনুযায়ী তাঁর গ্রন্থতালিকা:

ক. *দানকেলিচিন্তামণি* খ. *মুক্তাচরিতম্* গ. *পদাবলি* (*পদকল্পতরু* এবং *পদামৃতমাধুরী*-তে পদগুলোসংগৃহীত হয়েছে)। এছাড়া তাঁর বাংলায় অনুবাদকৃত '*মুক্তাচরিত*' গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী মঞ্জরীভাবের সাধক ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজনরীতি ও আস্বাদনরীতির প্রবর্তক চৈতন্য স্বয়ং। কিন্তু ষড়গোস্বামীর মঞ্জরীভাবের সাধনার মধ্যদিয়ে স্তরটি উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। রতির নির্যাস প্রেমে। প্রেমের বহিঃপ্রকাশ অষ্টসাত্ত্বিকভাবে। ভাবের পূর্ণ বিকার ঘটে কীর্তনের রসময়তায়। চৈতন্য-উত্তর যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিষয়ভাবে গোস্বামীগণ যে ভজন প্রণালী নির্দেশ করেছেন তাই বৈষ্ণবদের মনস্তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পদাবলি ও তার কীর্তন, ভজনের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে বৈষ্ণব ভক্তের অন্তস্তলে এবং সুবিস্তৃত হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ধারা।

তৃতীয় অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ
ভক্তিধর্মের তাৎপর্য ও তার উপযোগিতা

ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাবল্যে বাংলাদেশে যে ভক্তিতরঙ্গের প্লাবন বয়ে যায়, তার মূলে ছিল চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সংস্কার ও পুনরভ্যুদয়। চৈতন্যের প্রভাবে সমাজে প্রগতির বাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলভক্তিবাদ। ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চৈতন্যদেব ভয়াবহ বর্ণাশ্রম উৎখাত করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। নিত্যানন্দকে পুরী (উড়িষ্যা) থেকে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য অবলুপ্তির জন্য। চৈতন্যদেবের ভক্তি-আন্দোলনবিষয়ে প্রখ্যাত গবেষক মেলভিল টি. কেনেডির একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

> … The reform of cast, as such, probably never entered Chaitary's mind. He was not concerned with social rules and regulations or their change. He was supremely concerned with riligions worship. And this brought him into conflict with certain caste ideas. His social hetero doxy lay in his experience of bhakti … Chaitanya saw that it was the nature of bhakti to create its own fellowship by a higher law than that of caste … In so for as his bhakti preaching broke down caste conventions it was social change undoubtedly but the lowering of caste barriers was not its aim. This was purely an effect. This fellowship in religions worship did not mean fellowship in eating or other domestic concerns. These were social matters to be governed by the traditional rules. Such a shrap distinction between the religious and social spheres is rather difficult for the modern mind to appreciate but that such was the point of view of Chaitanya seems clear.[১]

এক্ষেত্রে আমাদের মত হচ্ছে, চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় কোথাও কোথাও স্ববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হলেও লোকজীবনে বর্ণভেদের গণ্ডি অতিক্রমের প্রয়াস ছিল মুখ্য। কারণ, চৈতন্য-প্রবর্তিত ও প্রদর্শিত সংকীর্তন বা কৃষ্ণনাম কীর্তন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সব বর্ণকেএকসূত্রে মেলাবার প্রয়াস ছিল। এই প্রয়াসের আনুষঙ্গিক পরিণতিই চৈতন্যের নব্য ভক্তিবাদ। এর মাধ্যমে সামাজিক বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না হলেও একান্ত প্রয়াস ছিল সমাজে সমতাবিধানের। ফলে দেখা যায়, ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করেই চৈতন্যদেব সবাইকে একসূত্রে গ্রন্থিত করতে পেরেছিলেন। ভক্তিকে আঁকড়ে ধরে লৌকিক আচরণে ও সমাজজীবনে যে পরিবর্তন আনা যায় তা চৈতন্য এবং তাঁর পার্ষদগণের আচরণে লক্ষ করা যায়। বৃন্দাবন দাস এ-বিষয়ে জানাচ্ছেন:

> জাতিকুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে,
> প্রেমধন আর্তি বিনে নাই পাই কৃষ্ণেরে ॥
> যে - তে - কুলে বৈষ্ণবের জন্য কেনে নহে।
> তথাপিহ সর্বোত্তম – সর্বশাস্ত্রে কহে ॥
> যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
> জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবে মরে ॥[২]

১.Melvil T. Kanedy, *The Chaitanya Movement: A study of Vaishnavism in Bengal,* Calcutta, 1925, PP-120-121.

২. বৃন্দাবন দাস, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৩৬৯, বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২১৫

চৈতন্যদেব স্বমহিমায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলী তাঁকে নেতা হিসেবে অভিষিক্ত করেছিলেন। বলা যেতে পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আনুকূল্য পেয়ে চৈতন্য তাঁর অভীষ্ট অর্জনে অগ্রসর হন। এক্ষেত্রে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল তুলনারহিত। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত ভক্তিবাদী আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মোটাদাগে চিহ্নিত করা যায়:

ক. যোগ্য নেতৃত্ব উদ্ভাবন ও যথাযথ কর্মবণ্টন করা,
খ. অঞ্চল বিভাজনের মাধ্যমে ভক্তিবাদের প্রচার ও অনুশীলনের সার্বিক ব্যবস্থা করা,
গ. ভক্তিবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যসাধনের প্রয়াস,
ঘ. স্বয়ং চৈতন্যের নেতৃত্বে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার সমুদয় কার্য সম্পাদন।

সমাজজীবনে যে আঘাত চৈতন্যদেব করতে পেরেছিলেন তার মূলে ছিল আদর্শ বাস্তবায়নে তিনি যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। একদিকে প্রবীণ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, প্রিয়পার্ষদ গদাধর, শ্রীবাস প্রমুখ; অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত নবীণ সনাতন, রূপ, শ্রীজীব, রঘুনাথ, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রমুখের মাধ্যমে তিনি ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে সমাজজীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রয়াসের আনুষঙ্গিক পরিণতি ছিল বর্ণবাদ নির্মূল করা, ব্রাহ্মণ্যবাদের যাঁতাকল থেকে মুক্তি এবং সকলকে এক পঙক্তিতে নিয়ে আসা। মেলভিল টি. কেনেডির আর একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

> The broadening out of the religious privilege to include all castes was a great asvance socially over the Brahmanic teaching which limited the highest reaches of religion to the privileged Few … The emphasis upon Kirtan and the power of the name naturally would tend to breed an independence of the priest and give men a new sense of freedom.[১]

চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে ভক্তিবাদ প্রচার ও অনুশীলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ-বিষয়ে জানাচ্ছেন :

মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সভাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥
নিত্যানন্দ রায়ে পাঠাইল গৌড় দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে ॥
আপনি দক্ষিণ দেশে করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণ নাম প্রচারণ ॥[২]

ব্রজমণ্ডল, গৌরমণ্ডল, উৎকল মণ্ডল (দাক্ষিণাত্য সহ)–এই আঞ্চলিক বিভাজনের মধ্য দিয়ে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হয়েছিল।

১.Melvil T. Kanedy, *The Chaitanya Movement: A study of Vaishnavism in Bengal*, Calcutta, 1925, PP-121.

২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১১৫

বর্তমানে যে ভক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তার মূল উৎস হিসেবে *উপনিষদকে* চিহ্নিত করা যায়। *ছান্দোগ্য উপনিষদ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ*-এ ভক্তিবাদের সামূহিক বর্ণনা রয়েছে। তবে *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা*-তে ভক্তি আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণতা পেয়েছে। ভক্তিতত্ত্বের আধার 'গুরুবাদ' ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ঐতিহ্য। মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অন্ধ্র প্রদেশের তিরুপতি নিবাসী রামানুজ। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের প্রতিকূলে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভক্তি-আন্দোলনকে বেগবান করেছিল। পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতক জুড়ে অবশ্য ভক্তিবাদে নতুন প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। গান্ধারপুরের বিঠ্‌ঠল্ মন্দিরকে কেন্দ্র করে সন্ত নামদেবের পরিচালনায় এক বিশেষ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এই নামদেব ভক্তিবাদকে আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—একেশ্বরবাদ, প্রেম ও স্বাধীনতার বাণী প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর এই আন্দোলনের কেন্দ্রমূলে ছিল জাতিপ্রথা নির্মূল ও যাজকীয় ক্রিয়াকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করা। তিনি দেখিয়েছিলেন, মোক্ষলাভের পথ হলো ঈশ্বর-প্রেম। নামদেবের পরে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন একনাথ। এরপর আসেন তুকারাম। ভক্তিবাদী আন্দোলনে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক এবং সর্বোচ্চ প্রভাববিস্তারকারী। সাধক কবিরও এই তালিকাভুক্ত বলে আমাদের অভিমত। কবিরের ঐকাশ্রয়ী দৃষ্টিভক্তি, নানকের অতীন্দ্রিয়বাদ এবং চৈতন্যদেবের ভক্তি-প্লাবী আনন্দধারা গোটা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনধারায় নিঃসন্দেহে নবজোয়ার নিয়ে এসেছিল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায় বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম এবং ভক্তিবাদ নতুন কোনো বিষয় নয়। বৈদিক যুগ থেকেই ভক্তিবাদ নানান স্তরে নানাভাবে সাধিত হয়েছে [পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে]। বাঙালি চৈতন্যদেবের বহুপূর্বেই জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*, বিদ্যাপতির *পদাবলি*, চণ্ডীদাসের পদাবলি ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এরমাধ্যমে বৈষ্ণব মতবাদের সাথে পরিচিত হয়েছে। মাধবেন্দ্রপুরী স্থায়ীভাবে ভক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন। চৈতন্য-আর্বিভাবে স্থায়ীভাবে স্থিতি লাভ করে পরমপ্রিয় কৃষ্ণের প্রতি আনুগত্য, প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি। চৈতন্যদেব এই ভক্তির মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিলুপ্তিসাধন, 'সর্বজীবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'– এই আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে রাগানুগা ভক্তির অনুশীলনে সকলকে একসূত্রে গ্রন্থিত করার সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়েছিলেন এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মাধুর্য ঐশ্বরিক; দেহজ নয় এবং তা কামগন্ধহীন — এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তিবাদ নতুন ধারায় পদার্পণ করেছিল। চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিবাদ এ-পর্যায়ে দুটি পরম্পরায় গড়ে উঠেছিল—

ক. বৃন্দাবনকেন্দ্রিক ধারা
খ. নবদ্বীপকেন্দ্রিক ধারা

বৃন্দাবনকেন্দ্রিক ধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বৃন্দাবনের সপ্ত গোস্বামী ; যথাঃ সনাতন, রূপ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এঁরা সচেতনভাবে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তিগ্রন্থ প্রণয়ন, চৈতন্যবাদকে প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ, চৈতন্যদেব কর্তৃক কৃষ্ণপূজনপদ্ধতি ও তার আনুষঙ্গিক মতবাদ প্রণয়ন করেন। নবদ্বীপকেন্দ্রিক ধারায় মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ, চৈতন্য-সমসাময়িক পদকারবৃন্দ চৈতন্যদেবের জীবন ও তার রহস্য, অলৌকিক কর্মপ্রবাহ ও অতীন্দ্রিয় সম্মোহনী ধারা, ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস হিসেবে নাম-সংকীর্তনের প্রয়োগ এবং ভক্তিতত্ত্বের

অন্যতম আশ্রয় চৈতন্যকে 'পরমতত্ত্ব' ও 'রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনুরূপী অবতার' হিসেবে এক বিশেষ ধারা প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে, উপর্যুক্ত দুটি ধারাকে কেন্দ্র করে ভক্তিবাদ আশ্রিত প্রেমধর্ম শুধু বাংলাদেশেই নয়, বাইরেও এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক আন্দোলন সৃষ্টি করে; যা চৈতন্যের প্রকটকালীন সময়েই হয়েছিল।

চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম ও তত্ত্বের ভিত্তি রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, বিশেষভাবে রাধাতত্ত্ব। যেহেতু বৈষ্ণব মত অনুসারে তিনি রাধাকৃষ্ণের মিলিত অবতার, সুতরাং তাঁর প্রধান কৃতিত্ব রাধাপ্রেমের মহিমা কীর্তন, যার দ্বারা শুদ্ধ ভক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল, কারণ *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*-এর আদি লীলার প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে, রাধা কৃষ্ণপ্রেমের বিলাসরূপিনী হ্লাদিনী শক্তি এবং রাধাকৃষ্ণ একাত্ম হলেও বিলাসবাসনা চরিতার্থ করার প্রয়াসে দেহভেদ স্বীকার করে মর্ত্যধূলির বুকে নেমে এসেছেন। চৈতন্যের অন্তর্মূল কৃষ্ণ কিন্তু বাইরে রাধার ভাবকান্তিবিশিষ্ট রূপ এবং রাধাপ্রেমের মহিমা, কৃষ্ণের মাধুর্যাধিক্য, রাধার কৃষ্ণপ্রেমে যে আনন্দ তা জানার জন্যই চৈতন্যের আবির্ভাব।[১] এই বিচিত্র আস্বাদনের হেতু ভক্তি ও প্রেমের মাধ্যমে নিগূঢ় আস্বাদন। এক্ষেত্রে আমাদের অভিমত, প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে* এ-সম্পর্কে কোনো সূত্র উল্লেখ করা হয়নি, অর্থাৎ রাধার ভাবকান্তি নিয়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং রাধাভাবে ভাবিত হয়ে স্থায়ীভাব লাভ করা – এসব কিছুই বৃন্দাবন দাসের রচনায় পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতকে বহু পদকর্তা যেমন : বাসুঘোষ, মুরারি গুপ্ত প্রমুখ পদকর্তার ভণিতায় পদ রচিত হয়েছে, যাতে চৈতন্যের রাধাভাব ও তত্ত্ব ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত এ-সকল পদ অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত পদ। সুতরাং এ-সকল পদে এবং *ভক্তিরত্নাকর*, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* প্রভৃতি গ্রন্থে যে রাধাবাদ এবং চৈতন্যদেবের রাধাভাবে ভাবিত হবার প্রসঙ্গ ব্যাপক আকারে প্রচারিত হয়েছে তার ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। স্বয়ং চৈতন্যদেবের 'শিক্ষাশ্লোকাষ্টক'এবং আরও কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক, একটি বাংলা পয়ার, একটি ব্রজবুলি পদের ধ্রুবপদ পাওয়া গিয়েছে যেখানে রাধাভাব সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত। কৃষ্ণকে তিনি 'গোপীভর্তা' বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে তিনি কান্তাপ্রেমের কথা বলেছেন, কিন্তু তা নিশ্চিত করে রাধাভাব ও তত্ত্বকে কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠা করে না। বৃন্দাবন দাসকে আমরা প্রামাণিক জীবনীকার হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী এবং এক্ষেত্রে তাঁর মতানুসারে চৈতন্যদেব পরিপূর্ণ কৃষ্ণভক্ত হিসেবেই নিজকে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে যে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় তা চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে নয়, চৈতন্য-পার্ষদ গদাধর দাসের প্রসঙ্গে। কেউ কেউ নীলাচল পর্বকে উল্লেখ করেছেন রাধাভাব বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে। কিন্তু এ-মতের পক্ষে কোনো জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের অভিমত, নীলাচলের সঙ্গে রাধাপ্রসঙ্গ একেবারেই বেমানান। কারণ, নীলাচলের জগন্নাথ (জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা) ঐশ্বর্যমণ্ডিত সত্তা এখানে বৃন্দাবনের মাধুর্যের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজই তাঁর *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* চৈতন্যদেবের রাধাভাবের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন কোনোরকম সূত্র ছাড়াই। সুতরাং, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তিবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য রাধার অথবা চৈতন্যের রাধাভাবে ভাবিত হবার যে স্থায়ী রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা চৈতন্যদেবের সৃষ্টি বলে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পেলেও এর উদ্‌গাতা বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলে আমাদের ধারণা। এ-কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, চৈতন্যদেব পরমনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্তই ছিলেন তবে রাধার প্রতিওভক্তিভাব প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর উৎকর্ষের চরম মুহূর্তও অনুভব করতেন। কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যাবে না বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ধরে বিচার না করে

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২ ও ৩

সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না যে, তিনি রাধাভাবে ভাবিত হয়ে তাঁর ভক্তি-আশ্রিত প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন।

চৈতন্যদেব ও ভক্তিধর্ম প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তিনি দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণের কৈশোর লীলা এবং সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভাত্মক মধুর উজ্জ্বল রসের আস্বাদনের মধ্যেই প্রতিনিয়ত মগ্ন থাকতেন। বস্তুত এই উজ্জ্বল রসের আস্বাদনের মধ্যেই ভক্তির যাবতীয় প্রভেদ অর্থাৎ সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য প্রভৃতি রস একান্তভাবে জাড়িয়ে থাকে। সুতরাং ভক্তিবাদ বা ধর্ম একরৈখিক কোনো বিষয় নয়। ভক্তিধর্ম অন্তরের একান্ত অনুশীলন, তবে তা অনুশীলনসঞ্জাত পরোক্ষ জ্ঞানপ্রকাশক নয়. একেবারেই প্রত্যক্ষ অনুভূতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে তা প্রতিষ্ঠিত। একজন গবেষকের এ-বিষয়ে মন্তব্য :

> The *Bhagavata* which is pre-eminently a work on Divine Love is the foundation of the teachings, on love as taught by the Gaudiya School of Bengal. Sri Krishna of the Gopis is one made up wholly of beauty and sweetness, a person in whom all the sweetness and beauty of the Universe had been put together. The Gopis of vrindavan had natural love and attraction for him. They knew of one but Krishna, they loved none but Krishna. He was all in all to them. A moment's separation from Him caused them unbearable pain and appeared as if lasting many centuries. He was their Lord. He was their Friend, He was their affectionate child, and above all he was their sweetheart. These loving relations of Gopis have particularly been related in the tenth *Skandha* of the *Bhagavata*. Chaitanya not only proclaims all these loving relations which devotees can have towards their loving God but shows how all these loving relations can practically be attained in one's life. He was, indeed, himself aliving example of the *Rasa* Cult.[১]

চৈতন্যদেব তাঁর ভক্তিধর্ম প্রতিষ্ঠায় যখনব্রতী হয়েছিলেন তখন বাংলায় বিশেষভাবে নবদ্বীপ-শান্তিপুরে চিন্তাশীল ও উদার মনোভাব সম্পন্ন শিক্ষিত লোকের অভাব ছিল না। বর্ণভিত্তিক কঠোরতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বর্ণ ও জাতিকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতা, হিন্দুদের ধর্মান্তরিত হওয়া, হিন্দু-মুসলমান অভিজাত শ্রেণির বস্তুবাদী চিন্তা ও স্বার্থপরতা, জ্ঞানচর্চায় শুষ্কতা – এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই সংকট থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন ভক্তিতত্ত্বে। যদিও ভক্তি সম্পর্কে সমগ্র ভারতে তখন একাধিক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত ছিল। চিন্তায় বিভিন্নতা থাকলেও কতগুলো মৌলিক ক্ষেত্রে এই সময় মতের ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। যেমন:

ক. ভক্তির প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বসমূহে সদাচারকে অধিক গুরুত্ব প্রদান।

খ. অসৎসঙ্গ, স্বার্থপরতা, হিংসা ও দৈহিক সুখকে নিন্দিত বিষয় হিসেবে গণ্য করা।

গ. 'যোগ' মার্গ থেকে ভক্তিকে বড় করে দেখা ও তার প্রচার করা।

ঘ. ভক্তির উপস্থাপনা যেহেতু কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে, সুতরাং ভক্তির তত্ত্ববিচারে জ্ঞানমার্গ ও জাতি বিচারকে প্রধান্য না দেওয়া।

ঙ. ভক্তির তাৎপর্য প্রতিষ্ঠায় চিন্তায় ও কর্মে সুনিয়ন্ত্রিত অভিনিবেশ, সর্বজীবে সম্মান, উদারতা প্রদর্শনও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের গুরুত্ব।

চ. ভক্তিতে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রাতিস্বিকতাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান।

১.Dr. Abhaya Kumar Guha, *The Rasa Cult in the Chaitanya-ChaiCharitammrita,* SirAsutosh Mookerjee Silver jubilee volume-III Calcutta University. (?) PP-372-73

ভক্তির তত্ত্ব ও বিচারের মধ্যে অনেক দোষ বিভিন্ন সমালোচকেরা প্রতিপাদন করেছেন।[১]কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রচেষ্টায় এই ভক্তিধর্মের মাধ্যমেই মুক্তির সন্ধান অনেকেই পেয়েছিলেন, যার ঐতিহাসিকভিত্তি অনেক সুদৃঢ়। বিষ্ণুপূজার যে-সব ধারা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল তাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণযুগল উপাসনার গীতিময় ধারাটিতে চৈতন্য-পূর্ব হতেই ভক্তির তত্ত্ব প্রয়োগ করে নতুন রূপে উপস্থাপন করা হলো। এর কারণসম্ভবত–

> বাঙালি ভক্তরা রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতাবলীর প্রশ্নাতীত জনপ্রিয়তার কথা জেনেই রাধাকৃষ্ণের আরাধনাকে সরল এবং সহজে বোধ্য ভক্তির কথার উপরে প্রতিষ্ঠিত করলেন।[২]

এক্ষেত্রে শৈব, শাক্তেবা অন্যান্য লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কে, উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে বা ব্রাহ্মণ্য ও বৈদিক রীতি সম্বন্ধে তেমন বিশেষ উৎসাহ ছিল না বললেই চলে। কারণ ভক্তির মধ্যে যে সারল্য, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঊর্ধ্বায়ন, যে প্রীতিময় প্রশান্তির তত্ত্ব নিহিত আছে তার সঙ্গে কোনোভাবেই শৈব-শাক্ত-সৌরীয় পূজন-পদ্ধতিকে মেলানো যায় না। সুতরাং, ভক্তিমার্গে লোকপ্রিয় রাধাকৃষ্ণ এবং সংগীততত্ত্ব-নির্ভর তাঁদের অবতারই বাঙালির জনজীবনে ভক্তিধর্মে অন্যতম প্রধান হয়ে উপস্থাপিত হলো। দশ অবতারের নয় অবতার তখন গৌণ হয়ে পড়ল অথবা তাঁদের আর তেমন কোনো ভূমিকা রইল না। বৈষ্ণব গোস্বামীগণের যে রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গঅবতারতত্ত্ব তাঁর কিছুটা উপযোগিতা তৎকালীন পরিবেশ-কেন্দ্রিক ছিল বা ঐ সময়ের দাবি ছিল বলে উপর্যুক্ত বিষয়ে আমাদের অভিমত।

ভক্তিধর্মের ভিত্তি হিসেবে যে-সব গ্রন্থ রয়েছে তার মধ্যে *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রধান। ভক্তিধর্মে উল্লিখিত গ্রন্থ-ব্যাখ্যাত ভক্তিই জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে নীতিরূপে বিবেচিত হয়েছে এবং এর একটি বাস্তববাদী রূপও রয়েছে, তাহলো –ভক্তির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় পার্থিব জীবনকে কোনোভাবেই অবহেলা করা হয়নি, বরং মানুষের মনুষ্যত্ব ও মূল্যবান জীবনের স্বরূপকে অধিক গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করা হয়েছে। ভক্তিবাদের অন্যতম উপলক্ষ্য হলো, নাম এবং নামীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিরাজমান এবং এতে ক্রিয়াকাণ্ড ও নির্ভরশীলতা বা পৌরোহিত্য গৌণ। কিন্তু ভক্তি পথের মার্গ প্রদর্শনকারী হিসেবে গুরু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে যুক্ত হলো। যোগ্য গুরুর নেতৃত্বে ভক্তির যৌক্তিক অনুশীলনেই পরম সত্ত্বার সান্নিধ্য পান ভক্তেরা। যার ফলে ভক্তি ও প্রেম ধর্মে গুরু-গৌরাঙ্গ-গোবিন্দকে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে। যেহেতু ভক্তি ধর্মে এবং তার ক্রিয়াকর্মে জাতির বিচার ও পৌরহিত্যের কোনো স্থান নেই, কিন্তু গুরু এবং মহান্ত প্রসঙ্গ তত্ত্ব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। চৈতন্য-পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে আটজন-প্রধান মহান্ত এবং তাঁদের পরিচালনায় চৌষট্টিজন মহান্তের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধান আটজন মহান্ত হলেনঃ স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, রামানন্দ বসু, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষ। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয়, প্রধান আটজন মহান্তের ক্ষেত্রে জাতবিচার প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই গুরুপূজাকে কেন্দ্র করেই

---

১. J. N Farquhar, *An outline of Religions Literature of India*, Delhi, 1967, P.P-230

Max Weber, *The Religion of India, The Sociology of Hinduism and Buddhism,* The free press of Glencoe, 1962, PP-308-09

Richard Lanoy, *The Speaking Tree : A Study of India Culture and Society*, Bombay, 1971, PP-291

Sushil Kumar Dey, *Vaishnava Faith and Movement in Bengal*, Calcutta, 1961, PP-546-47

২. জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *চৈতন্য-প্রসঙ্গ*, রমাকান্ত চক্রবর্তী, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের প্রেক্ষাপট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা-২০

বৈষ্ণব ধর্মে ফাটল ধরে এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিধি ব্যাপক এবং তা স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই মাধবেন্দ্র পুরী ও অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক ভক্তিবাদী আন্দোলনের একটি সারবত্তা নির্ণীত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মাধ্যমে তার পূর্ণতা ঘটে এবং উত্তর কালে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ ভক্তিবাদের চূড়ান্ত পরিণতি দান করেন। বৈষ্ণবরা প্রথম ভক্তিধর্ম প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বাধার সম্মুখীন হন এবং পরবর্তীসময়ে দেখা যায় ব্রাহ্মণেরাই এর নেতৃত্বস্থানীয় হয়ে ওঠে। শুরুতে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড থেকে ভক্তিমার্গকে তুচ্ছ ভাবলেও পরবর্তীকালে তাদের মতের পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের পেছনে *শ্রীমদ্ভাগবত*, *নারদভক্তিসূত্র*, *শাণ্ডিল্যসূত্র* গ্রন্থের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। *বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী* গ্রন্থে বিষ্ণুপুরী স্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক শ্লোকগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যায় ভক্তি ও তার তত্ত্বকে প্রকাশ করেন।[১]রূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, মধুসূদন সরস্বতীর *ভগবদ্‌ভক্তিরসায়ন*, শ্রীজীব গোস্বামীর *ভক্তিসন্দর্ভ* গ্রন্থে ভক্তিবাদের সার্বিক তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। উপর্যুক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে সামাজিক জনজীবনের সাথে আধ্যাত্মিক ভাবধারার মেলবন্ধন ঘটে। ভক্তিবাদ তত্ত্বে ও মাধুর্যে নবকলেবরে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং এর স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যগুলো মোটাদাগে চিহ্নিত করলে তা হয় নিম্নরূপ :

ক. ভক্তিধর্মের অবস্থান বর্ণাশ্রম ধর্মের উপরে এবং তাত্ত্বিক বিষয়াবলি অর্জনসাপেক্ষ।
খ. ভক্তির তাৎপর্যে, উপযোগিতায় ‘গুরুতত্ত্ব’ অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
গ. সদাচারমূলক ভক্তিবাদে নিষ্ঠা ও দৈন্য প্রধান। এখানে দুর্নীতির কোনো স্থান নেই।
ঘ. ভক্তি অনুশীলনে জাতিভেদ স্বীকৃতি নয়, সাম্য এবং স্থিতি প্রধান।
ঙ. ভক্তি ও ভক্তের আত্মচৈতন্য একসূত্রে গাথা এবং ভক্তিমিশ্রিত আত্মচৈতন্য রহস্যবাদভিত্তিক।

জ্ঞানচর্চা ক্ষেত্রবিশেষে মানুষকে মানুষ থেকে আলাদা করে দেয়। চৈতন্যদেব এই সত্যকে মান্যতা দিয়ে, তাকে দূরে রেখে, ভক্তির সামাজিক ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টায় রত ছিলেন। বস্তুত ভক্তির দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে। তৈরি হয় নতুন সামাজিক প্রেক্ষাপট। ভক্তিধর্ম প্রতিষ্ঠার ফলে জনগণমনে উদ্ভাসিত হয় ‘সর্বজীবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান’। ভক্তির অনুশীলনে বুদ্ধি পবিত্র হয়, মননের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা আসে। জ্ঞানার্জন চেষ্টার ফলমাত্র কিন্তু ভক্তির ভাব স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বজনীন। ভক্তির নিরন্তর অনুশীলনে ব্যক্তিত্বের অহং বিলুপ্ত হয়, জাগ্রত হয় নিরবচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্য। সুতরাং, ভক্তিধর্ম ও তার উপযোগিতা সমাজজীবনে শুধু আধ্যাত্মিক জোয়ারই আনেনি, সমাজ-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, বৈষম্য নিরসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল।

১. বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: বিষ্ণুপুরী, এ. বি সম্পাদিত, *বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী*, এলাহাবাদ, ১৯১৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল চৈতন্যদেবের দ্বারাও নয়, চৈতন্যদেবের কালেও নয়। চৈতন্য-উত্তরকালে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের একান্ত প্রয়াসে এই ধারা বিকশিত হয়, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজ উপনিবেশে বলদেব বিদ্যাভূষণের*গোবিন্দভাষ্য*-এর মাধ্যমে এই দার্শনিক ধারা একটি স্থায়ী রূপ প্রাপ্ত হয়। বস্তুত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন 'প্রমাণ'-এর উপর অবস্থিত। এই 'প্রমাণ'-এর উৎস শ্রুতি ও বেদ। এক্ষেত্রে পুরাণ ও ইতিহাসের ঘনিষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। অবশ্য পুরাণের অস্তিত্ব থাকলেও চৈতনদেব ভক্তির অনন্য মাধ্যম হিসেবে *শ্রীমদ্ভাগবত*কেই বেছে নিয়েছিলেন। চৈতন্যের জীবনচর্যায় ভক্তিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভক্তি সাধারণ বিষয় নয়; এ-এক অপার্থিব অনুভূতি। ঈশ্বর ও ভক্তের মাঝে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে ভক্তিই হয়ে ওঠে অনন্য সোপান। অতীন্দ্রিয় এই সম্পর্কের হেতু বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ-বিষয়ে জানাচ্ছেন :

১. প্রেমময় নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥[১]

২. একালে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥
কৃষ্ণ মাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ ধরে ভক্তভাব ॥[২]

অর্থাৎ, ভক্তির অনুশীলনে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে যার ব্যাপ্তি অনুরাগের মাধ্যমে এবং আত্মদর্শনে। বস্তুত এখানে যে- প্রসঙ্গএসে দাঁড়ায় তা হলো, উপর্যুক্ত তত্ত্বের সাথে চৈতন্য ও দর্শনের সম্পর্ক কতটুকু?

ক. ধর্ম ও দর্শন বস্তুত স্বতন্ত্র বিষয় কিন্তু সময়ের দাবিতে তারা অনেক ক্ষেত্রেই কাছাকাছি অবস্থান করে। ধর্মের ক্ষেত্রে পরমতত্ত্ব বা সত্তা-সম্পর্কিত দর্শনের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু দর্শন প্রস্থান স্বতন্ত্র ধারারই বিষয় এবং এই ধারাকে যে বিশেষ কোনো মতবাদ বা মতাদর্শের সাথে মিলতে হবে এমন নয়। তবে ধর্মতত্ত্বের যে বিকাশ ও পরিণতি ঈশ্বরতত্ত্বে, এর মধ্যে অনেকটা অবধারিতভাবেই এসে পড়ে দর্শনতত্ত্ব। ধর্মের মধ্যে বা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদের মধ্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দর্শনের আধারসমূহের অনুসন্ধান অনেকটা বিরুদ্ধ স্বভাবের মধ্যেই পড়ে। বস্তুত দর্শন জ্ঞানাত্মক ব্যাপার কিন্তু ধর্ম অনুভূতি-প্রধান বা অনুভূতি-প্রাণ। দর্শনের চরম লক্ষ্য প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় হলেও জানা বা বোঝাতেই দার্শনিকের আপাত সার্থকতা নিরূপিত হয়, কিন্তু ধর্মের লক্ষ্য

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা- ৩১

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭১

জানা বা বোঝা নয়, এক হয়ে যাওয়া বা পাওয়া বা মিলিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য। সুতরাং জ্ঞান এবং ভাব মিললেও তারা পরস্পরকর্তৃক তীব্রভাবে প্রভাবিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দর্শন-স্বভাবের বিকৃতিও তাতে ঘটে। ধর্মের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ধর্ম মানুষের আত্মিক ও পরমার্থিক পিপাসা মেটাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিঃসঙ্গতার অনুভূতি, একাকীত্বের অনুভূতি এবং নিজেকে আবিষ্কারের অনুভূতি – এসব অনুভূতির পিপাসা বাড়িয়েছে ধর্ম। এখানেই জ্ঞান আর অনুভূতির পার্থক্য নিরূপিত করা যায়। জ্ঞান Impersonal কিন্তু সাধারণে অধিগম্য হতে পারে; অনুভূতি একেবারেই একান্ত বিষয় যা নির্ভর করে স্বতন্ত্র দৃষ্টি ভঙ্গির ওপর। প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে ধর্ম শব্দটির অর্থ ঈষৎ আলাদা হলেও বা ভাবানুষঙ্গ ও ব্যাঞ্জনা ভিন্ন হলেও বস্তু লগ্ন প্রাপ্তির সাক্ষাৎ মূলত আধ্যাত্মিক মূল্যেরই সমার্থক। এই সমার্থক বিষয়ই চৈতন্য তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। চৈতন্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হলেও ভাবভূমিতে তিনি উদাসীন; একটি ধর্ম আন্দোলনের জন্ম দিলেও বিপ্লবী ভূমিকায়ছিলেন নিরুত্তাপ। তবে তাঁর প্রভাবে সমাজ জীবন যে প্রেমের বিপুল বন্যায় ভেসে গিয়েছিল এবং জীবনবোধের ক্ষেত্রে নতুন আত্মচৈতন্যের সঞ্চার করেছিল, এ-কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। চৈতন্যদেব শুধু ধর্মগুরুই নন, একটি বিশাল পরিবর্তনের মঞ্চে পরিবর্তনের আন্দোলনের তিনি কেন্দ্রস্থ পুরুষ। তাঁর সেই রূপটি ছিল :

> চৈতন্য হয়তো নিজেকে নিয়েই, অন্তরঙ্গ রস-সাধনার ঘোরের মধ্যেই বুঁদ হয়েছিলেন, কিন্তু চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম-আন্দোলন বহুকে নিয়ে, বহু মানুষের চেষ্টা ও ইচ্ছাকে নিয়ে, বহুজনের পাওয়া না পাওয়াকে নিয়ে, সমাজের অনেক স্তরের অনেক মানুষের উৎকণ্ঠা ও উন্মাদনাকে নিয়ে – একটা বিপুল যৌথ উদ্দীপনাকে অবলম্বন করে এগিয়েছিলেন। সে আন্দোলনের অনেক শিকড় সমাজ দেহের গভীরে প্রবিষ্ট এবং বহুদূর বিস্তৃত। তার প্রেরণা নিছক আধ্যাত্মিকতাতেই নিঃশেষিত নয়, তা অনেক স্থূল-সূক্ষ্ম, গভীর-অগভীর ধর্মীয় ও ব্যবহারিক প্রেরণার সমাহার।[১]

চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের যে ধর্ম-আন্দোলন তার মূলসূত্র প্রোথিত ছিল সামাজিক আন্দোলনের ভেতর। চৈতন্যের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিকভাবে সমাজের উপর ক্রিয়া করেছিল। ফলে ধর্ম-আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর সামাজিক ভূমিকা, বিশুদ্ধ ধর্মের ভূমিকা – উভয়ই সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবে চৈতন্য-পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের উপর্যুক্ত দুই ভূমিকা প্রসঙ্গ অনেকাংশেই অনুচ্চারিত থেকে গেছে।

খ. রাধাগোবিন্দ নাথ তাঁর *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*-গ্রন্থে রায় রামানন্দের সাথে চৈতন্যদেবের 'সাধ্যসাধন তত্ত্ব' আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।[২] রায় রামানন্দের সাথে চৈতন্যের সাধ্যসাধনতত্ত্বের সংলাপটি নিম্নরূপ :

> প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
> রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয় ॥
> প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
> রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার ॥

১. অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-২৬৩।]

২. দ্রষ্টব্য : শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, *গৌড়ীয়বৈষ্ণব দর্শন*-১, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্মত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কর আর।
রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার ॥[১]

রায় রামানন্দের সাথে চৈতন্যদেবের উল্লিখিত সংলাপে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের দার্শনিক রূপরেখার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিমানুষের আত্মপরিচয়ে স্বধর্ম আচরণ গুরুত্বের সাথে রামানন্দ প্রথমেই আলোচনা করলেন। সাধারণত মানুষ সামাজিক জীবনে একটি বর্ণ ও বংশের পরিচয়ে নিজের অবস্থান সুস্পষ্ট করে থাকে। তার বংশসূত্রের মধ্যেই শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী উদ্দিষ্ট কর্তব্য নিরূপিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই স্বধর্ম আচরণই বিষ্ণুভক্তির প্রধান উপলক্ষ্য। বিষ্ণুই এখানে সাধ্য, সর্বোপরি মুখ্য সাধ্য। ভক্তি সাধনার অঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ গৌণ সাধ্য। সুতরাং স্বধর্ম হচ্ছে সেই আচরণীয় পথ যেখানে এক ধর্মানুশাসনের মধ্যে থেকে একজাতীয় মনোবৃত্তির উদ্বোধন; যা আত্মশান্তি, সমৃদ্ধি, পরিজন ও পরিবেশের নানাবিধ কর্মের দ্বারা সার্বিক পরিতুষ্টি সাধন করে থাকে। ভক্তির স্বরূপ 'নবধা' উপায় অবলম্বনে সাধিত হয়। বলা যেতে পারে, নিজের বা দশের প্রতি কর্ম আসক্তি দ্বারা উদিষ্ট কর্ম সম্পাদনের মধ্যেও যখন আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ভগবত সাধনায় সকলের জন্য সুখ-শান্তি কামনা করা হয় এবং 'নবধা' উপায় অবলম্বন করা হয়, তাই ভক্তি অভিধায় সিক্ত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে*এ-বিষয়ে বলা হয়েছে :

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বুদ্ধিঃ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এই-নব লক্ষণা ভক্তি।[২]

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২০৬-২১০

২. পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৯

এই নবলক্ষণা বা নবধা ভক্তির অনুষ্ঠানই উদ্দিষ্ট ভক্তির উপলক্ষ্য। কিন্তু এই ভক্তি-পাত্র রসময় করে তুলতে হলে ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এজন্যে ভগবানের সাথে সখ্য, দাস্য, শান্ত, বাৎসল্য, মধুর ভাবস্থাপনে আত্মনিবেদনই যথার্থ পথ। কিন্তু চৈতন্যদেব 'এহো বাহ্য' বলে বিষয়কে আরও গভীরে নিয়ে গেলেন। আত্মনিবেদনে ভোগবাসনারূপ কর্মফলের আশা ত্যাগ করতে হয়। এই স্তরে জ্ঞানমিশ্রভক্তির জন্ম হয়। দুটি ধারায় এই ভক্তি পরিচালিত হয়। তাহলো – স্বধর্মে থেকে বৈধীভক্তির যাজন এবং সমস্ত কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উপস্থাপন। চৈতন্য এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। 'এহো বাহ্য' বলে রামানন্দকে গভীর তত্ত্বের দিকে নিয়ে গেলেন। রামানন্দ বৈধীভক্তির পরে 'রাগভক্তির' কথা বললেন। অর্থাৎ জ্ঞানশূন্যাভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি; যা থেকে প্রেমের উৎপত্তি হয়। এই প্রেমভক্তিকেই সেরা সাধন বলে উপস্থাপন করলেন। প্রেমভক্তির পর্যায় বিশ্লেষণে তিনি একে একে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যভাবের প্রেমের কথা বললেন। পর্যায় সারণিতে পরীক্ষা করলে দেখা যায় মহৎ হতে মহত্তর দিকে তিনি বিষয়বস্তুকে তুলে ধরলেন। চৈতন্যদেবও এগুলোকে 'এহোত্তম' বললেন। কিন্তু গভীরতার শেষবিন্দুতে পৌঁছে রায় রামানন্দ সাধনার সর্বেসর্বা স্তরে আনলেন প্রেমভক্তির চরম সোপান 'কান্তাপ্রেম'কে। অর্থাৎ, এই কান্তাপ্রেমের সাধনাই সর্বোচ্চ পর্যায়।

এই প্রেমে বৃন্দাবনের গোপীগণের ভাবসম্পর্কিত। গোপীরাই এই প্রেমের শুদ্ধ চর্চাকারী ও অধিকারিণী। একমাত্র কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গোপীবৃন্দের এই নিত্য, অনির্বচনীয় প্রেমলীলাই 'রাগাত্মিকা' ভক্তি নামে চিহ্নিত হয়েছে। রাগাত্মিকা প্রেমের ভজনের অনুষঙ্গ – শ্রবণ, মনন ও অনুধ্যান। অর্থাৎ ভক্তচিত্ত ভজনের মধ্যে দিয়ে অনুভবে লীলারস আস্বাদন করে থাকে। গোপী-অনুগত মঞ্জরীভাবাপন্ন সাধকগণ এই রাগাত্মিকা ভজনের পাত্র। এঁরাই ভববৃন্দাবনে ও ভাববৃন্দাবনে তাঁদের নিত্য গতাগতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে এই প্রেমের সন্ধান দিয়েছিলেন।

রায় রামানন্দের সাথে এই যে আলোচনা তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলে এটি হবে রসতত্ত্বের এক অমূল্য দলিল, এক আবেগাত্মক পরিণতিপ্রাপ্ত তত্ত্ব। এখানে দর্শন কোথায়? কোনো কোনো সমালোচক দৃঢ়তার সাথে উল্লিখিত প্রশ্নটি করেছেন। এ-প্রসঙ্গে আমরা মনে করি, জীবনচর্যা ও দর্শনের ধারাকে যদিও এক রেখায় বসানো যায় না কিন্তু ভাববাদী জীবনাচরণ ও বস্তুবাদী চিন্তার প্রক্ষেপে যখন সাধনার মধ্যে একই সাথে দেখা ও অনুভবের বিষয়টি প্রবল হয়ে ওঠে, দর্শনের ভূমি যতই স্বতন্ত্র হোক না কেন, তা দর্শনেরই প্রবাহধারা। সুতরাং, এই শুদ্ধ ও সাধনমিশ্রিত সংলাপে তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাপকতাওঅনেক বেশি।

সাধ্যসাধনতত্ত্ব

চৈতন্যদেব রায় রামানন্দকেমানবজীবনের চরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সম্পকে প্রথম প্রশ্ন করেছিলে। এই প্রশ্ন দিয়েই তত্ত্বালোচনার সূত্রপাত এবং গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় পুরো আলোচনাটিতে আবেগাত্মক রসের সাধনার প্রসঙ্গ আসলেও তা ছিল প্রবলভাবে দার্শনিক আবেশে মোড়ানো। যেমন : চৈতন্যদেবের উপর্যুক্ত প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ কর্মযোগ থেকে আলোচনা শুরু করেছেন। স্বধর্ম

অনুশীলনের মধ্য দিয়েই বিষ্ণুভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুত এখানে দর্শনটি হলো–বিষ্ণু এখানে সাধ্য বা মুখ্য সাধ্য কিন্তু অনুভূতির যৌক্তিক রূপটি হলো ভক্তিকে অন্যতম সাধনাঙ্গরূপে অনুশীলন ও অনুধাবনে যে মনোবৃত্তি চরিতার্থ হয় তা ধর্মচারণ হলেও হৃদয়বৃত্তিতে শান্তিকরী সুখকরী আশ্রয় – এই স্বধর্ম অনুশীলনও এক ধরনের দর্শনচর্চা। কিন্তু চৈতন্যদেব এই তত্ত্বে সায় দিলেন না। 'এহো বাহ্য' বলে আরও নিবিড় অনুভূতির স্তরে যেতে চাইলেন। দ্বিতীয় ভাগে রামানন্দ আত্মনিবেদনের ভোগমুখী বাসনারূপ কর্শফলের আশা ত্যাগের প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন। এই ত্যাগের স্বরূপই জ্ঞানমিশ্রাভক্তি। যার লক্ষ্য শুভ-অশুভ কর্মফলবন্ধন মুক্ত করে। দুই অঙ্গে এই বৈধীভক্তি ক্রিয়াশীল থাকে।

স্বধর্মে থেকে ফলভোগ বাসনারূপ জ্ঞানতত্ত্ব দিয়ে বৈধীভক্তির অনুশীলন বা যাজন এবং ব্রহ্মভূত অবস্থায় বৈধীভক্তির সাধন। চৈতন্যদেব আরও এগিয়ে এলেন ; রামানন্দ তৃতীয়ত উত্থাপন করলেন রাগভক্তির প্রসঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞানশূন্যাভক্তি-তত্ত্ব; যার থেকে প্রেমের উদয় হয়। চৈতন্যদেব এই তত্ত্বের স্বীকৃতি দিলেন এবং আলোচনাটিকে চূড়ান্তপর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। যদিও রামানন্দ প্রেমভক্তিকেই সর্বশেষ এবং সকল সাধনার সেরা সাধন বলে প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রেমভক্তির পর্যায় বিশ্লেষণে তিনি শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ভাবের ভজন-প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন। চৈতন্যদেব গাঢ়তা অনুযায়ী 'এহোত্তম' বলে আরও গভীরে যেতে চাইলেন এবং রামানন্দও প্রেমভক্তি সর্বসার 'কান্তাপ্রেম'কে তুলে ধরলেন। এই কান্তাপ্রেমের সবার্থ শিরোমণি কৃষ্ণ, কিন্তু অন্তরঙ্গ অনুধাবনে বৃন্দাবনের গোপীরাই এই প্রেমের একমাত্র অধিকারী (যদিও কৃষ্ণ-মহিষীরাও এই প্রেমের অধিকার পেয়েছিলেন, কিন্তু আচারে-ব্যবহারে গোপীপ্রেম মহিষীদের থেকে উচ্চতর)। গোপীদের এই প্রেমাস্বাদন 'রাগাত্মিকা' নামে চিহ্নিত করা হয়। বস্তুত এই তত্ত্ব অনুরাগাত্মিক প্রেমের ভজন প্রণালি। সাধ্য সাধন-সংলাপকে তত্ত্বে দাঁড় করালে তার মধ্যে নতুন এক দার্শনিক প্রমাণ নির্ণয় করা দুর্লক্ষ্যণীয় নয়। যেমন :

১.স্বধর্ম হলো আপনার প্রতি বা সাধারণের প্রতি আসক্তির দ্বারা যে কর্ম সাধিত, সেই কর্মই পরমপ্রিয়ের সাধনার লক্ষ্যে সকলের জন্য সুখ ও শান্তি বাসনা করে;, যখন কর্ম 'নববিধ' উপায় অবলম্বনে সাধিত হয়, তাই হলো ভক্তি।

২.ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরের স্বরূপ অনুধাবন অর্থাৎ তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশরূপ তত্ত্ব জানেন এবং সেইভাবে ভাবিত হয়ে ক্রমান্বয়ে ভক্তিনিষ্ঠ অভ্যাসের দ্বারা ঈশ্বর সমীপে সম্মিলিত হন।

৩.মধুর লীলা এবং অন্যান্য পর্যায় অর্থাৎ দাস্য, বাৎসল্যাদি প্রেমসাধকের ক্ষেত্রে জ্ঞানাতীত বিষয়। কেবল মধুর রসের উপাসক যারা, তারা সেই অপার্থিব রস আস্বাদন করতে পারেন। সেই সাথে মধুর রসের ভক্তগণ বৃন্দাবনের সরাসরি লীলা অংশগ্রহণকারী আট সখীর কোনো একজন সখীর ভাবসাধনার পরিচয় পেলে তাঁর আশ্রয়ে রাগানুগা ভজন-প্রণালিকে আশ্রয় করে স্ব-সাধনায় রসাস্বাদনে একান্ত ব্রতী হয়ে অনুরাগে মনোনিবেশ করে সাধনসিদ্ধ ভাবাশ্রয়ে নিত্যধামে নিত্যলীলার অংশভাগিনী হন।

৪.কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার ভাববৃন্দাবনে প্রতিনিয়ত নব ভাবে ও রসের বিস্তারে যে আনন্দোজ্জ্বল মিলন, তা রাগীভক্ত-অন্তরে সর্বদাই লীলায়িত হচ্ছে – বৃন্দাবনের সখীগণ উপর্যুক্ত লীলার উত্তম

পরিকল্পনাকারী ও বিস্তারকারী। সুতরাং, তাঁদের রাগাত্মিকা সাধ্যসেবাসুখ এবং রাগানুগা ভক্তিরস দিয়ে উত্তম ভক্ত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে অপার্থিব আনন্দ আস্বাদন করে থাকেন।

৫.ভক্তি ধর্মের অন্যতম উপজীব্য গোপীপ্রেম বা রাধাভাবের ভজন। গোপীগণ একমাত্র কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেমসেবা ছাড়া সর্বপ্রকার জ্ঞানাসক্তি বর্জিত ছিলেন। আত্মসুখ বাঞ্ছাবর্জিত কৃষ্ণসুখের নিমিত্তে অভিলষিত ভক্তিভাবই নিষ্কাম গোপীপ্রেম। এই প্রেমের ধারা দ্বিমুখী – ঐশ্বর্যময়ী প্রেম ও ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন প্রেম বা শুদ্ধরতি প্রেম বা কেবলা প্রেম। কান্তাপ্রেম অনুধাবনে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষাশ্লোকাষ্টক-তত্ত্ব

চৈতন্য-প্রবর্তিত অভিনব প্রেমধর্মের বিকাশ মূলত তাঁর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর থেকে। কিন্তু এর গোড়াপত্তন বাংলা থেকেই শুরু হয়েছিল। বস্তুত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ভক্তিরসের আদি উৎস হিসেবে মাধবেন্দ্র পুরীকে চিহ্নিত করা যায়। কারণ, চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি অদ্বৈত আচার্যকে ভক্তিধর্মে দীক্ষিত করেন এবং নিত্যানন্দের সাথেও তাঁর দক্ষিণ ভারতে সাক্ষাৎ ঘটে;যা পরবর্তী সময়ে ভক্তিবাদী আন্দোলনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। চৈতন্যদেবের বাল্যবেলায় মাধবেন্দ্রপুরী তিরোহিত হন এবং পরবর্তীসময়ে তাঁর শিষ্য ঈশ্বর পুরী থেকে চৈতন্য মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পরপরই তাঁর মধ্যে ভাবান্তর ঘটে। চৈতন্য-গুরু ঈশ্বরপুরীও মাধবেন্দ্রপুরীর মতো ভক্ত-প্রেমিক ছিলেন। ফলে পূর্বাপর প্রভাব চৈতন্যদেবের উপর বর্তেছিল। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে চৈতন্যপূর্ববর্তী সকল সম্প্রদায়ের মতাদর্শের সাথে পরিচিত হন এবং প্রবহমান ভক্তিবাদের ত্রুটি সংশোধন করে নতুন কলেবরে ভক্তিধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। চৈতন্যদেব তাঁর প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম সম্পর্কে কোথাও কিছু লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু নিঃসন্দেহে তিনি পার্ষদের মধ্যে তাঁর মতাদর্শ সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। ফলে, চৈতন্য-উত্তরকালে ভক্তিধর্ম স্থায়ী রূপ লাভ করে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন নামে নতুন এক দার্শনিক ধারার জন্ম হয়। রূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের যে-গ্রন্থসমূহ ও তার বিষয়বস্তু – পঞ্চরসের ভজন, গোপীপ্রেমতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, যুগলতত্ত্ব, নামমাহিমা অর্থাৎ ভক্তিবাদের যে উৎকর্ষ ও ভজনপূজনপদ্ধতি তা চৈতন্যদেবই রূপ-সনাতনকে উপদেশ দিয়েছিলেন; চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং যে-সব গবেষক-আলোচক উত্তরকালের মতাদর্শ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর সম্পর্ক বা সম্পৃক্ততা নিয়ে, তা একেবারেই তথ্যহীন। তবে একথা বিচার্য যে, পরবর্তী মতসমূহের মধ্যে চৈতন্য-আদর্শের সাথে আরও নতুন মতাদর্শ যুক্ত হয়েছিল এবং এই সংযুক্তি অনেকাংশেই ষড় গোস্বামীদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের* অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে চৈতন্য-কর্তৃক রচিত শিক্ষাষ্টক শ্লোক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এই আটটি শ্লোকের মধ্যে তাঁর নবধর্মের সার নিহিত রয়েছে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর দর্শনে যে দৃষ্টিভঙ্গি আরোপিত তাতে অন্তরালে রাজনীতি কিন্তু সমান্তরালে নতুন আন্দোলনধারার স্বরূপকে চিহ্নিত করা যায়। তিনি স্পষ্ট করে ঘোষণা করছেন এক অভিনব বার্তা – ভগবান আছেন, আসেন এবং তিনি করুণাময় আনন্দময়। তাঁর অন্তহীন করুণা জগৎ জীবের জন্য, স্থাবর, জঙ্গম, জড়, চেতনের জন্য। তিনি যেহেতু আনন্দময়, সুতরাং আনন্দ বিতরণের

জন্য ব্যাকুল। তিনি একই সাথে পুত্র, সখা, প্রিয় দয়িত ; তিনি নন্দনন্দন কৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র সত্যবস্তু এবং ভালোবাসার কাঙ্গাল, সুতরাং তাঁকে ভালোবাসতে হবে। পঞ্চম পুরুষার্থের মূল প্রেম এবং জগৎ জীবের একমাত্র কাম্যবস্তুও প্রেম। সুতরাং, প্রেমের উপসানাই মানুষের চরমতম লক্ষ্য এবং পরম সাধন। উপর্যুক্ত বক্তব্যে চৈতন্যচরিতের এক বিশেষ মনোভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহলো–

> ... জীব কৃষ্ণনিত্যদাস।" মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। চরিত্রই মানুষের মেরুদণ্ড, প্রেম জগতের প্রাণ, এই প্রেমই মানুষ চেনার নিকষ পাষাণ। প্রেমিক যে সেই দ্বিজোত্তম, সেই জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ। এই প্রেম আনন্দ চিন্ময়রস, এই প্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু। কোনো সাধনায় এ প্রেম পাওয়া যায় না... ভক্তগণেরকৃপা হলেই প্রেমলাভ হয়। তাই তিনি শ্রীভগবানের নাম –শ্রীহরিনাম প্রচারকরেছিলেন, প্রচারে উপদেশ দিয়েছিলেন, প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে থাকতে নবদ্বীপেই এর শুভারম্ভ হয়, ...[১]

উপর্যুক্ত মন্তব্যে যে উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গ এসেছে চৈতন্য-রচিত শিক্ষাশ্লোকাষ্টকে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। চৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দকে উপলক্ষ্য করে অষ্ট শ্লোকের রস আস্বাদন করেছেন। যথা:

> পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক শিখাইল।
সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল ॥[২]

অর্থাৎ চৈতন্য তাঁর স্বীয় রচনা প্রত্যক্ষ আস্বাদনের মধ্য দিয়ে স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নিম্নে চৈতন্য-রচিত শিক্ষাষ্টক শ্লোকগুলো তুলে ধরা হলো :

১. চেতো দর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয় কৈরব চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুবিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন জয়লাভ করেছে। কৃষ্ণসংকীর্তনে মনরূপ দর্পণ মার্জিত হয়, সংসারের মহাদুঃখের আগুন নিভে যায়, কল্যাণের জ্যোৎস্না নেমে আসে ; বিদ্যারূপ বধু জীবনলাভ করে, আনন্দের সমুদ্রে জোয়ার আসে, প্রতিপদেই সমস্ত রস-সুধার আস্বাদ জন্মায় এবং সমস্ত অস্তিত্বকে যেন শীতল করে দেয়।

২. নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগ ॥

১. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *পদাবলী-পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬। পৃষ্ঠা-৪২

২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৬৩

নাম সাধকের নাম নিতে কালাকালের বিচারের প্রয়োজন হয় না। ভগবানের অনেক নাম আছে এবং প্রত্যেক নামে তাঁর সমস্ত শক্তি আছে। তোমার অনন্ত নাম অনন্ত ভক্তের রুচি অনুসারে বিহিত – যে নামে যার রুচি সে সেই নাম নিতে পারে, কারণ সর্বনামেই তোমার সর্বশক্তি নিহিত। হে ভগবান! এমনই তোমার কৃপা! আমার এমনই দুর্দৈব যে সেই নামে আমার তীব্র অনুরাগ হলো না।

৩. তৃণাদপি সুনীচেন তরোবিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
তৃণের চেয়ে নীচতার দ্বারা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে, নিজের মান-অভিমান ত্যাগ করে যারমন কোনও কালেই কারও কাছে নেই বা ছিল না সেই নিভৃতে অবহেলিত মনুষ্যত্বকে মর্যাদা প্রদান করে যিনি সর্বদাই হরিনাম সংকীর্তনের নিমগ্ন, তিনিই আনন্দের স্বাদ পাবেন।

৪. ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মানি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

হে জগদীশ ! আমি ধন বিত্ত বিভব যশ অর্থ কিছুই চাই না ; চাইনা স্বজন পরিজন সুন্দরী বণিতা তীব্র কবিত্ব শক্তি। এ সকলই তুচ্ছ; আমি চাই, জন্মে জন্মে যেন হে জগদীশ্বর, তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তিযুক্ত হয়ে থাকতে পারি।

৫. অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং
মা বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত –
ধূলি সদৃশং বিচিন্ত ॥
ভবসাগরে এই বিষম সংসার সমরে আমি পতিত, তোমার দাস, হে নন্দসুত! আমাকে
ধুলিসম চিন্তা করে এই বিষম ভবসাগর থেকে রক্ষা করে তোমার অবিরাম কৃপার ধারায় সিক্ত করো।

৬. নয়নং গলদশ্রু ধারয়া
বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥
হে জগদীশ্বর! কবে তোমার নাম গ্রহণে আমার নয়ন বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসবে? কবেতোমার নাম গ্রহণে বচন গদ্‌গদ, দেহ পুলকে কণ্টকিত, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে?

৭. যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥

গোবিন্দ-বিরহের নিমেষ কালও যেন আমার কাছে যুগসম মনে হচ্ছে। বর্ষার জলধারার মতো আমার নয়নবারি ঝরছে। জগৎ মনে হচ্ছে শূন্য, অর্থহীন।

৮. আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনাৎ মর্মাহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রাণনাথস্তু স এব না পরাঃ ॥

আমাকে তুমি আলিঙ্গন করো, তোমার পদতলে পিষ্ঠ করো অথবা আমাকে দেখা না দিয়েমর্মাহত করো; তোমার যেমন ইচ্ছা তাই হোক। হে লম্পট! সকল কিছুর উর্ধ্বে তুমিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেউ নয়। এই জীবনে আমার অন্য কেউ-ই কাম্য নয়।[১]

উপর্যুক্ত আটটি শ্লোকের বিষয়ভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে চৈতন্য স্বয়ং তাঁর প্রেমধর্ম সম্পর্কে কোনো বাণী লিপিবদ্ধ করে যাননি। তিনি মৌখিকভাবে তাঁর ভক্তদের যে-শিক্ষা দিয়েছিলেন তা পরবর্তী সময়ে ভক্তেরা নিজের মতো করে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। শিক্ষাশ্লোককাষ্টক রূপ গোস্বামী কর্তৃক *পদ্যাবলীতে* সংকলিত হয় এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* উদ্ধৃত করেন। এ বিষয়ে আমাদের অভিমত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাগভক্তি সম্পর্কিত যে-সমস্ত তত্ত্ব চৈতন্যপ্রদত্ত বলে পরবর্তীকালে সন্নিবেশিত হয়েছে তা কতটুকু প্রমাণিত সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

চৈতন্যদেব শিক্ষাষ্টকশ্লোকগুলো প্রথম সনাতন গোস্বামীকে প্রদান করেন। তাঁকে শুধু শিক্ষাষ্টকই নয়, কাশীবাসকালে চৈতন্য তাঁকে সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয় তত্ত্ব, প্রয়োজনতত্ত্ব, আত্মারাম ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। রূপ গোস্বামীও চৈতন্য-কর্তৃক উপর্যুক্ত বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন।

শিক্ষাশ্লোকাষ্টক থেকে মোটাদাগে যে-বিষয়গুলো দার্শনিক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১.আনন্দরূপ অমৃত লাভ করতে বা স্বীয় আত্মাকে আনন্দময় করে তুলতে কৃষ্ণের নাম-গুণ-দিব্যলীলার কীর্তনকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ সংকীর্তনের মাধ্যমেই চিত্তের কামনা বাসনারূপ মালিন্য দূর করা যায়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম হয় তাহলো—নাম সংকীর্তনের মধ্যে চিত্তমালিন্য দূর হয় কিন্তু পরমসত্তার তো অনন্ত নাম; এক্ষেত্রে কোন নাম গ্রহণযোগ্য? এর উত্তর প্রদানে চৈতন্য ভাববাদী দর্শনের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ভাববাদী উত্তর প্রদান করেছেন। যথা :

ক. পরম সত্ত্বার অনন্ত নাম অনন্ত ভক্তের রুচি অনুসারেই সে গ্রহণ করবে।
খ. সর্বনামেই সর্বশক্তি বিরাজমান। সুতরাং, যার যে নামে রুচি সেই নামকীর্তনে তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।
গ. নাম-স্মরণের ক্ষেত্রে কোনো কালাকালের বিচার নেই।

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৬১৯-৬২২। উদ্ধৃত শ্লোকগুলো বর্তমান গবেষক কর্তৃক অনুদিত।

২.নাম-সংকীর্তন দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হলে তার কিছু ফল অবশ্যম্ভাবী। যেমন : নিরহঙ্কারতা, আত্ম-বিচারণা ও সাধনলব্ধ বিনয়। অর্থাৎ, সাধনার প্রথম স্তরে থাকে কাতরতা ও বিনয়। দীনতর থেকে, সর্বোচ্চ কাতরতা দিয়ে নাম সাধনার মাধ্যমে প্রথমে সে বাসনা শূন্য হয়ে ওঠে –কেবল একটি চূড়ান্তবাসনার দিকে লক্ষ্য স্থির থাকে, তাহলো– ভগবৎ ভক্তি। তদ্‌গতচিত্তের ভক্তের কাছে আরাধ্যই একমাত্র সাধ্য, তাঁর চরণরেণু প্রার্থনাই একমাত্র কাম্য।

৩.নন্দনন্দন কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলে একান্ত বিশ্বাস স্থির হলে তাঁর বিরহ হয়ে ওঠে অসহনীয়। বিরহ থেকেই পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাবতরঙ্গ প্রবল হয়ে ওঠে। আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন ঘটে।

বস্তুত শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের মধ্যে চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত ভক্তিতত্ত্ব ও ধর্মের কিছু সার কথা উপস্থাপিত হয়েছে কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের যে বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি সেখানে শ্লোকগুলো কিছু তত্ত্বকে সূত্রায়িত করে মাত্র। বৃহৎ অর্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণারতির সাথে বা রসের উৎসারণে বা পরকীয়া প্রেমতত্ত্বে গভীর সংযোগ স্থাপনে আরও ব্যাপক তত্ত্বে-উপাত্তে পরবর্তীকালে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি হিসেবে শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের ভূমিকা অপরিসীম।

ঘ. রাগানুগা ভক্তি

ভক্তির মূলতস্বরূপ-লক্ষণ হলো মমত্ব বা প্রিয়তা। এই প্রিয়তা পূজনীয় ব্যক্তিতে সম্ভ্রমবোধ প্রকাশের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় এবং যথার্থ প্রিয়তা প্রকাশের মূলে থাকে ঐশ্বর্যবোধহীন এক বিশেষ আত্মনিবেদন। একেই ভক্তি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই ভক্তিকে শুদ্ধা, কেবলা, অহৈতুকী প্রভৃতি বিশেষণে অঙ্কিত করা হয়। ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব মহাজনেরা ভক্তির রসময় আস্বাদ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক তুলে ধরেছিলেন। ভক্তির নব রূপায়ণে দেখা দেয় ঈশ্বরের এক নতুন স্বরূপ। এ-প্রসঙ্গে রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে জানাচ্ছেন:

অন্যভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥[১]
অর্থাৎ, কৃষ্ণসম্মন্ধি অথবা শ্রীকৃষ্ণের জন্য অনুকূল অনুশীলনকে সামান্যত 'ভক্তি' বলে। এই অনুশীলন জ্ঞান-কর্মাদির দ্বারা এবং অন্য বস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য হলেই তাকে 'উত্তমা ভক্তি' বলা যায়।

রূপ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বিশেষভাবে ভক্তিবাদের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় এবং দার্শনিকতায় ভক্তিকে পূর্ববর্তী তাত্ত্বিকদের মত খণ্ডন করে এক অনন্য স্থানে আসীন করেছিলেন। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে ভক্তিতত্ত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হলো। মূলত ভক্তির ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে রূপ এবং জীব গোস্বামী উত্তমা ভক্তিকে 'জ্ঞান কর্মাদ্যনাবৃতং' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থাৎ, কৃষ্ণ বিষয়ক মানসিক

১. রূপ গোস্বামী, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, বহরমপুর, ১৯৩৩। পৃষ্ঠা-৮৬, ১৩৬

সমাধিই ‘কৃষ্ণানুশীলন’ এবং কৃষ্ণে নিত্য প্রবৃত্তিই ‘ভক্তি’ ; যা সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তি স্তরে সজ্জিত থাকে। বস্তুত এগুলি ভক্তি-অনুভবের ক্ষেত্রে ক্রোমচ্চ স্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সাধন-ভক্তি ইন্দ্রিগণের প্রেরণা বা শ্রবণ-কীর্তনাদি-দর্শনহেতু সাধন যোগ্য স্তর। এই ভক্তি-সাধনার দ্বারা ভাব ও প্রেমের সাধনাকে বেগবান করা যায়। কিন্তু রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যানুযায়ী ভাব ও প্রেম নিত্যবস্তু হওয়ায় তার কোনো সাধন প্রণালী নেই, তবুও জীবের যাপিত জীবনে অন্তরস্থিত যে প্রেমের তীব্র উদ্দীপন হয় তাই বৈষ্ণব-দর্শনে সাধন-ভক্তি নামে পরিচিত। এর রয়েছে দুটি স্তর, যথা: বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রশাসনের ভয়ে রাগের অপ্রাপ্তি হেতু যে প্রবৃত্তির জন্ম হয় তা বৈধীভক্তি। বৈধীভক্তি সাধন-পদ্ধতি তিনটি ধারায় বিন্যস্তঃ উত্তমা, মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা। বৈধীসাধনভক্তির চৌষট্টিটি অঙ্গ থাকলেও এর গতায়াতের ধারা নবধা বিভক্তিতে। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন – এই ধারা অনুযায়ী বৈধীসাধনভক্তির অনুশীলন করা হয়ে থাকে। বৈষ্ণব ধর্মের ভজনের ক্ষেত্রে রাগানুগা ভজন-পদ্ধতি ভক্তির অনন্য বিকাশের পরিচায়ক হিসেবে গৌড়ীয় মত অনুযায়ী গ্রাহ্য। বৃন্দাবনের ব্রজবাসীগণের কৃষ্ণের প্রতি প্রকাশ্যরূপে বিরাজমান যে ভক্তি তাই রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত হয়ে যে ভক্তি-সাধনা তাই রাগানুগা ভক্তি। রাগাত্মিকা সাধন ভক্তি দুটি স্তরে সজ্জিত : কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা। কামরূপা স্তরে রয়েছেন ব্রজগোপী এবং সম্মন্ধরূপা স্তরে রয়েছেন নন্দ-যশোদা প্রমুখ।

ব্রজবাসীজন প্রকটরূপে বিরাজমান রাগাত্মিকা সাধনভক্তিকে অনুসরণের মধ্য দিয়ে এক বিশেষ রতি –রাগানুগার সাধনা করে থাকেন। রাগানুগা ভক্তির মার্গ হলো, বৃন্দাবনে বহুভাবের বিন্যাস রয়েছে, সেই বহুভাবের বিন্যাস থেকে যে কোনো একটি ভাব গ্রহণ করে তার পূর্ণ অনুগামী হয়ে রতির যোগ্য অনুশীলন। তবে এই ভাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো মধুর ভাব। মধুর ভাবের সাধনায় যে আনন্দ আস্বাদিত হয় তা তুলনারহিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ-বিষয়ে জানিয়েছেন :

ক. সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম সর্ব ত্যাজি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

খ. সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী-বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনু এই লীলার অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ...
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তাঁর পল্লব পুষ্প পাতা ॥ ...
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।

রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য-জ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥[১]

বৃন্দাবনের ব্রজগোপীগণ রাগানুগা ভক্তির উজ্জ্বলতম নিদর্শন। রাগানুগাভক্তির পারিভাষিক নাম ‘রতি’। রাগানুগা সাধ্যভক্তির রূপ দুইটি – কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। কামানুগা ভক্তির স্তর দুটি – সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তদ্‌ভবেচ্ছাময়ী। সম্মন্ধানুগা চারটি ভাগে বিভক্ত : দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। দাস্য ও সখ্য রতি স্থায়িভাবযুক্ত এবং এই স্থায়িভাবের যোগে রতি রসে পরিণত হয়। দাস্য সকল ভক্তিশাস্ত্রেই অভিধেয়, কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব কেবল ব্রজলীলারই বিশেষত্ব। এদের মধ্যে মধুর ভাব বা কান্তাপ্রেমভক্তি সাধ্য শিরোমণি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত অনুসারে :

ক. শুদ্ধভক্তি হতে হয় প্রেমের উৎপন্ন ।
অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম ।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয় ॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥[২] [পৃষ্ঠা-৩৪৮-৪৯]

খ. কর্ম জপ যোগজ্ঞান বিধিভক্তি তপধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগ মার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তার কৃষ্ণ মাধুর্য সুলভ।[৩]

রাগানুগা ভক্তির অনুকম্পায় যে আনন্দ আস্বাদন হয় তা অপার্থিব এবং এই অপার্থিব ভক্তিরস গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২১১-২২৩
২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৩৪৮-৩৪৯

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৯১-৩৯২

রাগাত্মিকা ভক্তি

রাগানুগা ভক্তির বিকাশ ঘটেছে রাগাত্মিকা ভক্তিকে কেন্দ্র করে। রাগাত্মিকা ভক্তির উপযুক্ত অনুশীলন করেছিলেন বৃন্দাবনবাসী। রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে রাগাত্মিকা ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

> ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ
> পরমাবিষ্ঠতা ভবেৎ।
> তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তি
> সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥
>
> যা আকাঙ্ক্ষার ধন এবং তার জন্য যে গভীর তৃষ্ণা, তাতে যে নিবিড় আবেশ – তাকেই রাগ বলে। এই রাগ বা রতি যে ভক্তিতে প্রবলভাবে থাকে, তাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে অভিহিত করা হয়।[১]

ব্রজবাসীগণ এই ভক্তির অনন্য পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। আরাধ্য চিরকালই অভিলষিত; সুতরাং অভিলষিত বস্তুতে যে গভীর তৃষ্ণা, যে অনুরাগ তাই রাগের প্রধান লক্ষণ। আবিষ্টতা রাগের তটস্থ লক্ষণ এবং তা রতির অন্যতম বোধক। এই রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা। চৈতন্যদেব জ্ঞান ও কর্মের উপরে ভক্তিকে স্থান দিয়েছিলেন। তবে অনুরাগ জ্ঞান-কর্ম-মিশ্র এবং লৌকিক কামনা বাসনা অথবা আধ্যাত্মিক অন্য কোনো বিষয় এতে যুক্তহলে তা ভক্তির উত্তম লক্ষণ বলে বৈষ্ণব ধর্মে মান্যতা পায়নি। শুদ্ধচিত্ত মানুষ দিব্যসত্তার কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পরমাত্মা-সম্বন্ধে জ্ঞানের সম্যক অবধারণ লাভ করে। অর্থাৎ, পরমসত্তার বিভুত্ব, মহত্ত্ব, অন্তর্যামী-স্বরূপ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান ভক্তিতে এসে মিশে যায় তা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। কিন্তু পরমসত্তাকে জানা ও ভালোবাসা এক বিষয় নয়। শুধু জানার মধ্যে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকে, কিন্তু জানার চেয়েও আপন করে জানার মহত্ত্ব অনেক বেশি। সুতরাং, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শেষ কথা নয়; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি থেকেই প্রেমভক্তিতে যেতে হয়। কিন্তু তার পথ ঐশ্বর্য-জ্ঞান বিনির্মুক্ত এক অপার্থিব প্রেমের পথ। এই ভক্তি শুদ্ধাভক্তি। শুদ্ধাভক্তির পথ বেয়েই প্রেমভক্তির দ্বারে পৌঁছানো যায়। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তত্ত্বানুসন্ধান করে কিন্তু জ্ঞানশূন্যা ভক্তি লীলারসকে আস্বাদনের নিমিত্তে চিত্তকে নিমাজিত রাখে। একদিকে মুক্তি অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির স্বরূপ অন্যদিকে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি আনে নির্মল প্রেম। সুতরাং ভক্তির সারাৎসার মুক্তিতে নয় প্রেমে। রূপ গোস্বামীর ভাষায় :

> শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ সেবানির্বৃতচেতসাস্ ॥
> এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ।
> অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম সেবায় চিত্ত যাদের বিষণ্ন, মোক্ষে তাদের কোনো স্পৃহা থাকে না।[২]

শ্রীমদ্ভাগবত-এর তৃতীয় স্কন্ধেও উপর্যুক্ত রূপের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। আত্যন্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা ভক্ত কোনোভাবেই পরমসত্তার সেবা বর্জন করে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ইত্যাদি কোনো মুক্তিই

১. রূপ গোস্বামী, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, বহরমপুর, ১৯৩৩, পৃষ্ঠা-৪৮

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩

গ্রহণ করেনা। সুতরাং, জ্ঞানের সাথে ভক্তির একটি আপাত বিরোধ রয়েছে। এখানে একে অপরের দ্বারা অধমর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জীব যেখানে অভিন্নরূপে দেখা দেয় সেখানে ভক্তি উদ্ভাসিত হয় না। সুতরাং, শুদ্ধাভক্তির অনুশীলনেই প্রেমভক্তির উৎপত্তি হয়। প্রেমভক্তি পরিচ্ছন্ন কৃষ্ণরতি বা প্রেমে পর্যবসিত হয়ে ওঠে। রতি গাঢ় না হলে প্রেম পদবাচ্য হয়ে ওঠে না। প্রেমভক্তির প্রথম তরঙ্গ শান্তরস। উল্লেখ্য, প্রেমভক্তির পূর্বে ভক্তির নানাবিধ যে রূপের বিকার বা বিকাশ তা ভক্তিভাবমাত্র এবং রসের সূত্রপাত এখান থেকেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রতি ও প্রেমের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আবার কাম ও প্রেমের মধ্যেও রয়েছে সুস্পষ্ট ব্যবধান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানাচ্ছেন :

কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা – তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা – ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য – নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য – হয় প্রেম মহাবল ॥ ...
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥[১]

ভক্তির ক্ষেত্রে প্রেমভক্তি প্রকৃত অর্থেই অত্যন্ত দুর্লভ বিষয়। চিত্তসুখ বিসর্জন দিয়ে, আত্মকেন্দ্রিকতার অতি সংকীর্ণ বিন্দু থেকে চিত্তরাগ অর্পিত হতে থাকে পরমসত্তার সন্নিধানের দিকে। শান্তপ্রেমভক্তির বাইরে এসে আরও এক নতুন অনুভূতির জন্ম হয় তাহলো, পরমসত্তা শুধু মহিমাময়ই নয়, তিনি তো প্রভুও। তখনই শুদ্ধ চিত্তে যে অভিমানের জন্ম হয় অর্থাৎ কিঙ্করবোধই নতুন এক ভক্তিপথের জন্ম দেয়– দাস্যপ্রেমভক্তি। দাস্যপ্রেম অনুসৃত হয়ে ওঠে সখ্যে, বাৎসল্যে ও মাধুর্যে। এখানে মূল সম্পর্কের হেতু ‘সেবা’। দাস্যপ্রেমের অনন্ত মহিমা স্বয়ং চৈতন্যদেবও গুরুত্বের সাথে কীর্তন করেছেন :

অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান ॥
তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করো তোমার সেবন ॥[২]

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৪২-৪৩

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬২১

এরপরেই আসে সখ্যপ্রেমভক্তির প্রসঙ্গ। সখ্যপ্রেমভক্তি স্থাপিত সমতার ওপর। সখ্যপ্রেমভক্তি উৎকর্ষ লাভ করে ক্রমশ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগে পর্যবসিত হয়ে ওঠে। সখ্যপ্রেমভক্তির পরে বাৎসল্যপ্রেমভক্তি। রসশাস্ত্রে স্নেহ রতিবিশেষ। অর্থাৎ বৎসলের ভাবই বাৎসল্য। বৎসল সম্ভ্রমশূন্য রতিভাবযুক্ত। বাৎসল্যপ্রেমভক্তির মূল আধিক্য মমতায়। বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণের গুরুজনেরা এই রসের আলম্বন। এই ভক্তিমার্গের উৎকর্ষ প্রেমস্নেহাদি থেকে অনুরাগ পর্যন্ত। সর্বশেষ মধুর প্রেমভক্তি যাকে শৃঙ্গাররস বা আদিরস নামে অবিহিত করা হয়ে থাকে। লক্ষণীয়, আদি শব্দের মাধ্যমেই ভক্তির ক্ষেত্রে বা রসের ক্ষেত্রে প্রাথম্যকে জ্ঞাপন করায়। তবে গৌড়ীয় দর্শন মতে শৃঙ্গার আদিরস নয়, অন্ত্যরস। কারণ সর্বরসের আস্বাদ এসে মধুর রতিতে পর্যবসিত হয়। এই মধুর ভক্তিমার্গের বিষয় কৃষ্ণ ও তাঁর পর্যায়ের প্রেয়সীবর্গ। এখানে আত্মার সাথে আত্মার, প্রাণের সাথে প্রাণের এক গভীর মিলন-তাৎপর্য, মধুরভক্তিরসে শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের সমস্ত গুণ এবং প্রেমের একাত্মতা-বন্ধনকে প্রকাশ করে ভাব ও মহাভাব পর্যায়ের। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ-বিষয়ে জানাচ্ছেন :

> রুচি হৈতে ভক্তে হয় আসক্তি প্রচুর।
> আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ প্রীত্যঙ্কুর ॥
> সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
> সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দধাম ॥[১]

মধুররতিতে মহাভাব-পর্যায়একমাত্র রাধার পূর্ণ অধিকার। রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*-তে উপযুক্ত ভক্তিভাবের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন– ক্ষান্তি, অব্যর্থ-কালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, সমুৎকণ্ঠা ইত্যাদি বিভাগে। আধারভেদে প্রেমেরও তারতম্য ঘটে। যেমনঃ সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। সমর্থারতিই ব্রজগোপীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রূপ গোস্বামী *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*-গ্রন্থে জানাচ্ছেন :

> সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি মণির মত, চিন্তামণির মত ও কৌস্তুভমণির মত নাতিসুলভ, সুদুর্লভ ও অনন্যলভ্য হয়ে যথাক্রমে কুব্জাদিতে, মহিষীগণে ও ব্রজগোপীতে থাকে।[২](স্থায়ীভাব প্রকরণের ৫২-৫৮ শ্লোকের ভাবানুবাদ)।

উপর্যুক্ত রতিতে স্বীয় সুখের অভিলাষ থাকে না; মূল অভীপ্সা হলো কৃষ্ণসুখ।

গোপীপ্রেম পরকীয়া এবং এর স্থিতি কৃষ্ণের স্বভাবলীলায়। মূল আশ্রয় প্রেম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন মতে উল্লিখিত তত্ত্বই সর্ব সাধনসিদ্ধ বিষয়। লৌকিক বিষয় দিয়ে মধুর রসের নির্যাস অনুভব করা যায় না। ঔপপত্য এখানে কোনোভাবেই আরোপিত করা যায় না। পরকীয়া লীলারস উৎকণ্ঠা পরিপোষণের জন্য নয়। এই প্রেমভক্তির রস অলৌকিক। একজন গবেষকের এ-বিষয়ে মন্তব্য :

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতা*মৃত, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৪২-৪৩

২. রূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৭। পৃষ্ঠা-২১১

> শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বর, আত্মারাম, শৃঙ্গার রস তাতে চরম উৎকর্ষ পেয়েছে এবং তিনি সত্যসংকল্প। তাঁরই অনাদি সংকল্পনাবশত অ-পরভুক্ত তুল্য-রূপ-গুণ-যুক্তা গোপীদের আর্বিভাবও অনাদি। সুতরাং অনাদি পরকীয়া লীলায় শ্রীকৃষ্ণের কিছুমাত্র আত্মারামত্ব-হানি নেই, বরঞ্চ এতেই শৃঙ্গার রস পরমা পরিপুষ্টি লাভ করেছে।[১]

মধুর ভক্তিরসে প্রেমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোপীপ্রেম এবং এই প্রেমের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রাধাপ্রেম। এজন্য রাগাত্মিকা ভক্তিতত্ত্বে রাধাপ্রেমের গাঢ়ত্ব ও ব্যাপ্তির জন্য রাধাকে 'প্রেমস্বরূপিনী' বলা হয়ে থাকে। কৃষ্ণ এখানে প্রকৃতি, রাধা বিকৃতি। এই বিকৃতি প্রেমের বা প্রণয়ের নিমিত্তে।

ভক্ত মূলত জীবশক্তির অন্তর্গত বিষয়। এই জীবশক্তির অনন্য পর্যায় হলো তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তি মধ্যে যার অবস্থান। অর্থাৎ, তটস্থা শক্তির একদিকে মৃন্ময়ীরূপী বহিরঙ্গা অন্যদিকে চিন্ময়ীরূপী অন্তরঙ্গা। ভক্তের হৃদয় উদ্ভাসিত হয় বাইরে মৃন্ময়রূপ, ভেতরে অনন্ত চিন্ময়ী আনন্দ। মৃন্ময়ের আবেশে আসে সঞ্চারী, চিন্ময়ের দিব্য আলোয় রসাবেশ। বৈষ্ণব দর্শনেরও সিদ্ধান্ত এই।

আমাদের মনে হয়, মানবীয় প্রেম হৃদয়ের সংরাগ ও কামনার একান্ত সামগ্রী যার উৎপত্তিস্থল কামনার প্রাণকেন্দ্রে। ফলে, মানবিক প্রাণ প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ এবং তার স্বীয় স্বরূপের মধ্যেই ঘটে সংকোচনশীল পর্যায়। কিন্তু দিব্যপ্রেম মানবীয় কামনাজাত ভাবলীলার মহতী অনুবৃত্তিমাত্র নয়; এ এক অনন্য স্বতন্ত্র অপার্থিব চেতনা, যার প্রকৃতি, গতি, প্রগতি, উপাদান ও আত্মপ্রসাদলাভ – সমস্তই বিভিন্ন। এজন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ভক্তির এত ঔজ্জ্বল্য, এত গুরুত্ব।

১. ড. উমা রায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসের অলৌকিকত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-১৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বৈষ্ণব পদাবলি বিকাশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্বের ভূমিকা
(চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব পদাবলি বিকাশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্বের ভূমিকা (চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগ)

বৈষ্ণব কাব্যের অন্তর্মূলে প্রবাহিত একদিকে রসতত্ত্ব, অন্যদিকে দর্শন। কাব্যের সফলতা জীবনের গভীরতম সত্তার সুষমাময় বাণীর প্রতিষ্ঠাতে। বাণীর প্রতিষ্ঠায় একদিকে থাকে জীবনাভিজ্ঞতার সম্পাত অন্যদিকে কাব্যরসের সুষমা। অনুভূত সত্যের বহিঃপ্রকাশ এবং আত্মদর্শন প্রকাশ পায় স্বমহিমায়। দর্শনের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, অন্যান্য ক্ষেত্রে আলঙ্কারিকেরা যে রস উপস্থাপন করেছেন তা 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' অর্থাৎ ব্রহ্মের অনুধাবন-সদৃশ, কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলঙ্কারিকদের রস 'ব্রহ্মাস্বাদ স্বয়ং' অর্থাৎ ব্রহ্ম আস্বাদনতুল্য অনুভব। বস্তুত বৈষ্ণব সম্পর্কিত কাব্য ও দর্শন সমান্তরাল পথে নয়, তাদের মিলন ঘটেছে রসতত্ত্বের সম্মোহনী বিন্দুতে। সুতরাং, বৈষ্ণব রসতত্ত্ব যেমন বৈষ্ণব কাব্যের প্রাণ, তেমনি বৈষ্ণব দর্শন সেই প্রাণের অন্তর্লীন গতি-প্রবাহ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরমতত্ত্ব কৃষ্ণতত্ত্ব। এক্ষেত্রে কৃষ্ণের প্রতি প্রয়োজন তাঁর প্রেমসুখ নির্ধারণ এবং অভিধেয় বিষয় তাঁর লীলাস্মরণ-রূপ ভজন। বৈষ্ণব কাব্যের বিষয়ভাবও অনুরূপ। বৈষ্ণব দর্শনের ক্ষেত্রে রসতত্ত্বকে তত্ত্ববিশেষরূপে এবং বৈষ্ণব কাব্যের তত্ত্ববস্তুকে রস হিসেবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ উপস্থাপন করেছেন। আপাত বিচারে রসতত্ত্বই বৈষ্ণব কাব্য-দর্শনের প্রধান বিষয় বলে আমাদের অভিমত। সেক্ষেত্রে বৈষ্ণব রসের স্বরূপ-অনুধাবন স্পষ্ট করা গেলে বৈষ্ণব কাব্যও দর্শন সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট সারণি প্রস্তুত করা বা প্রকাশ করা সহজতর হয়। কারণ, বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদের সাথে অন্যদের যে পার্থক্য তা মানস-দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। এই পার্থক্যের ফলে বৈষ্ণব Rhythm-কে এক স্বতন্ত্র-রূপে স্থাপন করা যায়। এই স্বতন্ত্র রূপের অভিব্যক্তি বৈষ্ণব কাব্যের অন্তঃস্ফূর্তির প্রবহমান ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করে। স্বতন্ত্র আর একটি বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব পদাবলিতে দৃশ্যমান, তাহলো সমতানতা বা Harmony। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পদকার তাঁদের পদসম্ভারকে সৃজন করেছেন। তাতে যুগ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ থাকলেও সমস্তপদের মূলসুর একটি বিশেষ সমসূত্রে নিবন্ধিত হয়েছে। এই সমসূত্রায়ণ-পদ্ধতি দাঁড়িয়ে আছে বৈষ্ণব দর্শনের ওপর। যার, সূত্রপাত চৈতন্যদেবের সময়ে এবং পূর্ণতা পেয়েছে চৈতন্যোত্তর যুগে।

চৈতন্য-আদর্শ মূলত ভক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভক্তিবাদ রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক, ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ রাধাকৃষ্ণের পরস্পর লোকত্তর অনুরাগকে তাঁদের নিবন্ধাবলিতে রতিভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে রাধাপ্রেমের পরমতত্ত্ব কৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমই প্রেমরসের মূল উৎস এবং এই প্রেমরস দিব্য বা অপ্রাকৃত। কিন্তু অপ্রাকৃত হলেও তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল বৃন্দাবনে, কৃষ্ণলীলায়। দার্শনিক পরিভাষায় যার নাম প্রেম-বিলাস-বিবর্ত। চৈতন্যদেব তাঁর জীবনে যে ঐতিহ্যমণ্ডিত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন তার পেছনে ছিল সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক পটভূমি।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলি, বিল্বমঙ্গলের *কৃষ্ণকর্ণামৃত*, জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*, রায় রামানন্দের *জগন্নাথবল্লভ* প্রভৃতি গ্রন্থের পঠন-পাঠনে তাঁর হৃদয়ে সহজাত ভক্তিভাব অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে উঠেছিল সন্দেহাতীতভাবে। চৈতন্যের আবির্ভাবের বহুপূর্ব হতেই বাংলাদেশে কৃষ্ণভক্তির স্রোত অবিচ্ছন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে বাঙালির মানসলোককে অভিষিক্ত করেছিল। চৈতন্য-অনুধাবনে রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও তাঁদের প্রেম এক ভিন্নমাত্রায় পর্যবসিত হয়। রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পর রতির বিষয়ে প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের সাহিত্যের ভিন্ন স্বভাব এবং রতিভাব উপস্থাপনেও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। তবে, চৈতন্যোত্তর যুগের যে বৈষ্ণব পদাবলি,তার বিষয়ভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ-বিষয়ে একজন গবেষকের মন্তব্য :

> বৈষ্ণব সাধনায় ভগবদ্ভক্তির নাম প্রেম। প্রেম ও কৃষ্ণ অভিন্ন। ভগবানকে মানুষের রূপে ভজনা করতে হয় এবং তাতে মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির – স্নেহ প্রেম সখ্য বাৎসল্য ও কান্তাভাবের সহজ পথে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করে – শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের পথেই ঈশ্বরের আরাধনা করতে হয়। মানবিক সহজ হৃদয়বৃত্তি – ঐ সব ভাবগুলোকেই একটা মহাভাবে পরিণত করতে হয়। ঐ যে প্রেম – যা নরনারীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ – তাই ভগবানে সমর্পণ করতে হয়; সেজন্য বৈষ্ণব তার ভাবজীবনে একটি যুগল-মূর্তির ধ্যান করবে, তার একটি কৃষ্ণরূপী ভগবান, অপরটি সেই ভগবানের – সেই মহাপ্রেম পাত্রের, পরিপূর্ণ প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার। শ্রীরাধার সেই প্রেমই বৈষ্ণব নরনারীর সাধন আরাধনার বস্তু। [১]

উপর্যুক্ত মন্তব্যের সারবত্তা বৈষ্ণব পদাবলিতে সুস্পষ্ট। বস্তুত বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য অর্থাৎ রসের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাযার যাত্রা শুরু হয়েছিল চৈতন্য যুগ থেকে। চৈতন্য ধর্মের যে তত্ত্বদর্শন তা প্রাক্-চৈতন্য যুগ থেকে সুস্পষ্ট পৃথক এবং বৈষ্ণব পদাবলিতেও তা দৃশ্যমান।

চৈতন্যযুগের পদাবলির প্রধান বৈশিষ্ট্য

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণব সমাজে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের ধারাটি ছিল চেতনাগত। নানাবিধ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও তত্ত্ব-সন্নিবেশনের ফলে ভাবনার জগৎ, সাধন প্রণালি এবং বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়ভাবে এক নতুন আবহের সৃষ্টি হয়। যেমন :

ক. সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে আলোচনা শুরু হয়ে উপাসনার লক্ষ্যবস্তুতে বৈষ্ণব মতের নানা বিষয় ও বিচিত্র লীলানুষঙ্গ এসেযুক্ত হয় এবং পদাবলিতে নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাদে তা রূপায়িত হতে থাকে।

খ. বৈষ্ণব-মনন ও চিন্তার প্রবহমানতায় সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কিত বিবর্তিত ধারণা যুক্ত হয়। পরম পুরুষ নিঃসঙ্গতামুক্তি ও আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্ত নিজ অংশভূত নারীস্বরূপা সৃষ্টি করে যুগল হলেন। এই পরম পুরুষ ও প্রকৃতিই মায়াব্রহ্ম ও বিষ্ণুশ্রী। অর্থাৎ, মিলনে যে সৃষ্টির উদ্ভব তার

অন্তর্মূলে রয়েছে শাশ্বত প্রেম। সুতরাং, সৃষ্টির এই প্রেমজ ধারায়, স্রষ্টা ও সৃষ্টি বস্তুত আনন্দ-সহচর।

১. ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ*, সোনার তরী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১২৮

গ. অনুরাগই প্রেমের অন্যতম আশ্রয়স্থল। প্রেমের সার্থক উপলব্ধি বিরহে। চরম সার্থকতা নিরূপিত হয় মিলনে। এই মিলনসুখ, বিরহবোধ চৈতন্যযুগের পদাবলির অন্যতম বিষয়ভাব।

ঘ. চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলিতে যুক্ত হলো বাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে নবদ্বীপে অবতীর্ণ গৌরাঙ্গ ও তাঁর লীলা, যা বর্ণিত হলো বৃন্দাবন লীলার আদলে। যুগল রূপ ও অভেদ রূপের অনুরাগরঞ্জিত উপস্থাপন হলো নতুন দার্শনিক আবহে।

ঙ. প্রাক্-চৈতন্য যুগের রাধাকৃষ্ণের স্বরূপে তত্ত্বগত বিবর্তন ঘটলো চৈতন্যযুগের পদাবলিতে। প্রাক্-পর্বে যে জীবাত্মা-পরমাত্মার দ্যোতনা তা আর থাকলো না। রাধা হলেন হ্লাদিনী শক্তি এবং জীবব্রহ্মের তটস্থা শক্তি, আর কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়। তাঁদের মিলন–আনন্দময়। আনন্দের স্বরূপ রাধা কৃষ্ণের নিত্যশক্তি। ভাব-মহাভাবের এক অপূর্ব মিলনতত্ত্ব এ-যুগের পদাবলির অন্যতম বিষয়। চৈতন্য যুগের পদাকরগণ উপর্যুক্ত তত্ত্বেরই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করেছেন।

চ. চৈতন্য যুগের পদাবলিতে উঠে এসেছে পঞ্চম পুরুষার্থরূপে প্রেমের বিষয়বস্তু। এই প্রেম সবকিছুর উপরে। লীলার আস্বাদনে প্রেমের অঙ্কুরোদগম হয় এবং অনুরাগমিশ্রিত সাধন-ভজনে তার উপলব্ধি ঘটে।

ছ. মঞ্জরীর ভাব সাধনতত্ত্ব এ-যুগের পদাবলির অন্যতম বিষয়। অর্থাৎ, বৃন্দাবনের কোনো সখীর অনুগত হয়ে 'যুগল ভজন' করতে হয় এবং তা নারীভাব নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে।

জ. এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে ভগবানকে ঈশ্বররূপে নয়, অন্তরঙ্গজন ভেবেছেন চৈতন্য-যুগের বৈষ্ণব কবিরা। তাঁদের পদে উঠে এসেছে মিলনের তীব্র পিপাসা এবং বিরহের তীব্র রূপ, আত্মার করুণ ক্রন্দন ধ্বনি। যার জন্য এই ক্রন্দন, এই তীব্র বিরহ, তিনি ঐশ্বর্যে নয়; চির মাধুর্যে পূর্ণ। অচিন্ত্য মাধুর্যের চিন্ময় সত্তাই আরাধ্য – কারণ তিনি নিজজন।

ঝ. চৈতন্যযুগের পদাবলির এক অনন্য দিকহলো – ভগবান স্বয়ং বিশুদ্ধ প্রীতিলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুল। ভক্ত-ভগবান উভয়ই ক্রন্দনরত। বিরহের তাপানলে দগ্ধ ভক্ত ও ভগবানের এক নতুন রূপ চিত্রিত হলো। চির বিরহীর বিরহবোধের এক অপূর্ব ধ্বনির পরিস্ফূটনের রূপ

দেখা যায়–তা শুদ্ধ প্রেমের ধ্বনি, শুদ্ধ প্রেমের রূপ। এই অপূর্ব মাধুর্যরস জ্ঞানতত্ত্ব দিয়ে অনুধাবন যোগ্য নয়। শুধু নির্মম প্রেম দিয়েই সে প্রেম অনুভব করা যায়।

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম এবং তাঁর যুগের পদাবলি বাংলাদেশের একান্ত হৃদয়ের বস্তু। মানবরূপে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে চিত্ররূপ চৈতন্য-জীবনে এবং রসশাস্ত্র অনুমোদিত পদাবলিতে প্রকাশ পেয়েছে তা ভারতবর্ষের অন্যান্য মতাদর্শ থেকে স্বতন্ত্র। কারণ চৈতন্য-প্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব এবং শুদ্ধ ভক্তি-প্রেম ও তার সাধনা ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব অনুভবরঞ্জিত বিষয়। পদাবলির ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত বিষয়ভাবই ফুটে উঠেছে। চৈতন্যদেব পূর্ববর্তী কবিদের পদাবলির রসাস্বাদন করে নির্মল প্রেম ও আনন্দলাভ করতেন, কারণ সেখানে মানবপ্রেমই প্রাধান্য পেয়েছিল। জয়দেব কোমলকান্ত পদাবলিতে যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমচিত্র অঙ্কন করেছেন যেখানে তাঁদের দেবভাব নেই, লৌকিক প্রেমাবেশেই তাঁদের স্থিতি। প্রেমভক্তি ও বিলাস রসপূর্ণ সংমিশ্রণে জয়দেবের পদাবলি রসপূর্ণ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাপতির রাধার যে আকুতি যে বিহ্বলতা তা মানবীয় প্রেম-আবেদনেরই বহিঃপ্রকাশ। চণ্ডীদাসও মানবীয় আবেগের চরম মূহুর্তের ছবি এঁকেছেন। ধর্মাচরণে মানবীয় সহজভাবের সাধনা চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সহজ মানবীয় প্রেমসাধনায় চৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে নবপ্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। সেই সঞ্চারের পথে একে একে আসলো প্রেম, ভক্তি, সহজপথের সাধনপদ্ধতি, মানুষের মহত্ত্ব, রসতত্ত্ব, জীবন এবং তার বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ। চৈতন্যদেবের প্রেমস্বরূপের বহিঃপ্রকাশ সমৃদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং তাঁদের ভক্তিমনের প্রেমার্ঘ্য নিবেদিত পদাবলি; যা একদিকে প্রেমের স্বরূপ ও চৈতন্য-দর্শন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির প্রধান বৈশিষ্ট্য

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির অনন্য বিষয় এর আধ্যাত্মিক চেতনা। এই চেতনা চৈতন্য যুগ থেকে শুরু হলেও চৈতন্যোত্তর যুগে এসে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। চৈতন্যের তৃপ্তি-উপাদান উৎপাদন ও তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে এ-সময়ে। চৈতন্য যুগের যে বিশিষ্ট প্রেমদর্শনাশ্রিত ধর্মবোধ তার সুপরিকল্পিত রূপচিত্র গোস্বামীগণ দ্বারা নির্ধারিত হলো এবং উত্তর যুগের পদাবলিতে সেই সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতিফলন এবং ব্যাকরণের বিধি রক্ষা করে রসের যথোপযুক্ত নিয়ম মেনে পদ রচিত হলো। কীর্তনে আসলো নতুন আবহ। যেহেতু সাধনার বা ভজনের অন্যতম অনুষঙ্গ কীর্তন, তাই কৃষ্ণভক্তির সর্বসারত্ব যাতে কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য বিশুদ্ধ ধারায় পদ রচনা ও কীর্তন শুরু হয়। অর্থাৎ, গোস্বামীগণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলি ও তার কীর্তনে। যথা :

ক. বৈষ্ণব ধারণায় রাধাকৃষ্ণের লীলা নিঃসন্দেহে একটি অপ্রাকৃত প্রকটন এবং এই লীলা সর্বার্থপ্রেম-বিলাস। সুতরাং, সাধনার হেতু কৃষ্ণসুখলালসার নিবৃত্তি।

খ. চৈতন্যযুগে পঞ্চতত্ত্ব ও চৈতন্যদেব অবতারে পর্যবসিত হয়েছেন; চৈতন্যোত্তর যুগে ষড় গোস্বামীগণ কর্তৃক চৈতন্যলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা একই সমান্তরালে উপস্থাপিত হয়েছে এবং এ-সময়ের পদাবলির অন্যতম বিষয় হিসেবে তা পরিগণিত হয়েছে।

গ. চৈতন্যদেবকে মহাভাবের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করে পদসাহিত্য রসোপযুক্ত পদ রচিত হয়েছে। চৈতন্যের তপঃসিদ্ধ মধুর, কোমল, সহজ ও অতিসহজ ভাবের পরিপূর্ণ রসচিত্র পদকারেরাউপস্থাপন করেছেন।

ঘ. ভারতবর্ষের যে ত্রিবর্গ সাধনধারা প্রচলিত ছিল (কাম, অর্থ, ধর্ম), তা পরবর্তী সময়ে মোক্ষ বা কৈবল্য লক্ষ্যবস্তুতে এসে দাঁড়ায়। ত্রিবর্গ চতুঃবর্গে বিভাজিত হয়। চৈতন্যদেব এসে পূর্ববর্তী ধারার সাথে নতুন এক বৈপ্লবিক সামূহিক চৈতন্যের প্রতিমান প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলো–মুক্তি তিরস্কৃত বিষয়। মুক্তিকামনা কৈতবযুক্ত, স্বার্থসিদ্ধির নিন্দিত পথ। সুতরাং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত হলো, শুদ্ধাভক্তিজাত কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ, যা মুক্তি থেকে যোজন-যোজন দূরে। ভক্তিসুখের স্থিতি একমাত্র প্রেমে। প্রেমলাভের মধ্য দিয়েই মহাভাবের স্বরূপ হৃদয়স্থিত করা যায়। এই পুরুষার্থ–প্রেমভক্তির মূল, যা দাঁড়িয়ে আছে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে। উপর্যুক্ত বিষয় চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির অন্যতম তাত্ত্বিক দিক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

ঙ. বৈষ্ণব অভিলষিত পুরুষার্থ হলো প্রেমভক্তি যা অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তির ওপর অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি, মায়া শক্তি এবং জীবশক্তির ওপর দণ্ডায়মান। কৃষ্ণের লীলাবিলাস তিনশক্তির পরিনামের দ্বারা সংগঠিত। কৃষ্ণ এজন্য সচ্চিদানন্দময়। সৎ – কৃষ্ণের সত্তার প্রকাশ। চিৎ – কৃষ্ণের জ্ঞানাত্মক প্রকাশ; আনন্দ–কৃষ্ণের আনন্দদায়ক বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। হ্লাদিনী হচ্ছে আনন্দদায়ক বৃত্তির উৎস। হ্লাদিনীশক্তির প্রসারে ভক্ত-ভক্তি, নাম-নামী নিয়ে লীলাবিলাস সংগঠিত হয় ।উত্তর যুগের পদাবলিরবিষয়ভাব উপর্যুক্ত ভাব-সম্বলিত।

চ. আনন্দ হলো জীবের পরমারাধ্য বিষয়। এই আনন্দের উপলক্ষ্য হলো প্রেমের রস নির্যাস আস্বাদন এবং বৃন্দাবনের নির্মল রসের অনুসন্ধান। এই আস্বাদনের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির পথ পরিত্যাগ করে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়। এই-তত্ত্বে গৌরাঙ্গলীলা ও কৃষ্ণলীলার সারবস্তুকে এক করে পদাবলি সাহিত্যে দেখানো হয়েছে।

ছ. চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলিতে পরমতত্ত্ব হিসেবে ভগবান আখ্যা ও আখ্যাত হয়েছেন। বিষয়বস্তুর কেন্দ্রমূলে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে প্রেমভক্তিকে এবং তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে – রসনির্যাস আস্বাদনে তিনিই স্বরূপে ভক্ত ও ভক্তিতে অধিষ্ঠান করছেন।

জ. পদকারবৃন্দ চৈতন্যলীলাকে বৃন্দাবনলীলার অনুকরণে প্রকাশ করেছেন এবং আরাধ্য শিরোমণি হিসেবে রাধাভাবে ভাবিত রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপী চৈতন্যদেবকেই সাধনার লক্ষ্যবস্তুতে

রেখেছেন। ফলেএ-যুগের পদাবলিতে অবতার-তত্ত্ব গুরুত্বের সাথে বিবেচিত ও উপস্থাপিত হয়েছে।

ঝ. বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ অবতারাদির বিভাগ ও তার স্বরূপ নির্ণয়ে যে পথ দেখিয়েছেন, এ-যুগের পদাবলির তত্ত্ব প্রকাশে তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঞ. চিন্তাশীল বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত হলো– চৈতন্য বিভুতত্ত্ব, জীব অনুতত্ত্ব। এই বিভু-অণুর বিষয়ই চৈতন্যোত্তর পদাবলির কেন্দ্রীভূত বিষয়।

ট. উত্তর যুগের পদকারগণ এক বিশেষ রসের অনুসন্ধান করেছেন, তাহলো–কৃষ্ণের সমুদয় লীলা অহেতুক এবং মানুষের পক্ষে এর হেতু নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু অক্ষম হলেও প্রেমরস নির্যাস বলতে যে কান্তাভাবে মাধুর্য রসের বৈচিত্র্যপূর্ণ আস্বাদন, তা সমস্ত অক্ষমতাকে ঢেকে দিয়ে এক নির্মল আনন্দ-দান করে।

ঠ. ব্রজবাসীদের অন্তর কৃষ্ণপ্রেমময়। এই প্রেম সর্বোচ্চ ত্যাগের দৃষ্টান্ত এবং চিত্তগত শুদ্ধ সত্ত্বেও এ-একমহিমান্বিত রূপ। এই তত্ত্বের প্রয়োগ অভিসার, আত্মনিবেদন, বিরহ, ভাবসম্মিলন চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিরা নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন।

রাধাকৃষ্ণ অধ্যাত্মচরিত্র হলেও বৈষ্ণব কবির দৃষ্টিতে তাঁরা অপার্থিব নন। মানবজীবনের সীমানার মধ্যে তাঁদের গতায়াত। এইপ্রেম পার্থিব কোষে গভীর হয়ে অগ্নিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে প্রশ্নযুক্ত এবং প্রশ্নাতীত হয়ে। এই প্রেমের মহৎ আহ্বান – মহৎ সত্যের ভাস্বরতাকে চাক্ষুষ করানো। এর মধ্যেই বৈষ্ণব দার্শনিকগণ তত্ত্বের সংযোগ ঘটিয়েছেন। সুতরাং উত্তরকালের বৈষ্ণব পদ আস্বাদনের জন্য তত্ত্বদৃষ্টিময় অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ-যুগের পদাবলি ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চেতনার আচ্ছাদনে মোড়ানো থাকলেও তার কাব্যগুণ ব্যহত হয়নি। পদাবলির অভ্যন্তরে বৈষ্ণব কবির যে আত্মকেন্দ্রিক ভাবতন্ময়তার ঐকান্তিক প্রকাশ ঘটেছে তা তাঁর অন্তরের Moment’s creation-এর স্তরে বিচিত্র অনুভবরঞ্জিত উপলব্ধির অভিব্যক্ত রূপ। আধ্যাত্মিকতার আবরণে মোড়ানো বৈষ্ণব পদে প্রাকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি হিসেবে মানবীয় প্রেমের অনুরাগ-অভিমান-বিরহ-মিলনের জয়গানই যেন তত্ত্বভেদ করে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি প্রকাশে বৈষ্ণব কবির যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস তা মানবীয় প্রেমরূপ হৃদয়ার্তিরই বহিঃপ্রকাশ। তবে একথা ঠিক যে, চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির বিষয়ভাবের অনুধাবনে বিশুদ্ধ রসদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রত্যেক কাব্যেরই তার নিজস্ব পরিমণ্ডল রয়েছে। সুতরাং, বৈষ্ণব পদকারগণ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবন ও তাঁদের আরাধ্যকে দেখেছেন, কাব্যসৃষ্টির মূলে যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা, রসবিস্তারে যে তত্ত্ব, তা জানা থাকলে পদাবলির রসাস্বাদন আনন্দময় হয়ে ওঠে এবং আস্বাদনে এক প্রেমময় রসতরঙ্গেরও সৃষ্টি হয়। পদাবলির রস সীমাবদ্ধনয় – কালোত্তীর্ণ হয়ে যুগে যুগে ভক্তির বন্যায় যেমন ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ভক্তের অন্তর, তেমনি রসপল্লবীর বিস্তারে পাঠক-শ্রোতার অন্তর রসদৃষ্টির সাহায্যে লাভ করেছে এক অপার্থিব অমিয়কাব্যরসসুধা।

বৈষ্ণব পদাবলি ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রসতত্ত্বের ভূমিকা

রসতত্ত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদের মৌলিক অবদান ভক্তির রসত্ব প্রতিষ্ঠা করা। অভিনব গুপ্ত, মন্মটাচার্য, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখ আচার্যগণ দেবাদিবিষয়ক রতি বা ভক্তিকে স্বতন্ত্র রসের মর্যাদা দেননি। সপ্তদশ শতকে জগন্নাথ পণ্ডিতও ভক্তিকে রস হিসেবে অস্বীকার করেছেন, এমনকি বাৎসল্যকেও রসের মর্যাদা দেননি। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মধুসূদন সরস্বতী বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের ভিত্তি ধরে ভক্তির রসত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। পরবর্তী সময়ে কবি কর্ণপুর ভক্তিরস ও প্রেমরসকে প্রতিষ্ঠা দেবার প্রয়াস নিয়েছিলেন এবং প্রেমরসে সর্বরসের অন্তর্ভাব ঘোষণা করেছিলেন। রূপ গোস্বামী *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে প্রেমভক্তিকে সর্বোচ্চ স্থান দিলেন এবং বক্তিরসপঞ্চকের মধ্যে মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকদের মত; বিশেষভাবে যারা ভক্তিকে রস হিসেবে অস্বীকার করেছিলেন, তাদের যুক্তি খণ্ডন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে রসতত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী আলঙ্কারিকেরা স্বরূপযোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা এবং পুরুষযোগ্যতার অভাব দেখিয়ে ভক্তিকে রসের বাইরে রেখেছিলেন, শ্রীজীবগোস্বামী সে সব মত অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করেন এবং ভক্তিরসকে স্থাপন করেন। যা পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব পদাবলির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বস্তুত বৈষ্ণব পদাবলির তত্ত্ব বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—চৈতন্যোত্তর পদাবলিতে এই বিষয়টিই মুখ্য হয়েছে এবং রূপ ও শ্রীজীব গোস্বামীর দার্শনিক তত্ত্বও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিরা এর প্রয়োগকে রূপকের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। ফলে বৈষ্ণবপদের শ্রীবৃদ্ধিতে রসতত্ত্বের প্রয়োগ যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমনি তত্ত্বের সাথে সঙ্গতি রেখে এর দার্শনিক প্রবাহ আস্বাদনে আনন্দের আকর এক থাকলেও এর প্রকার ভিন্ন স্বরে ও সুরে এসে ধরা দেয়। প্রাকচৈতন্যযুগে বৈষ্ণব পদ বা কাব্য উপলব্ধির জন্য তত্ত্বদৃষ্টির তেমন কোনো প্রয়োজন পড়ে না। রাধাকৃষ্ণ অধ্যাত্ম চরিত্র হলেও তাঁরা পদে বা কাব্যে অপার্থিব চরিত্র নন। বস্তুত মানব জীবনেরই যেন এক উজ্জ্বল ছবি গভীরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদে সব পর্যায় না হলেও কোনো কোনো পর্যায়ের (অভিসার, বিরহ, ভাবসম্মিলন, আত্মনিবেদন) পদ আস্বাদনের জন্য তত্ত্বদৃষ্টি, অধ্যাত্মজ্ঞান এবং দার্শনিক প্রবাহধারার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যা চৈতন্যোত্তর যুগে এসে অনেকটা অবধারিত বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-বিকাশে বৈষ্ণব পদাবলিতে বেশ কিছু তাত্ত্বিক বিষয়কে যুক্ত করা হয়েছিল বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য। যেমন:

ক. প্রেমবিলাস বিবর্ত
খ. সম্বন্ধতত্ত্ব
গ. অভিধেয় তত্ত্ব
ঘ. প্রয়োজনতত্ত্ব

উপর্যুক্ত তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে পদাবলি সাহিত্য এক নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যদিও প্রত্যেক কাব্যেরই একটি নিজস্ব ভূমি রয়েছে এবং তার নিজস্ব ভূমিতে দৃষ্টি নির্বন্ধ করে বিচার করা হলে ঐ কাব্যের যথার্থ রসাস্বাদন সহজতর হয়ে ওঠে। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কর্তৃক প্রেমভক্তি রস হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত হলে বৈষ্ণব কাব্যেও সেই রসের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। উত্তর কালের বৈষ্ণব পদাবলি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রেমবিলাস বিবর্ত

চৈতন্যদেবের সাথে রায় রামানন্দের সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনায় 'প্রেমবিলাস বিবর্ত' বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। চৈতন্য রাধাকৃষ্ণের বিলাস মহত্ত্বের কথা জানতে চাইলে রামানন্দ রাধাকৃষ্ণের বিলাসের তাৎপর্যপূর্ণ দিক তুলে ধরলেন:

রায় কহে কৃষ্ণ হয়েন ধীর-ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত ॥
প্রভু কহে 'এহ হয় আগে কহে আর'।
রায় কহে 'ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর' ॥
যেবা প্রেম বিলাস-বিবর্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥[১]

'প্রেমবিলাস' এর অর্থ প্রেমক্রীড়া, 'বিবর্ত' অর্থ পরিণাম বা চরমাবস্থা। তবে 'বিবর্ত' শব্দের নানাবিধ অর্থ রয়েছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'বিবর্ত' শব্দের 'বিপরীত' অর্থ নির্ণয় করেছে।শ্রীজীব গোস্বামী অর্থ করেছেন 'পরিপাক'।[২] বিবর্ত শব্দের সাধারণ একটি অর্থ রয়েছে, তা হলো ভ্রম,, সাধারণ ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় প্রেমক্রীড়ায় রমণ ও রমণী এই উভয়ের পরস্পর ভেদজ্ঞানশুন্যতা অর্থাৎ উভয়ের অভেদভাবে কেবল বিলাসনিমিত্ত তন্ময়তা, বস্তুত এটিই প্রেমক্রীড়ার চরমাবস্থা। কিন্তু উল্লিখিত সাধারণ অর্থের অন্তস্তলে রয়েছে এক গভীর ভাবার্থ, তা হলো– রাধাকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাত্মক প্রেমক্রীড়ায় নানান ভেদ উপস্থাপিত হলেও তা মূলত স্বরূপগত হ্লাদিনীর একান্ত সারবস্তু–ঐকান্তিক প্রেম। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান* মতে:

> প্রেম প্রথমত বহির্বিলাসে স্ত্রী-পুরুষ ভেদভাবে প্রকাশিত হইয়া পুণরায় অন্তর্মুখতায় স্ত্রী পুরুষের পরৈক্য প্রতিপাদক হয়। তখন আদৌ ভিন্নভাবে প্রকাশিত শক্তি ও শক্তিমান আবার অভিন্নভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। প্রেমের যে অবস্থায় এই প্রকার বৈপরীত্য ঘটে সেই অবস্থাই প্রেমবিলাস বিবর্ত।[৩]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির আলোকে আমাদের অভিমত, 'বিবর্ত' শব্দের প্রয়োগত অর্থ হিসেবে শ্রীজীব গোস্বামীর 'পরিপাক' শব্দটি অধিক কার্যকরি অন্তত ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে এবং উপযোগিতা ও সার্থকতার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, প্রেমজনিত বিলাসের পরিপক্কতার চরমোৎকর্ষকেই বোঝায়। এক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের বিলাস বিবর্তের একটি গূঢ়তম রহস্য রয়েছে এবং এতে অব্যক্ত রহস্যের ইঙ্গিতও রয়েছে – যা বোঝা গেলেও ব্যাখ্যার অগোচর। রায় রামানন্দের একটি পদে উপর্যুক্ত বিষয়টি ফুটে উঠেছে:

পহিলাহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।

দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥
এ সখি! সো সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি ॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবান ॥

১.কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১২৯

২. দ্রষ্টব্য: রূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১২২-১২৮

৩.হরিদাস দাস সম্পাদিত,*শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান*, হরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ, ১৯৮৭। পৃষ্ঠা-১১৭২

অবসোই বিরগে তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেম কি ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধনরুদ্ধ নরাধিপমান।
রামানন্দ রায় কবিভান।[১]

বস্তুত নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নায়ক নায়িকার যখন কোনো অনুসন্ধান থাকে না, কোনো স্মৃতি উদ্ভাসিত হয় না; একমাত্র বিলাস ব্যতীত আর কোনো বিষয়েই স্পৃহা থাকে না, তখনই চরমোৎকর্ষ অবস্থায় বিলাস-হেতু তন্ময়তা জন্মে। সমস্ত কিছুর অন্তর্মূলে থাকে শুধু বিলাস-ভাব। অনুসন্ধানের বিষয় থাকে– বৈচিত্র্য, পরিপাট্য, আনন্দ বাড়বে কীভাবে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বিলাস শব্দের অর্থ নির্ণয়ে যে বৈপরীত্য সৃজন করেছেন তার বৈশিষ্ট্য উপর্যুক্ত সময়ে দেখা যায়। অনুসন্ধান করতে করতে এক চরমাবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন কে, কেন অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছে, সেই অনুভূতিশূন্য হয়ে ওঠে নায়ক-নায়িকা। এই ক্রমপ্রবহমান চরম উৎকণ্ঠাতেই তাদের মধ্যে বৈপরীত্য– যা নায়ক-নায়িকার চেষ্টার বৈপরীত্য নয়। বৈপরীত্যের হেতু নির্ণয় করলে হয় 'ভ্রান্তি'। অর্থাৎ, এ-এমন এক পর্যায় যেখানে নায়ক-নায়িকার আত্মবিস্মৃতি ঘটে। ভ্রান্তি মূলত বিলাসজনিত আত্মতন্ময়তার নির্যাস এবং এই তন্ময়তার মধ্য দিয়েই চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। সুতরাং, উল্লিখিত তিনটি অর্থই বিলাস শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে শ্রীজীব গোস্বামীর পরিপক্কতা বা চরম উৎকর্ষতাবস্থা অর্থটিই অধিক কার্যকর। অর্থাৎ–

> এই বৈপরীত্য প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার একটি বাইরের লক্ষণ মাত্র। এই বৈপরীত্য বোধ প্রেমবিলাসের লক্ষণও নয়, চরমোৎকর্ষাবস্থা তো নয়ই। কেবলমাত্র চেষ্টা ও আচরণের বৈপরীত্যে প্রেমবিলাস বিবর্ত সূচিত হয় না, প্রেমবিলাসের তন্ময়তার যে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি বা ভ্রান্তি, তা থেকে যে বৈপরীত্য উদ্ভূত হয়, সেই বৈপরীত্যই প্রেম বিলাস বিবর্তের লক্ষণ।[২]

প্রেমবিলাস বিবর্তের অন্তস্তলীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো–

ক. প্রেমবিলাসের ক্ষেত্রে প্রেমজনিত আত্মসুখবাসনার গন্ধলেশহীন সুখ-তাৎপর্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

খ. তাৎপর্যপূর্ণ প্রেম থেকে যে প্রেমের প্রেরণা সংগঠিত তাই যথার্থ বিলাস।

গ. এখানে স্বসুখ বাসনা দ্বারা প্রণোদিত যে কামবিলাস তাকে বলা হয়নি। কারণ, স্বসুখ-বাসনার দ্বারা যে কামবিলাস সংগঠিত হয় তা পশুবৎ এবং এতে কোনো মহত্ত্ব থাকে না।

ঘ. প্রেমবিলাস মূলত নিষ্কাম প্রেমেরই অন্তস্তলীয় প্রবাহ। বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ–এঁরা কেউই নিজের সুখ চান না। বিলাস-হেতু যে তন্ময়তা তার জন্য তাঁদের মধ্যে আপাত ভেদজ্ঞান লোপ পায়। কারণ, এই ভেদজ্ঞান রহিত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

ঙ. বস্তুত অন্তরে যতক্ষণ চিত্তজনিত ভেদ থাকে ততক্ষণ কান্ত-কান্তা জ্ঞান বর্তমান থাকে এবং স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু যখন প্রেমপরাকাষ্ঠায় চিত্তের স্বতন্ত্র ভেদজ্ঞান দূর হয় তখন কান্ত-কান্তা বিষয়ে যে পারস্পরিক চিহ্নায়ন, তা আর থাকে না।

চ. একমাত্র বিষয় হলো বিলাসসুখ-তন্ময়তা।

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২১৯

২. ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ*, সোনার তরী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১০৬

ছ. প্রেমবিলাস বিবর্তেই বিলাস-মহত্ত্বের চরমতম বিকাশ অর্থাৎ প্রেমের চরমতম বিকাশ ঘটে।

রাধার সাথে কৃষ্ণের যে বিলাস তা কামগন্ধহীন এবং এই বিলাসই প্রেমবিবর্ত বিলাস। এখানে রাধা মহাভাবস্বরূপা – যার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে মাদনাখ্য মহাভাবের মধ্য দিয়ে। স্বরূপত প্রেমই এখানে মুখ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানাচ্ছেন:

ক. প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য সার।[১]

খ. সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার নাম প্রেম।
আনন্দ-চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥[২]

প্রেমের চরমতম বিকাশ যেখানে, সেখানেই প্রেমবিলাসের চরম তাৎপর্য, অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য এবং বিলাসের চরমতম প্রকাশ–যা বৈষ্ণব পদাবলির অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং উপর্যুক্ত বিষয় প্রতিপাদন করেছে বৈষ্ণব দর্শন-তত্ত্ব।

সম্বন্ধ তত্ত্ব

অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য শ্রীনাথ চক্রবর্তী তাঁর *শ্রীমদ্ভাগবতের* টীকা 'চৈতন্যমঞ্জুষা'র মঙ্গলাচরণে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের নান্দনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যথা:

> আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
> রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধুবর্গেণ যা কল্পিতা ॥...
> অর্থাৎ, ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্যতত্ত্ব (সম্মন্ধ), তাঁর ধাম শ্রীবৃন্দাবন, আর তাঁর উপাসনা প্রণালী (অভিধেয়) যেরূপ ব্রজবধুগোপীগণ সম্পাদিত করেছেন, তদ্রূপ; এ বিষয়ে অভ্রান্ত প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র। তার পরম পুরষার্থ (প্রয়োজন) কৃষ্ণপ্রেম।[৩]

১.কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২১৬
২.পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৬
৩. শ্রীনাথ চক্রবর্তী, টীকা: চৈতন্যমঞ্জুষা, *শ্রীমদ্ভাগবত*, উদ্ধৃতি, ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী, *গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক*, শ্রীচৈতন্যমঠ, নদীয়া, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১৯১

সমস্ত শাস্ত্র এবং যিনি সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ যাঁর থেকে সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ও যিনি সমস্ত কিছুতে বিরাজমান, তাঁর সাথে ঐকান্তিক সম্পর্কই সম্বন্ধ।

পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এবং তার অতীত যা কিছু আছে বা থাকা সম্ভব, তার মূলে যিনি অথবা, যার মধ্যে সমস্ত বিরাজমান, বেদ-অনুযায়ী তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দটি দিয়ে স্বরূপবাচক আকারকে প্রতিপন্ন করা হয় যার অর্থ বৃহত্তম এবং √বৃংহ থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মে বৃহত্ত্ববাচক বিষয়রেই প্রকাশ ঘটেছে, অর্থাৎ যিনি নিজে বৃহৎ এবং যিনি বৃহৎ করেন, তিনি ব্রহ্ম[১]। এই ব্রহ্ম থেকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এবং স্বরূপে বৃহৎ হওয়ায় তিনি সর্বব্যাপক –সর্বগ, অনন্ত এবং বিভু। ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিকী। শক্তির সাথে শক্তিমানের যে সম্বন্ধ তা নিত্য এবং এই সম্বন্ধ অনাদি ও নিত্যবস্তু যা ত্রিধারায়–পরাশক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তিতে পরিব্যপ্তমান। পরাশক্তি হলো স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি, মায়াশক্তি হলো বহিরঙ্গা শক্তি এবং জীবশক্তি হলো তটস্থা শক্তি। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* ৪/৫ নং শ্লোকে ব্রহ্মের শক্তি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। স্বরূপ শক্তি জড়প্রতিযোগী এবং জড়বিরোধী চিন্ময়ী শক্তি বা চিচ্ছক্তি। এই শক্তিতেই ব্রহ্মের সাথে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তিনটিবৃত্তিক –সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী সহযোগে। পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়। যথা:

> সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
> একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥
> আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
> চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥[২]

ব্রহ্মের এই আনন্দস্বরূপ ত্রিশক্তিতে স্থিত, কোনো অবস্থাতেই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বায় যখন তিনটি শক্তিই যুগপৎ সমানভাবে স্বীয় অভিব্যক্তি লাভ করে, তখন ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বাই হয়ে ওঠে মূর্তি। সন্ধিনী বা আধারশক্তি শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপশক্তি যার দ্বারা পরব্রহ্ম নিজের ও অপরের সত্তা

ধারণ করেন এবং সত্তা প্রদান করেন। সম্বিৎ শক্তির দ্বারা পরব্রহ্ম নিজে জানেন এবং অপরকে জানান। সম্বিৎ শক্তির প্রাবল্যে আত্মবিদ্যার জন্ম হয় এবং এই আত্মবিদ্যার বৃত্তি—জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্তকের সাহায্যে ব্রহ্মসম্মন্ধীয় জ্ঞান লাভ করা যায়। হ্লাদিনী প্রধান স্বরূপশক্তি। ব্রহ্ম স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হয়েও নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন। এবং অপরকে আনন্দ আস্বাদন করান। এই আনন্দদায়িনী শক্তিই হ্লাদিনী, যা প্রাধান্য লাভ করলে গুহ্যবিদ্যা—ভক্তি ও ভক্তির প্রবর্তক অংশের মধ্য দিয়ে অনুভব করা যায় এবং সমস্ত সাধনার ফল ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির ইচ্ছাতেই লাভ করা সম্ভব।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি —সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিশাখায় বিভাজিত। *শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়* একে গুণময়ী বলা হয়েছে (শ্লোক নং-৭/১১)। তমোগুণের আধিক্যে অবিবেকতা জন্মে এবং বিষয়-জ্ঞান অর্জনে অক্ষমতা জন্মে। রজোগুণের প্রাবল্যে বিষয়তৃষ্ণা ও বিষয়শক্তির জন্ম হয়। সত্ত্বগুণ নির্মল, শান্ত ও উদাসীন। এই

১. শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*-১, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৪১

২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৩৫

সত্ত্বগুণ জীবসত্তাকে সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দিয়ে আবদ্ধ করে। তবে, সত্ত্বগুণসম্মন্ধীয় জ্ঞান লৌকিক বা মায়িক জ্ঞান, মায়াতীত পরব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান নয়। মায়া জড়রূপাশক্তি যার চেতনা নেই। মায়া দিয়ে ব্রহ্মকে স্পর্শ করা বা অনুভব করা যায় না। পরব্রহ্ম যেহেতু সর্বব্যাপক তত্ত্ব, সুতরাং মায়ার গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই ব্রহ্মের বাইরেই মায়ার অবস্থিতি; যা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। জীবমায়া এবং গুণমায়ায় জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে।

ব্রহ্মের জীবশক্তি তটস্থা শক্তি। এই শক্তির অংশই হচ্ছে অনন্ত কোটি জীব। ব্রহ্মের স্বরূপ জড়রূপা নয়। জীব নিত্যমুক্ত ও মায়াবদ্ধ হয়ে জীবন অতিবাহিত করে। মায়াবদ্ধ জীবের পার্থিব জীবন-যন্ত্রণায় জীবন অতিবাহিত হয়, কিন্তু নিত্যমুক্ত যারা, তারা এসবকিছুর উর্ধ্বে। জীবশক্তি ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থান করে না, তবে সম্বন্ধের হেতু তারা কখনো কখনো যুক্ত হয় ভগবৎ-কৃপায়। এই বিষয় মূর্ত ও বিমূর্তে সংগঠিত হয় এবং উপর্যুক্ত সমস্ত শক্তিই নিত্য সম্বন্ধযুক্ত যা চিচ্ছক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ দেখালেন, রসত্বের পূর্ণ প্রকাশ এবং বিকাশ যাঁর মধ্যে তিনিই রসের স্বরূপ এবং সর্বআকর্ষণকারী। তিনি কৃষ্ণ এবং তিনিই উপর্যুক্ত পরমব্রহ্ম। প্রাকৃতে-অপ্রাকৃতে তিনি বিরাজমান এবং ধামে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউই নেই। এই পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে, সকল সৃষ্টির সঙ্গে, দৃশ্যের অতীত যা কিছু আছে সমস্ত কিছুর আদি উৎস ও স্থিতি ব্রহ্মে বা কৃষ্ণে। যাঁর সাথে একটি নিত্য, শাশ্বত, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় ও অন্তরঙ্গ। যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ই সম্বন্ধ-তত্ত্ব হিসেবে বিবেচিত, সুতরাং বেদাদি সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যরূপে কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম এবং কৃষ্ণই সম্বন্ধ তত্ত্ব। যথা:

ব্রহ্মা বিষ্ণু হয় এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥
মহাবিষ্ণু পদ্মনাভ ক্ষীরোদক-স্বামী।
এই তিন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব অন্তর্যামী ॥
এই তিন সর্বাশ্রয় জগৎ-ঈশ্বর।

এহো সব কলা অংশ কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥[১]

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য অপার এবং তাঁর মাধুর্য অনন্ত এবং বৈষ্ণব দর্শনে তা প্রকাশ পেয়েছে সর্বস্তরে। এই অসীম মাধুর্যময় কৃষ্ণ নিজের রূপমাধুর্য দেখে বা স্বসৌভাগ্য অনুধাবন করে নিজেই বিস্মিত হয়ে ওঠেন এবং তা আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এই নিত্যমাধুর্যসৌন্দর্য গুণ কৃষ্ণের নিত্য আশ্রয় এবং এই মাধুর্যের দ্বারা তিনি সকলকে আশ্রয় দেন। এই মাধুর্য সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পূর্ণ প্রকাশক ও মাধুর্যের আস্বাদক; ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণসেবাতেই সম্বন্ধের পূর্ণরূপ বিকশিত; যা বৈষ্ণব পদাবলিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানাচ্ছেন :

ক. পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণমাধুর্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ ॥[২]

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৩৮৭
২.পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা-৩৮৭

খ. সর্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ॥[১]

বৈষ্ণবদর্শন ও পদাবলিতে সম্বন্ধতত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কারণ ব্রহ্মা-জীবের যে নিত্য সম্বন্ধ, কৃষ্ণেই যে সমস্ত কিছুর স্থিতি এবং পরিকররূপে সেবাতেই যে জীবনের চরম সার্থকতা, এই তাত্ত্বিক দিক বৈষ্ণব দর্শনের প্রবহমানতায় সন্দর্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অভিধেয় তত্ত্ব

অভিধেয় তত্ত্ব মূলত ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকারী বিষয়। অভিধেয় অর্থ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য অর্থাৎ, সাধন সিদ্ধির জন্য বা অভীষ্ট লাভের জন্য যে উপায়কে আশ্রয় করা হয়, তাই-ই অভিধেয়। জাগতিক জীবনে অভীষ্ট বস্তু এবং কামনা-বাসনা অন্তহীন;সবকিছুরই মূলে রয়েছে সুখলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পার্থিব সুখলাভের আকাঙ্ক্ষাজনিত যে কামনা তা নীরস ও ক্ষণস্থায়ী। এই সুখের হেতু হচ্ছে, যাঁর সাথে জীবের নিত্যসম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধতত্ত্বের নিমিত্তে সুখবাসনা; এ-সুখ রসস্বরূপ পরব্রহ্ম কৃষ্ণের জন্য। কারণ, তিনি রসস্বরূপ, তিনি আনন্দের প্রস্রবণ। তা-থেকেই উৎসারিত আনন্দ ধারায় জীব-জগৎ প্লাবিত ও আনন্দিত হয়। সেই আনন্দেই জীবনের মুখ্য স্থিতি এবং সংসারে তাঁর নিত্য আনন্দের খেলা। কিন্তু এই আনন্দ এবং সম্বন্ধ মায়ায় ঢাকা পড়ে যায়। ত্রিতাপ–আধিভৌতিক তাপ, আদিদৈবিক তাপ এবং আধ্যাত্মিক তাপ-এর দ্বারা বিস্মৃত সম্বন্ধ ও সংসারের দুঃখময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে নিত্য সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত করবার দরকার পড়ে। সেই নিত্য সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত হলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরম আকাঙ্ক্ষা ও তৃপ্তির পথ খুলে যায়। অর্থাৎ, এই স্মৃতি জাগ্রত করাই হয়ে দাঁড়ায় জীবের মুখ্য দায়িত্ব। সংসার কেবল দুঃখময় নয়; সুখ-দুঃখময় এবং নেপথ্যে সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-দ্বেষ, শুভ-অশুভ, জীবন-মরণ–এ-থেকেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। বস্তুত এই দ্বন্দ্ববুদ্ধি দূর হলে যা অনুভূত হয় তা অদ্বয় আনন্দ। তার জন্য

সম্বন্ধের স্মৃতিই মুখ্য বিষয় ও তা জাগানো একান্ত কর্তব্য এবং এই বিষয়ই অভিধেয় তত্ত্ব। গৌড়ীয় দর্শন মতে, একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণের উপাসনার মধ্য দিয়েই সম্বন্ধ-স্মৃতি জাগ্রত করা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে এ-বিষয়ে জানিয়েছেন :

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃকৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণমোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান ॥
বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন ॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯,পৃষ্ঠা-৩৬৫

কৃষ্ণমাধুর্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে আর কৃষ্ণরস আস্বাদন ॥[১]

বস্তুত, বিষয়ে যে আনন্দ অর্থাৎ রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-জনিত যে আনন্দ এবং সংসারের স্নেহ-প্রীতিজনিত যে আনন্দ এসবই পরমানন্দ অনুসন্ধানের স্মারক। কিন্তু অপার্থিব আনন্দ-প্রাপ্তিতে মুখ্যত প্রয়োজন ভক্তির পরশ। শাস্ত্র-বর্ণনা অনুযায়ী কোনো কোনো স্থানে কর্ম, জ্ঞান ও যোগকেই অভিধেয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু কর্ম, জ্ঞান ও যোগ বহিরঙ্গ বিষয়, অন্তমূর্লীয় বিষয় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি। সুতরাং, বৈষ্ণব দর্শন অনুযায়ী মায়াবদ্ধজীবের কৃষ্ণ-বহির্মুখিতা দূর করে কৃষ্ণের প্রতি যে তীব্র পরাকাষ্ঠা (Acme of Happiness), আত্যন্তিক সুখকে উন্মুখ করে তোলার জন্য শাস্ত্রে যত প্রকার সাধনরীতি বা অভিধেয় উল্লেখ আছে তার মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। পরমপ্রেম অমৃত স্বরূপ এবং তা একমাত্র ভক্তি দ্বারাই অনুভব করা যায়। ভক্তির অনন্য স্তম্ভ কৃষ্ণসেবা যার সাথে কর্ম, জ্ঞান, যোগের তুলনা করা চলে না। এখানে একটি বিষয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, তাহলো– নির্বিশেষ জ্ঞান ভক্তি ছাড়া কাউকে মুক্ত করতে পারে না, কিন্তু ভক্তি স্বাধীন ও অনন্য; জ্ঞান ছাড়াও ভক্তি মুক্তির সোপান রচনা করতে পারে। সুতরাং দার্শনিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে : পরিণামবাদী, জীবনবাদী, লীলাবাদী যাই হোক না কেন, জীবমাত্রই কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং এই দাসত্বই জীবের নিত্যস্বরূপ। এই স্বরূপতত্ত্ব বিস্মৃত কেবল মায়ার জন্য। জগৎ মিথ্যা নয়, জীবনও স্বপ্ন নয়, মায়া বস্তুত এসবের অচিন্ত্য সৃজনী শক্তি। মায়াযোগে ব্রহ্ম জগৎ স্রষ্টি করে তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তিনি মায়াতীত এবং আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। এই আনন্দ এবং তার রসের সাধনায় প্রবিষ্ট হতে হলে মায়ার জাল ছিন্ন করতে হয়। কৃষ্ণে প্রীতি এবং ভক্তি স্থাপন করে প্রিয়কার্য সাধনই পরম নিঃশ্রেয়স। যথা:

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

অর্থাৎ, আমাতে সতত আসক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্বক আমার ভজনাকারী, তাদেরযথোপযুক্ত বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যারদ্বারা আমাতে সমর্পণকারীরা আমাকেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।[২]

অর্থাৎ, কৃষ্ণে শরণ ও গ্রহণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৃষ্ণে শরণ গ্রহণ ও সমর্পণে মায়াবন্ধন ছিন্ন হয়। কৃষ্ণসেবাতেই কৃষ্ণভক্তির উদয় হয় এবং প্রেমরস আস্বাদনের দুয়ার খুলে যায়। ভক্তির অনুসঙ্গে ভক্তসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈষ্ণব সদাচারের মধ্যে সাধুসঙ্গের অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং কৃষ্ণ-ব্যতীত যিনি অন্য কারো ভজনা করেন না তাকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। ভক্তি যেহেতু জীবের নিত্য সিদ্ধভাব তাই তাকে হৃদয়ে প্রকট করার বিষয়ে বা সাধ্যতা-প্রসঙ্গে অভিধেয় বিষয়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ উল্লেখ করেছেন।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদিতে ভক্তির স্ফুরণ হয় এবং মায়ার বন্ধন কাটতে শুরু করে। যেহেতু উল্লিখিত বিষয়গুলো সাধনভক্তির অঙ্গীভূত তাই এগুলোকেই সাধনভক্তির স্বরপলক্ষণ হিসেবে ধরা হয়।

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯,, পৃষ্ঠা-৩৬৫

২. শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, *শ্রীগীতা*, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩৪৩

প্রেমসাধনভক্তির তটস্থা লক্ষণ। রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তি-সহযোগে জীবহৃদয়ে চিরকাল বর্তমান কৃষ্ণপ্রেমকে উদ্বোধিত করতে হয়। সাধনভক্তির বহু অঙ্গ রয়েছে। এই অঙ্গসমূহের যাজন অনুশীলনসর্বস্ব, যা গুরুচরণাশ্রয়, দীক্ষাগ্রহণ, সৎকর্ম নিরূপণ, নর-নারায়ণ সেবা, আকাঙ্ক্ষা, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে আত্মসুখ ত্যাগ, বৃন্দাবনে বসবাস, সেবা - অপরাধ থেকে দূরে থাকা, অবৈষ্ণবের সঙ্গ ত্যাগ, শ্রবণ কীর্তনাদি অনুশীলন, পরিক্রমা, জপ-সংকীর্তন, জপ, কৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন, কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া ইত্যাদি চৌষট্টি ভজনাঙ্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; চৈতন্যোত্তর পদাবলির যা অনন্য বিষয়।

ব্রজবাসীগণ যে ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন তা রাগাত্মিকা ভক্তি। বস্তুত বৈষ্ণব পদাবলিতে যে দার্শনিক তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে তাহলো রাগানুগা ভক্তিসাধনা। অর্থাৎ, আরাধ্যে গাঢ় তৃষ্ণাই রাগের স্বরূপ লক্ষণ, আবিষ্টতা বা ভাব-তন্ময়তা হয় রাগের তটস্থলক্ষণ। এর অন্তর্মূলে থাকে একান্ত সেবা-অভিলাষ। বস্তুত এই সাধনার দুটি ধারা, যথাঃ বাহ্য সাধন ও অন্তর সাধন; যার মধ্য দিয়ে রতি ও ভাবের জন্ম হয় এবং এই রতি ও ভাব দ্বারাই কৃষ্ণ ভক্ত-অন্তরে বাধা পড়েন। এ-বিষয়ে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
খ. সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥
গ. বেদশাস্ত্রে কহে সম্মন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহাধন ॥
ঘ. অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥[১]

অতএব, বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রেমভক্তিই অভিধেয় এবং তা অনন্য সাধনভক্তি। বৈষ্ণব পদাবলির তত্ত্ব-দর্শনে যা নিগূঢ় রসতত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রয়োজন তত্ত্ব

প্রয়োজন হলো উদ্দেশ্য-পরিপূরণ। যে-উদ্দেশ্যে উপাসনা বা ভক্তির সাধনা করা হয় তাই প্রয়োজন। প্রয়োজন তত্ত্বের অন্তর্মূলে থাকে ভক্তি, যা সাধন ভক্তির চেয়ে উচ্চে। প্রয়োজন তত্ত্ব যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তাহলো প্রেমভক্তি। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, ভাব বা রতি যখন গাঢ়তা প্রাপ্তি হয় এবং তার ফলে সাধক চিত্ত যখন সম্যকরূপে দ্রবীভূত হয় এবং কৃষ্ণের বিষয়ে অধিক মমতাসম্পন্ন হয়, তখন বিদগ্ধজন তাকে প্রেম বলে থাকেন। যে-কোনো বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ দুই ধরনের হয়ে থাকে, যথা: প্রকৃতি ও আকৃতি। প্রেমের প্রকৃতি হলো গাঢ় অবস্থা এবং আকৃতি হলো গাঢ়তা। এক্ষেত্রে ভাব হচ্ছে ভাগবতীপ্রীতির তারল্য রূপ, আর প্রেম গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত ভাগবতী প্রীতি। বস্তুর তটস্থ লক্ষণ হচ্ছে ঐ-বিষয়ের কার্য বা প্রভাব। প্রেম স্থিত হলে, রতি গাঢ় হলে, অভিলাষ বর্ধিত হয় এবং

১.কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯,পৃষ্ঠা ৩৬৫-৩৬৭

মমতাতিশয়ের আবির্ভাবে সমৃদ্ধ যে প্রীতির জন্ম হয়, তাই প্রেম। প্রেম-সম্পর্কিত ভক্তিই কেবলা ভক্তি বা প্রেমভক্তি। সুতরাং, প্রয়োজন তত্ত্ব হচ্ছে পরমপ্রীতির সঙ্গে পরমসত্ত্বার সেবার জন্য যে অকৃত্রিম আশা-লালসা, তা ভক্ত সবসময়ই করে থাকেন ; পার্থিব জীবনে এই-ই তার একমাত্র কাম্য এবং একমাত্র প্রয়োজন। প্রয়োজন পরিপূরণে দরকার প্রেম; এই প্রেমভক্তিই প্রয়োজনতত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছেন :

কৃষ্ণের রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি-রসের এই স্থায়িভাব নাম ॥ ...
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্তে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রাবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্তে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজনে সর্বানন্দ ধাম ॥[১]

বস্তুত ভাব থেকেই প্রেমের আবির্ভাব ঘটে। সাধকের প্রেম মূলত কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রতি এবং কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাবই প্রেম। সাধনভেদে প্রেমের ভেদ দুই ধরনের – বিধি মার্গের সাধন এবং রাগানুমার্গের সাধন। বিধিমার্গের সাধকের চিত্ত-ঐশ্বর্য জ্ঞানে পরমপ্রিয়ের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয় এবং বিধিমার্গের সাধনায় মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেমের জন্ম হয়। রাগানুগামার্গের সাধকের মূল উপলক্ষ্য থাকে কৃষ্ণসেবার অন্তহীন লোভ এবং এই সাধনায় পরম প্রিয়ের মাহাত্ম্য বা ঐশ্বর্যের জ্ঞান অপ্রয়োজনীয় বিষয়, কেবল প্রেম-সাধনাই অনন্য উপলক্ষ্য। এই প্রেমই কেবলা প্রেম বা প্রেমভক্তি। গৌড়ীয় দর্শনে ভক্তিবাদ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় তাই প্রয়োজন তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

বস্তুত, জাতপ্রেমভক্তের কার্যকলাপ ও আচরণের মর্ম অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনেরাও বুঝতে পারেন না।[২] এর কারণ কৃষ্ণের প্রেমে তিনি এমন উন্মত্ত থাকেন যে, নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ কিছুই অনুভব করতে পারেন না, পরমানন্দে নিমগ্ন থাকাই তার একমাত্র আধার। অর্থাৎ, এই উপাসনার প্রভাবে এবং কৃপায় ব্রহ্মের সাথে জীবের নিত্য সম্মন্ধের বিষয়ে স্মৃতি জাগ্রত হয়, তখন প্রেমই হয় একমাত্র কাম্যবস্তু; একমাত্র প্রয়োজন।

প্রেমভক্তির সাধনায় ভক্ত-অন্তরে প্রেমের স্বরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ে প্রকাশমান হয়। এই প্রেম ক্রমেই বেড়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব বা মহাভাব পর্যন্ত যায়। স্নেহ, মান, ভাব, প্রেম–এসব স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ, যেমন : প্রেমের বিষয় হলেন কৃষ্ণ, সুতরাং প্রেম বিষয়ে উপলব্ধি হচ্ছে কৃষ্ণেরই উপলব্ধি – স্নেহ সেই উপলব্ধিকে উদ্দীপ্ত করে থাকে। মান হচ্ছে – স্নেহ উৎকৃষ্টতার প্রাপ্তিহেতু নতুন মাধুর্যকে অনুভব করা এবং কৌটিল্য ধারণ করা। অর্থাৎ, স্নেহই গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে উদাত্ত ও ললিত মান

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার(সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯,পৃষ্ঠা-৪১৬-৪১৭

২. শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন*-৩, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৫৯।

হয়।প্রণয় মানের গাঢ়তা বিশেষ এবং সম্ভ্রমাদির যোগ্যতা থাকলেও এই রতিতে তার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। মান গাঢ়তা লাভ করে যখন প্রিয়জনের সাথে অভেদমনন সৃষ্টি করে, (এই অভেদমনন জীবব্রহ্মের সাথে সাজুয্যকামীদের মতো অভেদমননধারণা নয়) তখন প্রণয়, মৈত্র ও সখ্য ভাবে প্রণয় সাধিত হয়। প্রণয়ের উৎকর্ষতায় যখন অতিশয় দুঃখ ও সুখ হৃদয়ে অনুভূত হয়, তখন তা রাগ হয়ে ওঠে। নীলিমা ও রক্তিমা ভাগে রাগ সাধক অন্তরে উৎকণ্ঠা বাড়ায়। অনুরাগ নিজে নতুন নতুন বৈচিত্র্য ধারণ করে সবসময় প্রীতির বিষয়কে নতুন নতুনভাবে অনুভব করায়। গাঢ়তা প্রাপ্তির ফলে রাগ অনুরাগে পর্যবসিত হয়। কৃষ্ণের মাধুর্যও আস্বাদনের জন্য ভক্তের লালসাকে বৃদ্ধি করে, কিন্তু এই মাধুর্যের আস্বাদনের লালসা কখনো উপশান্ত হয় না, বরং বৃদ্ধি পেতেই থাকে। অনুরাগের ক্রিয়া হচ্ছে– পরস্পরের বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, অতিশয় লালসা এবং বিপ্রলম্ভে থাকে একমাত্র কৃষ্ণমূর্তি। অনুরাগ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়ে যখন কতগুলো বিশেষ লক্ষণ ধারণ করে তখন তা ভাব বা মহাভাব হয়। উল্লেখ্য, বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ভাব ও মহাভাবের মধ্যে বস্তুত কোনো পার্থক্য নিরূপণ করেননি। মূলত অনুরাগই ভাব, করণ ও কর্মে অর্থাৎ আনন্দাংশে কৃষ্ণের অনুভবরূপ, অনুরাগে মাধুর্যের আস্বাদন এবং আস্বাদনের নিমিত্তে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ভাব বা মহাভাবে পরিণত হয়। ভক্তিরসের ভেদে কোনো ভক্ত শান্ত রতিতে, কেউ দাস্য রতিতে, কেউ সখ্য আবার কোনো ভক্ত বাৎসল্য রতিতে অধিকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু মধুর রতিকে উৎকৃষ্ট বলা হলেও উল্লিখিত সমস্ত রতিতেই রয়েছে ভাবের চরমতম পরিণতি। ফলে এই রতিগুলো হয়ে উঠেছে রসের স্থায়িভাব। অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি রসে পরিণত হওয়াটা জরুরী এবং এক্ষেত্রে আস্বাদনে চমৎকারীত্ব আসে। এই চমৎকারীত্বের মূল স্তম্ভ মধুর বা শৃঙ্গার রস। মধুর রতিতেই ভাব বা মহাভাব বিদ্যমান। অনুরাগ মূলত রতির চরমোৎকৃষ্টাবস্থা। সুতরাং অনুরাগ যখন স্বীয় উৎকর্ষ দশাগ্রস্ত হয় তখন তা মহাভাবে পরিণত হয়। মহাভাবের দুটি বৈশিষ্ট্য – মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য এবং মহাভাবের প্রভাবের বৈশিষ্ট্য। মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য হলো, প্রেমের বিভিন্ন স্তরের মধ্যেও মহাভাবের চেয়ে আস্বাদ্য আর কিছু নেই। মহাভাবের প্রভাব-বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়, মনকে স্বীয় স্বরূপত্ব প্রাপ্ত করায়। সুতরাং কৃষ্ণরতির গাঢ়তম অবস্থাই মহাভাব। মহাভাবের স্বরূপ

দুইভাগে বিভক্ত। রূঢ় মহাভাব এবং অধিরূঢ় মহাভাব। মহাভাবের প্রথম অবস্থা রূঢ় মহাভাব, অর্থাৎ মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্ত্বিক ভাব (অশ্রু, কম্প, পুলক ইত্যাদি) জাগ্রত হয় তাই রূঢ় মহাভাব। মহাভাব যখন রূঢ় মহাভাব অপেক্ষাও অনির্বচনীয় কোনো এক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, সেই অবস্থাই অধিরূঢ় মহাভাব। অধিরূঢ় মহাভাব মোদন ও মাদন স্তরে বিভক্ত। মোদন অর্থ মিলনজনিত বা সম্ভোগজনিত বিষয়, আনন্দ যেখানে সূচিত হয়; মাদন অর্থে কৃষ্ণের সাথে মিলনজনিত আনন্দ-উন্মত্ততা। বস্তুত রাধাকৃষ্ণের মধ্যে যখন উদ্দীপ্ত সাত্তিকভাবসকল নবপুষ্পের ন্যায় সৌষ্ঠব ধারণ করে, তাই মোদন। রূঢ় মহাভাবেও সাত্তিকভাব জাগ্রত হয়, কিন্তু অধিরূঢ় মহাভাবে সাত্তিক ভাব এক অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। মোদনের প্রভাব প্রেমের আশ্রয় রাধার মধ্যে এবং আশ্রয় সারণি রাধা এবং তাঁর যূথ। সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত মহাভাব পরমোৎকৃষ্ট প্রাপ্ত হলে সাত্ত্বিক ভাবের জন্ম হয়। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে আটটি সাত্ত্বিক ভাবের পাঁচ, ছয় বা সবগুলো জাগ্রত হয়। মোহন পর্যায়ে বস্তুত উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের সুদীপ্ততা থাকে। অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেও কৃষ্ণের সুখকামনা মোহনভাবের উদয়েই হয়। এমনকি মৃত্যু স্বীকার করেও নিজের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃষ্ণসঙ্গতৃষ্ণা ত্যাগ করতে পারে না; বস্তুত মোহন এক দিব্যোন্মাদ যা অনুভাবে পর্যবসিত হয়।

সাধকভক্তে রতির আর্বিভাব হলে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত হয় এবং সেই হৃদয়ে কৃষ্ণরতির আবির্ভাব ঘটে। শ্রবনকীর্তনাদি অনুষ্ঠানে হৃদয়কে প্রস্তুত করতে হয়। প্রস্তুতকৃত হৃদয়ে সাধন ভক্তির প্রাবল্যে রূপদর্শনজনিত রতির জন্ম হয়। রসের আস্বাদনে মধুর রসের সম্ভোগস্পৃহা জন্মে। এ-থেকেই সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের সৃষ্টি। সম্ভোগের স্তর বহু এবং বিপ্রলম্ভ – পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস স্তরে যে অনুভব হয় তা সাধকের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। রাধাকৃষ্ণই একমাত্র আশ্রয় ও বিষয় – তাঁদের পাদপদ্মকে সুখসম্পত্তি বলে মনে করা এবং সেই প্রেরণায় সাধনাই তখন একমাত্র উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ–

> ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
> নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥[১]

বৈষ্ণব দর্শন অনুযায়ী, সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে যাঁদের দোষগুলো দূর হয়েছে, যাঁরা ভগবৎ সম্মন্ধীয় বিষয়েই অনুরক্ত, রসজ্ঞ ভক্তগণের সঙ্গলাভেই যাঁরা আনন্দিত, কৃষ্ণের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ সুখসম্পত্তিকেই যাঁরা জীবনসর্বস্ব বলে মনে করেন এবং যাঁরা প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনগুলোই অনুষ্ঠান করেন, সেই সমস্ত ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত, প্রাক্তন ও বর্তমান সংস্কারবশে উজ্জ্বল আনন্দরূপ রতি অনুভবরূপে কৃষ্ণ বিভাবে আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হয়ে অপূর্ব আনন্দ লাভ করে থাকেন। একমাত্র কৃষ্ণভক্তগণই এই আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন।[২] কৃষ্ণপ্রেম বৈষ্ণব দর্শন, রসশাস্ত্র এবং বৈষ্ণব পদাবলিতে পঞ্চম পুরুষার্থ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সম্মন্ধ জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ ঘটে সেবাবাসনার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, স্বাভাবিকতার স্ফূর্তিতে। সুতরাং, নিত্য সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্রে যার দ্বারা সেবাবসনার স্ফূরণ হয়, কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করে, সেবা-বাসনাকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই একান্ত প্রেমই মুখ্য বিষয়, মুখ্য প্রয়োজনতত্ত্ব।

চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়ভাব বিকাশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের উল্লিখিত তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বস্তুত এই সময়ের পদকারবৃন্দ সাধনার নিমিত্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের রসগ্রন্থের ভাব ও তত্ত্ব নিয়ে পদ রচনা করেছিলেন। ফলে বৈষ্ণব পদাবলির কোনো কোনো অংশে Lyricকবিতার রস প্রকাশিত হলেও সেগুলোর মধ্যে তত্ত্বপ্রাধান্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্বাশ্রয়ে সার্থক কাব্যে নয় দার্শনিক ধারার বিকাশেই যেন বৈষ্ণব পদ পুষ্পাঞ্জলি হিসেবে আত্মনিবেদন করেছে।

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেবসাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯,, পৃষ্ঠা-৪২২

২. দ্রষ্টব্য :ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের স্বরূপ*, সোনার তরী, কলকাতা, ১৯৯৭,পৃষ্ঠা-১৪৩-১৪৪

চতুর্থ অধ্যায়: কীর্তনের উৎস ও অর্থ-তাৎপর্য

প্রথম পরিচ্ছেদ : কীর্তনের শ্রেণি

চতুর্থ অধ্যায় : কীর্তনের উৎস ও অর্থ-তাৎপর্য

প্রথম পরিচ্ছেদ : কীর্তনের শ্রেণি

কীর্তন শব্দের উৎপত্তির মূলে রয়েছে কৃৎ ধাতু; যার অর্থ কীর্তি বা প্রশংসা। কীর্তি শব্দের উৎসমূলও কৃৎ ধাতু। সুতরাং কীর্তন শব্দটির [কীর্তি + অন (ল্যুট্)] সাথে কীর্তির একটি সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। কীর্তন শব্দের সাধারণ অর্থ বা ব্যবহারযোগ্য অর্থ করলে দাঁড়ায় – সংশব্দন, কথন, বচন, বর্ণন, ঘোষণা। তাহলে এই কীর্তিগাথা বা প্রশংসা কার নিমিত্তে? উত্তরে বলা যায়, রূপে-শৌর্যে, জ্ঞানে-কর্মে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁর যশোকথা, নাম, গুণ ও গানই কীর্তন এবং এ-ই হচ্ছে কীর্তনের ব্যবহারিক ও প্রচলিত অর্থ। এই অর্থের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর ১০/২১/৫ শ্লোকে :

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণোয়োঃ কর্ণিকারাং
বিভ্রদবাসঃ কনককপিশাং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বোণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতিকীর্তি ॥

অর্থাৎসুন্দর দেহ, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের ভূষণ, কানে কর্ণিকার ফুল, সোনার মতো উজ্জ্বল পীতবাস পরণে, গলায় বৈজন্তীমালা পরে অধরে ন্যস্ত বেণু বাজাতে বাজাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজলীলা ভূমি বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। তখন গোপগণ চারদিকে তাঁর কীর্তি গান করছিল।[১]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (২/৬/৫৪-৬০)-এ উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করার নির্দেশ পাওয়া যায়। রূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থ হতে জানা যায় নাম, লীলা, গুণাদি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করাই হচ্ছে কীর্তন। জীব গোস্বামী তাঁর *ভক্তিসন্দর্ভ* গ্রন্থে জানিয়েছেন, উচ্চকণ্ঠে প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম কীর্তন। কীর্তন একক সংগীতও হতে পারে আবার সম্মিলিতও হতে পারে। বহুজনের সম্মিলিত কৃষ্ণবিষয়ক গানই সংকীর্তন। অবশ্য ভক্তিধর্মের সর্বজনীনতায় যে আবেদন বা তার যে অনুরাগাশ্রয় তাতে বহুজনের সম্মিলিত প্রয়াসেই কীর্তনের সার্থকতা নিহিত। সুতরাং বলা যেতে পারে, বহুজনের সম্মিলিত কণ্ঠে যে কীর্তন প্রকাশিত হয় তা-ই সম্যক কীর্তন বা সংকীর্তন, আবার বহুজনে মিলে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' – এই নাম কীর্তন করলেও তা হয় নাম সংকীর্তন।

কীর্তনের আবহমান পথ-পরিক্রমা বৈচিত্র্যপূর্ণ। কীর্তন এমনই এক বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি ও সাংগীতিক বিষয়, যার রয়েছে ঐতিহ্যময় ব্যুৎপত্তি ও রূপান্তরিত ইতিহাস। আনুমানিক ষষ্ঠ থেকে নবম শতকে দেখা যায় মন্দির বা অন্যান্য দেবস্থলীতে উপাসনার মাধ্যম ছিল কীর্তন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে (বিশেষভাবে বেদের সূক্তে) ঈশ্বর ও দেবতার স্তুতিকীর্তনই দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, উপাসনার মাধ্যম হিসেবে কীর্তনের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ভক্তিবাদ প্রসারের মধ্য দিয়ে এবং তা ভারতের দাক্ষিণাত্যে সূচিত হলেও মূলত তামিলনাড়ু ও কেরালার আড়বার সন্তগণ একে সাধন-পদ্ধতি হিসেবে রূপদান করেন। বিষ্ণু বা কৃষ্ণের প্রেয়সী ভেবে মিলনাকাঙ্ক্ষায় রচিত আড়বার-ভজনসংগীতগুলো

১. গীতা প্রেস প্রকাশিত, *শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ*, গোরক্ষপুর, ২০১৯, পৃষ্ঠা-১২৩৩

ভক্তিবাদী সাধকদের সাধনার মাধ্যম হিসেবে ছিল। এই আড়বার সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই দাক্ষিণাত্যে ভজনসংগীত ব্যাপক প্রসার লাভ করে। অপভ্রংশ-অবহট্ঠ ভাষায়ও পদাবলি রচিত হতে দেখা যায়। এতে বৈষ্ণব কীর্তনের সূত্রপাত ঘটে বলে অনেক গবেষক মন্তব্য করেছেন। *প্রাকৃতপৈঙ্গল* গ্রন্থেও এই ধরনের বহুপদ সংকলিত হয়েছে। ইতিহাসের প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে জানা যায়, 'প্রাচীনকালে বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত ছিল। তার একাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত কালে উৎকীর্ণ অন্তত পঁয়ত্রিশটি প্রত্নলেখতে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ দেখা যায়।[১]

সুতরাং, সংগীতঅন্তপ্রাণ ভারতীয়দের মাঝে কীর্তন একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল বহুপূর্বেই। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল রাধা-মাধবের গোপন প্রেমের গান। কবি ডিম্বোক রচিত সেই সময়ের একটি গানের বিবরণ নিম্নরূপ :

> খুব শীত পড়েছে; রাস্তায় ধর্মার্থীরা শততালি-দেওয়া লেপ গায়ে দিয়ে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করছে। ভোররাতে সুমিষ্ট সুরে তারা রাধাকৃষ্ণের গোপন প্রেমের গীত গেয়ে নগরের মানুষদের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে।[২]

এই সুভাষিত শ্লোকগুলো কবি জয়দেবের সময়েও প্রচলিত ছিল এবং গাওয়া হতো। কীর্তনের উৎপত্তির প্রকৃত সময়কাল নির্ধারণ করা দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব। তবে ৩০০ খ্রিস্টাব্দে রাজা চন্দ্রবর্মণের প্রস্তরলেখ হতে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের যথেষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। আবার, একাদশ

শতাব্দী পর্যন্ত অন্তত একাত্তর জন সুভাষিত রচয়িতার নাম পাওয়া যায়, যাঁরা বিষ্ণু, লক্ষ্মী, হরি, কৃষ্ণ, রাধা এবং বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে শ্লোক রচনা করেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো – জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্যটির নামকরণে এবং তার পদেও কীর্তনের সুর ও তালের উল্লেখ রয়েছে। যেমন: মালবরাগ, গুর্জরীরাগ, বসন্তরাগ, রামকিরীরাগ, দেশাগরাগ প্রভৃতি; আবার তাল হিসেবে একতাল, রূপকতাল, যতিতাল, নিঃসারতাল প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি কুলশেখর রচিত *বৈষ্ণবীয় সুভাষিত*-তে ভক্তিভাবের উপস্থাপন দেখতে পাওয়া যায়; যা *সদুক্তিকর্ণামৃত*-সংকলনে উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু বৈষ্ণব উপপুরাণ রচিত হয়। এসবের মূল উপলক্ষ্যই ছিল বৈষ্ণব 'যোগ'-এর প্রচার। সুতরাং কীর্তনের উৎপত্তির নির্দিষ্ট সময়-ক্ষণ নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এর ক্রমবিকাশের পূর্ণতা জয়দেবের হাতেই, এবং উৎস আনুমানিক ৩০০-৫০০ খ্রিস্টাব্দে – এ কথা বলা যতে পারে। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী – এই তিনশ বছর ভারতে ভক্তির রস-প্লাবন ঘটে। ভক্তিধর্মের প্রভাবে এসময় সাংগীতিক ভজন বা কীর্তনের ব্যাপক বিকাশ সাধন হয়। যেহেতু ভক্তিধর্মের রূপই জনমুখী, তাইভক্তির প্রচার এবং ভক্তি-সাধনার পক্ষে কীর্তনের উপযোগিতা লক্ষ করার বিষয়। কারণ, এই উপযোগিতার মূল উপলক্ষ্য – উদ্দীপনা সঞ্চার করা। এ জন্যই ভক্তিধর্মের প্রচারকগণ সাধনার পথ হিসেবে সংগীত বা কীর্তনকে অবলম্বন

১. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ, কলকাতা-২০১৫,পৃষ্ঠা-৯

২. D. D. Kosambi, V. V. Gokhalw ed, *Subhasitaratnakosa of Vidyakare* (Cambridge, Massachusetts). 1975. Introduction. শ্লোক নং-৯৮০

করেছিলেন।চতুর্দশ শতকে নামদেবের (? - ১৩৫০) প্রভাবে কীর্তন খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এছাড়াও সন্ত একনাথ (১৫২৮ - ১৬০৩), তুকারাম (আনুমানিক ১৬০৮ - ৪৯), রামদাস (১৬০৮ - ?), কবীর (আনুমানিক ১৪৪০ - ১৫১৮), রবিদাস ও সদনা (১৫ - ১৬ শতক), সুরদাস (১৪৮৩ - ১৫৬৩), রবিদাসের শিষ্যা প্রখ্যাত সাধক-কবি মীরাবাঈ, দাদু (১৫৪৪ - ১৬০৩), নানকদেব (১৪৬৯ - ১৫৩৯), শঙ্করদেব (১৪৪৯ - ১৫৬৮) প্রমুখ প্রচারক ও সাধকভক্তগণ মহারাষ্ট্র, উত্তর ভারত, গুজরাট, রাজস্থান, প্রভৃতি স্থানে সাংগীতিক সাধনাকে ভক্তিধর্মের সাথে একীভূত করে প্রচার করছিলেন। আর বাংলায় ভক্তিধর্মের প্রসার হয় চৈতন্যদেবের নায়কতায়। বাংলায় কীর্তনের আনুষ্ঠানিক রূপদাতাও তিনি। তাঁর পর্ষদ এবং অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই কবি ও গায়ক ছিলেন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে গণবিনোদনের একটি প্রচলিত মাধ্যম ছিল কীর্তন। তাতে ভক্তির ভাব পরিলক্ষিত হয় না। এই কীর্তনের বিষয়ভাবে রয়েছে – সাধারণ নরনারীর প্রেমে যে মানসিক প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয় – সেই বিষয়। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই প্রাচীন কাহিনিমূলক কাব্যে আমরা দেখি – বড়ু চণ্ডীদাস সংগীতের বিভিন্ন ধারার সাথে পরিচিত ছিলেন এবং অনুমান করা যায় – তাঁর সময়ে অধিকাংশ জায়গায় মার্গ সংগীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। বিদ্যাপতির কাব্যেও আমরা বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে লীলাশুক রচিত *শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম* আবিষ্কৃত হয়। তাতেও আমরা সুর ও তালের পরিচয় পাওয়া যায়। মিথিলার কবি লোচন শর্মা তাঁর *রাগতরঙ্গিণী* গ্রন্থে বিদ্যাপতির সাংগীতিক ঐতিহ্যের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে বিদ্যাপতির ৫১টি পদের রাগরূপ নির্দিষ্ট করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

> ‘মাধবী’, ‘নেপাল ববাড়ী’, ‘দেশ দেশাখ’, ‘কেদার’, ‘কামোদ কেদার’, ‘শ্রীরাগ’, সুর পঞ্চম’, ‘মালব’, ‘বিজয়পুরমালব’, ‘জোগিয়ামালব’, যোগিয়া আসাবরী’, ‘মলারিকা’, ‘বিভাসী’, ‘ভীম পলাসি’. ‘গোপীবল্লভ’, ‘দেশী’, ‘অভিরাম’, ‘শোভনা’, ‘সারঙ্গি’, ‘দেশ’, ‘স্মরসন্দীপন’, ‘কোভার’ ইত্যাদি।[১]

আবার বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যেও তাঁর উল্লেখকৃত রাগ-রাগিণীর পরিচয় পাই। যেমন :

> আহের, কক্রূ, কূকগুজুরী, কোড়া-দেশরাগ, কেদার, গুজ্জরী, দেশাগ, দেশাববাড়ী, ধানুষী, পাহারিআরাগ, পঠমঞ্জরী, বেলাবলীম বসন্ত, বঙ্গালববাড়ী, বিভাষ, বিভাষকক্রূ, ভাটিয়ালীরাগঃ, ভৈরবী, মল্লার, মহারঠারাগ, মালবশ্রী, মালব, রামগিরীরাগ, রামকিরী, ললিত, শৌরীরাগ, শ্রীরাগ, সিন্ধোড়ারাগ।[২]

---

১. রাজ্যেশ্বর মিত্র (সম্পাদিত), লোচন শর্মা-বিরচিত *রাগতরঙ্গিণী*, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, উদ্ধৃতি, রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৫৩
২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৬, কলকাতা–হতে রাগগুলি গৃহীত

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় কীর্তনের ক্রমবিকাশ একটি সুস্পষ্ট ধারায়ই প্রবাহিত হয়েছে। বিশেষভাবে বাংলায় কীর্তনের অনুষঙ্গে ভক্তিবাদ ও প্রেমধর্মের প্রভাব বা তার অংশী হলেও বিষয়কে করেছে সমৃদ্ধ। চৈতন্য-যুগ ও উত্তর যুগের পদাবলি তার অনন্য দৃষ্টান্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত হতে জানা যায়, বিষ্ণুভক্তি লাভের উপায় নয়টি, যা এই গ্রন্থে নির্দেশ আকারে বর্ণিত হয়েছে। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্যভাব, সখ্যভাব ও আত্মনিবেদন। ভক্তিবাদী বৈষ্ণবের কাছে কীর্তনই প্রধান অবলম্বন। ভক্তিশাস্ত্রমতে নাম ও নামী অভিন্ন এবং নামের মধ্যেই নামীর আবির্ভাব হয়ে থাকে। সাধক তুকারাম-এর বাণী থেকে জানা যায়, তিনি ‘কীর্তন-ভক্ত-ভগবান’ এই ত্রয়ীকে ত্রিবেণীসঙ্গম-এর সাথে তুলনা করেছেন। নাম মানুষের মনে শক্তি জাগায়, সর্বভয় নিরসন করে, নামেই ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ হয়, নামেই ঘটে সার্বিক মুক্তি, এই বিশ্বাসই কীর্তনের মূল প্রতিপাদ্য। আচার্য শঙ্করদেব-এর ধর্মেও দেখা যায় নামকীর্তনই মুখ্যভজন। *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে এ-বিষয়ে যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ:

> হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রাম রায়।
> নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায় ॥
> সংকীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
> সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
> নাম সংকীর্তন হৈতে সর্বানার্থ নাশ।
> সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস ॥[১]

সুতরাং একথা বলা যেতে পারে, সব বৈষ্ণব-সন্ত-সাধকেরই এক স্থিরবিশ্বাস তখন গ্রহণযোগ্যতা বা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তাহলো – নাম কীর্তনই কলিযুগের সর্বোত্তম সাধনা।

কীর্তন মূলত ভাবাবেগের গান। কিন্তু এক্ষেত্রে ভাবাবেগের প্রাবল্য থাকলেও সাংগীতিক দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব বরাবরই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চৈতন্যদেবই বাংলায় কীর্তনের মৌলিক আধার এবং ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক। ঐকান্তিক ভক্তিবাদী বৈষ্ণব 'মধ্ব' সম্প্রদায়ভুক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর হাতে যে প্রেমভক্তি সাধনা প্রচারের সূচনা হয়, তার পরিপূর্ণতা আসে চৈতন্যদেবের ঐকান্তিকতায়। নবদ্বীপের বৈষ্ণব গোষ্ঠীর নেতৃত্ব অদ্বৈতাচার্যের হাতে ছিল এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ি ছিল সংকীর্তনের মূল স্থান।

*শ্রীকৃষ্ণবিজয়*রচয়িতা মালাধর বসুর পরিবারবর্গ চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্ব হতেই বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁদের কুলীনগ্রামের প্রায় অধিকাংশ লোক বৈষ্ণব মতের ছিলেন। এই গ্রামেই জগদানন্দ পাঠকের গৃহে থেকে হরিদাস ঠাকুর সাধন-ভজন ও সংকীর্তন প্রচার করেছিলেন। কাটোয়ায় ভক্তিবাদের প্রাবল্যে কীর্তন গানের ভালো রকম চর্চা শুরু হয়েছিল। শান্তিপুর, ফুলিয়া, কেতুগ্রাম, বৈদ্যখণ্ড বা খণ্ডগ্রাম প্রভৃতি স্থান চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বেই কীর্তনে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। নবদ্বীপে প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণবগোষ্ঠীতে নিয়মিতসম্মেলক কীর্তন গানের সূচনা হয়। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত, তাঁর তিন ভাই

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ ,*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৬১৯

যথাক্রমে-শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, গোপীনাথ আচার্য, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ও মুরারী গুপ্ত। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যায়, নবদ্বীপে চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণবগোষ্ঠী উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম করত এবং উদ্দণ্ড নৃত্যের সহযোগও তাতে সংঘটিত হতো। চৈতন্যেদেবের মহাবির্ভাবে যথাযথ কীর্তন ও তার ভাবসমূহের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। শ্রীরূপ গোস্বামীর*লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থ হতে আমরা দেখতে পাই :

> শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
> মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥[১]

অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্য-মুখনিঃসৃত হরিনামেই জগৎ নিমজ্জিত হয়েছিল। তাঁর নাম কীর্তনেই কলিজীব পরমার্থের সন্ধান পেয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত*-এ চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকে 'সংকীর্তন পিতরৌ' বলে অভিহিত করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *চৈতন্যচরিতামৃত*-এ 'সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলে উল্লেখ করেছেন। লোচন দাসের *চৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে 'সঙ্কীর্তনদাতা গৌরহরি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চৈতন্যপূর্ব-যুগে বৈষ্ণবগোষ্ঠীর কীর্তন থাকা সত্ত্বেও চৈতন্যচরিতকার চৈতন্যদেবকেই সংকীর্তনের স্রষ্টা ও প্রবর্তক বলেছেন। এর কারণ সম্ভবত এই – বাংলায় বৈষ্ণব ভক্তের জন্য উপাসনা পদ্ধতি হিসেবে কীর্তন ও সংকীর্তনের বিশিষ্ট রূপ ও তাৎপর্য চৈতন্যদেবের প্রভাবেই একটি সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করেছিল। বৃন্দাবন দাস - তাঁর *চৈতন্যভাগবত*-গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন:

> ক. কলিযুগে ধর্ম হয় হরি সঙ্কীর্তন।

এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥
এই কহে ভাগবত সর্বতত্ত্ব সার।
কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার ॥
খ. কলিযুগে সর্ব-ধর্ম হরিসংকীর্তন
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ ॥[২]

লোচনদাসের *চৈতন্যমঙ্গল* হতে আমরা (চৈতন্যজবানীতে) পাই :

সর্বধর্মসার এই সংকীর্তন ধর্ম।
বিশেষ জানিবে কলিযুগে এই কর্ম ॥ ...
যে যজ্ঞ বেড়িয়া রহে বৈষ্ণব আচার্য্য।
জানিতে কীর্তন যজ্ঞ সর্বযজ্ঞ আর্য্য ॥[৩]

---

১. রূপ গোস্বামী, *লঘুভাগবতামৃত*, উদ্ধৃতি, হীতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস*, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২৪

২. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১২ ও ১৩।

৩. লোচন দাস, *চৈতন্যমঙ্গল*, ভগবানদাস কাব্য ব্যাকরণতীর্থ (সম্পাদিত), আনন্দগোপাল শাস্ত্রী সংস্করণ, নবদ্বীপ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৪৩৮

কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* হতে পাওয়া যায়:

তত্ত্ববস্তু - কৃষ্ণ, কৃষ্ণ - ভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম সংকীর্তন - সবার আনন্দ স্বরূপ ॥[১]

সুতরাং, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির আলোকে আমরা বলতে পারি শ্রীচৈতন্যরূপী স্বয়ং নামীই যেন সর্বসাধারণকে নামসংকীর্তনে আহ্বান করছেন। তাই বৈষ্ণবীয় সাধনায় তথা সর্বজীবে কীর্তনই সর্বধর্মসার এবং প্রেমলাভের পরম উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

চৈতন্যদেবের বদান্যতায় কীর্তন যে সর্বধর্মসার এবং এতে সর্বসাধ্য প্রেমলাভ হয় – এই চেতনা আপামর সবার মাঝে স্থিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে গুহ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবেতকণ্ঠে আধ্যাত্মিক গান করার রীতি প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এই রীতিই চৈতন্যদেব ও তাঁর সম্প্রদায় গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যায়, চৈতন্যসম্প্রদায় শাস্ত্রশাসনে আবদ্ধ হলেও সংকীর্তনের আকর্ষণ তাতে ক্ষুণ্ন হয়নি। আজও সেই প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মন্দিরে, আখড়ায়, সর্বজনীনভাবে নিয়ন্ত্রিত বা নৈমিত্তিকভাবে নামকীর্তন, পদাবলি কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অষ্টপ্রহর, ষোলোপ্রহর, চব্বিশপ্রহর, ছাপান্নপ্রহর প্রভৃতি উপায়ে কীর্তনের ধারা আজও চলমান। কীর্তনের মাধ্যমে চৈতন্যদেব যে রীতি প্রচলন করেছিলেন তা যেমন সেই সময়ের উপযোগী বিষয়বস্তু ছিল এবং তা আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ, চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে সনাতন ধর্ম বিভিন্ন ভাগে এবং মার্গে বিভক্ত ছিল, যেখানে জাত্যভিমান এতো গভীর পর্যায়ে ছিল যে, প্রথাউন্মুখ পরিবেশ সৃষ্টি ছিল দুরতিক্রম্য। গুহ্য

সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ববেত্তারা আধ্যাত্মিক গানকে কেন্দ্র করে একত্রে সমবেত হবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁদের সাম্প্রদায়িক ধর্মাচরণে জাতিবিচার ছিল না; অস্পৃশ্যরাও যোগ দিতে পারতো। চৈতন্যদেবও সেই একই পথ অনুসরণ করলেন। তাঁর প্রচারিত কীর্তনে সর্বজনসমক্ষে আচণ্ডাল সর্বজাতি মিলিত হয়ে গাইতো, নৃত্য করতো। এতে এক মহামিলনের সেতুবন্ধ রচিত হয়েছিল। ভক্তির আবেগে, প্রেমানুসন্ধানে ভাবোন্মত্ত ভক্তেরা কীর্তনকে করে তুলেছিলেন মিলনক্ষেত্র। কবি কর্ণপুরের *চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্* নাটকে এ-বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব হতে যেভাবে কীর্তনের প্রসার ঘটে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপ:

প্রথম পর্ব : নবদ্বীপ

১. চৈতন্যদেব পিতৃতর্পণ শেষে গয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর মধ্যে ভাবোন্মাদ আসে। অধ্যাপনায় মনোনিবেশ না করে তীব্র ভাবাবেগে ছাত্রদের হাতে তালি দিয়ে কীর্তন শেখানো শুরু করেন তিনি। যথা:

এই হৈতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সঙ্কীর্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ ॥
চতুর্দ্দিগে অশ্রুকণ্ঠে কান্দে শিষ্যগণ।
সদয় হইয়া প্রভু বোলেন বচন ॥
"পাঢ়িলাঙ শুনিলাঙ এতকাল ধরি।
কৃষ্ণের কীর্তন কর' পরিপূর্ণ করি ॥"
শিষ্যগণ বোলেন, "কেমন সঙ্কীর্তন?"
আপনে শিক্ষায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
* "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাথে তালি দিয়া।
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া ॥[১]

২. ভাবাবেগ শুরু হবার পর নিমাই বা চৈতন্যদেব বৈষ্ণবগোষ্ঠীর সাথে কীর্তন সুর করেছিলেন এবং নবদ্বীপে কীর্তনের উদ্যোক্তা ছিলেন চৈতন্যপার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিত।

৩. নিমাই পণ্ডিতের বাড়িতে সন্ধ্যা হলে ভক্তরা এসে জড় হতো। সুকণ্ঠ গায়ক মুকুন্দ দত্ত ভক্তিশ্লোক পাঠ করতেন এবং তারপর কীর্তন চলত।

৪. নবদ্বীপে চৈতন্যভক্তগণ চৈতন্যদেবের ভগবত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। ফলে নবদ্বীপে কীর্তন শুরু হলে বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা এসে মিলিত হতে থাকে।

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১৩

৫. নবদ্বীপের এই কীর্তন-স্থল ছিল সাধারণত তিনটি। যথা: নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি, চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ি ও শ্রীবাস অঙ্গন।

৬. চৈতন্যজীবনী অনুসারে জানা যায় – এই সময়েই প্রকাশ্যে নবদ্বীপের পথে পথে নগরকীর্তন শুরু হয়। মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা, শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও শুরু হয়। এর সাথে থাকে নৃত্য, যথাক্রমে উদ্দণ্ড বা মধুর নৃত্য। যেমন:

ক. গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি   সভে দেয় করতালি
হরি বোল হরি বোল বলিয়া ॥[২]

---

১. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৪১

টীকা : * চিহ্নিত এই শ্লোকটি চৈতন্য-প্রবর্তিত কীর্তন গানের আদি বাণী। তখন এই কীর্তনের নাম ছিল নামকীর্তন; যা বেড়া কীর্তন নামে পরিচিতি পেয়েছিল।

২. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-১৬২

খ. সঙ্কীর্তনে নাচে প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে।
কত সুরধনী বহে নর্ত্তন তরঙ্গে ॥
শ্বাস হাস স্বেদ কম্পা হুঙ্কার গর্জ্জন।
অবনী হরিল হেম মেঘ বরিষণ ॥[১]

৭. চৈতন্যদেবের ভাবপ্রকাশ শুরু হয় সম্ভবত ১৫০৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে। তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ ঘটে ১৫১০ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে। মধ্যবর্তী এই সময়েই সম্প্রদায়গত কীর্তন (সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে) শুরু হয়। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* হতে জানা যায় তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের কথা। এসব সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন শ্রীবাস, মুকুন্দ দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষ। এসব সম্প্রদায়ে থাকত গায়ক, বাদক ও নর্তক।

৮. চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গগোষ্ঠীর কীর্তন কিছু দিন চলার পরে চৈতন্যদেব সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ্যে ভক্তিবাদ প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের নিমিত্তে কীর্তন করার জন্য। এই নগরকীর্তনের নেতৃত্বে ছিলেন নিত্যানন্দ এবং হরিদাস ঠাকুর।

৯. নবদ্বীপ জীবনে চৈতন্যদেবের কীর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় আয়োজন চাঁদ কাজীর বাড়ির উদ্দেশ্যে সমবেতগণকে নিয়ে উদ্দণ্ড নৃত্যের মাধ্যমে গমন। এই কীর্তনে দেখা যায় বহু নারীও অংশগ্রহণ করেছিল। এ বিষয়ে গবেষক হিতেশরঞ্জন সান্যাল-এর বর্ণনা নিম্নরূপ:

... মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ দত্ত, মুকুন্দ দত্ত, রামাই পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত ও বাসুদেব প্রমুখ পরিকরগণ নিমাই পণ্ডিতকে বেড়িয়া নৃত্যগীত করিতেছিলেন। নিমাই পণ্ডিতের দুই পাশে চলিতেছিল নিত্যানন্দ ও গদাধর পণ্ডিত। বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, মন্দিরা, করতাল বাজাইয়া ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতেছিল এবং নামকীর্তন ও নামগুণ কীর্তন করিয়া গাহিতেছিল

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন ॥
এবং
হরিবোল মুগধা বোলরে।
যাহে নাহি হয় শমন ভয় রে ॥
... ইহাও নামকীর্তন। নিমাই স্বয়ং গুণকীর্তন করিয়া গাহিতেছিলেন
তুয়া চরণে মন লাগুহুঁ রে।
শারঙ্গধর তুয়া চরণে মন লাগুহুঁ রে ॥[২]

---

১. জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল*, বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বিবলি ওথেকা ইণ্ডিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ, কলকাতা-১৯৭১, পৃষ্ঠা-২৩

২. হীতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস*, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৫৬

গবেষক সান্যাল-এর উদ্ধৃতি হতে নিমাই বা গৌরাঙ্গের কণ্ঠে যে পদটি পাওয়া যায় তা পদগানের ধুয়া বলে অনুমান করা যায় এবং বৃন্দাবন দাসও এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, নবদ্বীপ হতে শিমুলিয়া পর্যন্ত অর্থাৎ চাঁদ কাজীর বাড়ি পর্যন্ত নগর কীর্তনে লোক সমাগম হয়েছিল। এই নগর সংকীর্তনই নবদ্বীপে চৈতন্যের বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ সম্মিলন।

দ্বিতীয় পর্ব : নীলাচল

চৈতন্যদেবের শেষ আঠারো বছর অর্থাৎ, ১৫১৫ সালের মে মাস হতে ১৫৩৩ সালের এপ্রিল বা জুন মাস পর্যন্ত, চৈতন্যজীবন ছিল শ্রীরাধার ভাবমাধুর্যে পরিপূর্ণ অর্থাৎ ভাবোন্মত্ত অবস্থায়; কিন্তু এই দিব্যোন্মাদ অবস্থায়ও দৈনন্দিন কার্যাবলিতে অপরিহার্য ছিল কীর্তন। *চৈতন্যভাগবত*-কার এ-বিষয়ে জানাচ্ছেন:

ক. ... নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন-বিহার ॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-আনন্দ-আবেশে।
রাত্রি দিন না জানেন প্রভু প্রেমরসে ॥
নীলাচলবাসী যত অপূর্ব দেখিয়া।
সর্বলোকে ‘হরি’ বোলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥[১]

খ. এই মত যতেক সেবক যথা ছিলা।
সভেই প্রভুর পাশে আসিয়া মিলিলা ॥
প্রভু দেখি সভার হইল দুঃখনাশ।

সভে করে প্রভুসঙ্গে কীর্তন বিলাস ॥[২]

নীলাচল পর্ব কীর্তনের ক্ষেত্রে পরিণত পর্যায়। মূলত এই সময়েই চৈতন্য-যুগের পদকর্তাদের রচিত পদাবলির কীর্তন গান শুরু হয় এবং বহু প্রথিতযশা কীর্তনীয়াগণের আবির্ভাব ঘটে। আমরা এখন সূত্রাকারে নীলাচল - পর্বের কীর্তনের ধারাকে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হব।

১. নীলাচলে দেখা যায়, চৈতন্যদেব রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সাথে বসে শাস্ত্রালোচনা এবং কাব্য-কীর্তন আস্বাদন করতেন।

২. অন্তরঙ্গ পরিকরবৃন্দের সাথে বসে চৈতন্যদেব শাস্ত্র, শাস্ত্রীয় সংগীত ও কীর্তন-চর্চা করতেন। পদকর্তা নরহরি সরকার ও বাসু ঘোষের অনেক পদে উল্লিখিত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অচ্যুতানন্দের *শূন্যসংহিতা* গ্রন্থে ভক্তসঙ্গে চৈতন্যদেবের কীর্তন প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন :

---

১. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৩৯৪

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯৫

বৈষ্ণবমণ্ডলী খোলকরতাল বজাই বোলন্ত হরি।
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার দণ্ডকমণ্ডলুধারী ॥
অনন্ত অচ্যূত ঘেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এ পঞ্চ সখাহিঁ নৃত্য করি গলে গৌরচন্দ্র সঙ্গত ॥[১]

৩. বাংলাদেশের ভক্ত-বৈষ্ণবরা নীলাচলে আসতেন চাতুর্মাস্য ব্রত উপলক্ষ্যে। চার মাস তাঁরা সেখানে থাকতেন এবং রথযাত্রার পরে ফিরে আসতেন। এই সময়ে নীলাচলে কীর্তনের সমারোহ খুব বেড়ে যেত। *চৈতন্যচরিতামৃত* হতে জানা যায়, প্রথমবার ভক্তরা আসলে চৈতন্যদেব কীর্তনীয়া সম্প্রদায়কে চারটি ভাগে ভাগ করে জগন্নাথদেবের মন্দিরে কীর্তন করিয়েছিলেন। প্রতিটি সম্প্রদায়ে ছিল দুটি মৃদঙ্গ ও আটটি করতাল। স্বয়ং চৈতন্য কীর্তন করে মন্দির প্রদক্ষিণ করেছিলেন। মুরারিগুপ্তের *কড়চা*-এ (৪/১/১) এর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

৪. রথযাত্রার সময় জগন্নাথ মন্দির হতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ বের হয়ে গুণ্ডিচা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, আবার সাতদিন পরে বিগ্রহ মূল মন্দিরে ফিরে আসে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে চৈতন্যদেব রথযাত্রার দিন বিরাট কীর্তন-সমারোহের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই কীর্তনের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে কবি কর্ণপুরের *চৈতন্যচরিতামৃতম্*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে। এই কীর্তনে সাতটি দল বা সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেছিল। গায়ক সংখ্যা ছিল ২৪ জন এবং মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন ৮ জন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একজন ছিলেন প্রধান গায়ক, একজন নর্তক ও দুইজন মৃদঙ্গ বাদক ও পাঁচজন ছিল দোহার। মুখ্য ছিল চারটি সম্প্রদায়। এই চার সম্প্রদায়ের মূল গায়ক ছিলেন যথাক্রমে : স্বরূপ দামোদর, শ্রীবাস

পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ ঘোষ। এছাড়াও ছিল কুলীন কীর্তনীয়া সম্প্রদায়, শ্রীখণ্ডের কীর্তনীয়া সম্প্রদায় এবং শান্তিপুরের আচার্যের সম্প্রদায়। সম্প্রদায়গুলোর বিভাজন ছিল নিম্নরূপ :

১ম দল বা সম্প্রদায় : মূল গায়ক : স্বরূপ দামোদর।
দোহার : দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীগোবিন্দ
নর্তক : শ্রীঅদ্বৈত।

২য় দল বা সম্প্রদায় : মূল গায়ক : শ্রীবাস।
দোহার : গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান শুভানন্দ, শ্রীরাম পণ্ডিত।
নর্তক : শ্রীনিত্যানন্দ।

৩য় দল বা সম্প্রদায় : মূল গায়ক : মুকুন্দ দত্ত।
দোহার : বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন ও আরও দুইজন।
নর্তক : শ্রীহরিদাস ঠাকুর।

---

১. অচূত্যানন্দ, *শূন্যসংহিতা*, ১ম অধ্যায়, হীতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস*, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১০৩

৪র্থ দল বা সম্প্রদায় : মূল গায়ক : গোবিন্দ ঘোষ।
দোহার : বাঘব, হরিদাস, বিষ্ণুদাস, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ
নর্তক : বক্রেশ্বর পণ্ডিত।

৫ম দল বা সম্প্রদায় : মূল গায়ক : অজ্ঞাত।
দোহার : অজ্ঞাত।
নর্তক : রামানন্দ বসু।

৬ষ্ঠ দল বা সম্প্রদায় : মূল গায়ক : অজ্ঞাত।
দোহার : অজ্ঞাত।
নর্তক : নরহরি সরকার এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন।

৭ম দল বা সম্প্রদায় : মূল গায়ক : অজ্ঞাত।
দোহার : অজ্ঞাত।
নর্তক : অদ্বৈত-পুত্র অচ্যুতানন্দ।

জগন্নাথদেবের রথকে ঘিরে এই কীর্তনের দলের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব, এবং তিনি প্রত্যেকটি দলে আলাদা-আলাদা ভাবে কীর্তন ও নৃত্য করেছিলেন। এই কীর্তনযজ্ঞে দেখা যায় চৈতন্য নিজেকে transformation প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করেছেন এবং নৃত্য ও কীর্তনের ক্ষেত্রে Composition-এ এক

ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। অনুমান করা যেতে পারে, এই মহাসমারোহে কীর্তনই পরবর্তীকালে বাংলাদেশে সংকীর্তন ও পদাবলি কীর্তনের ধারাকে বেগবান করে এবং একটি আনুষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করে দেয়। ভক্তির রসময়তা, প্রেমের পল্লবগ্রাহী আত্মনিবেদন যেন ভক্তকুলকে প্লাবিত করেছিল প্রেমবন্যায় ও ভক্তির ফল্গুধারায়। কীর্তন যেন হয়ে উঠলো :

> নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
> নো বা বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
> কিন্তু প্রদ্যন্নিখিলপরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
> গোপর্ভ্তিঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।
> অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, চিত্রকর, গৃহস্বামী অথবা বনবাসী সন্ন্যাসী আমি ইহার কিছুই নহি, কিন্তু সমুচ্ছলিত পরমানন্দের সুখসাগর গোপীবল্লভের পাদপদ্মযুগলের আমি দাসানুদাস।[১]

নীলাচল পর্বে পদগানের দৃষ্টান্ত বেশি। কারণ, বাংলায় পদগানের ঐতিহ্য বেশ পুরানো। *গীতগোবিন্দের* মধুর কোমলকান্ত পদাবলি গান পদগানের আদর্শ স্বরূপ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস* (১ম ভাগ)[২] গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

---

১. বাসুদেব সার্বভৌম-রচিত শ্লোক, শ্রীরূপ গোস্বামী (সংকলিত) *পদ্যাবলি*, উদ্ধৃতি, হীতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস*, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১০৭

২. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস (১ম ভাগ)*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা-৬, ১৯৭০, পৃষ্ঠা -৮২- ৮৮, ১২০ - ১৩৪, ১৯৮, ২০৭

নীলাচলে বহু জনতার উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে কীর্তনে পদাবলি গান হয়েছিল। উদ্দণ্ড কীর্তনের মাঝে মাঝে পদাবলি গান হওয়াতে এই গানে রূপ-আঙ্গিকের কিছু বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রকাশ্য কীর্তনে বিশেষভাবে পদাবলি কীর্তনে চৈতন্যদেব যে রীতি প্রবর্তন করেছিলেন তাই তাঁর উত্তরকালে লীলাকীর্তনে এক অভিনব বিকাশ নিয়ে আসে। অতঃপর – বৈষ্ণব পদাবলি খোলা আসরে লীলার অপরূপ মাধুর্য নিয়ে হাজির হয়। সংগীতের সুরধারায় ভক্তজন-মন প্লাবিত হতে থাকে।

খেতুরি উৎসব : পদাবলি কীর্তনের বিকাশ, প্রস্তুতি ও উপযোগিতা

চৈতন্যোত্তর যুগে ভক্তি-আন্দোলনের ধারা নানা কারণে ব্যাহত হয়েছিল। এর যেমন রয়েছে সামাজিক কারণ, তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিক পটভূমি। চৈতন্যদেবের নামে তখন কী যে অসামাজিক ভাবধারা প্রচলিত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক সারবত্তা বিস্তৃত গবেষণার বিষয়। বহুকাল পর্যন্ত চৈতন্যের ধর্ম-আন্দোলনের কোনো নির্ধারিত বা সর্বগ্রাহ্য তত্ত্ব প্রচার পায়নি। ফলে, এই সময় দেখা যায় – বৃহৎ বঙ্গে বহুতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। শুধু তত্ত্বই নয়, বৈষ্ণবগোষ্ঠী বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আবার বহু স্থানে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বও উদ্ভাবিত হয়েছে। এই বিরুদ্ধ পরিবেশের উৎস সম্ভবত শ্রীখণ্ডনিবাসী নরহরি সরকার প্রবর্তিত 'গৌরনাগরবাদ' তত্ত্ব। তান্ত্রিক প্রভাবপুষ্ট চিরকুমার বৈষ্ণব সাধক নরহরি সরকার

'বামাচারী' তন্ত্রের দ্বারা সুস্পষ্ট প্রভাবিত ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। কারণ, চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ হতে জানা যায় – পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম গদাধর পণ্ডিত ও নরহরি সরকারের সখ্য ছিল এবং তাদের সাধনার পথও ছিল প্রায় একই। গদাধরের অনুসারীদের মতে, গদাধর পণ্ডিত ছিলেন স্বয়ং রাধার অবতার এবং চৈতন্য ছিলেন কৃষ্ণের অবতার। ফলে অনুগামীদের মধ্যে দেখা যায় বামাচারী তন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাবপুষ্ট সাধন-ধারা। তাঁদের দৃষ্টিতে গদাধররূপী রাধা 'কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ সখী বিপরীত-রতি প্রিয়া'।[১] অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের যে পরিণাম দেখা যায় তা সত্যিই অভাবনীয় এবং বেদনাদায়ক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাঢ়ে-বঙ্গে, অর্থাৎ বৃহৎ বাংলায়-ই বৈষ্ণবগোষ্ঠীর বহু দল-উপদল পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিল :

অদ্বৈত আচার্যের অনুগামী বৈষ্ণব গোষ্ঠী।
নিত্যানন্দের অনুগামী বৈষ্ণব গোষ্ঠী।
শ্রীখণ্ডের "গৌরনাগরবাদী" বৈষ্ণব গোষ্ঠী।

---

১. রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী, *সাধনদীপিকা*, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), হরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ, ১৯৪৬, শ্লোক-৫, পৃষ্ঠা-১৩৫

গদাধর পন্ডিতের অনুগামী "গদাই-গৌরাঙ্গ" বৈষ্ণব গোষ্ঠী।
চৈতন্যপূজক "গৌরপারম্যবাদী" সম্প্রদায়।
বিষ্ণু প্রিয়া দেবীর ভক্ত-গোষ্ঠী।
সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়।[১]

এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ। যেমন : গৌরনাগরবাদীগণ প্রচার করতে লাগলেন, গৌরাঙ্গ নারীর দিকে না তাকালেও বা তাদের সঙ্গ কামনা না করলেও, নারীরা গৌরাঙ্গের প্রেমে পড়ে উন্মাদিনী হয়েছেন। এই উন্মাদগ্রস্ততার বিবরণ দিয়ে অনেক বৈষ্ণব কবি পদও রচনা করেছিলেন। সেই সব পদের মূল বক্তব্য অভাবনীয় ও অশ্রাব্য। একটি পদের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

একদিন আমি শাশুড়ী ননদী বসিয়াছি আঙ্গিনায়।
খেড়কীর পথে বাইতে দেখিনু যাইছে গৌরাঙ্গ রায় ॥ ...
অঙ্গের বসন শিথিল দেখিয়া শাশুড়ী দিলেন তাড়া ॥
বিবশ ননদী গোরারূপ হেরি সে তাড়া না শুনিল।
দেখিতে দেখিতে সর্বাঙ্গ উলঙ্গ বসন পড়িয়া গেল ॥
তা দেখিয়া আমি হাসিতে হাসিতে বস্ত্র পরাইতে গেলাম।
বস্ত্র পরাব কি! গৌররূপ হেরি নিজেই উলঙ্গ হৈলাম ॥
দুহারে শাসিতে কোরধ করিয়া শাশুড়ী নিকটে গেল।
বিধির কি কাজ! গৌরাঙ্গ দেখিয়া বুড়িও উলঙ্গ হৈল ॥[২]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চৈতন্যদেবের ভক্তি-আন্দোলন কোন পথে ধাবিত হয়েছিল এবং কোন পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঐ সব দল ও উপদল তাদের মতাদর্শ প্রচার করছিল।

এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবনের উদ্ভাসিত তত্ত্বাবলির গভীর প্রয়োজন দেখা যায়। এ - বিষয়ে গবেষক রমাকান্ত চক্রবর্তী যে অভিমত দিয়েছেন তা স্মরণযোগ্য :

> বৃন্দাবনের গোস্বামীরা বৈষ্ণবীয় অতিন্দ্রিয়বাদকে শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁরা সদাচারের উপরে, বৈষ্ণব স্মৃতির উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বৈষ্ণবীয় তুরীয় আদিরসকে তাঁরা যে ভাবে হিন্দুধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করেছিলেন, তার কোনও সমান্তর রাঢ়ে বঙ্গে দেখা যায়নি। অদ্বৈত আচার্যের জ্ঞানভক্তি নিত্যানন্দের দাস্যভক্তি, গদাধর পণ্ডিতের রাধাভাব, নরহরি সরকারের গৌরনাগরবাদ-এ সবের কোনও সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল না। চৈতন্যের মতকে কেন্দ্র করে ঔপসাম্প্রদায়িক বিভিন্নতাও কাম্য ছিল না।[৩]

বাংলায় বৈষ্ণবদের দলাদলি ও সার্বিক সমস্যার কথা বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ জানতেন। তবে বাংলার বৈষ্ণবদের সাথে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের এক ধরনের বিচ্ছেদ পরিলক্ষিত হয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর সাত ও আটের দশকে রচিত জয়ানন্দের *চৈতন্যমঙ্গল* এবং লোচন দাসের *চৈতন্যমঙ্গল* -

১. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ, কলকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-৮৩

২. জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত, *শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৯৮

৩. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ, কলকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-৮৫

এই দুই চৈতন্যচরিত গ্রন্থে গোস্বামীদের সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন থেকেছেন। সম্ভবত এর মূল কারণ, উপাস্য ও উপাসনা পদ্ধতি নিয়ে এবং অন্য কারণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এসব কারণেই সম্ভবত নিত্যানন্দের সহধর্মিণী জাহ্নব দেবী দুইবার বৃন্দাবনে গমন করেন এবং ফিরে এসে বৈষ্ণবদের একত্র করার মানসে প্রধান বৈষ্ণবদের সাথে কথা বলেন। নিত্যানন্দ দাসের *প্রেমবিলাস* গ্রন্থে এসবের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের তত্ত্ববিচার ও শাস্ত্রালোচনা এতই খ্যাত হয়েছিল যে নবীন তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা গোস্বামীগণের কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গমন করতে থাকে।

বৃন্দাবনে গমনকারী নবীন তত্ত্বানুসন্ধানীদের মধ্যে তিনজন ছিলেন প্রভাবশালী বৈষ্ণব। এঁরা হলেন : শ্রী নিবাস আচার্য, শ্রীনরোত্তম দত্ত এবং শ্যামানন্দ। এঁদের নিবাস ছিল যথাক্রমে: শ্রীনিবাস – বর্ধমান জেলার যাজীগ্রামের ; শ্রীনরোত্তম দত্ত – রাজশাহী জেলার খেতুরীর, এবং শ্যামানন্দ – মেদেনীপুর জেলার ধারেন্দা-বাহাদুরপুর গ্রামের। নিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন সম্ভবত ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে বা পরে। তাঁদের বৃন্দাবনে আগমন এবং বসবাসের সময় রূপ-সনাতন জীবিত ছিলেন না। এঁদের শাস্ত্রীয় শিক্ষা শ্রীজীব গোস্বামীই প্রদান করেন। বৃন্দাবনেই শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরোত্তম ও শ্যামানন্দের পরিচয় হয়। এঁদের সম্বন্ধে জানা যায় যথাক্রমে : যদুনন্দন-রচিত *কর্ণানন্দ*, গোপীজনবল্লভ দাস-রচিত *রসিকমঙ্গল* এবং নরহরি চক্রবর্তী রচিত *নরোত্তম-বিলাস*-গ্রন্থ হতে। এই তিনজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের হাতে জীব গোস্বামী নির্বাচিত পুথিসমূহ বাংলায় নিয়ে প্রচারের জন্য তুলে দেন। এইসব পুথির মধ্যে অধিকাংশই ছিল রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীর রচনাবলি। আরও ছিল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর

হরিভক্তিবিলাস ও অন্যান্য গ্রন্থ। দুই গাড়ি ভর্তি পুথি নিয়ে এই বৈষ্ণবত্রয় যখন বাংলায় প্রবেশ করেন তখন গোপালপুর নাম স্থানে ডাকাতেরা পুথি-ভর্তি গাড়ি দুটিকে লুঠ করে। এমতাবস্থায় নিবাস-আদেশে নরোত্তম খেতুরিতে এবং শ্যামানন্দ ধারেন্দাতে চলে গেলেন। পুথির খোঁজে নিবাস বিষ্ণুপুর আসেন এবং পরে বাগদি-জাতির রাজা বীরহাম্বীরকে শিষ্য করেন। পরবর্তীকালে এই বীরহাম্বীরের সহযোগিতায় লুণ্ঠিত পুথি উদ্ধার হয়।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই তিনজনের মধ্যে নরোত্তম ছিলেন উচ্চপর্যায়ের প্রচারক ও সংগঠক। তিনি একটি বিষয়ে সম্ভবত নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, শাস্ত্রসম্মত তত্ত্বালোচনা বাদ দিয়ে চৈতন্য-পন্থাকে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। এ-বিষয়ে চৈতন্যপন্থীদের সার্বিক তত্ত্ব ও শাস্ত্রালোচনার ফল হলো বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত। সুতরাং এই পন্থাকে সুদৃঢ় করতে গোস্বামী সিদ্ধান্তের কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু বাংলায় গৌরপারম্যবাদীদের এতই প্রভাব ছিল যে সমন্বয় ভিন্ন বাংলায় গোস্বামী - সিদ্ধান্ত প্রচার ছিল প্রায় অসম্ভব। নরোত্তম দত্তের দীক্ষাগুরু লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন গৌরপারম্যবাদী এবং তাঁর শিক্ষাগুরু শ্রীজীবগোস্বামী ছিলেন ভিন্ন মতাবলম্বী। ফলে বাংলায় ফিরে আসার পরে তাঁদের আদেশ নিয়ে নরোত্তম দোটানার মধ্যে পড়ে যান এবং দ্বৈত প্রভাবে গৌরমণ্ডল-ব্রজমণ্ডলের মতাদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলায় ভক্তি-আন্দোলনে গৌরপারম্যবাদ ও কৃষ্ণপারম্যবাদ – এই উভয়ধারারই উৎস চৈতন্যদেবের জীবন ও সাধনা। এই ধারণাকে কেন্দ্র করেই খেতুরি মহোৎসবের সূচনা হয়।

বৃন্দাবনে এই তিন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব তাঁদের জ্ঞান ও নিষ্ঠার জন্য উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীনিবাস–'আচার্য', নরোত্তম–'ঠাকুর মহাশয়' এবং শ্যামানন্দ–'প্রভু' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। প্রচলিত একটি কিংবদন্তি আছে: বাংলায় পুথি নিয়ে ফিরে আসার পরে শ্রীনিবাস, গদাধর পণ্ডিত ও নরহরি সরকারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময়ে নিবাসের পাশে এসে দাঁড়ান পদাবলির বিখ্যাত কবি গোবিন্দ দাস কবিরাজের বড় ভাই রামচন্দ্র দাস কবিরাজ। কাঙ্ক্ষিত কর্মপন্থা স্থির করার জন্য এই ত্রয়ীবৈষ্ণব পুনরায় বৃন্দাবন যান এবং শ্রীজীব গোস্বামীর সাথে আলোচনায় তাঁদের পরবর্তী কর্মপন্থা নিশ্চিত করেন। অনুমান করা যেতে পারে, শ্রীজীব গোস্বামী কৃষ্ণপ্রেমের 'স্বকীয়-ভাব' ও 'বৈধী-তত্ত্ব' প্রচারের ওপর জোর দেন এবং নরোত্তমকল্পিত মহোৎসবের আয়োজন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। আমাদের অভিমত, গোস্বামী সিদ্ধান্তকে ভিত্তি ধরে গোস্বামীশাস্ত্রবর্ণিত 'কৃষ্ণপারম্যবাদের' সাথে প্রচলিত ভক্তিধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেষত গৌরাঙ্গ-উপাসনা, কীর্তনের মাহাত্ম্য ও সহজপন্থী ধ্যানধারণার এক বিশেষ সমন্বয় সাধিত হয় এবং এই সমন্বিত রূপই পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রূপ পরিগ্রহ করে। খেতুরির মহোৎসব, বাংলার বৈষ্ণবদের একত্র করার ও ঐক্য স্থাপন করার এক নিগূঢ় প্রয়াস।

সবচেয়ে বড় মহোৎসব খেতুরিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে কাটোয়াতে এবং শ্রীখণ্ডে পরপর দুটি বৃহৎ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।[১] ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন জাহ্নবাদেবী, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্যামানন্দ প্রভু, রামচন্দ্র কবিরাজ এবং তাঁদের সমর্থকগণ। অনুমান করা যায় ১৬১২ থেকে ১৬২০-এর মধ্যেই এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খেতুরি উৎসবের মধ্যদিয়ে কৃষ্ণ পূজন. চৈতন্য পূজন, মহোৎসব, বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত*, কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত*

গ্রন্থপাঠ, বিশেষভাবে কীর্তন অনুষ্ঠান ও অন্যান্য আচারাদিও প্রাধান্য পায়। এই খেতুরি উৎসবেই কীর্তন স্বতন্ত্র সাংগীতিক বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয় এবং এর বিভিন্ন ধারার সূচনা হয়। খেতুরি-মহোৎসবের একটি বড় প্রাপ্তি হলো – নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আঞ্চলিক ঐতিহ্যের সাথে তত্ত্ব ও শাস্ত্রের সমন্বয় করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সামাজিক সংগঠনকে দৃঢ় করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টার অভিনব প্রকাশ নরোত্তম-প্রবর্তিত নতুন কীর্তকৌশল। এই কৌশলে ছিল বাংলায় প্রচলিত কাব্যসংগীত ও লোকসংগীতের সঙ্গে প্রবহমান ভারতীয় রাগসঙ্গীতের মিলন ঘটিয়ে কীর্তনে এক নতুন কৌশল প্রবর্তন করা। নরহরি চক্রবর্তীর *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে এই মিশ্রিত ধারার কীর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিবরণটি প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনায় উদ্ধৃত করা হলো:

প্রথমেই দেবী দাস মর্দ্দল বামেতে।
করে হস্তাঘাত - প্রেমময় শব্দ তাতে ॥
অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে।
শ্রীবল্লবদাসাদি সহিত বিস্তারয়ে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গদাসাদিক মনের উল্লাসে।
বায় কাংস্যতালাদি প্রভেদ পরকাশে ॥

---

১. এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় - নরহরি চক্রবর্তী, *নরোত্তমবিলাস*, রাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন (সম্পাদিত),
রাধারমণ প্রেস, বহরমপুর, ১৯২১, পৃষ্ঠা-৮৮-১২৮, নিত্যানন্দ দাস, *প্রেমবিলাস*, যশোদালাল তালুকদার সম্পাদিত), অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, বিলাস - ১৪ ও ১৯

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদদ্বয়।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয় ॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বারালাপ।
আলাপে গোকূল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ ॥
আলাপে গমক মন্দ্র মধ্যতার স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কেবা বা ধৈর্য্য ধরে ॥
গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয়।
যৈছে সে সবার শোভা কহিল না হয় ॥
নরোত্তম বেষ্টিত এ সব পরিকরে।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্য্যের নাই সীমা।
সঙ্কীর্তন আবেশে কি মধুর ভঙ্গিমা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রে।
গণসহ চিন্তয়ে মানসে মহানন্দে ॥
বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপ অদ্ভুতরাগ প্রকট কারণে ॥
রাগিণী সহিত রাগ মুর্ত্তির্মন্ত কৈলা।

শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্ছনাদি প্রকাশিলা ॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক সুধা নহে তার সম ॥
তাল পাঠাক্ষর চারু ছান্দে উচ্চারয়।
বাদকগণের যাতে মোদবৃদ্ধি হয় ॥
ক্রমে ক্রমে গীতবাদ্য বৃদ্ধি হয় যৈছে।
শ্রীপ্রভুগণের প্রেমানন্দ বাঢ়ে তৈছে ॥
খণ্ডবাসী শ্রী রঘুনন্দন প্রেমময়।
সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥
শ্রী প্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল।
তাহে স্পর্শাইলা চন্দন পুষ্পমাল ॥
গণসহ নরোত্তমে করি আলিঙ্গন।
নিজহস্তে পরাইলা শ্রীমালাচন্দন ॥
নরোত্তম গণসহ তাঁরে প্রণময়।
নিবদ্ধ গীতের পরিপাটি প্রচারয় ॥[১]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে কীর্তনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, কীর্তনগানের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি-উল্লিখিত প্রথা এখনও পালন করা হয়। বাজনা কীর্তনের এক অন্যতম অনুষঙ্গ। মৃদঙ্গবাদক বাজনার সাথে মুখ দিয়ে বোল উচ্চারণ করে থাকেন, যা পাট রীতি বলে পরিচিত। এরপর শুরু হয় বর্ণন্যাস স্বরালাপ বা রাগ-রাগিণীর আলাপচারিতা। এই আলাপচারিতায় রাগের সাথে মিলন ঘটে বা আলাপন ঘটে। এই আলাপন অর্থযুক্ত কোন কথার দ্বারা আবদ্ধ নয়, তাই এই রীতি অনিবদ্ধ গীত নামে পরিচিত। অর্থযুক্ত পদে রাগ-রাগিণীর প্রকাশ ঘটলে তা হয়ে ওঠে নিবদ্ধ সংগীত। খেতুরি-মহোৎসবে গাওয়া হয়েছিল প্রবন্ধ সংগীত বা শুদ্ধ সংগীত। রীতিতে ছিল ধ্রুবপদের মতো আলাপ এবং তারপর গীত সংযোজন। কীর্তনের সার্থকতা গায়ক-বাদক উভয়ের সমবেত অনুভূতি বিস্তারের মধ্যদিয়ে। খেতুরি-উৎসবে যে কীর্তন শুরু হয়েছিল তার পূর্বার্ধেই ছিল নিবদ্ধ সংগীত; যা ছিল গৌরাঙ্গবিষয়ক গান। এরপরই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় অভিলাষ করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের বিলাস গান করার। নিত্যানন্দ দাসের *প্রেমবিলাস* গ্রন্থের ১৯ বিলাস-এ বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। *ভক্তিরত্নাকর* ও *প্রেমবিলাস*-গ্রন্থ হতে জানা যায়, খেতুরিতে গৌরাঙ্গবিষয়ক গান হবার পর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলা গান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ধারাই পরবর্তীকালে লীলাকীর্তন নামে খ্যাত হয়েছে। এই লীলাকীর্তনে দেখা যায় রাধাকৃষ্ণ লীলা গান করবার পূর্বে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক গান গাওয়ার রীতি নির্ধারিত হয়। এই রীতিই তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা নামে পরিচিতি পেয়েছে। এ-সবকিছুই খেতুরি মহোৎসবে নরোত্তম ঠাকুরের অবদান। তিনিই প্রথমে রাধাভাবে মগ্ন গৌরাঙ্গলীলাগান এবং পরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ গেয়ে এই রীতির প্রবর্তন করেন। কীর্তনের এই রীতির মধ্যে রয়েছে এক গভীর তাত্ত্বিক যুক্তি। কারণ চৈতন্যদেবই কীর্তনকে 'সাধ্য-সাধন' তত্ত্বে পর্যবসিত করেছিলেন। তাত্ত্বিক যুক্তির মর্মমূলে রয়েছে 'যুগলাবতার তত্ত্ব'। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃতলীলায় যে নিগূঢ় অর্থ-তাৎপর্য আছে তার সার্থক সাধিষ্ঠান চৈতন্যদেবে। তাই রাধা-কৃষ্ণের অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপে যে স্থিতি তার নিগূঢ় প্রেমতত্ত্ব বিকশিত হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু চৈতন্যে। তিনি

১. নরহরি চক্রবর্তী, *ভক্তিরত্নাকর*, নন্দলাল বিদ্যাসাগর (সম্পাদিত), গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ, কলিকাতা-১৯৬০, পৃষ্ঠা-৫২৮-৫২৯

স্বয়ং রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল, কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের সর্বাথ শিরোমণি। কীর্তনের অর্থ-তাৎপর্যে এই তাত্ত্বিক যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে সংগীতের অপার্থিব ভাব ও রস আস্বাদন করা হয়।

খেতুরি মহোৎসবকে কেন্দ্র করে পদ-কীর্তন জনসমক্ষে চলে আসে। নরোত্তম দাসের অনুকম্পায় এই কীর্তন প্রণালীবদ্ধরূপে আসরে উপনীত হলো এবং গায়ক-বাদক-দোহার মিলে যে প্রক্রিয়ায় কীর্তন গাওয়া হবে তারও সাঙ্গীতিক কাঠামো তিনি ঠিক করে দিলেন। নানান রীতিও কীর্তনে প্রতিষ্ঠিত হলো। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'খোলমঙ্গল'। আসরে ভক্ত-বৈষ্ণবের কাছে লীলাকীর্তন শুধু সাংগীতিক বিষয় নয়, আধ্যাত্মিক এবং তা ভক্তিলাভের উপায় বলে বিবেচিত হলো; ভক্তগণ তখন কীর্তনকেই সাধনার অন্যতম অঙ্গ বলে মনে করলো। তবুও কীর্তনে সাংগীতিক বিষয়ের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়নি। এ বিষয়ে গবেষক হীতেশরঞ্জন সান্যাল-এর অভিমত :

> নরোত্তম কীর্তনকে শুধুমাত্র ভক্তিলাভের উপায় হিসাবে দেখেন নাই। তাহার সাঙ্গীতিক সত্তা ও সম্ভাবনা বজায় রাখিয়াছেন। নরোত্তম দাস ভক্তি সাধনার সঙ্গে মার্গ সঙ্গীতের রস ও শৃঙ্খলা অবিভাজ্যভাবে মিশাইয়া দিয়াছেন। এই কারণে নরোত্তমের পরে কীর্তনে সাঙ্গীতিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।[১]

খেতুরি-মহোৎসব এবং নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লীলাকীর্তনের যে রূপ ও তাৎপর্য প্রকাশ করেছিলেন তা পরে নানাভাবে পরিবর্তিত হলেও আদর্শের ক্ষেত্রে আজও তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বাংলার কীর্তন গানের ইতিহাসে ও অর্থ-তাৎপর্যে তাই এই মহোৎসব এবং নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় চিরস্মরণীয় ও প্রণম্য হয়ে রয়েছেন।

---

১. হীতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস*, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৮৬

কীর্তনের শ্রেণিবিভাগ

কীর্তন গান এককালে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ সংগীত ছিল। কীর্তন যে কেবল গ্রামীণগান ছিল তা নয়, নাগরিক জীবনেও এর প্রভাব কোনও অংশে কম ছিল না। বিভাগ-পূর্ব সময় বিবেচনা করলে নবদ্বীপ এবং ঢাকা ছিল কীর্তনের অন্যতম ক্ষেত্র। কীর্তন নিজেই একটি বিশেষ পর্যায়ের গানের শ্রেণি হলেও এর রয়েছে বিষয়ভিত্তিক ও প্রয়োগভিত্তিক ধরন। এই ধরনই কীর্তনের শ্রেণি হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে।

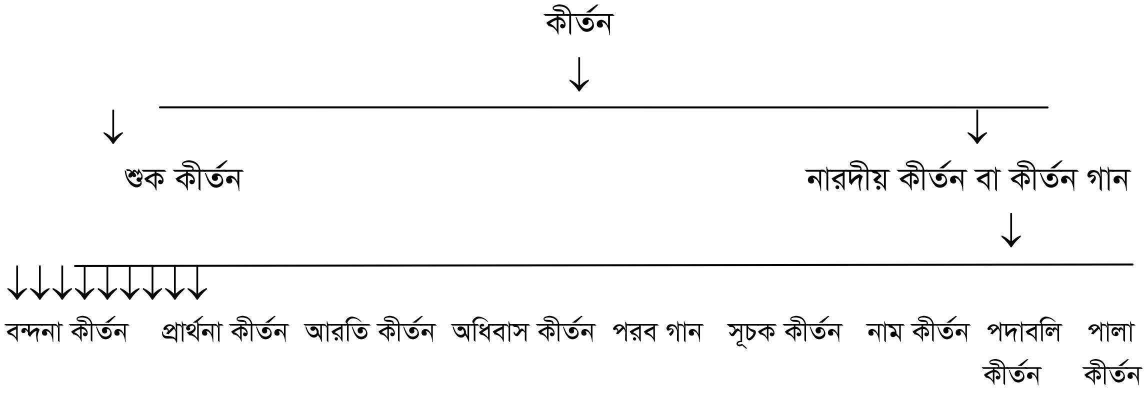

উল্লিখিত ছকনিবন্ধিত শ্রেণিভিত্তিক কীর্তন সমসাময়িক সৃষ্টি নয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি পদাবলি কীর্তনের ধারা প্রাচীন; পরব কীর্তনের ধারাও। পদাবলি কীর্তন বিবর্তিত হয়ে লীলাকীর্তন রূপে প্রতিষ্ঠা পায় এবং চৈতন্যের একান্ত বদান্যতায় নামকীর্তনের সূত্রপাত ঘটে। বৈষ্ণবীয় ভজন-পূজন রীতিতে বা প্রণালিসূত্রে বন্দনা কীর্তন, প্রার্থনা কীর্তন, আরতি কীর্তন, অধিবাস কীর্তনের সূত্রপাত ঘটে। সূচক কীর্তন ষোড়শ শতকে প্রকরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। তবে এরও উৎসধারা প্রাচীন।

বন্দনা কীর্তন

'বন্দনা' রীতিটি প্রাচীন যুগের কাব্য-নিদর্শন। প্রাচীন সাহিত্যের নিয়মানুসারে যে-কোনো গ্রন্থকার তার গ্রন্থসৃষ্টির শুরুতেই উপাস্য দেবতার উদ্দেশে বিভিন্ন ভাষায় বন্দনা লিখতেন। মঙ্গলকাব্যে এই বন্দনা-পর্বটি ছিল খুবই আকর্ষণীয়। *মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল* প্রভৃতি কাব্যে এবং *চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল,* ইত্যাদি সব রচনাতেই 'বন্দনা'-অংশটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই অংশে দেখতে পাওয়া যায় গ্রন্থকার-পরিচিতি এবং আরাধ্য দেব-দেবীর বন্দনা। এই 'বন্দনা গানের' উৎস সম্ভবত 'মঙ্গল গান' এবং 'কড়চা'। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বন্দনা-পর্বটি মঙ্গল কাব্য বা গানের আঙ্গিক কিন্তু কীর্তনের ক্ষেত্রে 'বন্দনা' একটি স্বতন্ত্র পর্যায়ের গান। বৈষ্ণবীয় সাধনায় নববিধা ভক্তির একটি বিশেষ অঙ্গ হলো 'বন্দনা'। বন্দনা কীর্তনের রয়েছে সুপরিচিত তাল ও সুর। এর মাধ্যম এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যাতে সমবেত সবাই এই কীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারে। আসরে বন্দনা কীর্তন চলাকালে নানাবিধ ভাবের উদয় হয়। তখন সহৃদয় ভক্তজন অন্তরের আর্তিতেই 'আখর' সংযোজন করে থাকেন এবং এই পর্যায়ে বন্দনা কীর্তন একটি বিশেষ শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়। বন্দনা কীর্তনের রয়েছে নানাবিধ অঙ্গ। যেমন : গুরুবন্দনা, গৌরবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা, রাধা-গোবিন্দ বন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনা ইত্যাদি।

সহজিয়াপন্থীদের মতে, গুরু-কৃষ্ণ অভিন্ন সত্তা এবং দেখা যায় সমগ্র সাধনপথে এই তত্ত্বটি বৈষ্ণবীয় রীতি ও মতকে জটিল করে তুলেছে। বৈষ্ণবেরা গুরুতত্ত্বকে একটি মৌলিক নীতি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং ভজনের অন্যতম প্রদর্শক হিসেবে একটি দার্শনিক ভিত্তি তৈরি করেছেন। যার মূল বিষয়-দীক্ষাদি গ্রহণের ফলে গৌরাঙ্গ বা রাধাকৃষ্ণের ভজনের অধিকার জন্মে এবং এই অধিকারদাতা গুরু। বাউল ও সুফি মতাদর্শেও আমরা গুরুতত্ত্বকে গুরুত্বপূর্ণ সত্তা হিসেবে পাই। গুরুকে এঁরা দেখেছেন সর্বানন্দময় বিভুসত্তা হিসেবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা গুরুকে কৃষ্ণরূপে, সখারূপে ভজন করে থাকেন। গুরু-অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ বা গুরু-ব্রহ্মা গুরু-বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর কিংবা তিনি 'জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া'। বৈষ্ণবীয় মত—যেহেতু আত্মা তথা পরমাত্মাকে প্রিয়তমরূপে পাবার সুযোগ করে দেন তাই তিনি বিদ্বান এবং তিনিই হরি বা কৃষ্ণস্বরূপীয় সত্তা। *শ্রীমদ্ভাগবত, বামনসংহিতা* প্রভৃতি গ্রন্থে গুরুমাহাত্ম্য প্রণীত হয়েছে :

ক.স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মন্নপি,
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান যো বিদ্বান সো গুরুর্হরিঃ ॥ (*শ্রীমদ্ভাগবত*)
খ. আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়তে সর্ব দেবময়া গুরু ॥ (*বামনসংহিতা*)

অর্থাৎ আচার্যকে আমার স্বরূপজ্ঞান করবে; কখনো তাঁকে তিরস্কার করবে না। তাঁকে সাধারণ মানব গুণে দোষদৃষ্টি রাখা অনুচিত কারণ তিনি সর্বদেবতাময় হয়ে থাকেন।[১]

গুরুকে কৃষ্ণরূপে, আবার সখারূপে ভজনা করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিধি। বৈষ্ণবীয় প্রকরণে গুরুতত্ত্বের সরল বর্ণনা করেছেন নরোত্তম ঠাকুর।

শ্রীগুরু - চরণ পদ্ম কেবলি ভক্তি সদ্ম,
বন্দোঁ মুই সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হতে ॥
গুরুমখপদ্মবাক্য হৃদি করি মহা শক্য
আর না করিও মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তমগতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা ! প্রভু ! কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥[২]

১. গীতা প্রেস, *শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ*, গোরক্ষপুর, ২০১৯, পৃষ্ঠা–৬৫৪, ১৮৪৪
২. শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়, অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ সম্পাদিত *প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১৬, পৃষ্ঠা–৯-১৯

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর *স্তবামৃত লহরী*-তে 'গুর্বাষ্টক' নামে একটি শ্লোক নিবন্ধ একটি বন্দনা রচনা করেছেন, যা আজও বৈষ্ণব ধর্মানুসারীরা এবং কীর্তনীয়া সম্প্রদায় পরম শ্রদ্ধার সাথে কীর্তন করে থাকে। বর্তমান গবেষক বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কীর্তনের আসর পর্যবেক্ষণে বেশকিছু প্রসিদ্ধ গুরুবন্দনা কীর্তন কীর্তনীয়াদের গাইতে দেখেছে। এর মধ্যে বেশি জনপ্রিয় গুরু বন্দনা পদটি বৈষ্ণবদাসের রচনাকৃত। পদটি নিম্নরূপ:

১. জয় জয় শ্রী গুরু প্রেম-কলপ-তরু
অদভূত যাক প্রকাশ।
হিয়-অগেয়ান তিমির সুনিবিড়
জ্ঞান-কিরণে করু নাশ ॥
হই লোচন-আনন্দ ধাম।
অযাচিত এ হেন পতিত হেরি পহুঁ
যাচি দেওল হরিনাম ॥
দূরগতি অগতি অসত-মতি যো জন
নাহি সুকৃতি-লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল-ভজন-ধন

তাহে করত উপদেশ ॥
নিরমল গৌর প্রেম-রস-সিঞ্চনে
পূরণ সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণবদাস ॥[১]

অন্য একটি পদও শোনা যায় :

২. শ্রীগুরু-বৈষ্ণব অবতার সার।
নাম-প্রেম দিয়া সকল তরাইলা সংসার ॥
অধম দুর্গত জনের করিয়া উদ্ধার।
এইত ভরসা চিত্তে মুঞি হমু পার ॥
এই বড় ডর হয় আমার অন্তরে।
মো সম পাতকী নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥
নিরপরাধী পাপী যত তারা হৈল পার
সাপরাধ মহাপাপী মুঞি জীব ছার ॥
সকল খণ্ডিতে পারে করুণা তোমার।
লোকে শাস্ত্রে শুনি অতি ভরসা আমার ॥
এজন উদ্ধার করি দেখাও নিজবল।
রাধামোহন যশ গায় আর ভুবন সকল ॥[২]

---

১. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-১০১৯
২. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী (?) কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৪

উল্লিখিত পদগুলোতে দেখতে পাওয়া যায় যথাযথ বৈষ্ণবোচিত আর্তি এবং শ্রীগুরুদেবের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা।

‘গৌর বন্দনা’কীর্তন গানের ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশকীয় বিষয়। কীর্তনের শুরুতেই চৈতন্যদেবের বন্দনা গান গাওয়া হয়। বিশেষত লীলাকীর্তন শুরুর প্রাক্কালে এই বন্দনা গানই গৌরচন্দ্রিকা। এই ধরনের গান মূলত আবাহন পর্যায়ের। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ‘আপত্তনের’ সূত্রানুযায়ী, অর্থাৎ ‘পূর্বরূপ’ ও ‘উত্তররূপ’-সুরের আলাপে এই বন্দনা গাওয়া হয়। আবাহনে থাকে ‘গৌর এসো, এসো হে’ ... ইত্যাদি ভাব। আবার এই সূত্রে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের আবাহনও করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ কীর্তনীয়াগণ নরহরি সরকার এবং নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পদ গেয়ে থাকেন। আপত্তনের অংশ দুটিতে তাঁরা বিভিন্ন আখর সংযোজন করে দর্শক-শ্রোতার হৃদয় বিগলিত করে থাকেন। প্রচলিত পদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

১. এস দুটি ভাই গৌর নিতাই
দ্বিজমনি দ্বিজরাজহে
পূজিব চরণ এই আকিঞ্চন
রাখিব হৃদয় মাঝ হে ॥

যন্ত্র যদি পড়ে থাকে
লক্ষ জনার মাঝে
যন্ত্রিক বিহনে যন্ত্র
কেমনে যে বাজে ॥[১] ...

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ বাঙালি বৈষ্ণব ও অন্যান্য মতাদর্শীদের একটি নিত্যপাঠ অনুষ্ঠান। এই পাঠ-অনুষ্ঠানে আদ্যন্ত বা আঙ্গিক কীর্তন হিসেবে **'পঞ্চতত্ত্ব বন্দনা'** কীর্তন করা হয়ে থাকে। এই বন্দনা মূলত 'গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস ও অন্যান্য গৌরপরিকরদের সূচক কীর্তন বা জয়সূচক গান। এক্ষেত্রে সমবেত প্রায় সবাই এই কীর্তনে অংশ নিয়ে থাকেন। প্রধান কীর্তনীয়া উপযুক্ত স্থানে বিশেষ বিশেষ আখর সংযোজন করে থাকেন। এই কীর্তন গ্রন্থ পাঠের শুরুতে অবশ্য কর্তব্য হিসেবে গাওয়া হয়। পদটি নিম্নরূপ:

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ।
প্রভু নিত্যানন্দ আমার প্রাণ গৌরচন্দ্র ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ ।
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ ॥[২]

---

১. বর্তমান গবেষক-এর ক্ষেত্রসমীক্ষায় বাংলাদেশের বিখ্যাত কীর্তনীয়া অশোক কুমার গোস্বামী - এর সাথে আলোচনায়এই পদটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্ষেত্রসমীক্ষা : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, রাধাবল্লভ অঙ্গন, বানীবহ,রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী
২. এই অংশটি কীর্তনীয়ারা একটু টেনে দাসপ্যারী তালে গেয়ে থাকেন

জয় জয় যশোদানন্দন শচীসূত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ ॥
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
জয় জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ ॥
জয় জয় কাশী মিশ্র সার্ব্বভৌম জয় প্রতাপরুদ্র।
জয় জয় কানাই খুটিয়া শিখি মাহিতী গোপীনাথ আচার্য্য ॥
জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে নাচেন সেন শিবানন্দ।
জয় জয় কাশীবাসী তপন মিশ্র জয় প্রকাশানন্দ।
জয় জয় ছোট বড় হরিদাস জয় দাস গোবিন্দ ॥
জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টি মোহান্ত ॥
জয় জয় গিরিপুরী ভারতী আদিপুরী মাধবেন্দ্র ॥
জয় জয় ছয় চক্রবর্তী অষ্ট কবিরাজাচন্দ্র।
জয় জয় বসুধা জাহ্নবী প্রাণ গঙ্গাধর চন্দ্র ॥

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
জয় জয় কালিদাস ঝড়ু ঠাকুর জয় উদ্ধারণ দত্ত ॥
জয় জয় রাঘব পণ্ডিত গদাধর দাস জয় ভাগবতাচার্য্য।
জয় জয় অভিরাম গৌরীদাস জয় নন্দন আচার্য্য ॥
জয় জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জয় বক্রেশ্বর পণ্ডিত।
জয় জয় জগাই মাধই চাপাল গোপাল জয় দেবানন্দ ॥
জয় জয় ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় জয় শ্যামানন্দ।
জয় জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম জয় প্রাণ রামচন্দ্র ॥
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী নবদ্বীপচন্দ্র।
জয় জয় উড়িয়া গৌড়িয়া আদি গৌড় ভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় হইয়াছেন আর হবেন যতো বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ ।
তোমরা সবেমিলে কর দয়া আমি অতি মন্দ ॥
কপট খটনটি ঘুচাই ভজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
নিশিদিশি হিয়ায় জাগাও গদাধর গৌরাঙ্গ ॥
শ্রীসংকীর্ত্তন রঙ্গে দেখাও শ্রী নিতাই গৌরাঙ্গ।
যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ ॥
গাই যেন হা নিতাই গৌরাঙ্গ।
তোমরা কৃপা করে দাও গৌর চরণারবৃন্দ ॥ [১]

১. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *পদামৃত লহরী*, জেনারেল লাইব্রেরী এন্ড প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২২৪-২২৫

'রাধাকৃষ্ণ বন্দনা' পাঠ সমাপনান্তে গাওয়া হয়। 'চঞ্চুপুট' তালে সাধারণত গাওয়া হয়ে থাকে। সমবেত ভক্তজন সমস্বরে এই বন্দনা কীর্তন করে থাকেন। পদটি নিম্নরূপ:

জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবন চন্দ্র।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ ॥
জয় জয় রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধাগোবিন্দ।
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদনী ভানুকুলচন্দ্র।
জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি মঞ্জরী অনঙ্গ ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় আভীরীবৃন্দ।
তোমরা সবে মিলে কর কৃপা আমি অতি মন্দ ॥
যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা রাধে গোবিন্দ।
তোমরা সবে মিলে দাও যুগল চরণারবৃন্দ।[১]

'বৈষ্ণব বন্দনা' কীর্তন সর্বক্ষেত্রেই একটি আবশ্যকীয় বিষয়। সকল ধরনের কীর্তনের শেষে সবাই মিলে এই গান করে থাকেন। এই গানের সুর পাঁচালি গানের মতো। বৈষ্ণব বন্দনার অসংখ্য পদ রয়েছে। তার মধ্যে অনেকেই নরোত্তম দাসের নিম্নবর্ণিত পদটি গেয়ে থাকেন:

শ্রীহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবার নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞীর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥
এই ছয় গোসাঞী যার মুঞি তার দাস।
তা সবার চরণ রেণু মোর পঞ্চ গ্রাস ॥
এই ছয় গোসাঞি যাইয়া ব্রজে কৈল বাস।
রাধাকৃষ্ণ নীত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
এই ছয় গোসাঞি প্রভু মোরে কর দয়া।
চরণে স্মরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া ॥
আনন্দে বলহরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পদে পদ্ম করি আশ।
নাম সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥[২]

---

১. জনৈক কীটাধম (সম্পাদিত), *ভজন-পূজন-মালা*, মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, কলিকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৬৮, ৬৯।
২. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী (?) কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৩৯৩
বাংলাদেশের অনেক স্থানে এই পদটিতে নানাভাবে প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযোজন করে গাওয়া হয়।

প্রার্থনা কীর্তন

প্রার্থনা কীর্তন বৈষ্ণবদের কণ্ঠহারস্বরূপ। এই কীর্তনের মূল উপলক্ষ্য – ভক্তহৃদয়ের আর্তি প্রকাশের নিমিত্তে দৈন্যবোধ, বৃন্দাবনের যুগলমুরতি দর্শনের লালসা, আত্মনিবেদন, গৌর-নিতাই চরণে শরণাগতি, বৈষ্ণবের কৃপালাভের ভিক্ষা, শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণে শরণাগতি প্রভৃতি বিষয়। বৈষ্ণব পদাবলিতে অসংখ্য পদ উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, রাধামোহন, বাসুদেব ঘোষ, নয়নানন্দ, বলরাম দাস প্রমুখ পদকারের পদ রয়েছে প্রার্থনা পর্যায়ের। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা বিষয়ক পদ

প্রকৃত অর্থেই হৃদয়গ্রাহী এবং আত্মনিবেদনের আকুতিতে পূর্ণ। পদমাধুর্য বিচারে বা নিবেদনাত্মক হৃদয়াভিব্যক্তি হিসেবে এই পদগুলি তুলনারহিত। প্রার্থনা কীর্তন সাধারণত বিগ্রহের সামনে এবং

আত্মপরিশুদ্ধির নিমিত্তে ছোট ছোট আসরে গাওয়া হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশের অনেক কীর্তনীয়া পালা কীর্তনের আসরেও প্রার্থনাসূচক এই পদগুলো গেয়ে থাকেন। প্রার্থনা কীর্তনের কিছু নমুনা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা হলোঃ

১. মাধব বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয় ॥
গণনইতে দোষ গুণলেশ ন পাওয়বি
যত তহু করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহা নহ মুঞি ছাড় ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখীকুলে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতায়তি পুনপুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥[১](বিদ্যাপতি)

---

১. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-১১৯

২. ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করোঁ এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
এ সংসার জলনিধি তাহে ডুবাওল বিধি
চুলে ধরি মোরে কর পার ॥[১] (নরোত্তম দাস)

৩. গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ঝরে নীর ॥
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাঁড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই মধুর বৃন্দাবন ॥
রূপ রঘুনাথ পদে করিয়ে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সেই যুগল পীরিতি ॥
রূপ রঘুনাথ পাদপদ্ম করি আশ।

প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥[২] (নরোত্তম দাস)

'কামোদ' রাগে নিম্নবর্ণিত পদটি অধিকাংশ কীর্তনীয়া আসরে গেয়ে থাকেন। এই পদটি প্রসিদ্ধ বড় দশকোশী তালে গাওয়া হয়:

হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কণক সম্পূট করি কর্পূর তাম্বূল পূরি
যোগাইব অধর যুগলে ॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণ-ধন
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিতপাবন দেহ মোর এই ধন
তোমাবিনা অন্য নাহি ভায় ॥
শ্রীগুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদে ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥[৩]

---

১. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-৫৫৭

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫৮

৩. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫। পৃষ্ঠা-৫৬৪।

আরতি কীর্তন

সাধারণত খোল, করতাল, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আরাধ্য বিগ্রহকে সামনে রেখে ত্রিসন্ধ্যা যে নিত্যকৃত্য কীর্তন করা হয়, তাই আরতি কীর্তন। আরতি কীর্তন তিন প্রকারের হয়ে থাকে :

ক. মঙ্গল আরতি কীর্তন
খ. মধ্যাহ্নকালীন ভোগ-আরতি কীর্তন
গ. সন্ধ্যা আরতি কীর্তন

ক. প্রত্যুষে শ্রীবিগ্রহের জাগরণের পরে মঙ্গল আরতি হয়। এর উপকরণ : পঞ্চপ্রদীপ, ধূপ, কর্পূর, জলশঙ্খ, আচ্ছাদন, পাখা, ফুল ও চামর। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে–শ্রীবিগ্রহের আরতির কালে প্রাতঃকীর্তন আবশ্যকীয় বিষয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্দিরে (রাধাগোবিন্দ মন্দির) দুটি পর্যায়ে মঙ্গল আরতি হয়ে

থাকে। একটি শ্রীগৌরাঙ্গের আরতি, অপরটি রাধাগোবিন্দ বা যুগলকিশোরের আরতি। শ্রীগৌরাঙ্গের মঙ্গল আরতির সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে পদ গাওয়া হয় তা নিম্নরূপ :

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর ॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙ্গে ॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল ॥
মঙ্গল ধূপদীপ লইয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অনুরূপ ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস।
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস ॥[১]

পদটি **'একতালা'** রাগে ও **'বিভাব'** রাগিণীতে গাওয়া হয়। রাধাগোবিন্দ বা যুগলকিশোরের মঙ্গল আরতি কীর্তন:

মঙ্গল আরতি যুগলকিশোর।
জয় জয় করতহিঁ সখিগণ ভোর ॥
রতন প্রদীপ করে টলমল থোর।
নিরখত মুখ বিধু শ্যাম সুগৌর ॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেম আগোর।
করত নিরমঞ্ছল দোহে দুহুঁ ভোর ॥
বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভুবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগল কিশোর ॥
গাওত শুক পিকু নাচত ময়ূর।

---

১. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা বিরচিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?), পৃষ্ঠা-৩৭৬

চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর ॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় থোর।[১]

খ. বাংলাদেশে মধ্যাহ্নকালীন আরতি কীর্তন ভোগ-আরতি কীর্তন নামে পরিচিত। মধ্যাহ্নে ভোগের নানাবিধ দ্রব্য মন্দিরে সাজিয়ে দেওয়া হয় তুলসীমঞ্জরী দিয়ে। সেবক বা পূজক নানাবিধ দ্রব্য আরাধ্য দেবতায় নিবেদন করেন এবং এই সময় বাইরে সমবেত ভক্তবৃন্দ খোল-করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আরতি কীর্তন করে থাকেন। এই কীর্তন দুটি ভাগে বিভক্ত। গৌরাঙ্গের ভোগারতি এবং রাধাগোবিন্দের ভোগারতি। ব্যবহৃত পদ দুটির কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো:

১. গৌরাঙ্গের ভোগারতি (শ্রীঅদ্বৈত গৃহে ভোজন)

ভজ পতিত-উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।

শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ বিহারী, দীনদয়াময় হিতকারী ॥...
শ্রীশচীনন্দন প্রভু কর অবধান।
ভোজন-মন্দিরে প্রভু করহ পরান ॥
একমুষ্টি তণ্ডুল আমি করেছি রন্ধন।
কৃপা করি দুই ভাই করহ ভোজন ॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাঞি ॥ ...
ভোগের উপরে দিলা তুলসী মঞ্জরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়াবিহারী।[২]...

২. রাধাগোবিন্দের ভোগারতি

ভজ গোবিন্দ মাধব শ্রীগিরিধারী।
জয় গিরিধারী নিকুঞ্জ বিহারী।
কেলিকলা রসময় দুই মনহরী ॥

অথবা

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগিরিধারী।
জয় গিরিধারী গোর্বদ্ধন বিহারী।
জয় জয় দীন দয়াল ভক্ত হিতকারী ॥
শুন শুন রাধাকৃষ্ণ মোর নিবেদন।
ভোগ মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান ॥
আমি অতি দীন হীন ক্ষুদ্র উপাচার।
কৃপাতে অমৃত করে করহ গ্রহণ ॥ ...
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা আর লুচিপুরী।
আনন্দে ভোজন করে বৃন্দাবন বিহারী ॥[৩]...

---

১. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা বিরচিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?), পৃষ্ঠা-৩৭৭
২. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা বিরচিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?), পৃষ্ঠা-২৭
৩. বাংলাদেশের বিখ্যাত কীর্তনীয়া অশোক কুমার গোস্বামীর 'পদ সংগ্রহ' খাতা থেকে পদটি উদ্ধৃত

অসংখ্য আখর-সহযোগে অত্যন্ত সহজ সুরে এই পদগুলি গাওয়া হয়ে থাকে। বৈষ্ণব গৃহে, নাম সংকীর্তন যজ্ঞে এই ভোগারতি কীর্তন হয়।

গ. সন্ধ্যা-আরতি মূলত বৈষ্ণবীয় আরাধ্য-দেউল কৃত্য। খোল, করতাল, কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ছন্দ মিলিয়ে সন্ধ্যারতি কীর্তন হয়ে থাকে। সমানভাবেই বিভিন্ন পর্যায়ে আরতির পদগুলো গাওয়া হয়ে থাকে। আখরের খুব বেশি প্রয়োগ হয় না। সমবেত সকল ভক্তই অংশগ্রহণ করে থাকেন। কখনও কখনও শুধু হাততালি দিয়েও এই কীর্তন করতে দেখা যায়।[১]

সন্ধ্যা-আরতিতে নানাবিধ পর্যায় লক্ষ করা যায়। যেমনঃ গৌরাঙ্গের সন্ধ্যারতি, গোপাল-আরতি, তুলসী-আরতি, হরিবাসরীয় আরতি কীর্তন প্রভৃতি। অষ্টকালীয় নিত্যলীলা স্মরণ-কীর্তনে ও আরতি কীর্তনে করা হয়ে থাকে। বিশেষভাবে, উত্তর গোষ্ঠ পর্যায়ের পালায়। সারাদিন গোষ্ঠ বিহার শেষে গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ

প্রিয় সখা শ্রীদাম-সুদাম-দাম-বসুদাম প্রভৃতি ধেনুবৎসসহ যখন গৃহে ফিরে আসেন তখন সন্ধ্যাবেলা মা যশোদা তাঁর প্রাণাধিক পুত্রকে আদর করে কোলে নিয়ে বসেন এবং গোপালের অপূর্ব মুখপানে চেয়ে আরতি করেন।

বাৎসল্য ভাবাশ্রয়ের একটি অপূর্ব পদ রয়েছে পদকর্তা জগদানন্দের। বাংলাদেশের অধিকাংশ কীর্তনীয়া উত্তর গোষ্ঠ পালায় তাঁর পদটি গেয়ে থাকেন। পদটি নিম্নরূপ :

আরতি করে নন্দরাণী বালক মুখ হেরি।
গায়ত নব নাগরীগণ রাখাল সব ঘেরি ॥
রম্ভাফল, ঘৃত প্রদীপ, পুষ্প রচিত থারি।
সুন্দরীগণ, উলত দেই, শিশুগণ করতারি ॥
রাখি শিঙ্গা বেণু যশোদা মাই, কোলে নিন দোন ভাই।
মাখন দধি, দেই খির, খাওয়ে রাম কানাই ॥
সকল শিশুর চাঁদমুখ তুলি যশোমতি চুম্ব খাই।
মঙ্গল পুছত নন্দঘোষ জগদানন্দ গাই ॥[২]

অন্যান্য সন্ধ্যা-আরতি কীর্তনের কিছু দৃষ্টান্ত :

১. গৌরাঙ্গ আরতি

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি ।
বাজে সংকীর্তন সুমধুর ধ্বনি ॥
কিবা শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥
বিবিধ কুসুম ফুলে বনি বনমালা।

---

১. বর্তমান গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষা: মন্দির পরিক্রমায় এই ধরনের কীর্তন বৈষ্ণব-সেবক কণ্ঠে শুনেছে এবং তাঁদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য উল্লিখিত অংশে ব্যবহৃত হয়েছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

২. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *পদামৃত লহরী*, জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৭৯-৮০

শতকোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকে করজোড় করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে ॥
শ্রীনিবাস, হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।
শিবশুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাহি পরাৎপর ভাব বিভোরে ॥
বীর বল্লভদাস, শ্রীগৌর চরণে আশ।
জগ ভরি রহল মহিমা প্রচার রে।[১]

২. শ্রীরাধিকার আরতি

জয় জয় রাধাজীকো শরণ তুহাঁরি।

ঐছন আরতি যাই বলিহরি ॥ ...
পাট পটাম্বর ওড়ে নীল শাড়ি।
সিঁথি পরে সিঁদুর যাই বলিহারি ॥
নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্ম সখিগণ চামর ঢুলায়ে ॥
কিবা রতনে জড়িত মণি মানিক মোতি।
ঝলমল আভরণ কোটি অঙ্গ জ্যোতি ॥
রাধা পদপল্লব ভকত হি আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা।[২]

৩. শ্রীকৃষ্ণের আরতি

আরতি করিছে তব নন্দকিশোর।
যমুনা পুলিনে বিহরত গোপী চিতচোর ॥
তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোবর্দ্ধনধারী।
মথুরার রাজা তুমি কংসনিধনকারী ॥
কুরুক্ষেত্রে সারথি হে বীর অগ্রগণ্য।
বৈকুণ্ঠ নাথ তুমি হে চির বরেণ্য ॥
অপরূপ রূপ তব তুলনা যে নাই।
মুনি-ঋষি ধ্যান করে সে রূপ সদাই ॥
ত্রিলোকের নাথ তুমি ওগো জনার্দ্দন।
যশোদার দুলাল তুমি শ্রীনন্দনন্দন ॥
দীন নিতাই দাস তোমার চরণে আশ।
অন্তিমেতে ঠাঁই দিও রাঙাচরণ পাশ ॥[৩]

---

১. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *পদামৃত লহরী*, জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ২৩০-২৩১

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩১

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩২

৪. তুলসীদেবীর আরতি

নমঃ নমঃ তুলসী কৃষ্ণ প্রিয়সী।
জয় রাধাকৃষ্ণ পদ সেবা এই অভিলাষী ॥
যে তোমার স্মরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূরণ হয়, কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।
এই মোর অভিলাষ, বিলাসকুঞ্জে দিও বাস, নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপ রাসি ॥
এই নিবেদন ধর, সখির অনুগত কর, রাধাকৃষ্ণ সেবা দিয়ে কর নিজ দাসী।
দীনকৃষ্ণ দাসে কয়, এই যেন মোর হয়, শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসি ॥[৩]

বাংলার বৈষ্ণব সমাজে আরতি কীর্তন বাস্তবিক অর্থেই এক অপূর্ব সম্মিলন। ভক্তি-ভাব-প্রেম বন্যায় ভক্তহৃদয় প্লাবিত করে এ-সব কীর্তন।

অধিবাস কীর্তন

অধিবাস কীর্তনের প্রবর্তক স্বয়ং চৈতন্যদেব। অধিবাস কীর্তন মূলত একটি আনুষ্ঠানিক কীর্তন। এই কীর্তনের উপলক্ষ্য কীর্তন-মহোৎসবের সংকল্পবিষয়ক এক বিশেষ সংকল্পিত কীর্তন। সংকল্পিত কীর্তন বলতে প্রহরব্যাপী সংকল্প। অর্থাৎ আট, ষোল, চব্বিশ প্রভৃতি প্রহরব্যাপী নাম সংকীর্তনকে বুঝায়। শুধু নাম সংকীর্তনই নয়, পদাবলি, পালাকীর্তন এবং অষ্টকালীয় নিত্যলীলাস্মরণকেও বোঝায়। অধিবাস উৎসবের পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলায়অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সময় সাধারণত আরাধ্য বিগ্রহের অভিষেক পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই উৎসবের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিবাসের শুরুতে ভাগবত পাঠ-অনুষ্ঠান হয় এবং গায়ক, বাদক, শ্রোতা, বৈষ্ণবদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আসরে মালা-চন্দন দিয়ে খোল-করতাল-বৈষ্ণব-বন্দনা করা হয়। তারপর অধিবাস কীর্তন শুরু হয়। কোথাও একটি আবার কোথাও পাঁচটি পদ গান গাওয়া হয়। অধিবাস কীর্তন সমাপ্ত হলে পরের দিন সূর্যোদয় হতে কীর্তন শুরু হয়। অধিবাস কীর্তনের মূল পদটির রচয়িতা নয়নানন্দ। বাংলাদেশের বিখ্যাত পদাবলি কীর্তন গায়ক অশোককুমার গোস্বামী ও গোপেশ মোহান্ত-থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় নয়নানন্দের পদটিই অধিকাংশ জায়গায় গাওয়া হয়। তবে কোথাও কোথাও ঐ পদটিসহ আরও চারটি পদ গাওয়া হয়ে থাকে। **'মঙ্গল'** রাগিণীতে **'দশকোশী'** তাল ব্যবহার করে আখরের মাধুর্যে পদটি প্রাচুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ **'লোফা'** তালেও গেয়ে থাকেন। পদটি নিম্নরূপ:

জয় রে জয় রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন সুঠাম।
কীর্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে মুকুন্দ বাসু গুণগান ॥
দ্রাংদ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি, মাদল বাজত, মধুর মধুর রসাল।
শঙ্খ করতাল, ঘণ্টারব ভেল মিলন পদতলে তাল ॥
কো দেই গোরা অঙ্গেঁ সুগন্ধি চন্দন, কো দেই মালতিক মাল।
পিরিতি-ফুলশরে মরম ভেদল, ভাব সহচরি ভাল ॥
কোই কহত গোরা, জানকীবল্লভ, রাধার প্রিয় পাঁচবাণ।
নয়নানন্দের মনে, আন নাহিক জানে, আমার গদাধরের প্রাণ॥[১]

১. শ্রীবন্ধুবিহারী সাহা বিরচিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?), পৃষ্ঠা-৩৮২
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫

অন্যান্য অধিবাস কীর্তনের পদের কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো:

ক. একদিন লহু হাসি অদ্বৈত-মন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিলা রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার।
শুনিয়া আনন্দে হাসি
সীতা ঠাকুরানী আমি
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসব বিধানে
বোলে কিছু শচীর নন্দন ॥[২]...

পরমেশ্বর দাসের এই পদটি **'তেওট'** বা **'মায়ূর তেওট'** তালে সাধারণত গাওয়া হয়ে থাকে।

খ. নানাদ্রব্য আয়োজন করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥
করি এত নিবেদন আনিল মোহান্তগণ
কীর্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
কালি হবে মহোৎসব বিলাস ॥[২] ...

গ. রামরম্ভা আরোপণ, পূর্নঘট সংস্থাপন, আম্রপল্লব সারি সারি।
... দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সবে উতরোল করত আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালা চন্দন, কীর্তন মঙ্গল অধিবাস ॥[৩] ...

ঘ. জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া ঠাকুর অদ্বৈত লইয়া করে খোল মঙ্গলের সাজ ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই ধন দেয় মালা চন্দন
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ ॥[৪] ...

---

১. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-১০৮২
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯৩
৩. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা বিরচিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?), পৃষ্ঠা-৫
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬

ক-সংখ্যক গানটি মূলত বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণের পদ এবং সাধারণত **'একতালি'** সুরে গাওয়া হয়। **'মধ্যম দশকোশী'** তালে **খ-সংখ্যক** পদটি গাওয়া হয়। এই পদটি অনেকে লীলাকীর্তনের অধিবাস-পদ বলে মনে করেন। **'বিভাস-তেওট'** তালে **গ-সংখ্যক** পদটি গাওয়া হয়। এই পদটি মূলত নবদ্বীপ পর্যায়ের অধিবাস। **ঘ-সংখ্যক** পদটি **'কামোদ'** রাগে, **'দশকোশী'** তালে গাওয়া হয়ে থাকে। **খ ও গ-সংখ্যক** পদ-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস এবং **ঘ-সংখ্যক** পদটি বংশীবদন-এর লেখা। এই পদ গাওয়া শেষে কিছুক্ষণ নাম সংকীর্তন করে অধিবাস কীর্তন সমাপ্ত হয়।

পরব গান

রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক বৈষ্ণবদের বেশকিছু পর্ব রয়েছে। এই বিশেষ পর্বকে কেন্দ্র করে ঐ দিনে যে সমস্ত গান গাওয়া হয়ে থাকে তাই 'পরব গান' বা পর্ব গান। যেমনঃ হোরি (প্রচলিত হোলি) ঝুলন রাস, ফুলদোল, বাসন্তী উৎসব (রাস) ইত্যাদি। এসব পর্বকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব ভক্তগণ গীতি-তন্ময়তায় তাঁদের আরাধ্যে ভক্তি-অর্ঘ্য সমর্পণ করেন। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায় অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিতভাবে উল্লিখিত উৎসবগুলো করে থাকেন এবং এ-সব উৎসবকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন স্থানে পালা কীর্তন, নাম সংকীর্তন এবং অষ্টকালীন কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে বসন্তকালীন বিশেষ লীলা হচ্ছে হোরিলীলা। এটি 'দোল অনুষ্ঠান' নামে প্রচলিত ও পরিচিত। এই পর্বের আরও বিশেষ তাৎপর্য হলো এই তিথিতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। সুতরাং দেখা যায়, এই তিথিতে রাধাকৃষ্ণের হোরিলীলার গান যেমন করা হয় তেমনি মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কীর্তনও গাওয়া হয়। বৈষ্ণব পদাবলিতে অসংখ্য পদ রয়েছে হোরিলীলাবিষয়ক। বহুল প্রচারিত কয়েকটি পদের চুম্বক অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হলোঃ

১. শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব বিষয়ক

ক. ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিলা গোরা পড়ে হুলাহুলি ॥
অম্বরে অমর সভে ভেল উম্মুখ।
লভিলা জনম গোরা যাবে সব দুখ ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়ধ্বনি সুরকুলে কুসুম বরিষে ॥[১] ...

'লোফা' তালে পদটি কীর্তনীয়ারা গেয়ে থাকেন এবং বিচিত্র **'আখর'** এতে সংযোজিত হয়।

খ. হের দেখসিয়া, নয়ান ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে।
নদীর নগরে, শাচীর মন্দিরে, চাঁদের উদয় দিনে ॥
কিয়ে নাখবান, কসিল কাঞ্চন, রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর, জলদে নিকসিল, স্থির বিজুরি পারা ॥[২]...

---

১. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা বিরচিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?), পৃষ্ঠা-১২
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১

এই পদটি কীর্তনীয়ারা **'একতালে'** গেয়ে থাকেন।

২. রাধাকৃষ্ণের হোরি বিষয়ক

ক. রঙ্গে হো হো হোরি।
খেলত নওল কিশোরী ॥
বাজত তাল, রবাব পাখোরাজ, সখীগণ ঘন করতারি।
কুঙ্কুম চন্দন, আবির উড়ত ঘন,
বরিখত ঘন পিচকারী ॥
দুহুঁ দুহুঁ খেলন, সমর প্রবন্ধহি, দুহুঁ পর দুহুঁ পড়ু ভোরি।
জিতনু জিতনু ঘন, দুহুঁ দোলে

গরজন সখিগণ ভণ রব জোরি ৷৷[১] ...

খ. রাধা প্যারি সহ খেলত নন্দদুলাল।
অরুণিত মরকত, অরুণিত হেমযুত, ঐছন মুরতি রসাল ৷৷
অরুণাম্বর বর, শোহে কলেবর অরুণ মতি মণিমাল।
নটপটিপাগ, উপরে শিখি চন্দ্রক, উড়ণী রঙ্গ গোলাল ৷৷[২]...

বর্ষালীলা হচ্ছে **'ঝুলন'**। শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথি হতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই লীলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সুন্দর একটি দোলনায় নানান পুষ্প-সমারোহে রাধাকৃষ্ণকে বসিয়ে দোলানো হয়। এই লীলার অপর নাম **'হিন্দোল লীলা'**। এই লীলা প্রসঙ্গের সূত্রপাত রাধারাণীর অভিসারের মধ্য দিয়ে এবং সমাপ্তি ঘটে রাধাকৃষ্ণের মুখোমুখি ঝুলনে বসা এবং পরস্পরের বিরহবোধের মাধ্যমে। প্রেমবৈচিত্ত্যের অপূর্ব প্রকাশ ঘটে এই আবহে। যেমন:

নবঘন কানন শোহন কুঞ্জ।
বিকসিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ ৷৷
নবনব পল্লবে শোভিত ডাল ৷৷
সারি শুক পিক গাওয়ে রসাল ৷৷
ব্রজ রমণীগণ দেয়ত ঝকোর।
গীরত জানি ধনি কারতহিঁ কোর ৷৷
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ ।
গোবিন্দ দাস তহিঁ দেখত রঙ্গ ৷৷[৩]

'রাসলীলা' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চির আকাঙ্ক্ষিত একটি পর্যায় এবং সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। রাসলীলা প্রসঙ্গটির উৎস *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের ২৯ থেকে ৩৩ অধ্যায়। এই পাঁচটি অধ্যায়ে রাস সম্পর্কিত

---

১. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা বিরচিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?), পৃষ্ঠা-২৮২
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৮৫
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৯০

বর্ণনা ও গুহ্য বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বৈষ্ণব কবি এই উৎস থেকেই আপন-আপন সাধনা ও অনুভবে সাংগীতিক বিন্যাস করেছেন। সমগ্র লীলার মূল আদর্শ প্রেম যেখানে কোন আত্মসুখের কামনা-বাসনা নেই; কামগন্ধ বিবর্জিত এক অপূর্ব লীলা। লীলা পরিকরগণ সবাই সেবাভিলাষী। কেউ দাস্যভাবে সেবা-অভিলাষ করছে। কেউ বাৎসল্যভাবে সেবাভিলাষী। আবার কেউ সখ্য এবং মাধুর্য সেবাভিলাষী। এই সেবাভিলাষের মূল সংকল্প হলো কৃষ্ণসেবা। এই লীলা সাধারণ কিছু নয়, এটি পূর্ণ একটি তত্ত্বের প্রকাশ। রাসলীলা-পর্যায়ের কীর্তনে এই বিষয়ভাবই প্রকাশিত।

'রাসলীলা' পর্যায়ের কীর্তনের দুটি প্রকরণ রয়েছে। একটি 'মহারাস' বা 'নিত্যরাস' এবং অপরটি 'শরৎকালীন রাস' বা 'শারদীয় রাস'। শারদীয় রাসকে নর্তক রাসও বলা হয়। নিত্যরাস যে কোন সময়ে গাওয়া চলে কিন্তু শারদীয় রাসের রয়েছে নির্ধারিত সময়। শারদীয় রাস – দেবী কাত্যায়নী পূজার শুভ

বিজয়ার পর দিন একাদশী তিথি থেকে শুরু করে পূর্ণিমা পর্যন্ত এ কীর্তন গাওয়া হয়ে থাকে। বৈষ্ণব মতানুসারে, এই রাসলীলাই হচ্ছে গুহ্যতম লীলা, শৃঙ্গার ও সম্ভোগের পূর্ণতম বিলাসের প্রকাশরূপ। বৈষ্ণব পদাবলি এবং তার কীর্তনে তাই এই লীলা-পর্যায়ে দেখা যায় রসের বিচিত্র বিকাশ। রাগ, রাগিণী, নৃত্য, তালের নব নব প্রকরণের উদ্ভব এবং তার বৈচিত্র্যপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। যেখানে রসরাজ গোবিন্দ মদনমোহনরূপে আস্বাদন করছেন মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধাকে, আবার মহাভাবরূপী শ্রীমতী রাধা আস্বাদন করছেন রসরাজ রূপকে। এই পারস্পরিক আস্বাদনের চরম পর্যায় বা পরিণতিই গৌরাঙ্গ। জড়জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব এই লীলার সারবস্তু। এছাড়াও পর্ব গানের পর্যায়ে আরও দেখা যায় কৃষ্ণের শুভাবির্ভাব তিথি 'জন্মাষ্টমী'কে কেন্দ্র করে 'নন্দোৎসব' লীলাকীর্তন এবং ফুলদোলকে কেন্দ্র করে 'ফুলদোল' উৎসববিষয়ক কীর্তন হতে।

সূচক কীর্তন

সূচক কীর্তন মূলত বিরহ পর্যায়ের গান। বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের ও গুরুবর্গের তিরোধান তিথিকে স্মরণের উপলক্ষ্যে এই কীর্তন গাওয়া হয়। নির্দিষ্ট তালে ও সুরে পদ গেয়ে আচার্যবর্গকে স্মরণ করা হয়। কীর্তন যজ্ঞে নানা সূচক কীর্তন রয়েছে। যেমন : সনাতন গোস্বামীর সূচক, নিবাস আচার্য প্রভুর সূচক, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সূচক ইত্যাদি। সূচক কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকা:

প্রেম সিন্ধু গোরা রায় নিতাই তরঙ্গ তায়
করুণা বাতাস চারিপাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে জগত হাফান ছাড়ে
তাপতৃষ্ণা সভাকার নাশে॥
দেখ দেখ চৈতন্য দয়াময়।
ভক্তহংস চক্রবাকে পিবি পিবি বলি ডাকে
পাইয়া বঞ্চিত কেন হয় ॥[১]...

সূচক কীর্তনে ভক্ত-অন্তরের বেদনামথিত অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

---

১. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-৫৫২

নামসংকীর্তন

নামসংকীর্তন হলো:

চেতদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদংপূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥

অর্থ : শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন জয়লাভ করেছে। কৃষ্ণসংকীর্তনে মনরূপ দর্পন মার্জিত হয়। সংসারের মহাদুঃখের আগুন নিভে যায়। কল্যাণের জ্যোৎস্না নেমে আসে, বিদ্যারূপ বধূ জীবন

লাভ করে, আনন্দের সমুদ্রে জোয়ার আসে, প্রতিপদেই সমস্ত রস সুধার আস্বাদ জন্মায় এবং সমস্ত অস্তিত্বকে যেন শীতল করে দেয়।[১]

নামসংকীর্তনের স্বরূপ হচ্ছে :

নাম সংকীর্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস ॥[২]

বৈষ্ণব তথা কলিযুগে নাম-সংকীর্তনই একমাত্র উপাস্য। চৈতন্যদেব নির্দেশিত অনেকে মিলে গাওয়া নাম-ই নামসংকীর্তন। এই কীর্তনে দেখা যায়, অনেকে মিলে ভগবৎ সম্পর্কিত গান ভগবৎসুখ-নিমিত্ত গেয়ে থাকেন। তাই বলা হয়, 'নামসংকীর্তন কলৌ পরম উপায়'। এই নামসংকীর্তনই মহাদাবাগ্নি থেকে মানুষকে রক্ষা করে। বৈষ্ণবীয় এই বিশ্বাসই 'নাম সংকীর্তন'-এর মূলভিত্তি। সনাতন শাস্ত্রানুযায়ী যুগ চারটি : সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি। এই চারযুগেই রয়েছে 'নাম'। যেমন :

সত্যযুগ : "নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরামুক্তির্ণারায়ন পরাগতির" ॥

ত্রেতা যুগ : "রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসায়ে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।"

দ্বাপর যুগ : "হরে মুরারে মধু কৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥"

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৬১৯-৬২৪
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬১৯

কলিযুগ :"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"[১]

উল্লিখিত কীর্তনগুলোর ত্রাণ-ক্ষমতা আছে বলে এদের তারকব্রহ্ম নাম বলা হয়ে থাকে। নানাবিধ নামকীর্তন বিভিন্নসূত্রে প্রচারিত হলেও চৈতন্যদেবই মূল প্রচারক। তাঁর সামাজিক আন্দোলনের মূল বিষয়ই ছিল নাম সংকীর্তন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বছরের বিভিন্ন সময় নামসংকীর্তন 'যজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই কীর্তনের দল 'সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। আট, ষোল, চব্বিশ প্রভৃতি প্রহরব্যাপী এই কীর্তন হয়ে থাকে। এক-একটি সম্প্রদায়ে বেশ কয়েকজন গায়ক, একজন মূলগায়ক এবং বাদক দিয়ে প্রায় দশ থেকে পনেরো জন থাকে। শুধুমাত্র 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' – নাম গাওয়া হয় বিভিন্ন ক্ষণ অনুযায়ী রাগ-রাগিণীর দ্বারা। সাধারণত, একটি সম্প্রদায়ের কীর্তনের ক্ষণ আড়াই ঘণ্টা থেকে তিন ঘন্টা হয়ে থাকে। এই কীর্তনে বহু বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। যেমনঃ মৃদঙ্গ, করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশি, বেহালা এবং বিভিন্ন লোকজ যন্ত্র, যেমন : খমোক, একতারা, দোতারা, সরোদ, সারিন্দা, বায়া প্রভৃতি। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই কীর্তন নির্দিষ্ট কয়েকটি সুরে গাওয়া হতো, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে এই কীর্তনের প্রথাগত পরিবর্তন শুরু হয়। রাগসংগীতের ধারায় কিছু কিছু সংমিশ্রণ হতে থাকে। অধুনা বাংলাদেশে যে নামসংকীর্তন হয় সেখানে শুদ্ধ রাগের মিশ্রিতরূপের প্রয়োগ হয়ে থাকে। বর্তমান গবেষক নাম-সংকীর্তনের গবেষণায় আট প্রহরভিত্তিক কীর্তনের আটটি বিশেষ রাগের ব্যবহার করতে দেখেছে। কীর্তনীয়াগণের সাক্ষাৎকারে যে সব রাগের পরিচয় পাওয়া গেছে সেগুলো হলো :

প্রথম প্রহর :	সকাল ৬টা থেকে ৮টা।	রাগ : ভৈরবী
দ্বিতীয় প্রহর :	সকাল ৮টা থেকে ১০টা।	রাগ : আশাবরী, আনন্দ ভৈরবী
তৃতীয় প্রহর :	সকাল ১০টা হতে দুপুর ১২টা।	রাগ : দেশ
চতুর্থ প্রহর :	দুপুর ১২টা হতে ২টা।	রাগ : মনোহরশাহী
পঞ্চম প্রহর :	দুপুর ২টা হতে বিকাল ৪টা।	রাগ : কাজরী
ষষ্ঠ প্রহর :	বিকাল ৪টা হতে সন্ধ্যা ৬টা।	রাগ : ভীম পলশ্রী
সপ্তম প্রহর :	সন্ধ্যা ৬টা হতে রাত ৮টা।	রাগ : পুড়িয়া ইমন কল্যাণ
অষ্টম প্রহর :	রাত ৮টা হতে ১০টা।	রাগ : খাম্বাজ
নবম প্রহর :	রাত ১০টা হতে ১২টা।	রাগ : সিন্ধু, মালকোষ
দশম প্রহর :	রাত ১২টা হতে ২টা।	রাগ : বিহাগ খাম্বাজ বা মল্লার
একাদশ প্রহর :	রাত ২টা হতে ৪টা।	রাগ : বিহাগ (রাস)
দ্বাদশ প্রহর :	রাত ৪টা হতে ভোর ৬টা।	রাগ : ললিত[২]

১. উদ্ধৃতি, মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪

২. ক্ষেত্রসমীক্ষা : রাধাবল্লভ অঙ্গন, বাণীবহ, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী, সাক্ষাৎকারদাতা কীর্তনীয়া : অসিতকুমার আচার্য, রাধাগোবিন্দ সম্প্রদায়, ফরিদপুর, তারিখ : ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

পদাবলি কীর্তন

মহাজনী পদের উপযোগী অর্থাৎ সুর-তাল-লয়ে উপস্থাপনই পদাবলি কীর্তনের মূল আধার। বৈষ্ণব আচার্য কবির প্রতিটি গীতিকবিতাই পদ এবং নানান গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় – তাঁদের অধিকাংশ পদই ছিল প্রসিদ্ধ কীর্তন। এই মহাজনকৃত পদ-গানই পদাবলি কীর্তন। এখানে লীলা বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

খুব বেশি নয়। কিন্তু উপস্থাপন কৌশলে থাকে নানান রূপময়তা। পদাবলি কীর্তন মূলত কীর্তন-ধারার প্রাচীনতম নিদর্শন।

লীলাকীর্তন বা পালা কীর্তন

'পালা' শব্দটির অর্থ-তাৎপর্য অনেকটা ইংরেজি Canto এবং যাত্রা বা নাটকের পালার সাথে সম্পর্কিত। এই ধারায় যাত্রা বা নাটকের মতোই চরিত্র বর্তমান থাকে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে প্রকাশিত রাধা, কৃষ্ণ, সখীবৃন্দ, মা যশোদা, গোপ ও গোপললনাবৃন্দ, গোপীবৃন্দ, ব্রজরাখালগণ সকলের সঙ্গে গোবিন্দের বিলাসসূচক লীলাই যখন পালা বা ঘটনা আকারে প্রকাশ করা হয়, তাই লীলা বা পালা কীর্তন। এই কীর্তনের উৎসধারা আনন্দস্বরূপ ভগবৎরূপের অপ্রাকৃত খেলা, কিন্তু তা প্রকট বৃন্দাবনে পরিদৃশ্যমান। গোস্বামীবর্গের রসশাস্ত্র দ্বারা লীলাকীর্তন নিয়ন্ত্রিত থাকে, মুখ্যত, শ্রীরূপ গোস্বামীর *উজ্জ্বলনীলমণি* দ্বারা। রসপর্যায়, নায়ক-নায়িকা, তাঁদের লক্ষণ ও ভাব এই গ্রন্থানুসরণে উপস্থাপিত হয়। ভক্তিসিদ্ধান্তগুলি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ও *ভক্তিসন্দর্ভ* গ্রন্থানুসারে প্রয়োগ হয়। কৃষ্ণস্বরূপের লীলাস্বরূপ প্রসঙ্গ নানাভাবে ভাগবতীয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং তারই সূত্রধরে বৈষ্ণব মহাজনেরা তাঁদের কল্পনাশক্তির ব্যবহারে বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভবের গভীরতার সহায়তায় ভিন্ন ভিন্ন লীলারস-রূপ আস্বাদন করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই অনুভব-রস পারমার্থিক আস্বাদন এবং এর লক্ষ্য পরমপুরুষ কৃষ্ণ। লীলাকীর্তনে তাই রসের বিলাসদ্বারা কৃষ্ণের উপভোগকে ফুটিয়ে তোলা হয়। তাই এই কীর্তন 'রস কীর্তন' নামেও পরিচিত। প্রখ্যাত গবেষক ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী পালা বা লীলা কীর্তনের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। তবে এগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পর্যায় রক্ষা করে। লীলা কীর্তনে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয় :

১. রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ উপযোগী গৌরচন্দ্রিকা প্রথমেই গাওয়া হয়।

২. পদ-সংকলনে শাস্ত্রীয় ক্রম রক্ষা করতে হয়।

৩. ঘটনার রূপ দিতে যে যে ক্ষেত্রে মহাজন পদাবলির অভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে তুকগান বা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করতে হয়।

৪. আখর সংযোজনের ক্ষেত্রে রস-বৈশিষ্ট্য ও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত রক্ষা করতে হয়।

৫. শুদ্ধ কীর্তনের ধারা বজায় রেখে কীর্তন করতে হয় এবং পদের কীর্তন শেষে ভণিতায় পদকর্তার নাম উচ্চারণের সময় বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাতে হয়।

৬. সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা মানতে হয়। যে গান যে তালে ও সুরে গাওয়ার কথা সেভাবেই গাওয়া সমীচীন। এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্যণীয়, শ্রোতা-ভক্তদের আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি রক্ষা করা।

৭. লীলার বিশ্লেষণে কাঙ্ক্ষিত নায়ক-নায়িকার প্রতি গুরুত্ব দিলেও পরিবেশ বিশ্লেষণে শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হয়।

৮. লীলাকীর্তনে ভক্তিভাব সর্বাগ্রন্য। অর্থাৎ লীলা প্রকরণে এই অনন্য ভক্তিভাব জাগরণই মুখ্য।

৯. কীর্তন আসরে সার্বিকতা রক্ষাকল্পে এবং বিনত শ্রদ্ধাস্বরূপ মালা-চন্দন প্রদান করতে হয়।

১০. লীলা কীর্তনে যে-কোনো সময়ে যে-কোনো লীলা গাওয়া প্রাসঙ্গিক নয়। শাস্ত্র – অনুযায়ী যে প্রহরে যে লীলা প্রাসঙ্গিক সেই লীলাই গাওয়া বিধেয়। যেমন :

প্রভাতকালীন সময় :	কুঞ্জভঙ্গ
প্রাতঃকালীন সময় :	রসোদ্গার, বাল্যলীলা, দেবগোষ্ঠ, খণ্ডিতা, গমন গোষ্ঠ, মাথুর
পূর্বাহ্নকালীন সময় :	খেলা গোষ্ঠ, কলহান্তরিতা, শ্রীকুণ্ডমিলন।
মধ্যাহ্নকালীন সময় :	নবোঢ়া রসোদ্গার, সূর্যপূজা, গোপীগোষ্ঠ, নৌকাবিলাস
অপরাহ্নকালীন সময় :	উত্তর গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, ভাবোল্লাস, রসোদ্গার।
সায়াহ্নকালীন সময় :	আক্ষেপানুরাগ, রূপানুরাগ, গোবিন্দের পূর্বরাগ।
প্রদোষকালীন সময় :	রূপাভিসার, মিলন।
নক্তলীলাকালীন পর্যায় :	রাসলীলা, সাক্ষাৎ আক্ষেপ, রসালস।

১১. আটটি সময়োচিত লীলা প্রসঙ্গ নিয়ে এবং প্রসঙ্গের বিভিন্ন পর্যায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে অষ্টকালীন লীলা কীর্তন করতে হয়।

১২. লীলা কীর্তনের ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ, বাংলা, সংস্কৃত, ব্রজবুলি এবং আঞ্চলিক উপভাষা প্রয়োগ করা হয়।

১৩. লীলা কীর্তনে মূল উপলক্ষ্য, ভাব-সম্মিলন ও ভক্তিভাবের জাগরণ, লীলা শ্রবণে এই ভাবের আধ্যাত্মিক জাগরণ গায়ক-শ্রোতার মধ্যে জাগরিত হয়।

১৪. লীলা কীর্তনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক আবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে ‘মিলন’। এই মিলনই ভক্তকুলের চির আকাঙ্ক্ষিত। রাধাগোবিন্দের মিলন সম্পর্কিত গান দিয়েই কীর্তনের সমাপ্তি হয়।

ভক্তির কারণে লীলা কীর্তন ভাবময় সংগীত। গায়ক-বাদক-শ্রোতা সকলেই ভক্তজন এবং গানের প্রভাবে তাঁদের মনে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব যথা: অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, বৈবর্ণ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ ও মূর্চ্ছা-এর জাগরণ হয়। লীলা গানের পাঁচটি অঙ্গ রয়েছে। যথা: কথা, আখর, তুক, ছুট ও ঝুমুর। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্রজবুলি ভাষা বা নিগূঢ় সংকেতপূর্ণ ভাষায় যেসব পদ গাওয়া হয় তা অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ভক্তজনের কাছে একটু দুর্বোধ্য লাগতে পারে। তাই তত্ত্ব ও লীলার পারস্পরিক যে রহস্যময় সম্পর্ক পদাবলিতে বিদ্যমান, তা বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এজন্যই লীলাকীর্তনের ফাঁকে ফাঁকে কথা, আখর ও তুক দেওয়া হয়। লীলা কীর্তনের পদসমূহ বিভিন্ন পদকর্তার লিখিত আবেগ ও অনুভূতি-রঞ্জিত। কীর্তনীয়াগণের এক পদ থেকে অন্য পদে যাবার জন্য যে ভাবব্যঞ্জনাময় যোগসূত্রের প্রয়োজন পড়ে অর্থাৎ, পদের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া বা লীলা সংগঠনের ক্রমকে বোঝাবার জন্য নায়ক, নায়িকা, দূতী, সখা-সখীর উক্তি উদ্ধৃত করে বা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা প্রদান করে নিজের ভাষায় যা উপস্থাপন তাই কীর্তনের পরিভাষায় ‘কথা’। ‘তুক’ হচ্ছে অনুপ্রাসবহুল ছন্দোময় মিলনাত্মক গাথা। ‘তুক’ সাধারণত বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পদের মাঝখানে দেওয়া হয়। কোনো কোনো তুকে দেখা যায় গানের মতো কিছু কলি থাকে। তুকগানের উৎপত্তি গায়কগণের গুরুপরম্পরার মধ্য দিয়ে। প্রচলিত বৈষ্ণব কবিতার অংশ বিশেষও তুকগান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার অজ্ঞাত পদকবিদের পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দের পদ বা পদাংশও তুক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তুকগানের পদগুলিতে সাধারণত কোন ভূমিকা থাকে না। তুকগানের কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি:

গোষ্ঠ যাত্রার তুকগান

ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশ পায় রহি রহি চলি যায়

যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো।
বুঝি উহার কেহ আছে আসিতেছে অতি পাছে
তেঞিঃ চায় ফিরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া গো ॥
হায় আমরা কি করলাম নবনী পাসরি এলাম
খানিক রাখিতাম ননী দেখাইয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গো ॥
যদি ব্রজের বালক হতাম নেচে নেচে সঙ্গে যেতাম।
শ্যাম মাঝে যেত নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া গো ॥
রাণী টানে ঘর পানে রাখাল টানে বনপানে
রাই টানে নয়নে নয়নে নয়নে গো।
যদি ফুলের মালা হতাম শ্যাম অঙ্গে দুলে যেতাম
যেতাম হেলনে দোলনে দোলনে ভাসিয়া গো ॥
রবি বড় তাপ দিছে বন্ধু মুখ ঘামিয়াছে
কপালে তিলক যায় ভাসিয়া ভাসিয়া গো।
হেন মনে করি মায়া মেঘ হয়ে করি ছায়া
বন্ধু যাক জুড়াইয়া জুড়াইয়া জুড়াইয়া গো ॥[১]

অভিসার পর্যায়ের তুকগান

ক. কামিনী কি একাকিনী বনে যায় ঘোর যামনীতে।
ঘোর নিশিথে কেমনে যাবে হরি দরশনে। ...

খ. অব চিত ধরণে না যায় মুরলীকো গান শুনিয়ে ॥
মুরলীরে তোর গানে মৃত তরু মুঞ্জরয়ে রে।
দরবহী দারুমুঞ্জরে নব পল্লব রে।
মীন মকর সব উর্ধ্বমুখে চায় ॥

অভিসার অন্তে মিলনের তুকগান

আরে ধ্বনি প্রবেশিল রে কুঞ্জ কুটিরে।
রাধাশ্যাম দুহুঁজনে বৈঠল একাসনে।
হেরি সখী আনন্দে বিভোর।

---

১. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা-১৯৯০, পৃষ্ঠা-৯৪

মাথুর লীলার তুকগান

নন্দ শুধায় ব্রজে ঘরে ঘরে
আমার বাধা বওয়া ধন কে নিলিরে হরে
ওরে ব্রজবাসীরে আমার গোপাল কি আর
তোদের ঘরে যায় না।

আর খায় না ননী চুরি করে
তোদের বাছুরী কি দেয় না ছেড়ে,
আধুয়ার ননী কেবা নিলিরে হরে
আমি তো কারো মন্দ করি নাই।

রাস পর্যায়ের তুক গান

ক. ক ও হে গোপী কিসের লাগি বনে কেন এলে।
এমন কাজে উচিত হয় নাই।
ঘর ছেড়ে এ বনে আসা এ ঘোর রজনী জেনে।

খ. এখন পরম ধার্মিক হয়ে ধরম শিখাও,
ওহে ও লম্পটের গুরু,
তোমার মত সাজা ধার্মিক কে আর দেখেছে বল। [সখী উক্তি]

গ. রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু বাজত নূপুর নাচত কান।
মাতি রহত মদে মদন গোপাল,
বিকট তাল পর নাচে ভালে ভাল ॥

নৌকাবিলাস পর্যায়ের তুকগান

বহুদূরে একখানি তরী দেখা যায়,
তরী একবার ওঠে একবার নামে মধ্য যমুনায়।
কি সুন্দর তরণীখানি দেখে যা লো প্রাণ সজনী
তরীর অপরূপ শোভা দেখা যায়।

দানলীলা পর্যায়ে তুকগান

ক. ওহে ও তাই বল কানাই,
কেমনে তোমার সঙ্গে পিরীতি করিব হে।
ওহে কানাই তুমি রাখাল, আর আমি হলাম রাজার ঝি হে ॥
এই কথা লোকে জানলে বলবে কি হে
রাখালের সঙ্গে রাজনন্দিনীর প্রেমের কথা।

খ. কানাই তোমার হলো কালাবরণ
আর আমি হলাম গৌরাঙ্গিনী।
তোমার গলে বনফুলের মালা,
আমার গলে গজমতি,
এদিকে ও মিল নাই ও দিকে ও মিল নাই
ইথে কি পিরীত শোভা পায়।
সমানে সমানে হলে অত করে সাধতে হয় না
আপনি মেলে ॥[১]

তালের একটি নাম 'ছুট' আবার ছুট নামে গানও আছে। ছুট মূলত হালকা ধরনের গান। ভারি গানের মাঝে মাঝে কীর্তনীয়ারা একটু সহজ করে গান করে থাকেন। 'বড় তালের গানের মধ্যে তাল ফেরতার ছোট তালের গানকে ছুট বলে।'[২] কীর্তনের পঞ্চম অঙ্গ ঝুমুর। ঝুমুর গান লোকসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত এবং এই গান মূলত আদিবাসীদের উৎসব কেন্দ্রিক গান। ঝুমুর গানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কীর্তনের ক্ষেত্রে যে ঝুমুর গান গাওয়া হয় তার সাথে লোকসঙ্গীতের ঝুমুর গানের বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে। কীর্তনের আসরে ঝুমুর গান গাওয়া হয় শেষ পর্যায়ে। লীলা কীর্তনের ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের মিলনের মধ্য দিয়ে পালাটি শেষ হয়। মিলনের পর্যায়ে এই মিলনভিত্তিক গান যা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে। মিলনভিত্তিক পদের মধ্যে 'জয়ধ্বনিবাচক পদ' এবং 'স্মরণবাচক পদ' গাওয়া হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'রূপবাচক পদ' এবং 'শোভাবাচক পদ'ও গাওয়া হয়। ঝুমুর গানের সময় কীর্তনীয়া এবং বাদকেরা উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে ছন্দে ছন্দে গানগুলি উপস্থাপন করে থাকে।

উল্লেখ্য, এসব গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদকর্তাদের নাম থাকে না। বস্তুত গুরুপরম্পরায় এই গানগুলি চিরন্তন হয়ে কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে বেঁচে রয়েছে। ঝুমুর গানের কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছিঃ

ক. চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে
চাঁদ বদনী দাঁড়াল।
খ. এমনি থাকুক যুগল কিশোর আমাদের।
আমরা নিতুই আসব, নিতুই হেরর
এমনি থাকুক যুগল।[৩]

লীলা-কীর্তনের এই ব্যাপারে অনুমান করা যায়, এতে পাঁচালি গানের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পাঁচালি গানের ক্ষেত্রে যে 'নাচাড়ি' ও 'শিকলি' অঙ্গ রয়েছে তার একটি প্রভাব লীলাকীর্তনে দৃশ্যমান হয়। যেমন : মূল গায়ক 'নাচাড়ি' বা মূল অংশের গান করেন এবং 'শিকলি' বা গদ্যাকারে (কখনও কখনও সুরে) বর্ণনা করেন। লীলা কীর্তনেও এই পরম্পরা পরিলক্ষিত হয়। পদ বা পদাংশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও ভাব বুঝিয়ে দেবার লক্ষ্যে লীলাগায়ক সুর ও তালের যৌথ সংযোগে রসপুষ্টিকর যে উক্তি সন্নিবেশ করেন তা 'আখর'। লীলাতরঙ্গে এই আখর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কীর্তনে 'আখরের' সংযোজন প্রাচীন নয়। আমাদের ধারণা, কীর্তনের আখর সংযোজনের উৎস হিন্দুস্তানি ভজন ও ঠুংরির প্রভাব। হিন্দুস্তানি ভাষার শব্দটি 'আখেরি' নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে হিন্দুস্থানি সংগীত ধারা প্রচারিত হতে থাকে।[৪]

---

১. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১২৫-১২৯

২. হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান*, নবদ্বীপ, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা–১০৯৫-৯৬

৩. ক্ষেত্রসমীক্ষা। সাক্ষাৎকার : বিখ্যাত কীর্তনীয়া অশোক কুমার গোস্বামী, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, রাজবাড়ী

৪. দ্রষ্টব্যঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : *ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস* (দ্বিতীয় ভাগ), শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, ১৯৯১

সম্ভবত, এই হিন্দুস্তানি সংগীতধারা হতেই বাংলাদেশের কীর্তনে 'আখর' দেবার প্রচলন শুরু হয়। 'আখর' শব্দটি আরবি ভাষার শব্দ। শব্দটি ফার্সিতেও পাওয়া যায়। যার অর্থ : পৃথক, অপর বা পরবর্তী। কীর্তনে 'আখর' শব্দটির প্রয়োগ একটু প্রসারিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে 'আখর' ছাড়া কীর্তন হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আখর সব ধরনের লীলা কীর্তনে দেওয়া হয় এমনকি বিশুদ্ধ 'গরাণহাটী'-গানেও। যেমন

: 'সূর্যপূজা' পালায় একটি পদে দেখা যায় শ্রীমতীরাধা সখী পরিবৃতা হয়ে গোবিন্দ আশায় বসে রয়েছেন। কৃষ্ণ গোচারণে রয়েছেন, এমতাবস্থায় রাধা তাঁর সখীতুল্য তুলসীকে বলছেন:

১. রাধিকা রূপসী লইয়া তুলসী
কহয়ে মধুর কথা।[১]
আখর : কহে মধুর মধুর মধুর কথা
মধুর কথা কৃষ্ণ কথা
যা শুনলে জুড়ায় ভবব্যথা ॥[২]
২. কাননে গমন করহ এখন
নাগর শেখর যথা।[৩]
আখর : আমার গোবিন্দ পরাণ
নইলে শূন্য দেহ
পরাণ ছাড়া বাঁচে কি কেহ।[৪]

'আখর' প্রসঙ্গে পদাবলি সাহিত্যের বিখ্যাত গবেষক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন তা এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য:

> কীর্তনের আখর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত সম্পদ। কীর্তনীয়াগণকে আখর সৃষ্টি করিতে হয়। পদের বিষয়বস্তু প্রায় ধ্যানমগ্ন হইয়াই চিন্তা করিতে করিতে যে আখর তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল, তিনি সেই আখর দোহার এবং বাদকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ও গাহিয়া কণ্ঠস্থ করিতে বিস্তৃত হন না। এমন ভাবে আখরের উৎপত্তি হয়।[৫]

কীর্তনের আখর মাধুর্য-ভাব আস্বাদনের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন - 'কীর্তনের আখর কথার তান।' মূলত কীর্তনের এই পর্যায়টি এই কারণে এতো গুরুত্বপূর্ণ :

> আখর পদাবলী-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রস-ভাণ্ডারের কুলুপ খুলিবার কুঞ্চিকা। আখরকে পদের ব্যাখ্যা বলিলে আসল কথাটাই যেন বলা হয় না। পদে যাহা বলা হয় নাই, অনেক সময়ে আখরে তাহা প্রকাশ পায়। সুতরাং এক অর্থে আখরকে পদের ব্যঞ্জনা বলিতে পারি।'[৬]

---

১. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৫৫
২. ক্ষেত্রসমীক্ষা। সাক্ষাৎকার : অশোক কুমার গোস্বামী, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, রাজবাড়ী
৩. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৫৫
৪. ক্ষেত্রসমীক্ষা। সাক্ষাৎকার : অশোক কুমার গোস্বামী, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, রাজবাড়ী
৫. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা-১৯৯০, পৃষ্ঠা-৯৪
৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪

লীলাকীর্তনের 'আখর' প্রকৃত অর্থেই পরিবেশিত পদের এক নিবিড় ব্যঞ্জনাসৃষ্টিকারী বিষয়। মূলত আখর হচ্ছে ভাবোদ্দীপক শব্দগুচ্ছের বিধিবদ্ধ সংকলন। আখর কে সূত্রায়ন করলে দেখা যায়, এটি মূলপদের ভাব ও ভাষার এক আভিজাত্যময় বিন্যাস। আখরের সার্থকতা হলো, এর মধ্য দিয়ে শিল্পচাতুর্য এবং সৃষ্টিচাতুর্যের অপূর্ব বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। এই বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়েই লীলাবিন্যাস নাটকীয় হয়ে

ওঠে। আখর প্রয়োগের রীতি খুব প্রাচীন নয়। চৈতন্য-উত্তর কালে মহাজনপদকর্তার পদগুলোকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয় ফলে, সৃজনশীল কীর্তন গায়কেরা তাদের স্বকীয় সৃজনশীলতাকে বিচিত্র অনুভবে রঞ্জিত করে আখরের মাধ্যমে পদের ঐ ভাবকে প্রকাশ করতে শুরু করেন। যেহেতু আখর অলিখিত তাই হয়তো দৃশ্যমান সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করা হয় না, কিন্তু ভাবের মাধুর্যে সুর ও তালের আশ্রয়ে পদের মূলধারার সাথে সংযোজিত এসব গানের আবেদন অনন্য-সাধারণ। আখর শুধুমাত্র পদের শোভা নয়, এটি বস্তুত সংগীতের তীব্র উজ্জ্বলতা! আখরের প্রয়োগ:

১ম ধাপ – সুর – সাধারণ – ব্যবহার স্থায়ী ও অন্তরা
২য় ধাপ – সুর – ১ম ধাপ থেকে চড়া – ব্যবহার পূর্বার্ধ
৩য় ধাপ – সুর - ২য় ধাপ থেকে চড়া – ব্যবহার উত্তরার্ধ

বিশেষ বিশেষ পদের ক্ষেত্রে আখর নির্দিষ্টই থাকে এবং তা পরম্পরায় চলছে। আখর সংযোজনের পরিধি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ভাব ও উদ্দীপনার সাথে প্রেম ও ভক্তির মিশ্রণে কীর্তনীয়াগণ, চৈতন্যজীবনচরিত, ভাগবতীয় রস, আত্মনিবেদনাত্মক, প্রার্থনা প্রভৃতিকে উপস্থাপন করে থাকেন। আখরের পুনরাবৃত্তিতে বাদকের 'লহর' ও 'মাতন' বাজানোও এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আখর একদিকে যেমন মূলগানের কথার অপ্রকাশিত কিছু বক্তব্য বা মূলগানের পদকে গভীর ভাবব্যঞ্জক করে তোলে অন্যদিকে লীলবিস্তারে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে থাকে।

কীর্তনের গান

কীর্তন গানের ক্ষেত্রে কিছু পারিভাষিক শব্দ রয়েছে। এই শব্দগুলোর উৎপত্তি কীর্তন গানের সূত্র থেকেই। কীর্তন গানের আঙ্গিক ও পদ্ধতিগত বিষয় বা তার সংস্কারের সূত্র ধরেই গান সম্পর্কিত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় এবং কীর্তন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা কীর্তনীয়া অনায়াসে বুঝতে পারলেও সাধারণের পক্ষে তা অনুধাবন করা আয়াসসাধ্য ব্যাপার। যেহেতু সংগীত মানবহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি তাই কীর্তনের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় ভক্তহৃদয়ে গভীর-গভীরতর অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ। *নারদ-পঞ্চরাত্র*–গ্রন্থে এ-বিষয়ে ব্যাসদেব জানাচ্ছেন :

অর্থ গন্ধর্ব্বরাজস্তু ভববানাজ্ঞয়া বিধেঃ।
সঙ্গীতজ্ঞঃ জগৌ তত্র কৃষ্ণরাসমহোৎসবম্ ॥
সুষমং তালমানঞ্চ সতানং মধুরশ্রুতম্।
বীণা-মৃদঙ্গ-মুরাজ-যুক্তং ধ্বনি সমন্বিতম্ ॥
রাগিণীযুক্তরাগেণ সময়োক্তেন সুন্দরম্ ॥
মাধুর্য্যং মূর্চ্ছনাযুক্তং মানসো হর্ষকারণম্ ॥
বিচিত্রং নৃত্যরুচিরং রূপবেশমনুত্তমম্।
লোকানুরাগ বীজঞ্চ নাট্যোপযুক্তহস্তকম্ ॥

অর্থাৎ, অনন্তর ঐশ্বর্যশালী গন্ধর্বরাজ উপবর্হন ব্রহ্মার আদেশানুসারে সেই সভাস্থলে কৃষ্ণের রাসমহোৎসব গান করিলেন। সেই সঙ্গীত সুশোভন তাল মান সুতান সুমধুর বীণা মৃদঙ্গ

মুরজধ্বনি মিশ্রিত শ্রুতিমধুর। সময়োচিত রাগিণীযুক্ত সেই গান রাগ মূর্ছনাযুক্ত বলিয়া মাধুর্যময় ও মনের উল্লাসকারক। সেই সভায় উপস্থিত বিচিত্র রুচির নৃত্যকারী নটদিগের মনোহর রূপ ও উত্তম বেশ অনুরাগের বীজস্বরূপ এবং হস্তাদির চালন নাট্যোপযুক্ত।[১]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে কীর্তনের আঙ্গিক ও প্রকরণগত বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারা চিহ্নিত করা যায়। কীর্তন গানের ক্ষেত্রে তা খুবই প্রাসঙ্গিক, কারণ কীর্তনের যে সব গান, রাগ-রাগিণী প্রচলিত রয়েছে তার রয়েছে সামাজিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি। যুগের পরিবর্তনে কীর্তন গানের আঙ্গিক ও তার প্রকরণে ঘটেছে নানান পরিবর্তন ও সংস্কার। এই পরিবর্তন ও সংস্কারে এসেছে কীর্তন সম্পর্কিত নানা বিষয়। যেমন : গান সম্পর্কিত বিষয়। কীর্তন গান সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে এসেছে–নাট ও ধামাইল, দাগী গান, জাত গান, তুক গান, বটুক গান, গৌরচন্দ্রিকা গান, ঝুমুর গান, লুট গান, গড়াণহাটী গান, মনোহরশাহী গান। কীর্তন গানের আঙ্গিক সম্পর্কিত বিষয়বস্তু – মুখ, পূর্বার্ধ, উত্তরার্ধ, আখর, ঘটকালি, পর্যায়, কাটান, ভণিতা। সুর সম্পর্কিত বিষয়বস্তু – আপত্তন, সুরমিল, ভাতি, সুরের ভিয়ান, কোণাকুণি, গমক ও চিতান। কীর্তনের তাল সম্পর্কিত বিষয়বস্তু – কোশী, জোড়া, ছুট, ছোট-মধ্য-বড়, লঘু-গুরু, চাপড়। শ্রীখোল সম্পর্কিত বিষয় – হাত ও হাতুড়ি, ঘাত, মাতন, মুর্ছন, টুকি, লহর, জুয়ানী, মেলবাদ্য। গায়ক-বাদক সম্পর্কিত বিষয়–মুল গায়েন, শির দোহার, বাঁয় দোহার, শির বায়ান, বায়াটি বায়ান, কোল বায়ান, বকরা ও পেয়ালা। কীর্তন গানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ও এই পারিভাষিক শব্দগুলো এক অর্থে বলা যেতে পারে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কিন্তু অধুনা অতিসংস্কারবাদী এবং মূল কীর্তনের গানের যথাযথ গুরু ও যৌক্তিক শিক্ষার অভাব কীর্তনাঙ্গ সংগীতকে প্রক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। শুদ্ধ রাগচর্চার অভাব ও শিক্ষা না থাকায় মহাজনী পদগুলোর যৌক্তিক ও প্রাণস্পর্শী আবেগ থেকে শ্রোতারা বঞ্চিত হচ্ছে। তবে কিছু কিছু কীর্তনীয়া বাংলাদেশে রয়েছেন যারা এখনও বিশুদ্ধ ঘরানায় কীর্তন গান গেয়ে থাকেন। বাংলাদেশে কীর্তনের প্রবহমান ধারায় যে সব গান অনুষ্ঠিত হয় বা হয়ে থাকে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

নাট ও ধামাইল গান

অবিভক্ত বাংলায় রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক দুই ধরনের গান প্রচলিত ছিল। যথা : নাট গান ও ধামাইল গান। নাট গানের প্রবর্তক শ্রীনিত্যানন্দ। নাট গানের সংস্কৃত প্রকরণ হচ্ছে–'রায়ের নাটক গীতি'। প্রচলিত অর্থে 'নাটগীত' বলতে নাটকগীত বোঝায়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে এই নাট গানের প্রচলন ছিল। চৈতন্য চরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ-বিষয়ে লিখেছেন :

---

১. নারদ (বিরচিত), *নারদ-পঞ্চরাত্র*, উদ্ধৃতি, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৩৩

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি   রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে   মহাপ্রভু রাত্রিদিনে

গায় শুনে পরম আনন্দ।[১]

নাট গানে অন্যতম বিষয় হচ্ছে অভিনয়। চৈতন্য ও তাঁর সঙ্গীজনের নাট্যলীলার এক অনন্য সংযোজন ছিল এই নাটগান।[২] 'নাট' শব্দের অপভ্রংশ রূপ নটুয়া। রাজবংশী সম্প্রদায়ের 'নটুয়া'তে দেখা যায় রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক উপাখ্যান ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই গান তারা এখনও গেয়ে থাকেন।

কীর্তনে দেখা যায় 'ধামালী' নামে একটি তাল প্রচলিত আছে এবং এই তালটির ব্যবহারও প্রচুর হয়। 'ধামালী' তালটি ধামাইল-এর প্রভাবপুষ্ট। এই গানের অন্যতম প্রেরণা নাট গান। সাধারণত প্রথম দিকে কীর্তনের পদরচয়িতাগণ পালা আকারে পদ রচনা করতেন না। তাঁদের পদসম্ভারে রাধাকৃষ্ণ বা নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন প্রকরণ ও অবস্থা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় রূপকাশ্রয়ে বিশেষ ভাবকে কেন্দ্র করে রচিত হতো এবং ভাষার প্রাচুর্যে পদগুলো বিন্যস্ত হতো। পরবর্তীকালে দেখা যায় পালাকীর্তনের ক্ষেত্রে উপভোগ্য ঘটনার নাটকীয়তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ধামাইল ও মঙ্গল গানের রীতির প্রচলন করতে লাগলেন কীর্তনগায়কেরা। এই গানের রীতিতে মিলনাত্মক পদের সঞ্চার বেশি থাকে। বিরহসূচক পদের আধিক্য খুব একটা বেশি থাকে না। বর্তমানে 'ধামালী' তালের কীর্তনের ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হয়।

দাগী গান

দাগী গান হলো বড় গান বা বিলম্বিত তালের এক অপূর্ব মনোআকর্ষক গান। মূলত পদাবলি কীর্তনে দেখা যায় প্রত্যেকটি পদ সৃষ্টি হয়েছে কোনো বিশেষ রাগ-রাগিণীকে কেন্দ্র করে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেকটি পদেরই রয়েছে সুনির্ধারিত 'রাগ ও রাগিণী'। আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ*-এ বিষয়টির পরিচয় পাই। পদাবলি কীর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় গানের প্রকৃত পরিচয় চিহ্নিত হয় মুখরার পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধের সুরের ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কীর্তনীয়াগণ পদের মুখের অংশটি বড় তালে গেয়ে থাকেন। এই অংশে দেখা যায়, মূল গানের পর-পরই কাটান সংযোজন বা আখরের বিচিত্র প্রয়োগ সংযোজিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে মুখরার বড় তালের সাথে কাটান বা আখরের সুর মিশে গিয়ে এক বিচিত্র সুরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দাগী গান সেগুলিকেই বলা যায়, যার মূল সুরটি অপরিবর্তনীয় বা একক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অর্থাৎ মিশ্রিত সুরবিহীন এক শুদ্ধ রাগাশ্রয়ই দাগী গানের মূল বৈশিষ্ট্য। এই গানে কোনো জোড়া গানের পদের ব্যবহার সাধারণত ঘটে না। দাগী গান 'প্রসিদ্ধ গান' নামেও প্রচলিত। বাংলাদেশের প্রচলিত দাগী গানের কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো (ক্ষেত্র-গবেষণা থেকে প্রাপ্ত) :

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১৫৬

২. দ্রষ্টব্য : অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী, 'চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে নাট্য-উপাদান', সাহিত্য পত্রিকা, সংখ্য : ৩, বর্ষ : ৫৫, জুন ২০১৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক. গৌরাঙ্গ প্রসঙ্গ-বিষয়ক দাগী গান :

বড় দশকোশী তালের গান

১. গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া। (পদকর্তা-বাসুদেব ঘোষ)

মধ্যম দশকোশী তালের গান

২. বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে। (পদকর্তা - বৃন্দাবন দাস)

খামশা তালের গান

৩. কোথায় আছিল গোরা ভুবন সুন্দর (পদকর্তা - বলরাম দাস)

বড় দশকোশী তালের গান

৪. জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচী নন্দন। (পদকর্তা - নয়নানন্দ)

বড় দশকোশী তালের গান

৫. একমুখে কি কহব গোরাচাঁদের লীলা। (পদকর্তা - বাসুদেব ঘোষ)

বড় দশকোশী তালের গান

৬. শচীর নন্দন গোরা চাঁদ বয়ানে। (পদকর্তা - বংশীবদন)

খ. বিভিন্ন লীলা-প্রসঙ্গের প্রকরণের দাগী গান :

বড় দশকোশী তালের গান

১. বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল (পদকর্তা - অনন্ত দাস)

মধ্যম দশকোশী তালের গান

২. অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জির। (পদকর্তা - গোবিন্দ দাস)

বড় বীরবিক্রম তালের গান

৩. দুই ভুরু কামের কামান। (পদকর্তা - বলরাম দাস)

মধ্যম বীরবিক্রম তালের গান

৪. সজনি কি পেখলুঁ ও নীপমূলে ধন্দ। (পদকর্তা - জ্ঞান দাস)

গ. বিভিন্ন তালের দাগী গান (বাংলাদেশে প্রচলিত) :

মধ্যম বীরবিক্রম তাল

১. এমন হইবে কেবা জানে।
তবে কি চাইতাম শ্যাম পানে ॥ (রূপানুরাগ)

২. খেলে রাম রাম রাম কানাই।
যমুনা তরুর ছায় খেলে দোন ভাই। (গোষ্ঠ বিহার)

খামাশা তালের দাগী গান

১. কানাই না কর এতেক চাতুরালি।
যে না জানে মানসতা, তার আগে কহ কথা, মোর আগে বেকত সকলি ॥ (দানলীলা)

২. সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানি।
তাহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী ॥ (কলহন্তারিতা)

একতালি তালের (৮ মাত্রার) দাগী গান

১. লাখবান কাঞ্চন জিনি।
রসে ঢর ঢর গোরা মুয়ঙে নিছনি ॥ (রূপানুরাগ)

২. বিনোদ শ্যামের রূপ হেরি প্রাণ কান্দে।

নাগরী মোহন চূড়া বান্ধে কত ছান্দে ॥ (রূপ-অভিসার)

দুঠুকী তালের দাগী গান

১. অম্বরে ডম্বরু ভরু নবমেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥ (বাদরাভিসার)

২. রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রস তত্ত্ব লাগি, গোকুলে আমার স্থিতি ॥ (ঐ)

রূপক তালের দাগী গান

১. গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে।
নিরবধি ছল ছল আঁখি জল ঝরে ॥ (অনুরাগ)

২. ভাইরে সাধুসঙ্গ কর ভাল হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবে মহানন্দ সুখ পাবে, নিতাই চৈতন্য গুণ গাঞা। (প্রার্থনা)

তেওট তালের দাগী গান

১. অগো মা তোমার গোপাল কিবা জানয়ে মোহিনী।
আমরা সঙ্গের ভাই, তবুতনা মন পাই, তোমারে ভুলাবে কতখানি ॥ (ফিরা গোষ্ঠ)

২. মরকত মুঞ্জ, মুকুর মুখমণ্ডল, মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখি, শিখিকুল আকুল, কালিন্দী বহয়ে উজান ॥ (রূপ - অনুরাগ)

মহামণ্টক তালের দাগী গান

১. এমনে কেমনে যাব পথে, শ্যাম দানি।
আপনা খাইয়া কেনে, আইলাঙ তোমার সনে, জাতি জীবনে টানাটানি ॥ (দান লীলা)

২. শুন শুন সুন্দরী বিনোদিনী রাই।
তোমা বিনু কারু নাহি তোমারি দোহাই ॥ (ঐ)

বড় আড় তালের দাগী গান

১. এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ।
কৈছন তোহারি হৃদয় নিরবন্ধ ॥ (নৌকাবিলাস)

২. দানি দেখি কাঁপয়ে শরীর।
মো যদি জানিতাম পাছে, এ পথে কণ্টক আছে, তবে ঘরের না হইতাঙ বাহির ॥ (দান লীলা)

শশিশেখর তালের দাগী গান

ক. বড় শশিশেখর তাল

১. বাজত সব, গোঠ বাজনা, সাজত বল বীরে।
মদে ঘূর্ণিত নয়নযুগল, পাগ নট পটী শিরে ॥ (গোষ্ঠলীলা)

২. আনন্দে সুবদনী কিছু নাহি জান।
বেশ বেনায়ত নাগর কান ॥ (কুঞ্জভঙ্গ)

খ. মধ্যম শশি শেখর তাল

১. উঠিল নাগরবর নিন্দের আলিসে।
দুটি আঁখি ঢুলু ঢুলু হিলন বালিশে ॥ (কুঞ্জভঙ্গ)

২. মধুপুর নাগরী, হাসি কহত ফেরি, ব্রজপুর গোপ গোঙারি।
সপ্তম দ্বার, পার হরি বৈঠত, তাঁহি কাঁহা যায়বি নারী ॥ (মাথুর)

ইন্দ্রভাষ তালের দাগী গান

ক. বড় ইন্দ্রভাষ তাল

হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ।
ছোড়ি চলল কৈছে নবীন সুলেহ ॥ (ভবন বিরহ)

খ. মধ্যম ইন্দ্রভাষ তাল

বন্ধু তোমার রাঙ্গা পায় কি বলিব আমি।
অন্যের অনেক আছে আমার কেবল তুমি ॥ (দান লীলা)

দাসপ্যারী তালের দাগী গান

১. রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম, দক্ষিণে বসাইয়া রাম, চুম্ব দেয় মুখ সুধা করে। (উত্তর গোষ্ঠ)

২. চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার। (বাদরাভিসার)

দশকোশী তালের দাগী গান

ক. বড় দশকোশী তাল :

এমনে কেমনে যাব পথে শ্যাম দানি।
আপনা খাইযা কেনে, আইলাঙ তোমার সনে, জাতি জীবনে টানাটানি ॥ (দান লীলা)

খ. মধ্যম দশকোশী তাল

১. অরুণিত চরণে, রণিত মণি মঞ্জির, আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চণ বঞ্চন, বসন মনোরম, অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল ॥ (রূপানুরাগ)

২. বিকচ সরোজ, ভান মুখমণ্ডল, চিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরী, হাস উগারই, পীপী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর ॥[১] (ঐ)

---

১. ক্ষেত্রসমীক্ষা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, রাধাবল্লভ অঙ্গন, রাজবাড়ী, উদ্ধৃত পদগুলো বিখ্যাত কীর্তনীয়া অশোক কুমার গোস্বামী-হতে প্রাপ্ত এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫ ও শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা বিরচিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?) – হতে সংকলিত করা হয়েছে।
উদ্ধৃত পদগুলো দাগীগানের দৃষ্টান্ত মাত্র। আরও অসংখ্য পদ রয়েছে দাগী গান হিসেবে। দাগী গান এমনই পর্যায়ভুক্ত গান যেগুলি একটি স্বতন্ত্র ইতিহাসের ধারা এবং প্রতিটি গান একটি স্বতন্ত্র

সংগীততত্ত্বেরও ধারক। দাগী গানের মধ্যে প্রাচীন সংগীততত্ত্বের সুচিন্তিত ধারার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এ-প্রসঙ্গে ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তীর অভিমত :

> প্রতিটি দাগী গান একটি করে সুর। কীর্তনের গানগুলিতে রাগরাগিণীর পরিচয় গানের সর্বাত্মক পরিচয় নয়, গানের পরিচয় হ'ল গানের প্রথম চরণের কথা বা ভাষা। শুধু ঐ কথা কটিই হ'ল গানটির নাম আর ঐ নাম শুনেই সবাই বুঝতে পারে গানের কি সুর আর কি তাল। যে কোন গায়ক, বাদক বা নিয়মিত শ্রোতাই গানের পরিচয় জানেন।[১]

সর্বোপরি, দাগী গান কীর্তনের যেমন পরিচয়বাহক তেমনি এক-একটি সুরকেও ধরে রেখেছে যুগ যুগ ধরে।

লুট গান

লুট গান সহজ এবং এই গান গাইতে কোনো সহায়ক বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণত হাতে তালি দিয়েই গাওয়া হয়ে থাকে। আবার কীর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় – কীর্তন গানের শেষে ঝুমুর গান হয় এবং ঝুমুর গানের একটি বিশেষ জমাটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই শেষ জমাটের পরই কীর্তনে লুট গান গাওয়া হয়, তবে এটি সর্বক্ষেত্রে হয় না। লুট গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। সাধারণত এই গান প্রায় সকলেই জানেন, তাই বিশেষ অনুষঙ্গের প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশে প্রচলিত লুটগানের একটি দৃষ্টান্ত :

১. চাই আনন্দ চাই প্রেম চাই হরির নাম নিবি কে,
হরিনামের ফেরিওয়ালা
নিতুই নিতাই যায় ডেকে।
ত্রিতাপে তাপিত ভবে
কে আছিস কে আছিস রে।
জুড়িয়ে যাবে সকল জ্বালা
এই হরিনাম একবার নে ॥
… … … …
আয়রে তোরা লুটবি কে আয়।
আমার দয়াল নিতাই অমিয় বিলায় ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সুধার আধারে
নিতাইচাঁদ তাঁর অঙ্গ আধারে ॥
চাঁদে চাঁদে মিশে দুটি চাঁদ
এসে উদয় হলো নদীয়ায় ॥[২]

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গৃহস্থ বাড়িতেও সাপ্তাহিক লুট গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

---

১. ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১২০

২. ক্ষেত্রসমীক্ষা : রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির, ভাজনবাড়ী, রাজবাড়ী, মন্দির-সেবাইতকণ্ঠে শব্দযন্ত্রে ধারণকৃত পদের শ্রুতি লিখন, ১৬ নভেম্বর, ২০১৮

ঝুমুর গান

আদিবাসীদের উৎসবের গানই মূলত ঝুমুর গান। এই গানের প্রধান উৎস-বৈশিষ্ট্য লোকসঙ্গীতের ধারা। কীর্তনের প্রকৃতি অনুসন্ধানে ঝুমুর গানের যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় – তার সাথে লোক সঙ্গীতের যথেষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। পদাবলি কীর্তনের শেষে ঝুমুর গান করার যে রেওয়াজ রয়েছে তাও বেশ প্রাচীন ধারা। সাধারণত একটি পালা শেষ হয় রাধাকৃষ্ণের মিলনের মধ্যদিয়ে। এর মধ্যে দেখা যায় –

ক. স্মরণ বাচক পদে মিলন, এবং
খ. জয়ধ্বনি বাচক পদে মিলন।

গায়ক-বাদক সবাই দাঁড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে প্রাসঙ্গিক ছন্দে ঝুমুর গান গাওয়া হয়। পদটি সাধারণত মূল গায়কই গেয়ে থাকেন। যেমন :

ক. কালাচাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে,
চাঁদ বদনী দাঁড়াল।
শ্যামের বামে দাঁড়াল রাই ঘেরাঘেরি বাহু
পূর্ণিমার চাঁদে যেন গ্রাসশিল রাহু ॥
শ্যামের বামে দাঁড়াল রাই রসের মঞ্জরী।
রাধাকৃষ্ণের মিলন হলো বল হরি হরি ॥
জয় রাধে রাধে গোবিন্দ বল।[১]

লীলাকীর্তনে মিলনের ক্ষেত্রে অনেক কীর্তনীয়া নিম্নবর্ণিত পদটি গেয়ে থাকেন:

খ. দাঁড়াইল শ্যামের বামে নবীন কিশোরী।
পশু-পাখী উনমত দুহু রূপ হেরি ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে দোহার রূপ করে নিরীক্ষণ ॥
দোঁহ কান্দে দুহুঁজন ভুজ আরোপিয়া।
রাই বামে করি নাগর ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥
ডালে বসি দুহুঁ রূপ দেখে শুক সারী।
আনন্দে ঘনাঞা নাচে ময়ূর ময়ূরী ॥
গোবিন্দ দাস কহে রূপের মাধুরী।
নবীন জলদ কোণে থীর বিজুরী ॥[২]

১. ক্ষেত্রসমীক্ষা : বিখ্যাত কীর্তনীয়া অশোক কুমার গোস্বামী-হতে পদটি প্রাপ্ত, রাধাবল্লভ অঙ্গন, রাজবাড়ী, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

২. শ্রীবন্ধুবিহারী সাহা (বিরচিত), *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?), পৃষ্ঠা - ২৫৫

গৌরচন্দ্রিকা গান

খেতুরি-মহোৎসবে নরোত্তম দাস তাঁর নিবন্ধ সঙ্গীত আরম্ভ করেছিলেন গৌরাঙ্গ-বিষয়ক কীর্তন করে। বিষয়বস্তু-হিসেবে নরহরি চক্রবর্তী তাঁর *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে গৌরচন্দ্রিকা গানের তাত্ত্বিক দিকটি প্রকাশ করেছেন। যথা :

শ্রীরাধিকার ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ।
সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ ॥[১]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, চৈতন্যদেবের রাধাভাব নিয়ে মহোৎসবে পদ গাওয়া শুরু হলো। নরহরি চক্রবর্তী আরও জানিয়েছেন – নরোত্তম দাস রাধাকৃষ্ণের বিলাস-সম্পর্কিত গান গাওয়ার পূর্বে চৈতন্যদেবের অনুরূপ লীলা বিলাস গান করার প্রথা প্রচলন করেন।[২]

লীলাকীর্তনে প্রথানুযায়ী কৃষ্ণলীলা গান গাওয়ার পূর্বে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক গান গাওয়া হয়। এই গানই গৌরচন্দ্রিকা গান। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দের যে অর্থ সেই অর্থে কীর্তনে শব্দ হিসেবে তা ব্যবহার হয় না। গৌরচন্দ্রিকা শব্দের কীর্তনাঙ্গিক অর্থ – গৌরাঙ্গের লীলা প্রসঙ্গের গান। প্রতিটি লীলাস্মরণে ব্রজলীলার অনুরূপ নবদ্বীপলীলা বা গৌরাঙ্গ-মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে গৌরচন্দ্রিকার পদে।

প্রতিটি পালা পর্যায়ে অনেক গৌরচন্দ্রিকা পদ রয়েছে। কীর্তনীয়ারা গৌরচন্দ্রিকা পদগুলি সাধারণত বড় দশকোশী, সমতাল, যোতসম প্রভৃতি তালে গেয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, জাত গানের মূল সুরেই সাধারণত গৌর চন্দ্রিকার পদ গাওয়া হয়। বিভিন্ন লীলা প্রসঙ্গে দেখা যায় – গৌরাঙ্গের দুটি সত্ত্বায় এই পদগুলি বিন্যস্ত থাকে। প্রথমত কৃষ্ণসত্তা এবং অপরটি রাধাসত্তা। লীলা প্রকটের ক্ষেত্রে রাধাভাবে ভাবিত মনোভাব যে সব পদের মধ্যে প্রকাশ পায় সেগুলি 'ভাবময় গৌরচন্দ্রিকা' হিসেবে প্রচলিত।

গৌরচন্দ্রিকা গানে প্রথম অংশ নিয়মানুসারে বিলম্বিত গাওয়া হয়। শেষ অংশে জাতগানের মধ্যম সুর ব্যবহৃত হয় এবং তাতে আখর সংযোজিত হয়। পদের শেষ অংশের ভণিতা অংশটি বিশেষ বিশেষ কাটানের সুরে কীর্তনীয়ারা গেয়ে থাকেন। তারপর নানা ধরনের বাদ্যের মাধ্যমে বাদকগণ কীর্তনের আসরকে মাতিয়ে তোলেন। বহু ধরনের গৌরচন্দ্রিকা রয়েছে। গৌরচন্দ্রিকা গানের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলো :

১. সংকীর্তন-অধিবাস বিষয়ক

জয় রে জয়রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল, নটন সুঠান
কীর্তন আনন্দে, শ্রীবাস রামানন্দে, মুকুন্দ বাসুগুণ গান ॥[৩] ... (তাল–দশকোশী)

১. নরহরি চক্রবর্তী, *ভক্তিরত্নাকর*, নন্দলাল বিদ্যাসাগর (সম্পাদিত), গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬০ পৃষ্ঠা- ৫৪৭

২. দ্রষ্টব্য : নিত্যানন্দ দাস, *প্রেমবিলাস*, হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা সংস্করণ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ১৯ বিলাস, পৃষ্ঠা-৬৫

৩. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা বিরচিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?), পৃষ্ঠা - ৪

২. শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব-বিষয়ক

পূরব জনম, দিবস দেখিয়া আবেগে গৌর রায়।
নিজগণ লেয়া, হরষিত হৈয়া, নন্দ মহোৎসব গায় ॥[১] ... (তাল–বড় দশকোশী)

৩. শ্রীরাধারাণীর-জন্মবিষয়ক

প্রিয়ার জনম, দিবস আবেশে, আনন্দে ভরল তনু।
নদীয়া নগরে, বৃষভানু-পুরে, উদয় করল জনু ॥
গদাধর মুখ, হেরি পুনঃ পুনঃ নাচে গোরা নটরায়।
ভাব অনুভব, করি সঙ্গীসব, মহা মহোৎসব গায় ॥[২] ... (তাল–দশকোশী)

৪. শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক

ক. কিয়ে হাম দেখলু কনক পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া ॥ ... (তাল–দশকোশী)
খ. শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥ [৩] ... (তাল–বড় দশকোশী)

৫. শ্রীকৃষ্ণের চাঁদ ধরা বিষয়ক

হেদে লো মালিনী সই হের দেখসিয়া।
নিমাঞি কান্দিছে মোর চাঁদের লাগিয়া ॥[৪]... (তাল–ধরা)

৬. শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ বিষয়ক

নিরমল গোরা তনু, কষিত কাঞ্চন জনু, হেরইতে পড়ি গেনু ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মনে, অন্তর কাঁপয়ে মোর ॥[৫] ... (তাল–বড় দশকোশী)

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ক

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায়ে ধরণী ॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধনী ধারা বহে অরুণ নয়নে ॥[৬]... (তাল–বড় দশকোশী)

এই পদটিতে একটু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, তাহলো – পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণপিতা নন্দরাজের ভাবে বিভাবিত। বৈষ্ণব পদাবলিতে এমন পদ সচরাচর দেখা যায় না।

১. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা বিরচিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?), পৃষ্ঠা - ২৪
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৯
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২১
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৩১
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৫
৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৯

৮. গোষ্ঠলীলা বিষয়ক

শচীর নন্দন গোরা চাঁদ বয়ানে।
ধবলী সাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙার শবদ করি বদন বাজায় ॥[১] ... (তাল–বড় দশকোশী)

৯. মধ্যাহ্নলীলা বিষয়ক

হেম সঞে অতি গোরা, সুমধুর হাস থোরা, জগজন নয়ন আনন্দ।
পিরীতি মূরতি কিয়ে, রূপ স্বরূপ ধর, ঐ ছন প্রতি অঙ্গ বন্ধ।
আজু কিয়ে নবদ্বীপ চন্দ্র।
কামিনী কাম, কলিত তছুমানস, গতি অছু গজ জিনি মন্দ ॥[২] ...

(তাল–মধ্যম দশকোশী / বড় শশি শেখর)

১০. দানলীলা বিষয়ক

গৌরাঙ্গচান্দের মনে কিভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝারে দান সিরজিল ॥
কীসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগলিয়া রাখয়ে তরুণী ॥[৩]... (তাল–বড় দশকোশী)

১১. নৌকাবিলাস বিষয়ক

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
সুরধনী মাঝে যাইয়া নবীন নাবিক হৈয়া
সহচর মেলিয়া খেলায় ॥[৪]... (তাল–বড় দশকোশী / যোতসোম)

১২. উত্তর গোষ্ঠ বা ফিরা গোষ্ঠ-বিষয়ক

সুরধুনী গঙ্গার কুলে, হরি হরি হরি বোলে
খেলিতেছে গোরা বনমালী।
প্রিয় গদাধর সঙ্গে, পূরব রভস রঙ্গে
প্রেমানন্দে করিতেছে কেলি ॥ [৫]...(তাল - বড় দশকোশী)

১৩. সুরধুনী তীরে আজি গৌর কিশোর।

সহচরগণ মিলি আনন্দে বিভোর ॥
খেলায় বিনোদ খেলা গোরা বনমালী।
পুলিন বিহার করে ভকত-মণ্ডলী ॥[৬]... (তাল - বড় দশকোশী)

---

১. শ্রীবন্ধুবিহারী সাহা বিরচিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?), পৃষ্ঠা - ৬২
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৮৯
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১০৯
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৬৯
৫. পদকর্তা : কেশব দাস, উদ্ধৃতি, পদ-সংগ্রহ নামক, অশোককুমার গোস্বামীর খাতা হতে প্রাপ্ত
৬. শ্রীবন্ধুবিহারী সাহা (বিরচিত), *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?),পৃষ্ঠা - ১৩৬

১৪. রূপানুরাগ বিষয়ক

মরমে লাগিল গোরা না যায় পাসরা।
নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগিয়াছে পারা ॥
জলের ভিতরে ডুবি সেথা দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরা চাঁদ হৈল পারা ॥[১]... (তাল - বড় দশকোশী / সোমতাল)

১৫. শ্রীরাধিকার রূপাভিসার বিষয়ক
ব্রজ অভিসারিণী, ভাবে বিভাবিত, নবদ্বীপ চাঁদ বিভোর।
অভিনয় তৈছন, করত পুলক তনু, নয়নহি আনন্দ লোর ॥[২]... (তাল–জৈতি)

১৬. রসোদ্গার বিষয়ক
আরে মোর গৌর-কিশোর।
রজনী বিলাস রস ভাবে বিভোর ॥
কহহিতে গদ গদ কহই না পার।
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার ॥[৩]... (তাল–লোফা)

মূলত গৌরচন্দ্রিকা গানে রাধাকৃষ্ণলীলার এক বিশেষ ভাব-তন্ময় রূপের প্রকাশ ঘটানো হয়েছে গৌরাঙ্গের দিব্যলীলার মধ্য দিয়ে।

তুক গান

পদকর্তার ভণিতা ছাড়া যে সব কাব্যিকছন্দ ও গদ্যছন্দ নিবন্ধ পদ গাওয়া হয়, তাই তুক গান। বৈষ্ণব পদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো – পদের সমাপ্তি অংশে কবির বা রচয়িতার নাম উল্লেখ থাকে। মধ্যযুগের সাহিত্য তথা লোকসাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এটি। এই নামোল্লেখ করাকে বলা হয় ভণিতা। ভণিতা শব্দের অর্থ করলে হয় 'বলা'। 'ভণয়িতা' শব্দেরই চলিত অপভ্রংশরূপ ভণিতা। পদাবলি কীর্তনে মহাজনী পদের একটি সুনির্ধারিত তালিকা রয়েছে, কিন্তু কীর্তনে দেখা যায় – এমন কিছু গান গাওয়া হয় যা ভাবরসসমৃদ্ধ, বহুল প্রচারিত; যা গুরুপরম্পরায় গাওয়া হয়ে থাকে। তুক গান অনুপ্রাসবহুল ছন্দোময় মিলনাত্মক-গাথা। তুক অর্থে সঙ্গীতের বিশেষ অংশও বোঝায়। বাংলাদেশে কীর্তনে কীর্তনীয়ারা অনেক ধরনের তুক গান গেয়ে থাকেন। এ-থেকে অনুমান করা যেতে পারে – তুক গানের সংখ্যা অসংখ্য। পূর্বে তুক গানের কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন লীলা প্রসঙ্গে তুক গান গাওয়া হয়। যেমন :

রাসলীলা পর্যায়ের তুক গান : (দাসপ্যারী তালে গাওয়া হয়।)
কও হে গোপী কীসের লাগি এই গহীন বনে এলে হে
এ ঘন রজনী।
যাও হে তোমরা নিজ ঘরে, এ ঘন রজনী।[৪] ...

১. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *পদামৃত লহরী*, জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১১০

২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৯২৬

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৫

৪. ক্ষেত্রসমীক্ষা, অষ্টকালীন লীলাস্মরণ কীর্তন, রাধাবল্লভঅঙ্গন, বানীবহ, রাজবাড়ী, কীর্তনীয়া : গোপেশ মোহন্ত, ফরিদপুর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

আধুনিক কীর্তনের একটি তুক গান প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের রচনা থেকে উদ্ধৃত করা গেল; যেখানে আখর প্রভু সুন্দর নিজেই দিয়েছেন :

কাল-তরঙ্গ-রঙ্গ-সাঙ্গ-মঙ্গল।
ঐ-প্রসঙ্গ-ভঙ্গ, কীর্তন-কোন্দল ॥
আখর :
আর রক্ষা নাই
সবে, হরিনাম, লও
সদা, হরিকথা, কও
নাম সংকীর্তনে, রও
তাপ - সাবধান, হও।[১]

মাখুর পালায় ব্যবহৃত একটি বহুল ব্যবহৃত তুক গান : (মধ্যম দশকোশী তালে)
কহিও নিঠুরের আগে সই, কহিও নিঠুরে।
একবার যেন সে আসে ব্রজপুরে।
আসে যেন এ অভাগিনীর মরবার আগে।
সে যদি না দেখে মোরে -
আমি তারে দেখব আমার নয়ন দুটি ভরে ॥[২]...

জাত গান

'জাত গান' কীর্তন-সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ পরিভাষা। সংগীতের ইতিহাস পরিক্রমায় 'জাতি' শব্দের অপভ্রংশরূপে 'জাতগান' শব্দটি কীর্তনাঙ্গীয় ধারায় সংযুক্ত হয়েছে। আচার্য মতঙ্গ তাঁর *বৃহদ্দেশী* গ্রন্থে সংগীতের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে জাতি প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি গানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন – নিবন্ধ ও অনিবন্ধভেদে। নিবন্ধ গান কথা, রাগ, তাল প্রভৃতি যুক্ত। অনিবন্ধ গান আলাপ নির্ভর। নিবন্ধ-অনিবন্ধ গান শরীরের অগ্নি ও বায়ুর সংঘর্ষের কারণ থেকে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল আকারে বিকাশ লাভ করে। এই বিকাশের পর্যায়ে দেখা যায় পাঁচটি বিশেষ অবস্থা : 'সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও কৃত্রিম।'[৩] নাদের এই পঞ্চম এবং কৃত্রিম অবস্থা বা তার বিকাশই সংগীত। বিকশিত সংগীতের একটি বিশেষ ধারা হচ্ছে 'জাত গান।'

জাতিগানে শুরুতে আলাপ ছিল না। পরবর্তীকালে বৈচিত্র্য আনার জন্য এক একটি জাতিতে একাধিক অংশস্বর যুক্ত হয়। অংশস্বর-এর দুটি অংশ।, প্রথমটি মুখ্য অংশ এবং বাকি অংশকে বলা হয় গৌণ। এই গৌণ অংশের এক একটি কখনো কখনো অংশ-স্বর হিসেবে গাওয়া হতো। অংশ-স্বরের মধ্য দিয়েই পুনরার মুখ্যস্বরে ফিরে আসা হতো। গ্রাম-রাগের ক্ষেত্রে 'রাগালাপ' আবশ্যিক বিষয় ছিল। প্রত্যেকটি

১. প্রভু জগদ্বন্ধু, *শ্রীশ্রীহরিকথা*, মহাউদ্ধারণ মঠ, কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১-৩
২. উদ্ধৃতি, ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্য লোক, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১২৭
৩. মতঙ্গ, *বৃহদ্দেশী*, কে সাম্ব শিবশাস্ত্রী (সম্পাদিত), ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণ, ১৯২৮, শ্লোক ২৩ - ২৫, পৃষ্ঠা-৮৮

গ্রাম-রাগে একটি মাত্র অংশস্বর ছিল এবং ভাষা, বিভাষা, অন্তর বাষা জাতীয় বাগের ক্ষেত্রেও একটি অংশ-স্বর ছিল; এই ধরনের আলাপই ছিল ‘রূপ-আলাপ’ ও ‘রূপকালাপ’। উপর্যুক্ত রাগালাপে ‘তুক’ বা ‘ধাতু’ থাকত না। শুধু স্বর-সঞ্চালন করে দশটি লক্ষণ প্রকাশ পেত। জাতি বা জাতরাগের ক্ষেত্রে ‘জাতি-লক্ষণ’ ও ‘রাগ-লক্ষণ’ তৈরি হয়েছিল প্রাচীন লৌকিকগানকে কেন্দ্র করে। লৌকিকগানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম এবং নাদ-বিজ্ঞানের কতগুলি স্থির নিয়মের ভিত্তিতে জাতিরাগের লক্ষণ নির্মিত হয়েছিল যা গ্রহ-স্বর, ন্যাস-স্বর, অপন্যাস-স্বর, অংশ-স্বর, তারত্ব, মন্দ্রত্ব, ষড়বত্ব, ঔড়ুবত্ব, অল্পত্ব ও বহত্ব নিয়মের মধ্যে আলাপ করা হতো।

‘পদ’—যা ছিল ছন্দোবদ্ধ বৈদিক বা লৌকিক রচনা। এই পদকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হতে দেখা যায়। ক. **কাব্য-পদ** খ. **গেয়-পদ**। নিম্নে এ-বিষয়ে একটি ছক উল্লেখ করছি:

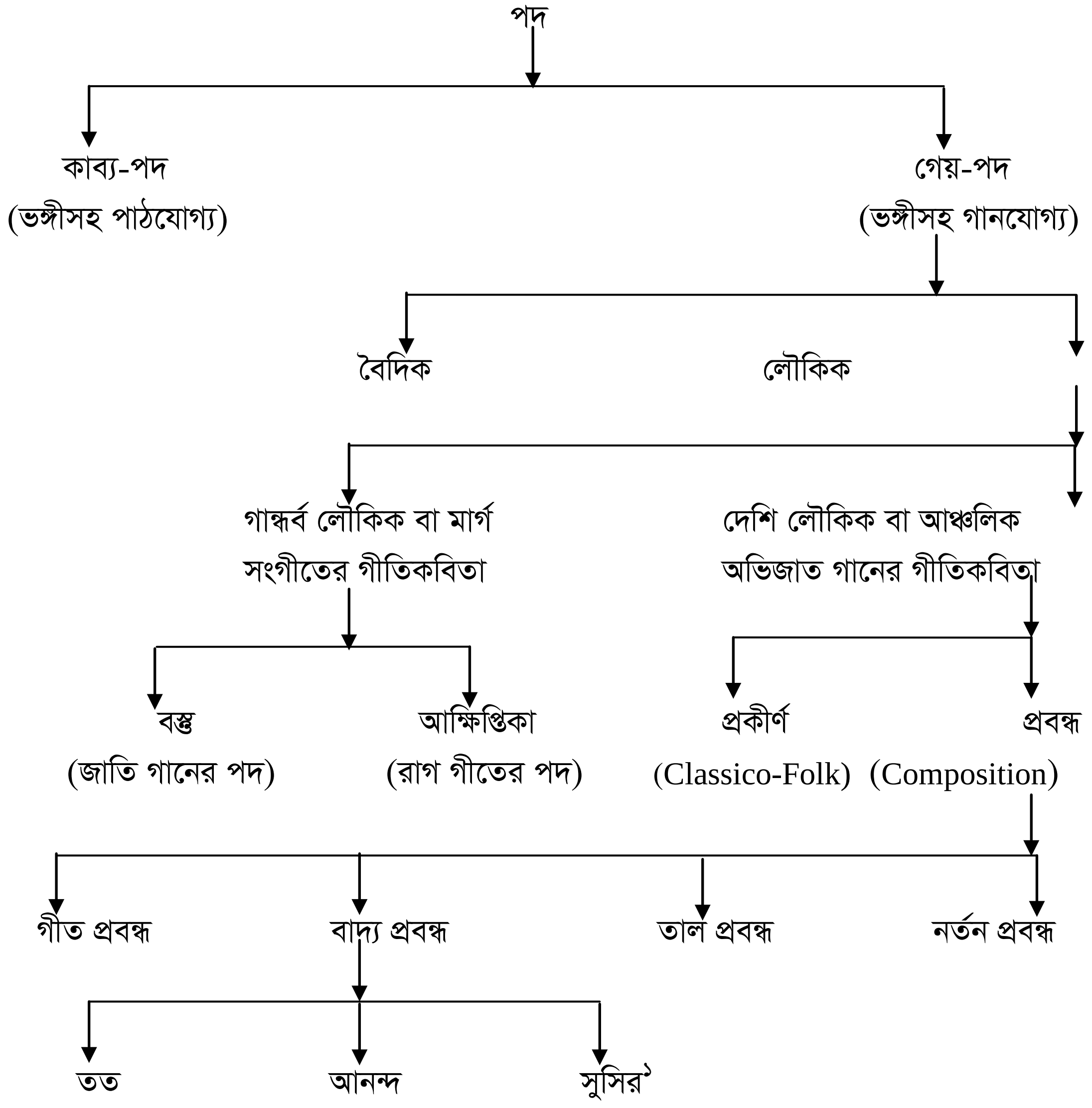

আচার্য ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে সাতটি শুদ্ধ জাতি এবং এগারটি বিকৃত জাতির উল্লেখ করেছেন। এই জাতির বিশেষ রাগে রয়েছে দশটি বিশেষ লক্ষণ। সঙ্গীতের প্রাণ ও অধিষ্ঠান রাগ এবং রাগের রূপ ও

১. ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, *সংগীত শাস্ত্র সমীক্ষা (২য় পর্ব)*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-২১

প্রকৃতিতে। রাগের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব হয় স্বর-এ। স্বরের ক্ষেত্রে রয়েছে দুইরকম স্তর : শুদ্ধ ও বিকৃত। শুদ্ধ স্বর সাতটি এবং বিকৃত স্বর দুটি : সাধারণ ও কাকলি। সাধারণ অর্থে সাধারণ-গান্ধার এবং কাকলি অর্থে কাকলি-নিষাদ বোঝায়। সাতটি স্বরের আরোহণ ও অবরোহণই মূর্চ্ছনা। মূর্চ্ছনার রয়েছে দুই ভাগ : সপ্তস্বর মূর্চ্ছনা এবং দ্বাদশ স্বর মূর্চ্ছনা। সপ্তস্বরের মূর্ছনার ভেদ চারটি : পূর্ণা, ষাড়বা, ঔড়বা বা উড়ুবিতা, সাধারণা। পূর্ণা অর্থে সাতস্বরের অকৃত্রিম মূর্চ্ছনা। ষাড়বে থাকে ছয়টি, ঔড়বে থাকে পাঁচটি এবং সাধারণে দুইটি। আচার্য মতঙ্গ মূর্চ্ছনা ও তানের প্রসঙ্গে – অগ্নিসোম, বিষ্ণুক্রান্ত, সূর্যকান্ত, গজকান্ত, চতুর্মাসিক, সৌত্রামণি, সাবিত্রী, আদ্যসাবিত্রী, অগ্নিচিৎ, দীক্ষা, সোম, সমিধ স্বাহাকার, গোদেহন প্রভৃতি যজ্ঞনামীয় তাল উল্লেখ করেছেন। যদিও বৈদিক সাহিত্যে এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকলেও তালগুলি জাত গানের উৎসানুসন্ধানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। পরবর্তীকালে দেখা যায়, উল্লিখিত তানগুলি পূর্ণা, ষাড়ব, ঔড়ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ছিল, সে ধারণা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। জাত গানের পূর্বতর অবস্থায় চার ধরনের বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলো : স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহী, অবরোহী। এই চারটি বর্ণের পরিচয় আচার্য ভরত, তাঁর *নাট্যশাস্ত্র*-এ দিয়েছেন। আমাদের ধারণা, যজ্ঞনামীয় উল্লিখিত তান ও বর্ণন্যাস থেকেই জাত গানের উদ্ভব হয়েছে। আচার্য মতঙ্গ *বৃহদ্দেশী* গ্রন্থে 'জাতি'র দশলক্ষণ প্রকাশ করেছেন। যথা : গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষাড়ব ও ঔড়ব। মতঙ্গই প্রথম প্রাচীন শাস্ত্রীদের মধ্যে 'জাতি' সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত দেন। তাঁর মতে জাতি হলো :

> ১. শ্রুতি, গ্রহ, স্বর (অলংকার, বর্ণ) প্রভৃতি উপাদান নিয়ে যে স্বরসম্ভার প্রকাশিত হয় তাকে 'জাতি' বলে।
>
> ২. যে স্বরসন্দর্ভের লীলায়িত গতি ও বিকাশ থেকে প্রত্যেকটি স্বরের – প্রত্যেকটি স্বর গঠনের রাগরূপের সত্যকারের রস প্রতীতি হয় তাকে 'জাতি' বলে।
>
> ৩. গন্ধর্ব ও দেশী রাগগুলি বা কারণরাগ থেকে জন্মলাভ করে তাকে জাতি বলে।[১]

সুতরাং বলা যায়, জাতি বা জাত গান প্রাচীন এবং তা অবশ্যই অভিজাত গান। উল্লিখিত দশলক্ষণ প্রযুক্ত জাতিগুলি পরিপূর্ণভাবে এক একটি শ্রেণির পরিচয় বহন করে থাকে। এই শ্রেণি বা 'জাতি' সংগীত রাগের ওপর নির্ভর করে যা রাগ-সংগীতের ব্যাকরণে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। রাগ শব্দের ব্যুৎপত্তি হলো : যা রঞ্জিত বা চিত্তকে বিমুগ্ধ করে অথবা যে সাংগীতিক ধ্বনি মানুষের চিত্তকে আনন্দের সংস্কারযুক্ত করে তাই রাগ। তবে এর শাব্দিক অর্থ ভিন্ন। অর্থাৎ স্বরবর্ণ-যুক্ত যে ধ্বনিতরঙ্গ মানুষের মনে প্রীতি ও আনন্দের সঞ্চার করে তাই 'রাগ'। আমরা মনে করি, 'রাগ' শব্দটি যৌগিক অথবা যোগরূঢ় শ্রেণিভুক্ত। কারণ, 'জলধি' বলতে জল ধারণ করে এমন কোন বস্তুকে না বুঝিয়ে যেমন শুধুমাত্র সমুদ্রকে বুঝিয়ে থাকে তেমনি 'রাগ' শব্দ স্বরসন্দর্ভ থেকে জন্ম হলেও শুধুমাত্র স্বরকে না বুঝিয়ে মানব-চিত্তবিমোহিনী বিশেষ অবস্থাসূচক রাগকে বোঝায়। এই রাগের স্বরসংখ্যা ব্যবহারের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে রাগগুলিকে নয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং নয়টি জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। রাগের জাতি নির্ণয়ে রাগভিত্তিক আরোহন ও অবরোহণের স্বরসংখ্যার ভিত্তিতে নয়টি বিশেষ নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে। যেমন :

১. সম্পূর্ণ - সম্পূর্ণ
২. সম্পূর্ণ - ষড়াব

১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস* (২য় ভাগ), শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা-১৯৯১, পৃষ্ঠা-৫০৬- ৫০৭

৩. ষাড়ব - সম্পূর্ণ
৪. ষাড়ব - ষাড়ব
৫. সম্পূর্ণ - ঔড়ব
৬. ঔড়ব - সম্পূর্ণ
৭. ঔড়ব - ঔড়ব
৮. ঔড়ব - ষাড়ব এবং
৯. ষাড়ব - ঔড়ব।[১]

যে কোন রাগই উল্লিখিত নয় প্রকারের কোনো না কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিরাগ থেকে অন্তরভাষা পর্যন্ত রাগগুলি গান্ধর্ব ও মার্গশ্রেণিভুক্ত। তাছাড়া সংগীতের তালের দশপ্রাণ রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান প্রাণ হচ্ছে 'জাতি'। 'জাতি' নির্ভর করে তালের মাত্রা ও সংখ্যার উপর। যেমন : ত্র্যস্র, চতুরস্র, খণ্ড, মিশ্র ও সংকীর্ণ। পূর্বে আচার্য ভরতও *নাট্যশাস্ত্র*-এ রাগের রীতির ক্ষেত্রে (জাতির ক্ষেত্রে?) পাঁচটি অঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন। যথা : প্রতিমুখ, গর্ভ, অবমর্শ, সংহার এবং রাগ-প্রয়োগরীতিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মুখ – গ্রামরাগরূপে মধ্যম-গ্রামরাগ, প্রতিমুখ – ষড়জ-গ্রামরাগ, গর্ভ – সাধারিত গ্রামরাগ, অবমর্শ – পঞ্চমগ্রামরাগ, সংহার – কৈশিক গ্রামরাগ পূর্বরাগ, ষাড়ব গ্রামরাগ ও কৈশিক মধ্যম-গ্রামরাগ। এগুলো সবই জাতিগানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিষয় ছিল এবং সংগীতের নানা ক্ষেত্রেও 'জাতি' শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কীর্তনের শ্রেণিপ্রকরণে জাতি শব্দের অপভ্রংশরূপ 'জাত গান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কীর্তনের ক্ষেত্রে জাত গানগুলি অভিজাত গান। একটি পূর্ণাঙ্গ জাত গানের ক্ষেত্রে ৪টি তুক ও ৬টি অঙ্গযুক্ত থাকে। ৬টি অঙ্গ হলোঃ স্বর, তাল, তেন, বিরুদ, পাট এবং অবশিষ্ট অংশ পদ-অঙ্গ নামে বিবেচ্য। এই অঙ্গ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ জাতির উপর নির্ভরশীল। যথা-

ক. তারাবলী ⟶ অঙ্গসংখ্যা ২ (পদ, তাল)
খ. ভাবনী ⟶ অঙ্গসংখ্যা ৩ (পদ, তাল, অন্য একটি অঙ্গ)
গ. দীপনী ⟶ অঙ্গসংখ্যা ৪ (পদ, তাল, অন্য দুটি অঙ্গ)
ঘ. আনন্দিনী ⟶ অঙ্গসংখ্যা ৫ (পদ, তাল, অন্য তিনটি অঙ্গ)
ঙ. মেদিনী ⟶ অঙ্গসংখ্যা ৬ (পদ, তাল, অন্য চারটি অঙ্গ)

জাতগানের একটি দৃষ্টান্তঃ

তাল : চচ্চৎপুট২ রাগ : নট
জয় জয় গোবর্দ্ধনধর৪ মধাব গোকুল গোপসূতা ধৃতি মোচন৪।
কালিয়া-বিষধর দর্প-বিমর্দক কেশব কৃষ্ণ কমলদল লোচন৪ ॥ (উদ্‌গ্রাহ)
লোলালক দলিতাঞ্জননিভ জনরঞ্জন ঘনচন্দন-পরিমণ্ডিত৪।
পীতাংশুকধৃত ললিত কৃশোদর মধুরানন নব-তাণ্ডব-পণ্ডিত ॥ (মেলাপক)
শ্রীবৃষভানু-তনয়ীমুখচন্দ্র চকোর চতুর সুন্দর সুখসাগর।
পীনবক্ষশিখি-পিঞ্জবিভুষণ গোচারণরত রসিক সুনাগর ॥ (ধ্রুব)
ঝিঁকি ঝিঁকি ঝিঁকি ঝিঁকি ঝাঁকৃণ কৃণ তক যোঙ্গ যোঙ্গ
তক থই থই থই থই৫।

১. ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১২১

করুণাঙ্কুর নরহরি পতি সে স সস রি গ রি১
তেন্না তি অই অ অই অই ॥ (আভোগ)৩[1]

উপর্যুক্ত পদে সূচক :

১ চিহ্নিত শব্দগুলো → স্বর

২ চিহ্নিত শব্দগুলো → তাল

৩ চিহ্নিত শব্দগুলো → তেন

৪ চিহ্নিত শব্দগুলো → বিরুদ

৫ চিহ্নিত শব্দগুলো → পাট

এই গানের সুর ও তালে আভিজাত্য থাকে। এ প্রসঙ্গে ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তীর অভিমত নিম্নরূপ :

> জাত গান বলে যে গানটিকে চিহ্নিত করা হয় ঠিক সে গানটির সুরে ও তালে আরও আরও বেশ কিছু গান থাকে। অর্থাৎ গানটির সুর ও তাল অভিজাত পদ্ধতির এবং একই সুর ও তালে আরও যে কয়টি গান গাওয়া হয় এই সবগুলিই 'জাত গান'।[2]

লক্ষণীয় বিষয়—প্রত্যেকটি পালায় যে সব পদ গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে গাওয়া হয় তার সুর (দাগী গান ছাড়া) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাত সুর। কীর্তনীয়ারা গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার সময় সাধারণত বড় দশকোশী তালের প্রকরণ, যথা : সম তাল, যোত সম বা বড়যতি তাল এবং দশকোশী তালে গেয়ে থাকেন। বাংলাদেশের কীর্তনীয়ারা উল্লিখিত তালে যে সমস্ত পদ গেয়ে থাকেন তার শ্রেণিবিন্যাসকৃত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো :

১. সম তালের গৌরচন্দ্রিকা (জাত সুরে) গান

ক. মরমে লাগিল গোরা না যায় পাসরা।
নয়ানে অঞ্জন হৈয়া লাগিয়াছে পারা ॥ ... (রূপানুরাগ)

খ. গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে।
নিরবধি ছল ছল আঁখিজল ঝরে ॥ (ঐ) ...

২. যোত সম তালের গৌরচন্দ্রিকা (জাত সুরে) গান

মান বিরহজ্বরে পহুঁভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহিঁ লোর ॥ ... (কলহান্তরিতা)

৩. বড় দশকোশী তালের গৌরচন্দ্রিকা (জাত সুরে) গান

ক. কি হেরিলাম অপরূপ গোরা রূপনিধি।
কতই চান্দ নিঙ্গাড়িয়া নিরমল বিধি॥ ... (রূপানুরাগ)

---

১. নরহরি চক্রবর্তী, *গীত চন্দ্রোদয়*, গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৬০, পৃষ্ঠা-৮৫

২. ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১২১

খ. নিরমল গোরাতনু, কষিত কাঞ্চন জনু, হেরইতে পড়ি গেনু ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মনে, অন্তর কাঁপয়ে মোর ॥[১]... (শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ)

উল্লিখিত তিনটি প্রকরণই বড় দশকোশী তালের জাত গানের প্রকরণ। এছাড়াও তেওট তালে বেশ কিছু জাত গানের সুর রয়েছে। এই তালের পরিচয় প্রদানকালে রাগিণীর নাম উল্লেখ করে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেমন : মল্লার তেওট, বেহাগ তেওট, আলেয়া তেওট, গৌরী তেওট, বিভাস তেওট, মায়ূর তেওট ইত্যাদি। বর্তমান গবেষকের ক্ষেত্রসমীক্ষা : ২০১৮-তে কীর্তনীয়াগণ-হতে প্রাপ্ত বহুল ব্যবহৃত তেওট তালের কিছু জাত গানের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো :

ক. মল্লার তেওট

রাস বিহারে, মগন শ্যাম নটবর, রসবতী রাধা বামে।
মণ্ডলী ছোড়ি, রাই কর ধরি হরি, চললহি আন বন ধামে ॥... (রাসলীলা)

খ. বেহাগ তেওট

সভে মেলি বৈঠল কালিন্দী তীর।
ঝর ঝর সবহু নয়নে বহে নীর।... (রাসলীলা)

গ. আলেয়া তেওট

সীদতি সখিমম হৃদয় মধীরং।
যদ ভজ মিহ নহি গোকুল বীরং ॥... (কলহান্তরিতা)

ঘ. গৌরী তেওট

চিকন কালিয়া রূপ, মরমে লাগিয়াছে, ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মজিয়াছে, না জানি তায় কত সুধা দিয়া ॥... (অনুরাগ)

ঙ. বিভাস তেওট

সোবর নাগর রাজ।
তপন তনয়া তটে, নিপহি নিকটে, হিলন নটবর সাজ ॥... (রূপানুরাগ)

চ. মায়ূর তেওট

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল, মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী, শিখিকুল আকুল, কালিন্দী বহয়ে উজান ॥... (রূপানুরাগ)[২]

---

১. ক্ষেত্রসমীক্ষা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, রাধাবল্লভ অঙ্গন, রানীবহ রাজবাড়ী। উদ্ধৃত পদগুলি কীর্তনীয়া অশোক কুমার গোস্বামী হতে প্রাপ্ত এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫ ও শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা (বিরচিত), *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?) – হতে উদ্ধৃত হয়েছে।

২. পূর্বোক্ত

এছাড়াও দুঠুকী তালের জাত সুর রয়েছে (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রকার প্রকরণ)। যেমন :

ক. সজনী ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরি, নবীন কিশোরী, নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥ ... (পূর্বরাগ)

খ. কি রূপ হেরিলাম কালিন্দী কূলে।
অপরূপ রূপ কদম্ব মূলে ॥
অচলা চপলা মেঘেরি গায়
মৃগাঙ্করহিত শশাঙ্ক ভায় ॥... (রূপানুরাগ)

গ. মধুকর-রঞ্জিত-মালতি-মণ্ডিত-জিতি-ঘন-কুঞ্চিত-কেশং
তিলক-বিনিন্দিত-শশধর-রূপক-যুবতি-মনোহর বেশং ॥... (রূপানুরাগ)

ঘ. বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥ [১]... (মাথুর)

জাত গানের সুরগুলি প্রকৃত অর্থে প্রাচীন নির্দেশক সুর, তবে অধুনা বাংলাদেশের কীর্তনে প্রাচীন গায়ক ছাড়া খুব কমসংখ্যক কীর্তনীয়াই জাত গানের প্রকরণ সৃষ্টি করেন বা ব্যবহার করে থাকেন।

মনোহরশাহী গান

পদগান মূলত বৈঠকী পর্যায়ের গান। নরোত্তম দাসই প্রথম পদগানকে আসরে উপস্থাপন করেন। খোলামেলা জায়গায় এ আসর বসে এবং সেখানে বহুলোক একত্র হয়ে কীর্তন শোনে। বিচিত্র মনের এ সব শ্রোতার মাঝে বৈঠকী মেজাজ রক্ষা করে গান গাওয়া বেশ কঠিন একটি ব্যাপার। আমাদের ধারণা, এসব কারণেই আসরভিত্তিক উপযুক্ত সরলতর গায়ন পদ্ধতির প্রয়োজনে মনোহরশাহী, গড়ানহাটী, রেণেটী ইত্যাদি 'ঘর' ভিত্তিক কীর্তনের ধারার সৃষ্টি হয়।

বৈষ্ণব পদাবলির কীর্তনের ধারায় মনোহরশাহী ও গড়ানহাটী - দুটি প্রসিদ্ধ ঘরানা। ঘরানা শব্দটির প্রথম ও যথার্থ প্রয়োগ ঘটে খেয়াল গানের ক্ষেত্রে। মূলত এটি এক ধরনের সঙ্গীতের আশ্রয় যেখানে প্রকরণ বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে উদ্ভাবনীবৃত্তির অনুপ্রেরণায় সঙ্গীতধারায় নানাবিধ আঙ্গিকের সংযোজন ও বিন্যাস ঘটানো হয়। অনেক গবেষক কীর্তনের ক্ষেত্রেও আঙ্গিকের ধারাকে ঘরানা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে কীর্তনের ক্ষেত্রে আদৌ ঘরানা শব্দটির ব্যবহার উপযুক্ত বা যৌক্তিক কিনা তা ভেবে দেখবার বিষয়।

১. ক্ষেত্রসমীক্ষা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, রাধাবল্লভ অঙ্গন বানীবহ, রাজবাড়ী। উদ্ধৃত পদগুলি কীর্তনীয়া অশোক কুমার গোস্বামী- হতে প্রাপ্ত এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫ ও শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা (বিরচিত), *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?) – হতে উদ্ধৃত হয়েছে।

খেয়ালের ঘরানার উপস্থাপন পদ্ধতি এবং কীর্তনের উপস্থাপন পদ্ধতির মধ্যে আঙ্গিকের বিচারে বহুক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মধ্যযুগে এ-সম্পর্কিত শব্দটি ছিল 'বাণী'। পরবর্তীকালে দেখা যায় বাণী শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে 'ঘর' হিসেবে। আমরা মনে করি, কীর্তনের ক্ষেত্রে ঘরানা শব্দটির ব্যবহারের ফলে যে বিতর্কের জন্ম হয়; উপযুক্ততা বিচারে 'ঘর' শব্দটি সচেতনভাবে ব্যবহৃত হলে আর বিতর্কের অবকাশ থাকেনা। যেমন : মনোহরশাহী ঘরের গান, গড়ানহাটী ঘরের গান ইত্যাদি। হিসেবে। আমরা মনে করি, কীর্তনের ক্ষেত্রে ঘরানা শব্দটির ব্যবহারের ফলে যে বিতর্কের জন্ম হয়; উপযুক্ততা বিচারে 'ঘর' শব্দটি সচেতনভাবে ব্যবহৃত হলে আর বিতর্কের অবকাশ থাকেনা। যেমন : মনোহরশাহী ঘরের গান, গড়ানহাটী ঘরের গান ইত্যাদি।

মনোহরশাহী ঘরের গান সৃষ্টির ইতিহাস দুটি মতের ধারায় প্রবাহিত। অবশ্য এ-সম্পর্কে আরও বিস্তৃত মত পাওয়া যায়। তবে এ-সব মত মাত্রাতিরিক্ত ভাবাবেগ ও কৃত্রিমতায় সজ্জিত বলে আমরা অভিমত পোষণ করি।

১. বস্তুত উল্লিখিত ঘরের কীর্তনের উৎস নির্ণয় করা দুরূহ একটি ব্যাপার। অনেক গবেষক মন্তব্য করেছেন - এই গানের সৃষ্টি হয়েছে শ্রীখণ্ড, কাঁদড়া (বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাস-এর জন্মস্থান), জাজীগ্রামকে কেন্দ্র করে। ঐতিহাসিকভাবে এ সব অঞ্চল মনোহরশাহী নামক পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জন্যই এই ঘরের গান 'মনোহরশাহী' বা 'মনোহরসাই' গান নামে পরিচিতি পেয়েছে। এই ঘরের কীর্তনের অন্যতম স্রষ্টা - জ্ঞানদাস, মঙ্গল ঠাকুর, নৃসিংহানন্দ মিত্র ঠাকুর, রঘুনাথ আচার্য প্রমুখ।

২. মনোহরশাহী ঘরের কীর্তনের সৃষ্টি প্রসঙ্গে আবার অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন – শ্রীখণ্ডের কাছাকাছি কাঁদড়ানিবাসী বংশীবদন ঠাকুর এবং তাঁর সঙ্গীতগুরু আউলিয়া মনোহর দাস এই ঘরের কীর্তনের উদ্ভাবক। এই মনোহর দাস পদকর্তা ও গায়ক ছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু লক্ষণীয় – মনোহর দাসের পদের সংখ্যা খুব অল্প এবং কীর্তনীয়াদের যে ইতিহাসের ধারার পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে তাঁর মৌলিক স্বীকৃতি খুবই নগণ্য।

উল্লিখিত দুটি মতের তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে আমাদের এই ধারণা হয় যে, ২ সংখ্যক মতটি জনশ্রুতি অনুসারে প্রচারিত হয়েছে এবং বাস্তবিকই এই মতের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কিন্তু ১ সংখ্যক মতের ক্ষেত্রে বহু ঐতিহাসিক সমর্থন রয়েছে। সুতরাং, সার্বিক বিচারে এই মতটিকেই যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি।

মনোহরশাহী কীর্তন গানের বৈশিষ্ট্য

১. মনোহরশাহী ঘরের গান একটু হালকা ধরনের এবং এতে রয়েছে সুস্পষ্ট গণমুখী প্রবণতা। অর্থাৎ, শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করার চূড়ান্ত প্রয়াস এই গানে লক্ষ করা যায়।

২. এই গানে শিল্পীর অপার সম্ভাবনা থাকে তার গায়কী প্রদর্শনের। ফলে, কীর্তনীয়াগণ অনায়াসে বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র আখর, পর্যায় প্রকরণ, ঘটনাবলি তৈরি করতে পারেন।

৩. মূলত এই ঘরের গানের ধারাই বা মূলসূত্র ধরে লীলাকীর্তনের সূচনা হয়।

৪. গৌরচন্দ্রিকা থেকে শুরু করে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক প্রসঙ্গ মিলন পর্যন্ত মহাজনী পদের বিচিত্র সংযোজন করে নাটকীয়ভাবে গাওয়া হয়।

৫. লীলা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, গোস্বামীবৃন্দের ব্যাখ্যা বা মতকে সূত্র হিসেবে ধরা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে পালাকে পূর্ণ রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ পাওয়া না গেলে গায়ক অন্তর্বর্তী তুক গানের প্রয়োগ ঘটান।

৬. সমস্ত উপস্থাপন কৌশলটিই থাকে নাটকীয়তায় পূর্ণ। অর্থাৎ রসসৃষ্টির বিচিত্র প্রয়াস গানকে কৌতূহলোদ্দীপক ও রসময় করে তোলে।

৭. মনোহরশাহী ঘরের কীর্তনে গানপ্রসঙ্গ অপেক্ষা লীলাপ্রসঙ্গের গুরুত্ব বেশি থাকে। ফলে এতে রসের নানান প্রকরণ পরিলক্ষিত হয়।

৮. এই গানের লয় ও ছন্দ তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত এবং সুরের মাত্রায় বিচিত্র জটিলতা দেখা যায়। মনোহরশাহী গানে চুয়ান্ন তালের গানের পরিচয় দৃশ্যমান।

৯. এই ঘরের গানের ক্ষেত্রে রাগসংগীতের ও লোকসঙ্গীতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, আবার গায়কদের প্রচেষ্টায় মিশ্ররূপও দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও আঞ্চলিক বা লোকায়ত সুরও সংযুক্ত করা হয়।

১০. মনোহরশাহী গানের ক্ষেত্রে গায়করা গানের ভাতিতে একটি লৌকিক ভাবের প্রয়োগ ঘটান। সুরগুলি অনেকক্ষেত্রেই আখরকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাতে সুরের বিচিত্র সন্নিবেশ ঘটে।

১১. একতালি, তেওটের কাটান, চঞ্চুপুট, মধ্যম ও ছোট দশকোশী, লোফা, দাস্যপ্যারী, দোঠুকী, ঝাঁতি ইত্যাদি কিছু নির্দিষ্ট তালে কথা ও সুরের বিস্তার ঘটানো হয়।

১২. মনোহরশাহী গানে আখর সংযোজনে বিচিত্র বিষয় লক্ষ্যণীয়, তাহলো – আখরে লৌকিক ভাষার প্রভাব এবং আঞ্চলিক উচ্চারণে তার প্রয়োগ। আখরবৈশিষ্ট্যই মনোহরশাহী গানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

১৩. এই গানে গায়ক-বাদক উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাদকই আখরগুলিকে সজীব করে তোলেন। লহরের পর লহর সংযোজনে বাদক গানকে সার্থকতার পর্যায়ে নিয়ে যান এবং গায়ক-বাদক মিলেই মনোহরশাহী গানের মূল রূপকে শ্রোতার সামনে আসরে উপস্থাপন করেন।

গড়ানহাটী গান

গড়ানহাটী গান সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচলিত, তাহলো – রাজশাহী জেলার খেতুরী গ্রাম গড়েরহাট পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। খেতুরী-মহোৎসবকে কেন্দ্র করে কীর্তন গানের ক্ষেত্রে নরোত্তম দাস

কর্তৃক যে ধারা সৃষ্টি হয় তাই গড়ানহাটী গান। নরোত্তম দাস ছিলেন একাধারে প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বিত রূপের আধার এবং সর্বান্তকরণে অনন্যসাধারণ সঙ্গীতবেত্তা। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে কীর্তনের নবরূপায়ণ ঘটে, অর্থাৎ উচ্চপ্রথার শৈল্পিক ধারাসম্পন্ন সঙ্গীতের ধারার সাথে লোক-ঐতিহ্যের এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটে। এই নবরূপায়িত ধারারই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন গড়ানহাটী কীর্তন গান। নরহরি চক্রবর্তী *ভক্তিরত্নাকর*-এ লিখেছেন :

নাচে গৌরচন্দ্র - কি অদ্ভুত গান সৃষ্টি।
ভুবন মাতায় প্রেমে, করে প্রেম বৃষ্টি ॥[১]

এই ভুবনমাতানো প্রেমময় কথা, সুর ও তালের অপূর্ব সমন্বয়ই গড়ানহাটী ঘরের গান। এই ঘরের গানের সাথে প্রাচীন রাগরীতির প্রকরণগত বিষয়–'ওহাটি' গানের সাথে তুলনা করা যায়। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, উভয়পক্ষেই বিলম্বিত মাত্রার সুর ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন বর্ণ, যেমন : 'ও', 'হা', 'আ' ইত্যাদি; আবার বিভিন্ন শব্দ, যেমন: 'ও আরে', 'ওকি' 'আহা মরি', ইত্যাদি শব্দ সংযোজিত করে গাওয়া হয়। তবে এই বিষয়টির উৎসানুসন্ধান একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। প্রকৃতঅর্থে, গড়ানহাটী ঘরের কীর্তনের মূল উৎসধারা সুপ্রাচীন এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, এই গানের সংগঠন পদ্ধতি, গায়কী পদ্ধতির ধরনে মোটামুটি সুস্পষ্ট নিয়ম রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবত*-এ কৃষ্ণবিষয়ক যেসব গান, যেমন : রুদ্রগীত, গোপিকাযুগলগীত, গোপীগীতি, ভিক্ষুগীতি, ভ্রমরগীতি, রাসগীত, রেণুগীত, ঐলগীত-এর পরিচয় পাওয়া যায় এবং যে গায়কী বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেক্ষেত্রে গড়ানহাটী গানের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যেও সুস্পষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। 'গৌড়েলা' ধারার সংগীতের মতোই গড়ানহাটী ঘরের গানও অনুপ্রাসযুক্ত রসপ্রধান সংগীত এবং প্রাচীন প্রকরণের নবরূপায়িত সংস্করণ। নরোত্তম দাস এই ধারাকে নবজীবন দান করে নবযৌবনা করে তোলেন, যা পরবর্তীকালে কীর্তনের ধারাকে মহিমান্বিত করে তুলেছে।

গড়ানহাটী গানের বৈশিষ্ট্য:

১. সুরের গতি আপন পরিমিতি কালের মধ্যে আদ্যন্ত সমভাবে স্থায়িত্ব লাভ করানো হয়। লয় বিলম্বিত হয় এবং লয় প্রদর্শিত তালও বিলম্বিত হয়।

২. গড়ানহাটী ঘরের গানের ছন্দ দীর্ঘ এবং মাত্রায় থাকে এক অপূর্ব সারল্য ও প্রসাদগুণযুক্ত আবহ।[২]

৩. এই গানকে মার্গসঙ্গীতে ধ্রুপদ গানের সাথে তুলনা করা যায়।

৪. গড়ানহাটী গানে তালের সংখ্যা একশ আটটি। এই তালের ব্যবহারও একটি ঐতিহ্যবিশেষ।

৫. তাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে–বিলম্বিত ও মধ্যগতিতে দশকোশী, তেওট, দোঠুকী, একতালি, লোফা প্রভৃতি এবং ক্ষেত্রবিশেষে ঝাঁপ তাল ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার্য তালগুলি দ্বিকল, চতুস্কল, বৃত্তিসম্পন্ন বার্তিক ও দক্ষিণ মার্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই ঘরের গানে আখরের ব্যবহার তুলনামূলক কম। পূর্বে উল্লিখিত দাগী গানগুলি গড়ানহাটী ঘরের গান। অধুনা বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক বিশুদ্ধ গড়ানহাটী ঘরের কীর্তনীয়া

১. নরহরি চক্রবর্তী, *ভক্তিরত্নাকর*, নন্দলাল বিদ্যাসাগর (সম্পাদিত), গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-৫৭৯

২. দ্রষ্টব্য : সঙ্গীতশাস্ত্রে তালই ছন্দ।

রয়েছেন। যেমন : মিহিরকান্তি ঘোষ, অশোক কুমার গোস্বামী, জগদীশচন্দ্র পাল, উত্তম সাহা, প্রমুখ এবং এই ঘরের চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন প্রয়াত গোপালচন্দ্র দাস, অমূল্যচন্দ্র সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, দয়ালকৃষ্ণ দাস, কেশবদাস মোহন্ত, কিশোরীমোহন গোস্বামী প্রমুখ কীর্তনীয়া।

মূলত গড়ানহাটী কীর্তন গান ধ্রুপদ গানের সাথে তুলনীয় এবং শুদ্ধ রাগ ও বিলম্বিত লয়ের গান। এর সরলতা ও গাম্ভীর্য বিবেচনায় রাগ-রাগিণীর ভঙ্গিতে ও তালের বিশিষ্টতায় একে এক স্বতন্ত্র স্থানে আসীন করে রেখেছে।

আরও বেশ কয়েকটি ঘরের গান বাংলার কীর্তন-ধারাকে পরিপুষ্টি দিয়ে বেগবান করে রেখেছে। সেগুলির মধ্যে রেণেটী, মন্দারিণী, বটুক গান, ঢপ কীর্তন উল্লেখযোগ্য। রেণেটী ঘরের প্রবর্তক হিসেবে কুলীন গ্রামের কাছে

অবস্থিত দেবীপুর গ্রামনিবাসী বিখ্যাত পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষকে অধিকাংশ গবেষক চিহ্নিত করেছেন। রেণেটী ঘরের গানের বৈশিষ্ট্য :

১. রেণেটি ঘরের গানের লয় ও ছন্দ সংক্ষিপ্ত।
২. এই গানের সুর মিশ্রিত ও তরল।
৩. আখরের ব্যবহার তুলনামূলক কম প্রয়োগ হয়।
৪. এই গানের সঙ্গে তুলনীয় ঠুংরী গানের আঙ্গিক প্রকরণ।
৫. রেণেটী ঘরের গানের তাল সংখ্যা ছাব্বিশ।

সম্ভবত এই ঘরের গানের ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশক হতে শুরু হয়েছিল বলে আমরা অভিমত পোষণ করি।

মন্দারিণী ঘরের কীর্তনধারার প্রবর্তক কীর্তনীয়া বংশীবদন।[১] মতান্তরে সরকার মন্দারণ।[২] মন্দারণ শব্দ থেকে মন্দারিণী শব্দের উদ্ভব এবং এর সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রামাণিক ভিত্তি হলো—ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার পশ্চিম অংশ মন্দারণ। সম্ভবত বংশীবদন মন্দারণ অংশেই বসবাস করতেন এবং তাঁর প্রবর্তিত ঘরটি মন্দারিণী নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। রেণেটীর চেয়ে সহজ ও সুলভ সুরের গান মন্দারিণী। এতে পাঁচালী ও মঙ্গল গানের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই ঘরের গানে তালের সংখ্যা মাত্র নয়টি উল্লেখ করেছেন।[৩]

---

১. হীতেশরঞ্জন সান্যাল, *বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস*, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২০৯

২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৭৩

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৩

'বটুক গান' মূলত বৈঠকী গান। এই গান সাধারণত ঘরোয়া আসরে বা বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি বা দুটি প্রসিদ্ধ গান গাওয়া হয়ে থাকে। বটুক গান মহাজনী পদ বা তুক গানও হতে পারে। সাধারণত মধ্যম দশকোশী, ছোট দশকোশী, দাসপ্যারী, তেওট, দুঠুকী, একতালি ইত্যাদি তালে গানগুলি গাওয়া হয়ে থাকে। বটুক গানের ক্ষেত্রে নানারকম তালফেরতা দেখা যায়। এই গান গ্রামীণ জীবন-সংশ্লিষ্ট এবং ভাববিন্যাসে অভিনবত্ব প্রকাশ করে থাকে। সাধারণত অন্তরঙ্গ ভক্তদের আস্বাদনের হেতু বটুক গানের গুরুত্ব অপরিসীম। বটুক গান সাধারণত রাগাঙ্গবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়ায় তালের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ জটিল হয়ে থাকে। গ্রামীণ জীবন-সংশ্লিষ্ট গান 'বান্ধুটী' গান নামে পরিচিত, আবার পরিবেশ বজায় রেখে বৈঠকী আসরে পরিবেশিত হলে তা হয়ে ওঠে বটুক গান। কথা, সংকলন, আখর, ভাববিন্যাসের অভিনবত্বে লঘু ও গুরু কাটান লহরে বটুক গান হয়ে ওঠে আস্বাদনীয়। অনেকক্ষেত্রে বটুক গানের ধরন গড়ানহাটীর মতো। বটুক গান অন্তরঙ্গ আস্বাদনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

চতুর্থ অধ্যায়: কীর্তনের উৎস ও অর্থ-তাৎপর্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের রসময়তা

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের রসময়তা

বৈষ্ণব পদাবলির রসময়তা ও তার সাহিত্যিক মূল্য বহুদেশদর্শী। কীর্তনের ক্ষেত্রে রসের উপযোগিতা বিষয়প্রকরণের ওপর যেমন বিন্যাসকৃত তেমনি এই বিষয়প্রকরণের অনন্য উপাত্ত হলো ভক্তি। 'ভক্তি' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে 'ভিজ্' ধাতু থেকে; যার অর্থ ভজনা বা অর্চনা করা। অধ্যাত্মবাদী চেতনার সঙ্গে ভক্তি, সুপ্রাচীন কাল থেকেই যুক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। যদিও কেউ কেউ বিষয়টিকে অতি প্রাচীন বলে মনে করেন না, কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে, উপনিষদে এর উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রবণ, মনন, ধ্যান মূলত উপাসনাসম্পর্কিত বিষয়। *ঋগ্বেদ*-এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে 'ভগভক্ত' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ক. <u>ভগভক্তস্য</u> তে বয়মুদ শেম তবাবসা। মূর্ধানাং রায় আরভে ॥ (১.২৪.৫)
খ. ইদা হি ব উপস্তুতিমিদা বামস্য <u>ভক্তয়ে</u>।
উপ বো বিশ্ব বেদসো নমস্যুরাঁ অসৃক্ষ্যন্যামিব ॥ (৮. ২৭. ১১)[১]

মাধবাচার্য যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেখানে 'ভগ' শব্দটির সাথে 'ভগবৎ', 'ভাগবত' শব্দের অর্থগত ও প্রয়োগগত সাদৃশ্য লক্ষণীয় এবং উল্লিখিত শব্দ ষড়্গুণের আধার স্বরূপ 'পরমাত্মা'র 'বোধক' হিসেবে আলোচিত হয়েছে। 'ভক্তি', 'ভগ', 'ভাগ' এবং 'ভিজ' ধাতু থেকে উৎপন্ন কৃদন্ত শব্দগুলো প্রায়শই শ্রীব্যাস দেবকৃত মন্ত্রে পাওয়া যায়। উল্লিখিত শব্দগুলির মধ্যে 'অংশভাক' হয়ে থাকে বা এ-জাতীয় অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি করে থাকে। অর্থাৎ অংশভাগিত্ব হিসেবে শব্দগুলোর উপযোগিতা নিরূপিত হয়। এই অংশভাগিত্বের মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রীতি, অনুরাগ ও প্রেম। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় মার্গ হিসেবে প্রধানত 'জ্ঞান' ও 'কর্ম'কে প্রাধান্য দিলেও সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মসাধনার ক্রমবিকাশের ধারায় তৃতীয় মার্গ হিসেবে 'ভক্তি' সমান্তরালভাবে স্বীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই। পরবর্তীকালে দেখা যায়, প্রাচীন মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক শ্রৌত সাহিত্যে যে কাণ্ডবিভাগ – 'জ্ঞানকাণ্ড', 'কর্মকাণ্ড', 'উপাসনা কাণ্ড'; একইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা*তেও দেখা যায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিকাণ্ডে (অধ্যায়ে) বিভক্ত হয়ে উপস্থাপিত হতে। মহর্ষি যাস্কেয়-এর *নিরুক্ত*, পাণিনি-এর *অষ্ট্যাধ্যায়ী*তেও 'ভক্তি' শব্দটি গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। পাতঞ্জল-এ 'মহাভাষ্য'; 'শিব-ভাগবত' প্রভৃতিতে ভক্তি শব্দের সচেতন উল্লেখে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, বৈদিক যুগ থেকেই 'জ্ঞানকাণ্ড' ও 'কর্মকাণ্ডে'র পাশাপাশি 'ভক্তি'কেও পরমতত্ত্ব-উপলব্ধি বা মার্গ সাধনার একটি অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ষড়বিধ কল্যাণগুণের আধারস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে প্রীতি, অনুরাগ এবং প্রেম দিয়ে যে অনুভব করা সম্ভব, তা ছিল ভক্তি-সম্পর্কিত বিষয়। যথা:

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যোয়া শৈচব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ (*বিষ্ণুপুরাণ*)
অর্থাৎ,ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান; যিনি সর্বশক্তিতে বিরাজমান, অর্থাৎ গুণানুপাতিক শক্তিতে বর্তমান। আনন্দ-শক্তিই তাঁর স্বরূপশক্তির আধার। ভক্তির প্রাবল্যে ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান হয়ে ওঠেন মাধুর্যময় ভগবান।[২]

১. রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদকৃত, *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৭, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৫

২.উদ্ধৃতি, সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠ-৪

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ভক্তিতত্ত্ব জনজীবনের প্রায়োগিক স্তরে এসে পৌঁছায়। পরম প্রেম-ভক্তি-ভক্ত—এই ত্রয়ীর সম্মিলনে ভক্তির অনন্য রূপায়ণ অর্থাৎ বিচিত্র বিলাসকে রসের কেন্দ্র হিসেবে উপস্থাপন করেন বৈষ্ণবাচার্যগণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে 'ভক্তিরস' বিচিত্র বিলাস এবং গাম্ভীর্যসূচক বিভাগ ও উপবিভাগে উপস্থাপিত হয়েছে। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা একদিকে যেমন রস-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, অন্যদিকে রসের মাধুর্য আস্বাদনে রসের অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং রসের বিচিত্র আস্বাদের স্বতন্ত্র নামকরণ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। যদিও প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা 'ভক্তি রস নয়, ভাব মাত্র' বলে উত্থাপন করেছিলেন।।

সাহিত্যদর্পণ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, রসগঙ্গাধর প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের ভাষ্যমতে, ভক্তি কখনোই রস নয়। কারণ ভক্তির স্থায়িভাব দেবাদিবিষয়া রতি। যেহেতু দেবাদিবিষয়া রতি ভাবের অন্তর্ভুক্ত, তাই ভাবের অন্তর্ভুক্ত বলে ভক্তি কখনো রসপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগে, রস আর ভাবের বস্তুত পার্থক্য কোথায়? বৈশিষ্ট্য ধরে বিচার করলে রস আর ভাবের পার্থক্য স্পষ্ট করা যায়, তাহলো—এই প্রভেদের বিষয়রূপ স্বরূপগত। রস অলৌকিক, কারণ আনন্দের চিন্ময়সত্তা-রূপই রসের বর্তমান। কিন্তু রসের যে ভাব তার স্থিতি একান্ত লৌকিক। শুধু রসের ব্যঞ্জক যা তাই-ই অলৌকিক। শুধু রূপের প্রক্ষেপণেই যা পার্থক্য, বিষয়ভাবে নয়। আচার্য ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়েও বেশ দৃঢ়ভাবে ভাব ও রস প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার সারসংক্ষেপ করলে যা উঠে আসে তাহলো – রস হতে হলে স্থায়িভাবের যোগ্যতা থাকা চাই এবং থাকা চাই তার পরিপুষ্টি। ঘাটতি থাকলে রসপদ্য বাক্য হবে না। আচার্য ভরত নাটকে রসীকরণযোগ্য আটটি রসকে স্থায়িভাবের শ্রেণিতে স্থান দিয়েছেন। অভিনব গুপ্ত পরবর্তীকালে আর একটি রস (শান্তরস) প্রতিস্থাপন করেন। সর্বমোট নয়টি রসের মধ্যে আটটি ধর্ম-অর্থ-কাম এবং অন্যটি মোক্ষমূলক রস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন এইসব আলঙ্কারিকদের আলোচনায় ভক্তিরসের স্থান নেই। কিন্তু জগন্নাথ পণ্ডিত *রসগঙ্গাধর*-এ শেষের দিকে যে ভাষ্য প্রদান করেছেন তাতে ভক্তিরসকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা চলে না। কারণ আলঙ্কারিকেরা স্থায়িভাবের যেসব লক্ষণ দিয়েছেন, তাতে ভক্তিকে রসীকরণযোগ্য স্থায়িভাব বলতে বস্তুত আপত্তি তোলার কোনো কারণই নেই। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরাও কেউ কেউ তা স্বীকার করে নিয়েছেন। চিত্তবুদ্ধিরূপ বহুভাবের মধ্যে যার রূপবাহুল্যে উপলব্ধি হয় তাই স্থায়িভাব এবং রসীকরণযোগ্য বলেই তাকে রস বলা হয়—এই সংজ্ঞা ভক্তিরসের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য এবং শান্তভাবের রূপ বহুলতার মতো ভক্তিভাবের রূপবহুলতা পরিপূর্ণভাবেই সম্ভব। ফলে, ভক্তের যে ভক্তিরস, সে-রসনিষ্ঠার ভাগবতীপ্রতিষ্ঠা, প্রাণ-ক্ষণ সঞ্চারিণী চিত্তরাগ-লীলা। এক্ষেত্রে আমাদের মত হলো 'ভক্তি' যৌক্তিক বিচারে স্থায়িভাবেরই একটি রস। দশম রস হিসেবে তাকে সার্বিকভাবে প্রতিস্থাপন করা হলে দার্শনিক ধারার নানান বিষয় ব্যাখ্যা এবং উপলব্ধি করা সহজতর হয়। সুতরাং ভক্তিকে পরিপূর্ণ রসের পর্যায়ভুক্ত করে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করাই যুক্তিসঙ্গত। *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর দশম স্কন্ধের একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা যায় :

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরা ভগবতি প্রতিলভ্য কামং

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।

অর্থাৎ, ব্রজবধূগণের সাথে ভগবানের এই চিন্ময় (ভক্তিরসের) রাসবিলাস তা শ্রীভগবানের চরণে পরাভক্তি লাভের সহায়ক এবং হৃদয়ের রোগস্বরূপ কামকে দূরীকৃত করতে ও কামনা-বাসনার বন্ধনথেকে মুক্তিলাভের অনন্যপথ।[১]

ভক্তিরস মূলত কামনা, আরাধনা, নিরাসক্তি ও অনুরক্তির অচিন্তনীয় শক্তিবলে মহিমা ও মাধুরীর এক অনির্বচনীয় সংযোগ-ভূমি হয়ে উঠেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণব পদাবলি ও কীর্তন তার অনন্য উদাহরণ।

ভক্তিরস ও কীর্তন

বৃন্দাবন দাস তাঁর *শ্রীচৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কীর্তনের আবির্ভাব, হেতু ও বৈষ্ণবপদাবলির রসময়তার উৎস নির্ণয় করেছেন :

১. আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ।
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ॥
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

অর্থাৎ, যাঁহাদের ভুজ-যুগল আজানুলম্বিত, যাঁহাদের কান্তি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, নয়ন-দ্বয় কমলদলের ন্যায় দীর্ঘ ও আয়ত, আমি সেই সঙ্কীর্তনের একমাত্র পিতা, বিশ্বসংসারের ভরণপোষণকর্ত্তা, যুগধর্ম্মপালক, জগতের প্রিয়কারী দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দয়ার অবতার (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে) বন্দনা করি।

২. কলিযুগে সর্ব-ধর্ম হরিসংকীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ ॥[২]

কীর্তনের রসময়তার মূল উৎস চৈতন্যদেব। কলিজীবের ভবভয়ে জর্জরিত জীবনকে অভয় প্রদান করে 'সঙ্কীর্তনৈক পিতরৌ'–চৈতন্যদেব দিলেন সাধনার মূল তত্ত্বখনি– কীর্তন। বলাবাহুল্য চৈতন্যদেবের করস্পর্শেই কীর্তন হয়ে উঠল সাধনার হেতু এবং নিগূঢ় রস আস্বাদনের মাধ্যম। শুধু তাই নয়, ভয়াবহ জাতিভেদপ্রথা নির্মূল করে একমাত্র কীর্তনই দিয়েছিল সর্বাত্মক ঐক্য এবং জন্ম দিয়েছিল পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেবামূলক মনোভাব। বৈষ্ণবীয় আচরণের মূল তত্ত্বই হচ্ছে সেবাবৃত্তি। মহোৎসবে আজও দেখা যায় বৈষ্ণবেরা এই বৃত্তিকে কেন্দ্র করে 'সর্বজীবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'–জ্ঞানে সবাই মিলিত হয়ে একস্বরে 'হরিবোল' ধ্বনি তুলে বিশেষ সর্বমানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর রয়েছে। কীর্তনের রসময়তার বিষয় ত্রিবেণীধারায় প্রবাহিত। মূলধারাটি হলো ভক্তি। ভক্তির অঙ্গই হলো আধ্যাত্মিক ভক্তি ও ভাবময়তা। ভক্তির মূল সোপানেই কীর্তনের সৃষ্টি। আর কীর্তনের ফলাগম ভাব ও তন্ময়তা এবং লীলাসুখ অনুধাবন, দর্শন। বৈষ্ণব পদগুলি বিচার করলে দেখা যায়, এগুলোর মাধ্যমে সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছে–

১. গীতা প্রেস প্রকাশিত, *শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ*, গোরক্ষপুর, ২০১৯, পৃষ্ঠা-১৫৭৭

২. বৃন্দাবন দাস, *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৩৬৯

বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১ ও ১৩

ক. সাহিত্যিক সত্তা (সাহিত্য প্রকরণগত বিষয়)

খ. সাংগীতিক সত্তা (সঙ্গীত প্রকরণগত বিষয়) ও

গ. আধ্যাত্মিক সত্তা।

বৈষ্ণবীয় আচরণে কীর্তনই হলো আধ্যাত্মিক সত্তা তথা সাধনতত্ত্বের অন্যতম মাধ্যম। দেখা যায় সৌরীয়, শাক্ত, গাণপত্য–প্রায় সবাই কীর্তনকে স্বকীয় ভজনের গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে কীর্তন শিল্পকে উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যই সমৃদ্ধ করেছে এবং ভাব, সঙ্গীত, সুর, অলংকার, তাল প্রভৃতি এই শিল্পকে দিয়েছে অপূর্ব নান্দনিকতা। এই অপূর্ব বিষয়প্রকরণের মূল উপাত্ত ভক্তি। সুতরাং দেখা যায়, বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের ক্ষেত্রে যে আধ্যাত্মিকতা ও রসময়তা তার রূপায়ণের হেতু অনন্য ভক্তি। এই ভক্তিরসকেই বৈষ্ণবেরা একমাত্র অলৌকিক রস বলে থাকেন। প্রাকৃত রস লৌকিক কিন্তু অপ্রাকৃত রস কৃষ্ণরাধাদিনিষ্ঠ, অর্থাৎ একমাত্র ভাগবতী রতি ও রস অলৌকিক ও রসোত্তীর্ণ হতে পারে, পার্থিব রতি বা রস নয়। কীর্তনের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধপুরুষ কৃষ্ণ এবং সেই আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণরতিই আধ্যাত্মিকতার অলৌকিকত্ব এবং রসময়তার মূল বিষয়।

বৈষ্ণবীয় মতে,কলিযুগে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মুক্তির উপায় কীর্তন। সনাতনধর্মীয় প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে এ-বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন : *শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, পরাশর সংহিতা* প্রভৃতি গ্রন্থে। এই কীর্তনের আবির্ভাব মঙ্গলময় ও জগতপ্রিয়কর চৈতন্যের বদান্যতায়। কীর্তনের নাম এতই শক্তিশালী যে, নামাভাসেই ঘটে মুক্তি–বৈষ্ণবীয় এই মতের মধ্যেই রয়েছে কীর্তনের আধ্যাত্মিকতার মূল বিষয়। লীলা কীর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় গৌরাঙ্গলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করা হয় এবং তা বিভিন্ন ভাবে ও রূপে আস্বাদন করা হয়। এই কীর্তন সংকল্পিত কীর্তন এবং বৃহত্তর বৈষ্ণব সম্মেলনে রসের ও ভাবের অলৌকিক সমাবেশ ঘটে থাকে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে কীর্তন ছিল গণবিনোদনের একটি বহুল প্রচলিত মাধ্যম। এ-ক্ষেত্রে ভক্তির ভাব ও রস সুস্পষ্ট রূপে বিকাশমান ছিল না। কিন্তু চৈতন্যের আবির্ভাবে কীর্তনের ক্ষেত্রে ঘটে অভাবনীয় পরিবর্তন। সরলতা ও ভাবের গভীরতায় কীর্তন হয়ে ওঠে রসাস্বাদনের অনন্য মাধ্যম। কীর্তনের বহিরঙ্গে থাকে তত্ত্ব আর অন্তরঙ্গে প্রগাঢ় অনুভব-তত্ত্ব। ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব কীর্তনের অনন্য আধার। ব্যবহারিক পর্যায়ে অনুভবের যে সম্পর্কসূত্র তাতে কীর্তনের অনন্য উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায় রসময় পরিবেশ ও রসাস্বাদন। এজন্যই বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন প্রকৃত অর্থেই 'রসকীর্তন'। কীর্তনের রূপগত বিচারে একদিকে যেমন স্বর, তাল, প্রক্ষেপ, সুর, গমক ইত্যাদি সাংগীতিক উপকরণ রয়েছে তেমনি অন্যদিকে আছে ভাবের বিকাশ এবং পদে কাব্যের দ্যোতনা। কাব্যের অনন্য আস্বাদনীয় বিষয় রস, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই। পদাবলি কীর্তনের অন্তরঙ্গে রসের নানা উপকরণ সজ্জিত থাকে। কীর্তনের রস-উৎপাদনে যে রসাস্বাদন হয় তা স্থায়িভাবের দ্বারা সার্থক ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। আচার্য ভরত উল্লেখ করেছেন :

> রতির্হাসশ্চ লোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
> জুগুপ্সা বিশ্চয়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতা ॥ *নাট্যশাস্ত্র*,৬/১৭
>
> অর্থাৎ রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়–এইগুলি স্থায়িভাব নামে খ্যাত।[১]

১. ভরত, *নাট্যশাস্ত্র (১ম খণ্ড)*, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৩৪

পদাবলি কীর্তনে ভক্তি যে রসরূপে স্বাদিত হতে পারে এবং বহুবৈচিত্র্যে অভিলক্ষিত হতে পারে তা বৈষ্ণব মহাজনেরা দেখিয়ে গেছেন। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই এখানে আস্বাদনীয় বিষয়। কীর্তনের রসময়তার আধার স্বরূপতত্ত্বরূপে প্রেমকে অনুভব করা, আধেয় মাধুর্য-রসাস্বাদন। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা উপনিষদের রস-ব্রহ্ম বা আনন্দ-ব্রহ্মেরই উপাসক। আনন্দই সমুদয় ভূতের জন্মদাতা, জীবনের হেতু এবং আনন্দেই স্থিতি। ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিশুদ্ধ একত্ব পরিহার করে দ্বৈতভাবের ভিত্তিতে বহু ও বিচিত্রের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কারণ তিনি রসাস্বাদন করতে চান। কিন্তু রসের বিকাশ হতে হলে তা দ্বৈতভাবের প্রয়োজন। দুই ভিন্ন সত্তা না থাকলে রসের উপযোগিতা ও ভালোবাসার মাধুর্যরস আস্বাদন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং পরম সত্তার রস-উপলব্ধিতে তাই বহু হওয়া প্রয়োজন। রসের ধারার বহমানতায় দ্বৈতভাব যেমন প্রয়োজন তেমনি
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দেরও প্রয়োজন। সম্পর্কের হেতুর প্রয়োজন। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* বলা হয়েছেঃ

> যদ্বৈ তৎসুকৃতং রসো বৈ সঃ । রসঁ হ্যেবায়ং লব্ধাহহনন্দী ভবতি।
> কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।
> এষ হ্যেবানন্দয়াতি।
> অর্থাৎ, তিনিই রস স্বরূপ। তিনিই রস আস্বাদন করে আনন্দ পান। এই পরব্রহ্ম
> পরমাত্মাইহলেন সকল আনন্দের উৎস ও দাতা।[১]

দ্বৈতভাব স্থাপনের জন্য তপস্যার প্রয়োজনীয়তা উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ* (২/৬)-এ ব্রহ্মের বহু হওয়া, জন্মগ্রহণ করা, সৃষ্টি ও তপস্যার প্রসঙ্গ এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *শ্যামলী* কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতায় জানাচ্ছেন :

> তত্ত্বজ্ঞানী জপ করেছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
> না, না, না–
> না–পান্না, না–চুনি, না–আলো, না–গোপাল,
> না আমি না তুমি।
> ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
> মানুষের সীমানায়।[২]

অদ্বৈত অবস্থায় পরমব্রহ্ম কবিত্বহীন, আকর্ষণহীন; সে অবস্থায় তাঁর আনন্দরূপ বিলয় হয়ে যায়। দ্বৈতরূপেই তিনি 'আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি' অর্থাৎ এই রূপেই প্রকাশিত হলেন। আনন্দেই আস্বাদনলাভ করলেন স্বরূপ। এই আনন্দরূপরসের সার্থকতা বৈষ্ণবীয় সাধনার মধ্যে নিহিত আছে। ঐশ্বর্যরস আস্বাদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। তাই ভগবানের মাধুর্যই প্রধান। ভগবান পূর্ণ ঐশ্বর্যময় হওয়া সত্ত্বেও নরলীলায় পূর্ণ মাধুর্যের আবরণে, রসাস্বাদনে নিজেকে মধুর করে তুলেছেন। তিনি আকর্ষণ করেছেন তাঁর অচিন্ত্য মাধুর্যের দ্বারা। রস-ব্রহ্ম নেমে আসেন ধূলার পৃথিবীতে। ভগবান ব্যাকুল হয়ে ওঠেন মানুষের বিশুদ্ধ প্রীতিলাভ করার জন্য। নাম এবং নামী তখন অভেদ হয়ে যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে এ-বিষয়ে জানিয়েছেনঃ

১. গীতা প্রেস প্রকাশিত, *উপনিষদ*, গোরক্ষপুর, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৩৩৯

২. সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-রচনাবলি* (সপ্তদশ খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১০

ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীতি ॥
আমারে ঈশ্বর মানে—আপনারে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমাকে ত'যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সেভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি ॥
আপনাকে বড় মানে—আমাকে সম, হীন।
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥[১]

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনে রসের আকর কৃষ্ণ। তিনিই নায়ক। পদাবলির কৃষ্ণ মাধুর্যরসময়। তাঁর ঐশ্বর্য–ভাব প্রচ্ছন্ন। নায়িকা শ্রীমতী রাধা। তিনি 'রাসরস-তাণ্ডবী', 'সুবিলাসা মহাভাবরূপী','রসময়ী'। এই অতুল প্রেম-ঐশ্বর্যময় নায়ক-নায়িকা রস-আস্বাদনের পরম হেতু এবং মাধুর্যমণ্ডিত রসের ভাণ্ডার। এই রসোপকরণই পদাবলি কীর্তনের মুখ্যবস্তু এবং কীর্তনে শিল্পী-শ্রোতার আহ্লাদময় রসসত্তাই আস্বাদনীয় হয়ে ওঠে। কীর্তনের এই রসতত্ত্ব দর্শনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের এই রস 'ব্রহ্মাস্বাদ স্বয়ং'। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব যেমন বৈষ্ণব কাব্যের তেমনি বৈষ্ণব দর্শনেরও প্রাণবিন্দু। লীলারসের মূল আশ্রয় রাধাকৃষ্ণ, পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম-সুখ, পরম অভিধেয় কৃষ্ণলীলাদিশ্রবণরূপ একান্ত ভজন। এই একান্ত ভজনরূপ কীর্তন হয়ে ওঠে ভক্ত হৃদয়ে 'রসকীর্তন'। কীর্তনে রসের প্রসঙ্গ শাস্ত্রগ্রন্থে উল্লেখ থাকলেও রসের সূত্রের অনুধাবনের অবস্থান অনুভবের রাজ্যে।

কীর্তনে রসব্যাপ্তির স্তরকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। অর্থাৎ রসের আশ্রয় ও বিষয় চারটি স্তরে ব্যাপ্ত থাকে :

ক. মূল নায়ক-নায়িকা
খ. কীর্তনের কাব্য ও সাহিত্যময় রসপ্রাচুর্য
গ. কীর্তনের সাংগীতিক বিন্যাস পদ্ধতির রসতাৎপর্য
ঘ. কীর্তনের গায়ক বা অনুকার নাট্যশিল্পীবৃন্দ ও কীর্তনের অনুকূল শ্রোতাদের অন্তস্তলে সুপ্ত রসসত্তার সুখময় উপলব্ধি।

প্রকৃতঅর্থে রসময় উলব্ধির জন্য সাধনভক্তি অপরিহার্য সোপান। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিকে মূলত তিনভাগে বিন্যস্ত করে রসাস্বাদনের কার্যকরণসম্মন্ধ নির্ণয় করেছেন। ভাগগুলি হচ্ছে : আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা এবং স্বরূপসিদ্ধা। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর *পরমাত্ম সন্দর্ভঃ* গ্রন্থে ভক্তির হেতু পরমাত্মতত্ত্বকে উল্লেখ করেছেন যাতে ভক্তি ও রসের একটি সুস্পষ্ট কার্যকরণ চিহ্নিত করা যায়। যথা :

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১৭৫

ক্ষেত্র ও আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পরেশ।
নারায়ণো ভগবান বাসুদেবঃ
স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ ॥[১] *(পরমাত্ম সন্দর্ভঃ)*

অর্থাৎ, জীবসমূহেই পরমেশ্বরের অয়ন বা অবস্থান। ভগবান ষড়বিধ ঐশ্বর্যশালী এবং তিনিই সকলভূতের আশ্রয় এবং আপনার অধীন যে মায়া তার দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ জীবে নিত্যরূপে বর্তমান থাকেন। তিনি শুদ্ধ ও মায়ার পর হয়েও মায়ারচিত বক্ষ্যমান সকল ক্ষেত্রেরই অতীত। কিন্তু ভগবদ্বিমুখ মায়াবদ্ধ জীবের পরমগতির জন্য মায়ার পাশ কাটাতে ভক্তিকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করতে হয়। সেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণে কর্ম-অর্পণ করাই হলো 'আরোপসিদ্ধা'। কর্মকাণ্ডমিশ্রা হলো 'সঙ্গসিদ্ধা' যা ভগবানের পরিকরাদির মধুময় সঙ্গ হতে উদ্ভূত। ভক্তির 'স্বরূপসিদ্ধা' স্তরে জ্ঞান-কর্ম সংযোগের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং এই স্তরের ভক্তি হলো প্রত্যক্ষ বা অকৈতব ভক্তি। রসময়তার অনুধ্যানে বৈধী ও রাগানুগা হিসেবে এই তিন ভক্তি ভক্ত-অন্তরে স্বচ্ছসলিলের মতো প্রবাহিত হয় এবং ধীরে ধীরে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে আস্বাদনের নিমিত্তে এক অপূর্ব বর্ণনাতীত রসময় তরঙ্গ বয়ে চলে। এই ভাবরসতরঙ্গ অনুধাবনে নবলক্ষণা ভক্তির প্রসঙ্গ *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যথা:

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥[২]

এই নবলক্ষণা বা নবধা ভক্তির অনুষ্ঠানই উদ্দিষ্ট ভক্তির উপলক্ষ্য। কিন্তু এই ভক্তি-পাত্র রসময় করে তুলতে হলে ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এজন্যে ভগবানের সাথে সখ্য, দাস্য, শান্ত, বাৎসল্য, মধুর ভাব স্থাপনে আত্মনিবেদনই যথার্থ পথ। কিন্তু চৈতন্যদেব সাধ্যসাধন তত্ত্বের ব্যাখ্যায় 'এহো বাহ্য' বলে বিষয়কে আরও গভীরে নিয়ে গেলেন। আত্মনিবেদনে ভোগবাসনারূপ কর্মফলের আশা ত্যাগ করতে হয়। এই স্তরে জ্ঞানমিশ্রভক্তির জন্ম হয়। দুটি ধারায় এই ভক্তি পরিচালিত হয়। তাহলো – স্বধর্মে থেকে বৈধীভক্তির যাজন এবং সমস্ত কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উপস্থাপন। চৈতন্য এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। 'এহো বাহ্য' বলে রামানন্দকে আরও গভীর তত্ত্বের দিকে নিয়ে গেলেন। রামানন্দ বৈধীভক্তির পরে 'রাগভক্তির' কথা বললেন। অর্থাৎ জ্ঞানশূন্যাভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি; যা থেকে প্রেমের উৎপত্তি হয়। এই প্রেমভক্তিকেই তিনি সেরা সাধনপন্থা বলে উপস্থাপন করলেন। প্রেমভক্তির পর্যায় বিশ্লেষণে তিনি একে একে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যভাবের প্রেমের কথা বললেন। পর্যায় সারণিতে পরীক্ষা করলে দেখা যায় মহৎ হতে মহত্তর দিকে তিনি বিষয়বস্তুকে তুলে ধরলেন ; চৈতন্যদেবও এগুলোকে 'এহোত্তম' বললেন। কিন্তু গভীরতার শেষবিন্দুতে পৌঁছে রায় রামানন্দ সাধনার সর্বেসর্বা স্তরে আনলেন প্রেমভক্তির চরম সোপান 'কান্তাপ্রেম'কে। অর্থাৎ, এই কান্তাপ্রেমের রসসাধনাই সর্বোচ্চ পর্যায় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও কীর্তনের অন্যতম বিষয় বলে বিবেচ্য।

১. শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত, শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত, *পরমাত্ম সন্দর্ভঃ* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২

২. গীতা প্রেস প্রকাশিত, *শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ*, গোরক্ষপুর, ২০১৯ পৃষ্ঠা-২০৫

এই প্রেম বৃন্দাবনের গোপীগণের সাথে ভাবসম্পর্কিত বিষয়। একমাত্র গোপীরাই এই প্রেমের শুদ্ধ চর্চাকারী ও অধিকারিণী। একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গোপীবৃন্দের এই নিত্য, অনির্বচনীয় প্রেমলীলাই 'রাগাত্মিকা' ভক্তি নামে চিহ্নিত হয়েছে। রাগাত্মিকা প্রেমের ভজনের অনুষঙ্গ – শ্রবণ, মনন ও অনুধ্যান। অর্থাৎ ভক্তচিত্ত ভজনের মধ্যে দিয়ে অনুভবে লীলারস আস্বাদন করে থাকে। গোপী অনুগত মঞ্জরীভাবাপন্ন সাধকগণ এই রাগাত্মিকা ভজনের পাত্র। এঁরাই ভববৃন্দাবনে ও ভাববৃন্দাবনে তাঁদের নিত্য গতাগতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে এই প্রেমের সন্ধান দিয়েছিলেন। পদাবলি কীর্তনে এই প্রেমময় লীলারস কীর্তনীয়াগণ পরিবেশন করে থাকেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আরাধ্য এই আস্বাদ্যরসেরই অনুসন্ধান। এটিই বৈষ্ণবীয় পরিভাষায় 'রাগানুগা' ভজন বলে প্রতিষ্ঠিত। এই ভজনের রূপ নরোত্তম দাস তাঁর একটি পদে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

শ্রীরূপ মঞ্জরী দয়া করহ আমারে।
মিছা মায়াজালে পড়ি গেনু ছারে খারে ॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোহারে পরাব ॥
সম্মুখে রহিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু চন্দন গন্ধ দুহুঁ অঙ্গেঁ দিব।
সিন্দুর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব।
সখীর আজ্ঞায় করে তাম্বুল যোগাব ॥
বিলাস কৌতুক কেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে ॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কত দিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে ॥[১]

সুতরাং রাগানুগা ভক্তির উদযাপনই পদাবলির মুখ্য বিষয় এবং রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জক্রীড়ার কথা স্মরণ-মনন-আলাপনের মধ্যদিয়ে নিরন্তর রসাস্বাদন করার বিষয়ভাবই পদাবলিতে আলোচিত হয়েছে এবং কীর্তনের মাধ্যমে তা সর্বস্তরে প্রকাশিত হয়ে থাকে। পদাবলির দার্শনিক ভিত্তিও উল্লিখিত বিষয়ের নিগূঢ় তাৎপর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাৎপর্যের নিগূঢ় বিষয় – নিরন্তর কৃষ্ণনাম, গুণ, যশ, রাধার আদর্শের সাধনা করা। অনুরাগাশ্রিত পথে বৈষ্ণবগণ কীর্তন করেন, বিগ্রহে আত্মতন্ময় হয়ে ওঠেন। আপনারজন ভেবে প্রিয়তম রাধাকৃষ্ণকে মালা-তুলসী-চন্দন প্রদান করেন। তারা ধীরে ধীরে লীলাসুখ বিহারে দিব্যোন্মাদ হয়ে ওঠেন। রাগানুগা ভক্তিপথের কোনো করণীয় আচরণ বা বিধিবদ্ধ প্রণালী নেই। তাঁরা স্বাধীন থেকে নিয়ত ভগবানকে পুত্ররূপে, সখারূপে, প্রভুরূপে, চিরমধুর কান্তরূপে অন্তরের তীব্র থেকে তীব্রতর অনুরাগকে পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রদান করেন। ভক্ত-ভগবানের অপূর্ব সম্মিলন বিকশিত হতে হতে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনে উপর্যুক্ত ভাবই কীর্তনের আসরে অন্যতম উপলক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫, পৃষ্ঠা-৫৬১

প্রেমের অধিকারী হতে হলে এক একটি অঙ্গ সাধন অপরিহার্য বিষয়। রাগানুগা ভক্তি-অনুশীলন এবং সিদ্ধ ভক্তেরা আত্মার আনন্দের নিমিত্তে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদ সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন অর্থাৎ নববিধা ভক্তির অনুশীলন করেন।

> শৃণ্বতাং স্বকথাং কৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
> হৃদ্যন্তঃ স্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতান্ ॥ (*শ্রীমদ্ভাগবত*) (১-২-১৭)
> অর্থাৎ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশোগাথা শ্রবণ ও কীর্তন দুইই পুণ্যকারী। তাঁর লীলাকাহিনি শ্রবণকারীর হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হন এবং তার অশুভ কামনাবাসনাকে বিনাশ করেন; তিনি ভক্তের নিত্য হিতকারী।[1]

সাধুসঙ্গের ফলে যাঁর অন্তরে শ্রদ্ধা উদগত হয়েছে, যিনি সদগুরুর পদাশ্রয় গ্রহণ করেছেন সেই ভক্তই কৃষ্ণকথা শ্রবণের মাধ্যমে ভক্তির আচরণ করবেন। নাম, রূপ, গুণ এবং লীলার শ্রবণই 'শ্রবণ' পর্যায়ভুক্ত।

দ্বিতীয়ভাগে কীর্তন অর্থাৎ ভগবানের নাম, গুণ, লীলাদি সুরসংযোগে গান করা। একক ও বহুব্যক্তি মিলেও কীর্তন হতে পারে। এই লীলাদি কীর্তন মূলত সংকীর্তন হিসেবে পরিচিত। নাম কীর্তন ও লীলাকীর্তন – এই দুইভাগে ভক্ত তার সাধনায় রসাস্বাদন করে থাকেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এ-বিষয়ে যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

> হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রাম রায়।
> নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায় ॥
> সংকীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।
> সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
> নাম সংকীর্তন হৈতে সর্বনার্থ নাশ।
> সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস ॥[2]

কীর্তন প্রসঙ্গে পুরাণ ও সংহিতায় যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা উপস্থাপন করছি :

ক. মহাপাতকযুক্তোহপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিঃ।
শুদ্ধান্তঃ করণো ভুত্বা জায়তে পঙক্তিপাবনঃ ॥ (*ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ*)

খ. তন্নাস্তি কর্মজয় লোকে বাগজং মানসমেব বা।
যন্নং ক্ষপয়তে পাপংকলৌ গোবিন্দ কীর্ত্তনাৎ ॥ (*স্কন্দপুরাণ*)

গ. আধয়োব্যধয়ো যস্য স্মরণান্নাম কীর্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তম্ নমাম্যহম্ ॥ (*স্কন্দ পুরাণ*)

১. গীতা প্রেস প্রকাশিত, *শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ*, গোরক্ষপুর, ২০১৯ পৃষ্ঠা-৫০
২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৬১৯

ঘ. সর্বপাপ প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
সর্বদুঃখ ক্ষয়কারং হরি নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ *(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)*
ঙ. সর্বরোগোপশমনং সর্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তেদং সর্ব্বারি ধর্মানং হরের্ণামনুকীর্ত্তনাৎ॥ *(বিষ্ণু পুরাণ)*
চ. নশাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়েং নন্যৌষধোরপি।
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যধিস্ত্যা জ্যো ন সংশয়ঃ॥ *(পরাশর সংহিতা)*[1]

অর্থাৎ,
ক. মহাপাপিষ্ঠও যদি নিরন্তর হরিনাম সংকীর্তন করে, তাহলেও তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং তিনি দ্বিজ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।
খ. এমন কোনো কর্মজ, বাগজ, মানস পাপ নেই যা এই কলিযুগে গোবিন্দ নাম সংকীর্তনে দূর হয় না।
গ. যাঁর স্মরণে ও নামসংকীর্তনে সকল আদি-ব্যাধি তৎক্ষনাৎ বিনষ্ট হয়, সেই অনন্তদেবকে প্রণাম করি।
ঘ. অনুক্ষণ হরির নামসংকীর্তনে সকল প্রকার পাপ, উপদ্রব এবং দুঃখের বিনাশ ঘটে।
ঙ. অনুক্ষণ হরির নামসংকীর্তন সকল প্রকার রোগ ও উপদ্রব নাশক এবং সকল প্রকার বিঘ্ননাশ করে বলে তা মঙ্গলপ্রদ।
চ. হে শাম্ব! ঔষধ প্রয়োগেও যখন ব্যাধিজনিত দুঃখ বিদূরিত হয় না; তখন তা দ্বারা রোগের প্রতিকার চেষ্টা কর্তব্য নয়। হরিনামরূপ ঔষধ পানে তা দূর হয়, এ-বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। (বর্তমান গবেষক কর্তৃক অনুবাদ)

এবং

চেত দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈবরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবদ্ধনং প্রতিপদংপূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপ নং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম ॥

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন জয়লাভ করেছে। কৃষ্ণ সংকীর্তনে মনরূপ দর্পণ মার্জিত হয়। সংসারের মহাদুঃখের আগুন নিভে যায়। কল্যাণের জ্যোৎস্না নেমে আসে, বিদ্যারূপ বধূ জীবন লাভ করে, আনন্দের সমুদ্রে জোয়ার আসে, প্রতিপদেই সমস্ত রসসুধার আস্বাদ জন্মায় এবং সমস্ত অস্তিত্বকে যেন শীতল করে দেয়।[2]

তৃতীয় অনুষঙ্গ 'স্মরণ'। পূর্বানুভূত বিষয়ের অনুভবকে স্মরণ বলে। ভক্তের মানস-অনুভবে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের রূপ, গুণ ইত্যাদির ধ্যানই স্মরণ। সুস্পষ্ট ধারণা থেকে ধ্যানের মাধ্যমে ভক্ত ভক্তি-প্লাবিত সমাধি প্রাপ্ত হন। মানসপটে ভক্ত-ভগবানের প্রেমময় বিহার ঘটে।

চতুর্থ বিষয় 'পাদসেবন', যার আভিধানিক অর্থ পরিচর্যা। ভজনের ব্যঞ্জনায় কৃষ্ণ ও তাঁর পরিবারবৃন্দ, চৈতন্য ও পরিবারবৃন্দ এবং তুলসীদেবীর সেবা এ-পর্যায়ভুক্ত। পাদসেবনের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত সপরিবার চৈতন্যকর্তৃক গুণ্ডিচাগৃহমার্জনকর্ম।

১. ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তনগান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৬

২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৬১৯-৬২৪

পঞ্চম বিষয় 'অর্চন'। *হরিভক্তিবিলাস*-মতে 'অর্চন' অর্থ হলো কর্তব্য। স্বাভাবিক অর্থে বোঝায়, মন্ত্রপাঠ দ্বারা নানাবিধ উপচার সমর্পণ। ভক্ত নিষ্কিঞ্চন হয়ে, অর্চনাভিলাষী হয়ে আত্মনিবেদন করে থাকেন।

ষষ্ঠ বিষয় 'বন্দন'। 'বন্দন' অর্থ গুণ ও মহিমাকে বন্দনা বা স্তুতি করা। শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের মহিমা ও বিবিধগুণ শ্রবণ শেষে অন্তরের বিশেষ আর্তিতে বন্দনা করে থাকেন।

সপ্তম বিষয় 'দাস্য'। এ-ক্ষেত্রে সাধারণ দাসভাবে ভজনই দাস্য ভজন। দাস্যভাবে সেবা ভাব আছে, কৃষ্ণনিষ্ঠাই প্রকৃত ভাব। দাস্য ভাবের ক্ষেত্রে ভগবানের ঐশ্বর্যবোধ প্রবল এবং তাঁর প্রতি আত্মনিয়োগই প্রকৃত দাসত্ব।

অষ্টম স্তর 'সখ্য'। বিশ্বাস সেবা ও নিষ্ঠা সখ্য বা মিত্রবৃত্তির অনন্য উপলক্ষ। মার্গ বিবেচনায় বিধিমার্গে সখ্যভাবনা আর রাগমার্গে সখ্যভাবনা একরকম নয়। বিধিমার্গে সখ্য বা মিত্রবৃত্তি আরোপিত বিষয়। এখানে রতি বা ভাব নেই।

নবম মার্গ 'আত্মনিবেদন' অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। জ্ঞান, কর্ম সমস্ত বিষয়ের সমর্পণই আত্মনিবেদনের অনুষঙ্গ।

বৈষ্ণবগণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভক্তির সাধন হিসেবে উপস্থাপন করেননি। বস্তুত স্বতন্ত্রভাব বিচার না করে প্রবৃত্তি, সাধুসঙ্গ, নিষ্ঠা, সেবা, রুচি, আসক্তি, শ্রবণ-কীর্তন ইত্যাদির মধ্যে যে ভাবোদয় হয় তার মধ্যে ভক্তির সঙ্গে আপনাআপনিই জ্ঞান-বৈরাগ্য এসে মিশে যায়। জ্ঞান মুখ্য নয়, ভক্তিই মুখ্য এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অনুগামী মাত্র। এ-সবই ভাবের বিষয়। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভাবরতির ক্রমোৎকর্ষ ঘটানো সম্ভব। মায়িকবৃত্তিজাত যে ভাব তা হলো লৌকিক। ভক্তিভাব রতির শক্তিযুক্ত, অর্থাৎ রাধার হ্লাদিনী শক্তিসম্ভূত। মূলত ভাব 'রতির' পর্যায়ভুক্ত এবং এতে স্থায়ি ও সঞ্চারী এ-দুই ভাবই স্বীকৃত। রতি বা ভাব বৃদ্ধি পেয়েই স্নেহ, প্রেম, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ সর্বান্তে পরিণাম হিসেবে ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। 'প্রেম' রতিরই প্রগাঢ় রূপ। প্রেমের শুদ্ধসত্ত্ব গতি হলো ভগবানের স্বরূপশক্তি অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির এক বিশেষ গতিময়তা। শুদ্ধসত্ত্বই হলো রসের মূল, যা প্রেম দ্বারা ভগবৎসঙ্গলাভের অভিপ্রায়ে অন্তরবৃত্তিকে স্নিগ্ধ ও আকাঙ্ক্ষিত করে তোলে। রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে এই ভাবই প্রেমের অনন্য সোপান এবং এ-থেকেই সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ ঘটে। সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ হয় ভক্তের সাধনে, অভিনিবেশে এবং চূড়ান্তে কৃষ্ণকৃপায়, যার উৎস বৈধী ও রাগানুগা সাধন প্রণালী। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাহলো—প্রেমভক্তির ক্ষেত্রে রূপ গোস্বামী কৃষ্ণরতি ও মোক্ষকামী ব্যক্তির রতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে ভক্তের ভক্তিরসের গুরুত্ব অনন্য। এ-প্রসঙ্গে ডক্টর উমা রায় যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য:

> ভক্তের যে ভক্তিরস, সে রস শান্তরসের মত নিরূপাধিক রসসংবিৎ মাত্র নয়। সে রস মোক্ষশৃঙ্গারের মত প্রতিকূল ব্যভিচারি-সংঘাত-চর্বণাযুক্ত-মাত্র নয়। সে রসে যেমন আছে নিষ্ঠার ভাগবতী প্রতিষ্ঠা, তেমনি আছে প্রতিক্ষণ-সঞ্চারিণী চিত্তরাগলীলা। যেমন আছে ভাগবতী ভূমিতে দৃঢ় প্রোথিত স্থিরসন্নদ্ধ নিষ্ঠার মূল কাণ্ড, আছে মাটির স্তরে স্তরে ভগবৎউপলব্ধির গভীর রস-চেতনা,–তেমনি আছে আকাশ-প্রসারী শাখায় শাখায় লীলাচঞ্চল জীবনের পবন-সমাকুল পত্রসম্ভার, হৃদয়াবেগের পুষ্পবৈচিত্র্য। ভোগ ও ত্যাগ, নিরাসক্তি ও অনুরক্তি, রহস্য ও লীলা এক অচিন্ত্যনীয় শক্তিবলেভক্তিরসে মহিমা ও মাধুরীর সংযোগ-ভূমি হয়ে উঠেছে।[১]

ভক্তিরসের মহিমা ও সংযোগভূমির উৎসমূলে রয়েছে পরমানন্দস্বরূপিনী হ্লাদিনীর স্বরূপশক্তি। এইশক্তি স্বয়ং ও অপরের ক্ষেত্রে আনন্দদায়িনী। এই হ্লাদিনী শক্তিকেই ভগবান স্বভক্তবৃন্দে সঞ্চারিত করে নিত্য বিরাজমান থাকেন। যদিও ভগবান প্রীতিস্বরূপ তবুও ভক্তির দ্বারাই রসাস্বাদনে প্রাণনীয় হয়ে থাকেন। জীব গোস্বামী তাঁর *পরমাত্মসন্দর্ভঃ* গ্রন্থে এ-বিষয়ে জানাচ্ছেন :

> পরম সারভূত স্বরূপশক্তির সারভূতা হ্লাদিনী নামে যে বৃত্তি, তারই সারভূত বৃত্তি বিশেষের নাম ভক্তি, সেই ভক্তিকেই বলে রতি। ভক্তির উভয় কোটির একটি থাকে ভক্তে, অপরটি থাকে ভগবানে।[২]

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনে রসের সূত্র নির্ধারণে উল্লিখিত বিষয়ভাবই প্রযুক্ত থাকে। বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভক্ত-অন্তরে ভক্তির নিবিড় অনুশীলন ও রসাস্বাদন কীর্তনের অন্যতম অনুষঙ্গ। কীর্তনে অলৌকিক রস স্থায়িভাবে মুখ্য ও গৌণভেদে আস্বাদন করা হয়ে থাকে। মুখ্য হচ্ছে শুদ্ধ, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা–এ্ই পাঁচ ভাবসম্পর্কিত বিষয়। অপরদিকে গৌণ হলো লৌকিক শাস্ত্রোক্ত রতি ও শুদ্ধ বা শম বাদে হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে এগুলো সবই কৃষ্ণবিষয়ক রতি। পদাবলি কীর্তনে ভাব ও রতির নিবিড় আস্বাদন হয়ে থাকে, বিশেষভাবে 'রস' অপূর্বরূপে অনুভূত হয়ে থাকে।

পদাবলি কীর্তনে রস বিচার

ক. নায়ক প্রসঙ্গ

বৈষ্ণব পদসমূহ এবং নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Dramatic Point of View) দ্বারা বিচার করলে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ নায়ক। *নাট্যশাস্ত্র* অনুসারে তিন ধরনের নায়ক দেখা যায়। যথা:**দিব্য নায়ক, দিবাদিব্য নায়ক** এবং **অদিব্য নায়ক**। সাধারণ জন কৃষ্ণকে যেমন ভগবৎস্বরূপ হিসেবে মানেন তেমনি রামচন্দ্রকেও তারা ভগবৎস্বরূপ হিসেবে হৃদমন্দিরে স্থান দেন, মান্যতা দেন। রামচন্দ্রেরও মানবোচিত লীলাপ্রকরণ আছে। বিচার্য বিষয় হলো তাঁর মানবোচিত লীলা 'দিব্যাদিব্য' মিশ্রিত। সুতরাং নায়কের গুণমিশ্রিত বিচারে রামচন্দ্র হলেন 'দিব্যাদিব্যনায়ক'। মাহভারতের পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম দিব্য। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব–এদের জন্ম দৈবসংযোগে কিন্তু তাঁদের কর্মপ্রবাহ মানবোচিত এবং লীলাপ্রকরণ ও দিব্যতারঅভাবসম্পন্ন অর্থাৎ মানবোচিত। নায়ক হিসেবে তাঁরা 'অদিব্য নায়ক'। কৃষ্ণের লীলাবিস্তার মানবোচিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ:

১. ড. উমা রায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসের অলৌকিকত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৮৮
২. শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত, শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত, *পরমাত্ম সন্দর্ভঃ* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৯০

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশে বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলা হয় অনুরূপ।[১]

মনুষ্যতনুধারী কৃষ্ণ অনন্ত দিব্যগুণসম্পন্ন। গুণাতিশয্য থেকে গুণাতীত–এই স্বরূপেই তাঁর নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ নায়কের সর্ববিধগুণ এবং প্রকরণ তাঁর চরিত্রে লক্ষণীয়। তাই তিনি 'দিব্যনায়ক'। *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে তাঁর নানাবিধ গুণ বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ সুরম্যাঙ্গ, রুচিশীল, সর্বলক্ষণান্বিত, বলীয়ান, নবতারুণ্য, বাবদূক, প্রতিভান্বিত, ধৃতিমান, বিদগ্ধ, চতুর, সুখী, কৃতজ্ঞ, প্রেমবশ্য, গভীর, বরীয়ান, কীর্তিমান, নিত্য নতুন, রূপমাধুর্য, বেণুমাধুরী, বিরুদাবলি, প্রিয়াধিক্য ইত্যাদি।

বস্তুত বৈষ্ণব সাহিত্য অনুসারে কৃষ্ণ সাধারণ নায়ক নন; রাধা, গোপীবৃন্দ, বৃন্দাবনধাম, চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরবৃন্দ অলৌকিক ও চিন্ময়। ফলত, নায়ক হিসেবে কৃষ্ণের এত উৎকর্ষ, এত রসময়তা!

কৃষ্ণ মধুর রসের নায়ক। লীলা বিস্তরণে নায়কত্ব বিশ্লেষণ করলে ছিয়ানব্বই প্রকার নায়কের প্রকারভেদ পাওয়া যায়। কিন্তু নায়ক মূলত চার প্রকার।

ক. ধীরোদাত্ত
খ. ধীরললিত
গ. ধীরোদ্ধত
ঘ. ধীরশান্ত

এই চার শ্রেণির নায়কের সমস্তগুণ কৃষ্ণে বিদ্যমান। উল্লিখিত চার প্রকার নায়কের প্রত্যেক প্রকারেই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।
তিন অবস্থা হলোঃ

ক. পূর্ণতম
খ. পূর্ণতর
গ. পূর্ণ।

চার × তিন = বারো প্রকার নায়কের মধ্যে আবার দুটি ভেদ রয়েছে। মধুর রসের ক্ষেত্রে পতিভেদ ও উপপতি ভেদ। তাহলে সংখ্যা দাঁড়ায়–বারো × দুই = চব্বিশ। পতি বা উপপতি ভেদে আবার অনকূল, দক্ষিণ,শঠ এবং ধৃষ্ট–এই চার ধরনের প্রভেদ দেখা যায়। চব্বিশ × চার = ছিয়ানব্বইটি প্রকারভেদেই নায়কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গৌড়ীয় দর্শনের মূল কেন্দ্রে রয়েছেন কৃষ্ণ এবং তাঁর নায়কত্বই হলো শ্রেষ্ঠ নায়কত্ব এবং চরিত্র হিসেবে শ্রেষ্ঠ রস-চরিত্র। এইই শাস্ত্রধার্য সিদ্ধান্ত; *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* অনুসারেঃ

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯,পৃষ্ঠা-৩০৮

ক. গম্ভীরো বিণয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ় ব্রতঃ।
অকত্থনো গূঢ়গবের্বা ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ ॥ (২।১।২২৬)

খ. বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়শীবশঃ ॥ (২।১।২৩০)

গ. মাৎসর্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥ (২।১।২৩৬)

ঘ. শমপ্রকৃতিক ক্লেশসহনশ বিবেচকঃ।
বিনয়াদি গুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে ॥ (২।১।২৩৩) [১]

প্রকারভেদে নায়কের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

ক. ধীরোদাত্ত নায়ক হয় বিনয়ী, গম্ভীর, করুণ, ক্ষমাশীল, সুদৃঢ়ব্রত, গূঢ়গর্ব, আত্মশ্লাঘাশূন্য এবং মহাবলবান।
খ. ধীরললিত নায়ক বিদগ্ধ, পরিহাসপটু, নবতারুণ্যযুক্ত, নিশ্চিন্ত এবং প্রায়শই প্রেয়সীবশ।
গ. ধীরোদ্ধত নায়ক হলেন অহঙ্কারী, মাৎসর্যযুক্ত, মায়াবী, ক্রোধী, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাঘাপরায়ণ।
ঘ. ধীরশান্ত নায়ক হবে শমপ্রকৃতিসম্পন্ন।

কন্দর্প চরিত্রের মধ্যে ধীরলালিত্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বৈশিষ্ট্যবিকাশ পূর্ণ নয়। আবার দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের মধ্যে ‘ধীরোদ্ধত’ নায়কগুণ এবং প্রথমপাণ্ডব যুধিষ্টিরের মধ্যে ‘ধীরশান্ত’ দেখা গেলেও নায়কত্বের পূর্ণপ্রকরণ একমাত্র কৃষ্ণেই বিদ্যমান। সনাতন গোস্বামীকৃত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থের ২/১/২২৬, ২/১/২৩০, ২/১/২৩৬, ২/১/২৩৩ ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত নায়কের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

নায়ক কৃষ্ণই পতি এবং অন্তর্গূঢ় পর্যায়ে উপপতি। কারণ গোপকন্যারা তাঁকে পতিরূপে পেতে চেয়েছিলেন। বস্তুত নায়ক-নায়িকার ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব ধর্মশাস্ত্রে ও লৌকিক রসশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থের ১১-১৬ এবং ১৭-২৪ শ্লোকে পতি ও উপপতি প্রসঙ্গে স্বচ্ছ বৈষ্ণবীর ধারণা প্রদান করেছেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার জীবগোস্বামীও উপপতি ও পরকীয়া তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৮] শ্রীজীব গোস্বামীর মতানুসারে বলা যায়, দুঃখবরণ ও

ত্যাগের চূড়ান্ত পরিচয় স্বকীয়াতে থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ *নাট্যশাস্ত্র*, *রুদ্রসংহিতা*, *বিষ্ণুগুপ্তসংহিতা*, *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে পরকীয়াত্ব এবং ঔপপত্যকেই নবরাগ-ধর্মের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কারণ, কৃষ্ণ প্রাকৃত নায়ক নন। তিনি সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর!

---

১. শ্রীরূপ গোস্বামী, রামদেব মিশ্র সম্পাদিত, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা সংস্করণ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের অনন্য টীকাকার, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী পরকীয়াত্ব স্থাপনের যথার্থতা নানান বিশ্লেষণে উপস্থাপন করেছেন এবং সুস্পষ্ট দেখিয়েছেন, কৃষ্ণের রাসলীলাদি যদি মায়িক হিসেবে উপস্থাপন করা হয় তবে ভক্তদের তো দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। যার কারণে শ্রীরূপ গোস্বামী স্পষ্ট ও সচেতনভাবেই পরকীয়া রতির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। উপর্যুক্ত বিষয় চিরন্তন অলংকার অনেকখানি বর্জনীয় বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। আলঙ্কারিক সম্প্রদায় শৃঙ্গার রসে পরকীয়া স্ত্রীরূপে নায়িকার এবং উপপতিরূপে নায়কের কল্পনা সর্বদা নিষিদ্ধ বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মধুর রসের ধারক কৃষ্ণই পতি এবং উপপতি। রুক্মিণী, সত্যভামা কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা; রাধা এবং ব্রজসুন্দরীগণ তাঁর পরকীয়া পরোঢ়া নায়িকা। শ্রীরূপাদি বৈষ্ণবগণের মতে, কৃষ্ণের পরকীয়া-রতিতেই প্রকৃত মাধুর্যের চরম অবস্থা উপলব্ধ হয়ে থাকে, কারণ পরকীয়া রাতির মাধুর্যপ্রকর্ষই মূলত বৈষ্ণব পদাবলির প্রেম ও রসাস্বাদনের মূল বিষয়। যথা:

> এতাঃ সর্বাতিশায়িণ্যঃ শোভা–সাদ্গুণ্য–বৈভবৈঃ।
> রসাদিভ্যোহপ্যুরু প্রেম-মাধুর্য ভরভূষিতাঃ ॥
> অর্থাৎ, আনন্দস্বরূপ ও চিৎস্বরূপ যে রস তাই 'মাধুর্যভরভূষিতা'। অতএব স্ব-স্বরূপভূতা সেই শক্তিগণসহ যিনি নিত্যকাল সেই অখণ্ড পরম সত্তা হয়ে মহাবৈকুণ্ঠোপরি কৃষ্ণলোকে এবং সর্বজীবাতু বা নরাকৃতি হয়ে ভৌম বৃন্দাবনে নিবাস করেন, তিনিই পরকীয়া মাধুর্য রসের হেতু।[১]

রূপ গোস্বামী এই মত বা শ্লোককে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর *নাটক-চন্দ্রিকা এবং শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে প্রমাণস্বরূপ *নাট্যশাস্ত্র*-র একটি 'কারিকা বা শ্লোক;, *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন প্রভৃতি থেকে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ দিয়েছেন। যদিও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরবর্তী বিকাশের যুগে বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের সমুন্নত পর্যায়ে'কৃষ্ণলীলার পরকীয়া রতি'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিস্থাপনে নানাবিধ গ্লানির উৎস হয়ে দেখা দিয়েছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী অবশ্য ভগবতরতিবাসনাশূন্য প্রাকৃতজনের কলুষচিত্তে এই অপূর্ব পরকীয়া রতির আকর্ষণ যে আধ্যাত্মিকতা-শূন্য বা ভ্রষ্ট হতে পারে এবং অনভিমত বহুবিধ পরিণতির নিদান হয়ে উঠতে পারে সে-বিষয়ে *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন।

পরকীয়া রতির মাধুর্যরস আস্বাদনের মূল অনুষঙ্গ ভক্তি। 'সর্বভাগবতোত্তম' উদ্ধব মহারাজের উক্তিতে কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকারূপের অপূর্ব মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে যা বৈষ্ণব শাস্ত্রে পরকীয়া রতির কামগন্ধশূন্য আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। বস্তুত এই গম্ভীর মহিমা ও তাৎপর্য শুধু ভগবতভক্তিপরায়ণ প্রেমমাধুর্যের সাধকই তার সহৃদয় অনুভব দিয়ে উপলব্ধি করেন। এক্ষেত্রে ভক্তিহীন,

কামজর্জরিত হৃদয়ধারীপ্রাকৃতজন তা উপলব্ধি করতে পারে না। এ-রতির মর্ম তার মরমীরাই জানে। এ-বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়:

আমাদের মনে হয়, উদ্ধব, আমাদের মত কৃষ্ণসেবা জানে এমন একজনও মথুরায় নাই। সেই জন্য রসরাজ শ্যামনাগরের অন্তরে আনন্দ নাই মনে ভাবিয়া আমরা দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হই। তুমি উদ্ধব, যদি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার যে আছে সেখানে প্রিয়তমের অভিমত লোক, যারা জানে তাঁকে সুখ দিতে, যাদের সাধনাই তাঁকে সুখ দিতে, যাদের সাধনাই তাঁকে সুখ দেওয়া, যাদের সহিত তিনি রাসনৃত্য বেণুগীত-বিনোদে আছেন—তাহা হইলে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—তাঁর বিরহে আমরা সুখে থাকতে পারি।[১]

উপর্যুক্ত মন্তব্যই প্রকৃত ভগবদভক্তিরসের অনন্য সুর! কৃষ্ণারতি-বাসনা চরিতার্থতার উপযুক্ত সুর ! এই ভক্তিরসের আস্বাদনেই যে শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎসেবকগণের জীবনের চরিতার্থতা মূলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গোস্বামীগণের রচনায়। তবে প্রাকৃতজনের উপর্যুক্ত বিষয়ে যে বিরোধ তার কারণ লীলাবিস্তার ও রসবিস্তারে স্থূলজ্ঞান ও ভক্তিহীন কামপ্রবণ উপলব্ধি করা। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে মত দিয়েছেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য:

যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল সুফল। যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষেইহার ফল কুফল। চিত্ত শুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞানার্জনী কার্যকারিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত কেহই বৈষ্ণব হইতে পারে না। এই বৈষ্ণবধর্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্য নহে। যাহারা রাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে—পৈশাচ।[২]

চৈতন্যযুগের শেষদিকেই পূর্বরাগ অনূঢ়ারতি এবং পরকীয়া-রতি অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। বিশেষভাবে চৈতন্যোত্তর যুগে সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এর গুরুত্ব ব্যাপকভাবে দেখা যায়। পূর্বরাগ-বিষয়ক নানা উপাখ্যান তখন নানান গ্রন্থে যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন: যদুনন্দন দাসের *কর্ণানন্দ*, অকিঞ্চন দাসের *বিবর্ত-বিলাস* প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বরাগ ও তার আকর্ষণ বিষয়ে নানান তাত্ত্বিক আলোচনা পাওয়া যায়। পূর্বরাগের আকর্ষণ যে শুধু বৈষ্ণব রসবেত্তাগণই সচেতনভাবে উপস্থাপন করেছেন তা নয়, প্রাচীন কবিরাও এই আকর্ষণ থেকে মুক্ত ছিলেন না। এক্ষেত্রে দেখা যায় প্রসিদ্ধ মহিলা কবি শীলভট্টারিকার শৃঙ্গাররসধ্বনির শ্লোককে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় রসতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে (*শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* অনুসারে) শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। অনূঢ়ারতি, পরকীয়া রতি ও তার গতিপ্রবাহ বৈষ্ণব আদর্শে এ-কারণেই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। Edward C. Dimcok, Jr.-এর একটি মত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য:

১. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, তৃতীয় অধ্যায় (শ্লোক নং-১৭ - ৩৩), পৃষ্ঠা-২০-২১

The *Bhagavata- Purana* – The basic text of Bengal Vaisnavism both orthodox and Sahajiya … It is a text of poetry and says to the Bengal Vaisnavas two basic things. The first is the separation of lovers in the best illustration of the proper attitude of the worshipper toward God, because it draws the mind away from the satisfaction of self … . The second things that the *Bhagvata* text states is the awkward butincontrovertible fact the Gopis were married to other persons at the time they fell in love with Kishna…[৩]

---

১. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, *উদ্ধব-সন্দেশ*, মহানামব্রত কালচারাল অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মহানাম অঙ্গন, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১৭৩

২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, (ধর্মতত্ত্ব, ২য় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬৬৯।

৩. Edward C. Dimcok, Jr. *The Place of Hidden Moom*. The University of Chicago Press, 1966. P. 11-12

বস্তুত ভক্তিমার্গের পথিক যারা, তারা ভক্তিরসপ্রধান রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক ও গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক কাব্যনাট্যগীত শ্রবণ ও দর্শনের ফলে মধুর উজ্জ্বল শৃঙ্গার রসের আস্বাদনে ধন্য হন, বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের নায়ক তাই হয়ে ওঠেন চিত্তাকর্ষক, অগতির গতি এবং পরম আশ্রয়।

'অনুকূল' নায়ক হলেন তিনি, যিনি অন্য নায়িকা-বিষয়ক স্পৃহা ত্যাগ করেন। এই শ্রেণির নায়ক কেবল একজন নায়িকাতেই আসক্তিযুক্ত থাকেন। রামচন্দ্র যেমন সীতাদেবীতেই অনুরক্ত ছিলেন, কিংবা রাধাতেই কৃষ্ণের অনুকূলতা। নায়কের 'অনুকূল শ্রেণি' ধীরোদাত্তানুকূল, ধীর ললিতানুকূল, ধীরশান্তানুকূল, ধীরোদ্ধতানুকূল রূপে বিন্যস্ত থাকে।

'দক্ষিণ' নায়ক পরমসদগুণসম্পন্ন অন্য কোনো নায়িকার প্রতি সাময়িক আকর্ষিত হলেও পূর্ব নায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেম, সারল্য, ত্যাগ করেন না। প্রেমশুদ্ধান্তর এই নায়কের অন্যতম অলঙ্কার, যাতে থাকে প্রেম ও দাক্ষিণ্য।

'শঠ' নায়ক হলেন তিনি, যে নায়ক নায়িকার কাছে খুব প্রিয়ভাষী কিন্তু পরোক্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় আচরণ করেন এবং নিগূঢ় অপরাধে অপরাধী হন।

'ধৃষ্ট' নায়কে অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন স্পষ্ট হলেও নির্ভয়ে পূর্ব নায়িকার কাছে যান এবং মিথ্যা বচনে স্বীয় দক্ষতা প্রমাণ করেন। উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যই নায়কের রসোপকরণ। লৌকিক মানদণ্ডে 'শঠ' ও 'ধৃষ্ট' অকৃত্রিম সৌন্দর্যরুচির আধার না হলেও উপপতিত্ব স্তরে এর চমৎকারীত্ব নিঃসন্দেহে অবিসংবাদিত এবং এসবের দ্বারা উজ্জ্বল কাব্যের উদ্ভব ঘটেছে।

নায়ক-সহায়ভেদে প্রকরণ

মধুর রসের লীলা প্রকটের জন্য নায়ক-সহায়ক চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রসশাস্ত্রানুসারে নায়কের সহায়ক চরিত্র পাঁচ প্রকার:

ক. চেট

খ. বিট

গ. বিদূষক

ঘ. পীঠমর্দ

ঙ. প্রিয়নর্ম।

এই পাঁচ প্রকার মূলত সখা প্রকরণ। এদের থাকে বিশেষগুণ। যেমন: নর্মবাক্যকথনে নিপুণতা, গাঢ় অনুরাগ, দেশকালের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, নিগূঢ় মন্ত্রণা-দান ইত্যাদি। 'চেট' নায়কের সেবকমাত্র। যে সব সখার বুদ্ধি খুব প্রখর, সন্ধানে চতুর, বিশেষ সন্ধানী এবং নিগূঢ় কর্মপরায়ণ তাঁরাই হলো 'চেট'। 'চেটসখা' কৃষ্ণপক্ষের এবং গোপিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষক। লীলা বিস্তারে তাঁরা বেণু, শিল্প, মুরলী, যষ্টি, পাশা ইত্যাদি উপকরণ বহন করেন এবং যথাসময়ে কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করেন। বৃন্দাবনে 'চেটসখা' হলেন ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার প্রভৃতি। 'বিট সখা' হলেন বেশরচনা ও উপচার-প্রয়োগে কুশল। সময়োচিত আলাপাদিতে সুদক্ষ, গোষ্ঠীবিশারদ, নারী বশীকরণে সমর্থ এবং মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে বিচক্ষণ। কড়ার. ভারতীবন্ধ প্রভৃতি ব্রজ পরিচারকগণ 'বিট'। 'বিদূষক' সখা অলঙ্কারশাস্ত্রের বিদূষকের মতোই অনুগত। তাঁরা ভোজন বিষয়ে খুব সতৃষ্ণ, কলহপ্রিয়, দেহ, বাক্যও বেশের বিকার-সম্পাদনে সকলের হাস্যকারী। *বিদগ্ধ মাধব*-এ বৃন্দাবনের মধুমঙ্গল অন্যতম 'বিদূষক সখা'। কোনো মানিনীর মানভঙ্গ করতে কৃষ্ণ যাঁকে প্রেরণ করতেন। 'পীঠমর্দ' নায়কতুল্য গুণবান হয়েও প্রেমভরে সেই নায়কেরই আনুগত্য করেন। কৃষ্ণের 'পীঠমর্দ সখা' হলেন শ্রীদাম। 'প্রিয়নর্ম' হলো আত্যন্তিক-রহস্যবেত্তা সখীভাবাশ্রিতা এবং রহস্যের সবকিছু ভালোভাবে জানে। প্রণয়ীদের মধ্যে বিশেষ প্রিয় এই সখাকে 'প্রিয়নর্ম সখা' বলা হয়। বৃন্দাবনলীলায় 'প্রিয়নর্ম সখা' হলেন সুবল; যিনি কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের প্রণয়বিষয়ে সবই জানেন।

নায়িকা প্রসঙ্গ:

শ্রীরূপ গোস্বামী ব্রজনায়িকা প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

> স্বকীয়াশ্চ পরোঢ়াশ্চ যা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতাঃ।
> মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভেতি প্রত্যেকং তাস্ত্রিকধা মতাঃ ॥[১]

নায়ক কৃষ্ণের নায়িকা বা প্রিয়াদের বিভাগ নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নায়িকা বিচারের তিনটি বিভাগ:

ক. স্বকীয়া নায়িকা
খ. পরকীয়া নায়িকা
গ. সাধারণী নায়িকা

স্বকীয়া নায়িকা মূলত কৃষ্ণের দ্বারকাভিসারের সাথে যুক্ত। এঁদের সংখ্যা ষোলো হাজার একশ আট। স্বকীয়া নায়িকারা নানান গণ ও শ্রেণিতে বিভক্ত এবং রয়েছে অসংখ্য সখী ও সাহায্যকারী। সখীবৃন্দ রূপে-গুণে স্বকীয়া নায়িকাদেরই তুল্য রূপগুণ তবে সাহায্যকারীদের ক্ষেত্রে তা কিছুটা কম। কৃষ্ণের দ্বারকাভিসারের সাথে যুক্ত মহীষীদের মধ্যে আটজন মুখ্যা, যাঁরা কৃষ্ণের পত্নীরূপে, অন্যভাবে প্রিয়তমারূপে প্রতীয়মান। এঁরা হলেন রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রী। মহীষীদের মধ্যে রুক্মিনী এবং সত্যভামা সর্বশ্রেষ্ঠ। রুক্মিণীরূপ-ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে, সত্যভামা সৌভাগ্যের দিক দিয়ে অনন্য স্বকীয়া নায়িকা। অনেক বৈষ্ণবাচার্যগণ ব্রজগোপিকাদের ঢালাওভাবে পরকীয়া নায়িকা বিভাগে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে সমস্ত ব্রজগোপিকাদের ঢালাওভাবে পরকীয়া নায়িকা বিভাগে উপস্থাপনযুক্তিসঙ্গত নয়। কোনো কোনো ব্রজগোপিকার কৃষ্ণই ছিলেন পতি (সাধনার ক্ষেত্রে)। মহারাসলীলার পূর্বে ব্রজবাসী গোপীবৃন্দ দেবী কাত্যায়নীর ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন কৃষ্ণকে

পতিরূপে পাবার জন্য। সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালে দেখা যায় কোনো কোনো ব্রজগোপিকা বিবাহিত (পার্থিব) না হয়েও কৃষ্ণকেই মনোলোকেপতিত্বে বরণ করে ভজনা করেছিলেন। উল্লিখিত গোপিকাদের সরাসরি পরকীয়া নায়িকা প্রকরণে স্থাপন করা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের প্রচ্ছন্ন প্রেমভাব সাধারণলক্ষণযুক্ত হলেও এঁরা স্বকীয়া নায়িকা বিভাগে উপস্থাপনের যোগ্য।

পরকীয়া নায়িকা হলো, যে সকল নায়িকা ঐহিক ও পারত্রিক ধর্মকে গ্রাহ্য না করে কেবলমাত্র আসক্তিবশত পুরুষ বিশেষে সমর্পণ করেন এবং যাদের পরিণয় বন্ধন ঘটে না, রসশাস্ত্রানুসারে এরাই

১. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৪২

পরকীয়া নায়িকা হিসেবে বিবেচিত। পরকীয়া নায়িকা কিছু ব্রজবালা যাঁরা শুধু কৃষ্ণে আসক্ত। কৃষ্ণই তাঁদের বিষয় এবং আশ্রয়। ব্রজগোপরমণীগণের প্রেমপ্রতিষ্ঠায় তাঁদের দুঃখবরণ ও ত্যাগ অতুলনীয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-অনুযায়ী কৃষ্ণের রূপ রূপ-রতন, অনন্তচমৎকারিত্বসম্পন্ন, মাধুর্যের মূলাধার অর্থাৎ তিনিই স্বয়ং মাধুর্য এবং পরমপতি। তাঁকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এক অপার্থিব প্রেমমাধুর্য ! লীলা মাধুর্যের চমৎকারিত্বে গোপীপ্রেম কাম-গন্ধবিহীন। রসশাস্ত্রে পরকীয়া রস নীতিবিরুদ্ধ হলেও কৃষ্ণলীলার মাধুর্য বিচারে, রসের চমৎকারিত্বে পরকীয়াপ্রেমই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যা সাধ্যসাধন তত্ত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈষ্ণবপদাবলির রসময়তা বিচারে উপর্যুক্ত বিষয়ের অবস্থান সুউচ্চে।

স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়িকায় আছে তিনটি ভেদঃ

ক. মুগ্ধা

খ. মধ্যা

গ. প্রগল্‌ভা

‘মুগ্ধা’ হলো সেই নায়িকা যে নায়িকার বয়স নবীন এবং রতি বিষয়ে থাকে সারল্য। যাঁরা সখীগণের অধীনা, সলজ্জ, অব্যক্ত নির্বন্ধ এবং মানে বৈমুখ্য। নববয়াঃ, নবকামা, রতি-পরাঙ্মুখী, সখীবশা, মানে বিমুখী, মানে অক্ষমা ইত্যাদি–মুগ্ধা নায়িকার বৈশিষ্ট্য।

‘মধ্যা নায়িকাকে রসশাস্ত্রানুসারে বলা যায়, যে নায়িকার লজ্জা অধিক এবং মদনতুল্য, প্রকাশমান যৌবনে শ্লাঘা, বাক্য ঈষৎ প্রগল্‌ভ, মান বিষয়ে সময় বিশেষে মৃদু, তাঁরাই ‘মধ্যা নায়িকা’। সমান লজ্জামদনা, তারুণ্যশালীনী, কিছুটা প্রগল্‌ভতা, মানের ক্ষেত্রে কোমলা, কর্কশা ইত্যাদি মধ্যা নায়িকার বৈশিষ্ট্য।

‘প্রগল্‌ভা’ হলো’, যে নায়িকার পূর্ণ যৌবন, যিনি মদান্ধা, বিশেষ উৎসুক, ভাবোদয়ে পটু, প্রেমরসে প্রিয়তমকে আক্রমণ-সমর্থা, মানবিষয়ে অতিকর্কশ–এরাঁই প্রগল্‌ভা নায়িকা। পূর্ণতারুণ্য, মদান্ধা, উরুরতোৎসুকা, ভাবোদয় অভিজ্ঞা, রসাক্রান্ত-বল্লভা, স্বাধীনভর্তৃকা, অতিপ্রৌঢ়ক্তি, অতিপ্রৌঢ়চেষ্টা, মানে অত্যন্ত কর্কশা ইত্যাদি প্রগল্‌ভা নায়িকার বৈশিষ্ট্য। ‘মধ্যা’ ও ‘প্রগল্‌ভা’ নায়িকার তিনটি করে প্রকরণঃ

ক. ধীরা

খ. অধীরা

গ. ধীরা ধীরা।

যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়কে সোপহাস বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, সেই ধীরা নায়িকা। অধীরা হলো, যে নায়িকা ক্রোধ করে প্রিয়কে নিরসন করেন। যে নায়িকা অশ্রু বিসর্জন করে প্রিয়তমকে বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তিনিই 'ধীরা ধীরা' নায়িকা।

পরকীয়া নায়িকাদের তিনটি শ্রেণি :

ক. সাধনপরা
খ. দেবী
গ. নিত্যপ্রিয়া

'সাধনপরা' সর্বদা সাধনায় নিরতা; কখনো একাকী কখনো যূথসহ। এঁরাই প্রকৃত রাগানুগা ভজনের অনন্য পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শনকারী। 'দেবী' তাঁরাই যাঁরা কৃষ্ণের অংশরূপে দেবযোনীতে অবতরণ করেন এবং তাঁরই তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর নিত্যকান্তাগণ দেবীরূপে প্রকট হয়ে থাকেন। ব্রজের গোপীগণ কৃষ্ণের অবতারে সেই নিত্যকান্তাগণ অংশিনী হয়ে বৃন্দাবনে প্রিয়সখী হয়েছেন। নিত্যপ্রিয়াদের অংশ বা সখী হলেন দেবী।

নিত্যপ্রিয়া নায়িকাদের স্বরূপ আনন্দময় ও তাঁদের চিৎস্বরূপে যে রসের ধারা তা প্রেমমাধুর্যে পূর্ণ। নিত্যপ্রেয়সীগণ হলেন–রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা, পালিকা ইত্যাদি। লোকপ্রসিদ্ধ নিত্য প্রিয়াদের নামঃ খঞ্জানাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী, কুসমা প্রভৃতি। এঁরা সকলেই যূথবদ্ধ এবং স্বীয় যূথে রাগাত্মিকা ভজনে দীপ্যমান। ব্রজধামে রাধা ও চন্দ্রাবলীই নিত্য প্রিয়াগণের মুখ্যা। এরাও কৃষ্ণের ন্যায় নিত্য সৌন্দর্য, বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি গুণের আশ্রয়।

এখানে উল্লেখ্য, লোক প্রসিদ্ধ নিত্যকান্তাগণের প্রত্যেকেরই শত শত যূথ আছে, আবার এক এক যূথেরও লক্ষ লক্ষ ব্রজাঙ্গনা আছেন। ললিতা, বিশাখা, পদ্মা এবং শৈব্যা–এঁরা কোনো দলভুক্ত নয়। সখীত্বেই এঁদের ভজনের অনন্য পরাকাষ্ঠা। ললিতাদি সখীগণ যূথেশ্বরী হবার যোগ্যতা থাকলেও রাধার প্রীতি-লোভে তাঁর সখ্যাভিলাষিণী হয়েছেন। রসশাস্ত্রানুসারে, বহুনায়কে নিষ্ঠা থাকে বলে সাধারণী নায়িকা তেমন বিচার্য বিষয় নয়। উপর্যুক্ত নায়িকাদের প্রত্যেকের আবার আটটি প্রকার রয়েছে। যথা:

১. অভিসারিকা
২. বাসকসজ্জিকা
৩. উৎকণ্ঠিতা
৪. খণ্ডিতা
৫. বিপ্রলব্ধা
৬. কলহান্তরিতা
৭. প্রোষিতভর্তৃকা
৮. স্বাধীনভর্তৃকা।

এই প্রকারগুলি প্রকৃত মাধুর্য আস্বাদনকারী নায়িকা হিসেবে কেবল রাধার মধ্যেই বর্তমান।

রাধা

রাধা বৃন্দাবনের সাক্ষাৎ মাধুরী। গোপীগণের তিনিই শিরোমণি-স্বরূপা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাধামাধব যুগলই উপাস্যতত্ত্ব। একদিকে অখিলরসামৃতমূর্তি কৃষ্ণ অন্যদিকে অখণ্ড মহাভাবস্বরূপিনী রাধা। ব্রজপ্রেম বিলাসে রাধার সাথে যুগলিত কৃষ্ণেই লীলাভেদে অপূর্ব তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। মূলত পরম মধুর প্রেমের বৃত্তি 'মহাভাব' গোপিকগণের মধ্যে প্রচুররূপে থাকলেও রাধাতেই তার সারাংশ-উদ্রেককারী। রাধার মহিমা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

ব্রহ্মেশ্বরাদি-সুদুরুহ-পদারবিন্দ, শ্রীমৎপরাগ পরমাদ্ভুত-বেভবায়া।
সর্বার্থসার-রসবর্ষি-কৃপার্দ্রদৃষ্টে, স্তস্যা নমহস্তু বৃষভাণুভুবো মহিম্নে ॥
অর্থাৎ, যার শ্রীচরণকমলরেণু ব্রহ্মা, ঈশ্বরাদির সুদুর্লভ, যিনি এরূপ পরমাদ্ভুত ঐশ্বর্যবতী এবং যাঁরকরুণাদৃষ্টিপাতে-সর্বার্থসার-শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-অজস্রধারে-বর্ষিত-হয়—সেই-বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারমহিমাকে নমস্কার করি।[১]

রাধা সম্পর্কে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থে জানাচ্ছেন:

তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
যূথরোস্তু যয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্যা মৃগীদৃশঃ ॥
অভুদাকুলিতো রাসঃ প্রমদাশত কোটিভিঃ।
পুলিনে যামুনে তস্মিন্নিত্যেষাগমিকী প্রথা ॥
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে, রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণেরতিবরীয়সী ॥ ...
হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি বরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা ॥
সুষ্ঠুকান্ত স্বরূপেয়ং সর্ব্বদা বার্ষভানভী।
ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা দ্বাদশভেরণাত্রিতা।[২]

অর্থাৎ, অষ্ট যূথেশ্বরীর মধ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী সর্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ; এঁদের প্রত্যেকের যূথে কোটি কোটি ব্রজসুন্দরী আছেন। যমুনা পুলিনে যে রাস হয়, তা শত শত কোটি প্রমদাগণে ব্যাপ্ত ছিল। শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলীর মধ্যেও শ্রীরাধা সর্বতোভাবে অধিকা; তিনি মহাভাব-স্বরূপা (অর্থাৎ তাঁর বিগ্রহটি মহাভাবময়, যেহেতু তিনি হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ) এবং গুণবিচারে তিনিই শ্রেষ্ঠ। সর্বগোপীমধ্যে তিনিই কেবল শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয়তমা কারণ সর্বশক্তি বরীয়সী যে হ্লাদিনীস্বরূপা মহাশক্তি বিরাজমান, তারই সারস্বরূপ যে মাদনাখ্যা মহাভাব-পরাকাষ্ঠা, শ্রীরাধা হচ্ছেন তাঁরই তদাত্ম্য প্রাপ্ত। এই বৃষভানুনন্দিনী সর্বদা সুষ্ঠুকান্তাস্বরূপ, ষোড়শ শৃঙ্গারধারিণী এবং তিনি দ্বাদশাভরণান্বিতা। (বর্তমান গবেষক কর্তৃক অনুবাদ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে এবং বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধা হলেন -

ক.সুষ্ঠুকান্তাস্বরূপা : রাধার কেশকলাপ সুকুঞ্চিত। বদনকমল চঞ্চল কিন্তু দীর্ঘনেত্রযুক্ত, বক্ষদেশ কঠিন কুচ-মণ্ডিত, মধ্যদেশ কৃশতার কারণে শ্লাঘনীয়। তাঁর স্কন্ধদ্বয় আনত এবং হস্তদ্বয়ের নখ রত্নমণ্ডিত। সমস্ত সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ দৃশ্যমান।

খ.ধৃত ষোড়শশৃঙ্গরা : রাধার নাসাগ্রে মুক্তা, পরিধানে নীলবস্ত্র, কোমরে নীবীবন্ধন, মস্তকে বেণী, কর্ণে উত্তংস। অঙ্গে লেপন করা হয়েছে কর্পূর, কস্তুরী ও চন্দন। চুলে গর্ভক হার, গলদেশে পুষ্পমাল্য, হস্তে লীলাকমল, মুখে তাম্বুল, চিবুকে কস্তুরিবিন্দু, নয়নে কাজল, গণ্ডদেশে মৃগমদ-রচিত মকরী পত্রভঙ্গাদি। চরণযুগলে অলক্তরাগ এবং ললাট জুড়ে সুশোভিত তিলক।

১. শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী রচিত, পণ্ডিত অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ অনূদিত *শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধিঃ*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১০

২. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৮

গ.দ্বাদশ ভরণাশ্রিতা : রাধার চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, নিতম্বে স্বর্ণকাঞ্চী, গলে স্বর্ণপদক, কর্ণের উপরে চক্রীদ্বয় ও শলাকাদ্বয়, হাতে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠহার, অঙ্গুলিতে অপুরীয়ক, বক্ষে নক্ষত্রতুল্য ভূষণ (তারা হার), ভুজদ্বয়ে অঙ্গদ, চরণযুগলে নানামণিশোভিত নূপুর এবং বিশাল পাদাঙ্গুরীয়কের এক অপূর্ব কান্তি।

রাধার গুণাবলি

রাধার প্রধান গুণাবলির মধ্যে রয়েছে—তিনি মধুরা, নব বয়স্কা, চঞ্চল কটাক্ষবিশিষ্টা, উজ্জ্বলমৃদুমধুরহাস্যকারিণী, চারুসৌভাগ্যসুলক্ষণ, সঙ্গীতবিদ্যাপারদর্শিনী, রম্যবাক, নর্মদক্ষা, বিনীতা, করুণাপূর্ণ, বিদগ্ধা, চাতুরীযুক্তা, লজ্জাশীলা, বিরহে বিপরীতা, সুবিলাসা, ধৈর্যগাম্ভীর্যশালী, পরমব্যগ্রা, সখীপ্রণয় বশীভূতা, শ্রীমাধবের নিত্য অধীন। কৃষ্ণের মতো তিনিও বহুগুণের অধিকারিণী, সর্বোপরি মধুর রসের তিনিই শ্রেষ্ঠ নায়িকা। বৈষ্ণব পদাবলির রসময়তার তিনিই প্রকৃত আশ্রয়। বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস সূত্রে নানান রসমাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে। এই মাধুর্যের মর্মমূলে রয়েছে স্বয়ং মাধুর্যময় কৃষ্ণ এবং মাধুর্যরসমাধুরী রাধা। মূলত রসমাধুর্যই হোলো রসের আশ্রয়। রসের উপলক্ষ অনন্য ভগবত প্রেম। রসময়তার বিচারে এই ভগবত প্রেমের দুইটি প্রকারভেদ।

ক.সোপাধি
খ. নিরূপাধি।

ক. সোপাধি : সোপাধিপ্রেম বিমলতাহীন। সুতরাং এর আস্বাদনও বিমলতাহীন। রাধাপ্রেমে সোপাধি প্রেমের কোনো স্থান নেই। যার জন্য বৈষ্ণব পদাবলিতে তার কোনো স্থান নেই।

খ.নিরূপাধি : নিরূপাধি প্রেম সত্যিকার রসময় প্রেম। নায়িকার শ্রেষ্ঠত্ব এতে প্রকাশমান। নিরূপাধি প্রেম বিমল, আনন্দময়; সুতরাং তার আস্বাদনীয় রসও নিত্যানন্দময়। ব্রজসুন্দরীগণ তথা রাধায় নিরূপাধি বা নির্মল প্রেমের চরমতা। যেহেতু রাধা গোপীগণের শিরোমণি-স্বরূপা, সুতরাং তাঁর মধ্যে বিকাশমান নিরূপাধি বা সুনির্মল প্রেমের পরাকাষ্ঠা। কান্তাপ্রীতিতে পাঁচটি উপাধি দেখা যায়, যথা :

ক. স্বসুখ-তাৎপর্য

খ. ঐশ্বর্যজ্ঞান

গ. সৌন্দর্যাদি গুণানুসন্ধান ঘ. পতি প্রভৃতি সম্বন্ধানুসন্ধান এবং ঙ. 'সে রমণ আমি রমণী' ইত্যাদি অনুসন্ধান। রাধাপ্রেমে উপর্যুক্ত পাঁচটি উপাধি নেই। সুতরাং লীলা বিস্তারে ও রসের আস্বাদনে তিনি রসসিন্ধুসার।

এ-প্রসঙ্গে একটি বৈষ্ণব পদ উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

জয় বিনোদনী ব্রজ বিলাসিনী,
বৃষভানু রাজবালা।
প্রেমানন্দ-নিধি রসৈক-বারিধি,
(মহা) কল্লোলমালাকুলা ॥
আয়ত অরুণ ললিত লোচন –
অঞ্চল-চালনে ধনি।
পরম আনন্দ কেলি-কলানন্দ
কেলিকুঞ্জে বিধায়িনী ॥
অদ্ভুত কাম বৈভবময়ী
শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী।
জগৎ মোহিনী আমার স্বামিনী
কুঞ্জেশ্বরী কমলিনী ॥
নিতুই নোতুন মহামহোৎসবে
বৃন্দাটবী–শ্রীমন্দিরে।
ভণে সরস্বতী সতত শ্রীমতী
আনন্দে বিরাজ করে ॥[১]

বস্তুত কৃষ্ণ এবং তাঁর মাধুর্য অভিন্ন সত্তা এবং মাধুর্যের একান্ত নির্যাসস্বরূপ 'মাদন' নামক মহাভাবের গূঢ় আধার হলেন রাধা। তিনি বিনোদনী এবং মহাভাবস্বরূপিনী। সুতরাং আধার এবং আধেয়র যে মিলন তার রস মধুর; মধুর রসের ক্ষেত্রে স্থায়িভাব এবং তার রতি মধুরা রতি। এই রতি গাঢ় হতে হতে ক্রমশ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাবে পর্যবসিত হয়। মহাভাবের থেকে উৎপন্ন হয় রূঢ়, অধিরূঢ়, মোদন, মোহন, মাদন–এই পাঁচ অবস্থার। মহাভাবের গুরুত্বপূর্ণ আধার 'মাদন' এবং এই অবস্থা থেকেই জাত 'মাদনাখ্য মহাভাব'। একদিকে রসরাজরূপে কৃষ্ণ অন্যদিকে মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপিনী রাধা এবং ফলস্বরূপ তাঁদের লীলাবিস্তার মাধুর্য রসের পরিপূর্ণ আকর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবকৃত পদাবলির রাধা চিন্তামনি, কায়ব্যূহ, উদ্বর্তন, কারুণ্যামৃতধারা, তারুণ্যামৃতধারা, লাবণ্যামৃতধারা, রক্তবর্ণানুরাগ, কুঞ্চলিকা প্রণয়-মান, উজ্জ্বলরসসিন্ধুসার, প্রেম-কৌটিল্য, সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বর ভেদ, বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয়, ধূমায়িত), জ্বলিতা, হর্ষাদি সঞ্চারী ইত্যাদি স্বরূপে আচ্ছাদিত।বৈষ্ণব ভজনার পরম নিগূঢ়তত্ত্ব রাধা। তিনি গুপ্ত মহাসিন্ধুরূপে প্রতীয়মান। এই পরম রহস্যময়ীর প্রেমরস অনন্ত মহাসিন্ধুর ন্যায় বিকশিত হয়ে প্রেমরসের এক ঘনীভূত মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর প্রেমের মহাসিন্ধু অনন্ত এবং সর্বত্র দৃশ্যমান হলেও তা গুপ্ত বা রহস্যময়। অর্থাৎ–

প্রত্যঙ্গোচ্ছলদুজ্জ্বলামৃতরস– প্রেমৈক পূর্ণাম্বুধি–
র্লাবণ্যৈক সুধানিধিঃ পুরুকৃপাবাৎসল্যসারাম্বুধিঃ।

তারুণ্য–প্রথম প্রবেশ–বিলসন্মাধুর্য্য সাম্রাজ্যভূ–
গুপ্তঃ কোহপি মহানিধির্ব্বিজয়তে রাধারসৈকাবধিঃ ॥

অর্থাৎ, যিনি প্রতি অঙ্গে উচ্ছলিত উজ্জ্বলামৃত প্রেমরসের একমাত্র পূর্ণাম্বুধি, লাবণ্যের সুধানিধি, বিপুলকৃপা ও বাৎসল্যের সারাম্বুধি, নব-যৌবন-বিলসিত-মাধুর্য সাম্রাজ্যের ভূমি, রসের একমাত্র অবধি–সেই রাধা নামক কোন গুপ্তমহানিধি সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করছেন।[২]

---

১. শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী রচিত, পণ্ডিত অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ অনূদিত *শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধিঃ*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৫৪৬-৫৪৭

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪৬-৫৪৭

সখী-দূতী প্রসঙ্গ

বৈষ্ণব পদাবলিতে বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলা সংগঠনে সখীদের স্থান তাৎপর্যপূর্ণ। প্রেমের মূর্ত বিষয়-স্বরূপ কৃষ্ণের প্রেমাশ্রয় হলেন হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা রাধা। তাঁদের এই অনন্ত প্রেমাশ্রয়ীলীলার বৈচিত্র্য, সেবা ও মাধুর্য বিস্তারকারীগণই হচ্ছেন সখী। অর্থাৎ এঁরা রাধাকৃষ্ণের লীলাসংগঠনের একান্ত সহায়। লীলা প্রসঙ্গ এবং রসোস্থাপন বিষয়ক সখীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. সখী : কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠা
খ. নিত্যসখী : কস্তুরী, মণিমঞ্জরী
গ. প্রাণ সখী : শশীমুখী, বাসন্তী
ঘ. প্রিয় সখী : কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা
ঙ. পরমপ্রেষ্ঠ সখী : ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি।

বস্তুত লৌকিক অলংকার শাস্ত্রে সখীপ্রসঙ্গ গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হয়নি, কিন্তু আমরা মনে করি রাধাকৃষ্ণ লীলায় সখীর স্থান সুউচ্চে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে পরিপুষ্ট করতে এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করতে বিশেষভাবে পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, মিলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সখীর গুরুত্ব অপরিসীম। সখীগণ রাধারই কায়া বা একান্ত অংশ। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হলেই এঁদের কর্মের ও সুখের চরম সার্থকতা। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানাচ্ছেন:

সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥
সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখী ভবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ॥ ...
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥

কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥[১]

সুতরাং 'সখীপ্রসঙ্গ' বৈষ্ণব পদাবলির রস বিচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থাপন যোগ্য।

সখীদের মধ্যে নানান অবস্থা। যেমনঃ যূথেশ্বরী, অযূথেশ্বরী, যূথহীনা রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কখনো কখনো সখীরা বামা এবং দক্ষিণাভুক্ত হয়ে সেবা কার্য চালিয়ে থাকেন। যূথেশ্বরী প্রকরণের মধ্যে অধিকা, সম, লঘু, প্রখরা, মৃদ্বী, মধ্যা, আত্যন্তিকাধিক্য রূপে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে উল্লিখিত সখীদের কাজ হলো নায়ক-নায়িকার কাছে একান্ত প্রশংসাবাচক প্রণয়-বার্তা পাঠানো, পারস্পরিক আসক্তিবর্ধনের জন্য সমুদয় প্রচেষ্টা করা, লীলাভিসারে সম্যক সহযোগিতা করা, পূর্ণ আত্মনিবেদন করা এবং লীলা বিন্যাস ও আস্বাদনে পূর্ণ ভূমিকা রাখা।

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৩১৩

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনে নায়িকা-দূতী প্রসঙ্গ

পরকীয়া রসাস্বাদনে দূতী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাকচৈতন্য যুগের কাব্যেও দূতীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দূতীকে দুই প্রকারে ভাগ করা যায়। **ক.** স্বয়ংদূতী **খ.** আপ্তদূতী। দৌত্য কার্যে এদের রীতি তিন ধরনের। বাচিক, আঙ্গিক এবং চাক্ষুষ। আপ্তদূতীরা অমিতার্থা, নিসৃষ্ঠাথা, পথহারিণী, শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, তপস্বিনীবেশধারিণী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী প্রভৃতি হয়ে থাকে। চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব পদকারগণ দূতীকে যোগমায়ার রূপকে ব্যবহার করেছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণলীলায় অঘটনঘটনপটিয়সী।বৈষ্ণব পদাবলিতে দূতী প্রসঙ্গ গুরুত্বহীন হলেও তাত্ত্বিক বিচারে এঁদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লিখিত বিষয়ে উমা রায়ের একটি চমৎকার মন্তব্য এক্ষেত্রে উদ্বৃতিযোগ্য :

> কৃষ্ণ প্রকৃতি, রাধা বিকৃতি। প্রকৃতি থেকেই বিকৃতি আসে। বিকৃতি প্রকৃতির অবস্থা বিশেষ। ... শ্রীকৃষ্ণপ্রেমস্বরূপ, শ্রীরাধা প্রেমস্বরূপা, তাঁদের লীলাও প্রেমস্বরূপ, – যেমন সূর্য আলোক-স্বরূপ,সূর্যকিরণ আলোক-স্বরূপ, সূর্যোদয়ও আলোকস্বরূপ। যেমন বহ্নি, বহ্নির দীপ্তি ও অভিজ্বলন বিভিন্ন নয় অথচ বিভিন্ন, ঠিক তেমনি। পুষ্প থেকে গন্ধ যেমন ভিন্ন নয়,রমণী থেকে রমণী লাবণ্য যেমন ভিন্ন নয় আর সে লাবণ্য ভাবাবেগে প্রতিক্ষণেই স্ফুরণশীল, রাগ যেমন সুর থেকে ভিন্ন নয় আর বিচিত্র তানমালায় যা মুহুর্মুহু আন্দোলিত, ... ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীরাধা ভিন্ন নয় আরযোগমায়ায় তাদের লীলাময় চাঞ্চল্য।[১]

এই অসাধারণত্বই চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এক অলোকগত অলৌকিক রস মানবিক প্রাণপ্রকৃতির সর্ববিধ বন্ধনকে দিব্যপ্রেমের ছোঁয়ায় মুক্ত করে দিয়েছে। পদাবলির স্পর্শে মানবমন দিব্যপ্রেমে হয়েছে মাতোয়ারা। স্বচ্ছমনে সাধনার দ্বারা সহজেই অনুভব করা যায় এই অপ্রাকৃত দিব্যপ্রেমের মহিমা। এই মহিমার জাগরণ হলে হৃদয় উন্মুখ হয় অসীমের স্পর্শ পেতে। শুধু স্পর্শতেই ক্ষান্ত হয় না, পরমসত্তাকে গভীর, গভীরতর করে পেতে তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। হৃদয় প্লাবিত হয়

ভক্তি-তরঙ্গে। তখন ব্যক্তি হয় ভক্ত আর প্রেম রূপ নেয় ভক্তিতে। দুইয়ের মিলনে হৃদয় ছুটে যায় প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে, একত্বের দিকে। রসময়তার মূল সূত্র এখানেই দীপ্যমান। এই ভগবৎ-প্রেমের সারতত্ত্বকে ঋষি অরবিন্দ বলেছেন–Cosmic Divine Love :

> 1.That self – existent transcendent love spreading itself over all, turning everywhereto contain, embrace, unite, help, upraise forwards love and bliss and oneness,becomes cosmic divinelove.

---

১. ড. উমা রায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-২০০০, পৃষ্ঠা-১৭৪

> 2.Inlensely fixing itself on one or other to find itself, to achieve a dynamic unification or to reachhere to wards the union of the soul with the Divine, itbecomes the individual divine love.[১]

চৈতন্য-আবির্ভাবে বাঙালি মানসে যেমন ভক্তি-তরঙ্গের প্লাবন সৃষ্টি হয় তেমনি ভাব-তরঙ্গের অভিঘাতে সৃষ্টি হয় গীতিরসময়ধারা পদাবলি; যা ভাবে, বিন্যাসের প্রাচুর্যে অনন্য ও উপভোগ্য।

রাধাকৃষ্ণের রসময় লীলা প্রকরণ :

রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস সূত্রে লীলা প্রকরণে নানাবিধ রসমাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই লীলামাধুর্যের অন্তস্তলে রয়েছে রাধাকৃষ্ণ এবং তাঁর পূর্ণ শক্তি ; একদিকে অনন্ত রসমাধুর্যের কৃষ্ণ অন্যদিকে হ্লাদিনীময় রাধা। কৃষ্ণ স্বয়ং লীলামাধুর্যময়। তাঁর সবই (নাম, লীলাধাম, পরিকর, বসন, ভূষণ, হাসি, বাঁশি, বাণী) মধুর। কবি বিল্বমঙ্গল তাঁর *শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থে কৃষ্ণের মাধুর্যমণ্ডিত রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কেবল মধুর মধুর বলেছেন:

> মধুরং মধুরং বসুরস্য বিভো–
> মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ॥
> মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
> মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥
> অর্থাৎ মধুর–মধুর চেয়েও মধুর কৃষ্ণের দেহ। মধুর চেয়ে মধুর তাঁর আনন। মধুর সৌরভ সে দেহে,মধুর হাসি সে মুখে–আহা !মধুর, সুমধুর, অতি সুমধুর–সবচেয়ে সুমধুর।[২]

এই ভাবতরঙ্গময় মাধুর্য সত্তা আছে বলেই সমস্ত লীলাপ্রকরণ রসময় লীলায় পর্যবসিত হয়েছে। হয়ে উঠেছে 'রসই মাধুর্য, মাধুর্যই রস'। মাধুর্যময় কৃষ্ণের রূপ সুখময় এবং পরম মাধুর্যময় অরূপরতন। তাঁর প্রতি সর্ববাধামুক্ত প্রেম নিবেদনই সাধ্য-স্বরূপ। কারণ–

১. বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।

কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥
পুরুষ ঘোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব চিন্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন।[৩]

---

১. Sri Aurobindo, *On MC Taggart's statements about love,* Letters of Sri Aurobindo. উদ্ধৃতি, ড. উমা রায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-২০০০, পৃষ্ঠা-১৮৩
২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯,পৃষ্ঠা-৩৯৩
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৩

২. যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ শুদ্ধ পরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
ভক্তগণার গূঢ়ধন ঐ রূপ রতন
প্রকাশিলা নিত্যলীলা কৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হইল চমৎকার
আস্বাদিত মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপ নিত্য তাঁর ধাম ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্তন। ...
কৃষ্ণ নব জলধর জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥[১]

কৃষ্ণের এই মাধুর্যময় রূপমাধুর্যের সাথে যুক্ত লীলামাধুর্য এবং বেণুমাধুর্য। কৃষ্ণের অপূর্ব লীলা সম্পাদনে বেণুধ্বনি অনন্ত মাধুর্যসম্পন্ন বিষয়।

কারণ—

তদ্ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্ ।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসসখীভ্যোহন্ববর্ণয়ন্ ॥
তদ্ বর্ণয়িতুমারদ্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণ চেষ্টিতম্ ।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ॥ ...
ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্বভূত মনোহরম্ ।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্বা বর্ণয়ন্ত্যোহভিরে ভিরে।[২]

বংশীধারী কৃষ্ণের বংশীধ্বনি তাঁর প্রতি প্রেমের জাগরণ ঘটায়, চিত্তকে আকুল করে তোলে অনির্বচনীয় মিলনাকাঙ্ক্ষায়। কৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্যমণ্ডিত আচার-আচরণ তাঁর লীলামাধুর্যকে অপূর্বতা দান করেছে। তাঁর

এই বেণুধ্বনির আকর্ষণ সর্বগ্রাসী এবং এর প্রভাবে মুগ্ধ হয় না এমন পদার্থ ত্রিভুবনে নেই। ব্রজাঙ্গনাদের আরাধ্য লীলামাধুর্যময় কৃষ্ণের বংশীধ্বনির আহ্বান নিবিড় এবং মনমধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই মোহন বংশীবাদকের রূপ। সুতরাং তাঁকে আবদ্ধ করতে হয় নিবিড় প্রেমে ! রাধার চিত্ত অধৈর্য হয়ে ওঠে, অভিসারে গমন তখন মুখ্য বিষয় হয়ে। এই অভিসারোদ্দীপনা, মিলনে উৎকণ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ের মূল চালিকা শক্তিই হলো বেণুধ্বনি এবং বেণুমাধুর্য। অন্যদিকে বৃন্দাবনলীলায় যে অনন্ত মাধুর্যময় লীলার বিস্তার ঘটেছে সেখানে মুখ্য রসবিস্তার। কৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য এখানে গৌণ, এমন কি ঐশ্বর্য-দর্শন করেও কৃষ্ণে ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয়নি। কৃষ্ণমাতা, পিতা, বন্ধু, সখী পরিবৃত! অনন্ত ঐশ্বর্যের অব্যবহিত মুহূর্তে, অনন্ত মাধুর্যের জাগরণ ঘটেছে। এখানে মূল বিষয় বা লীলাসংগঠনের চমৎকারিত্ব এই – অসংখ্যবার

---

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৩৯০-৩৯১

২. গীতা প্রেস প্রকাশিত, *শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ*, গোরক্ষপুর, ২০১৯, পৃষ্ঠা-১২৩১-১২৩৪

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যশক্তির প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও তাতে ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয়নি। বাল্যলীলায় পূতনাবধ, দামবন্ধন, বিভিন্ন অসুর বধ প্রভৃতি কাণ্ড ঘটলেও ব্রজবাসীদের নির্মল মনোমন্দিরে কৃষ্ণগোপাল তাঁদের ঘরের ছেলে। সেখানেও ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয়নি এবং বা তাঁদের চিন্তাতেও তা প্রকাশ পায়নি। ‘মৃত্তিকাভক্ষণ’ লীলায় মা যশোদা গোপালের মুখে বিশ্বরূপ দর্শনকে অশুভ শক্তির প্রাদুর্ভাব বলে মনে করেছেন। ব্রজসখাগণ সব দেখেও গোপালকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করেছেন একান্ত বান্ধব হিসেবে। ফলে কৃষ্ণের এই লীলাবিলাস হয়ে উঠেছে অনন্য রসমাধুর্যময়। লীলা মাধুর্যের স্বরূপ পার্থিব কিন্তু অনুভব নিগূঢ় এবং অপার্থিব। শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকরণের দুটি স্তর:

ক. মায়িকী
খ. স্বরূপ শক্তিময়ী।

বস্তুত স্বরূপ শক্তিময়ী স্তরে ঘটেছে অপূর্ব রসের সঞ্চার। এই রসতাৎপর্যের পরিধি-অনন্ত। অর্থাৎ–

> বৃষভানুনন্দিনী, রমণীর শিরোমণি, কৃষ্ণপ্রেমসায়রের মরালিনী, মাধুর্য কাদম্বিনী, মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণ ছাড়া কিছুই জানে না। কৃষ্ণই তাঁর প্রাণ বঁধু, কৃষ্ণই তাঁর পতি, কৃষ্ণই তাঁর সর্বস্ব ধন এবং ‘যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে’–এমন মধুর ভাবে বিভাবিত রাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভাববিলাসের মাধ্যমে অনন্তরসসমৃদ্ধ। কৃষ্ণও লীলা উপস্থাপনকল্পে শ্রীরাধাতেই আত্মসমর্পিত; এই অভিনবত্বই মাধুর্যের প্রাণ।[১]

লীলা সংগঠনে ঐশ্বর্য থাকলেও তা মাধুর্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। রাধাকৃষ্ণের অনন্ত প্রেম মাধুর্য লীলা কেবল অনুভবযোগ্য; জ্ঞানতত্ত্বে তা ব্যাখ্যাতীত। মূলত প্রকট ধাম বৃন্দাবনে অপূর্ব সম্পর্কজনিত লীলাই রসমাধুর্যময় ‘রসলীলা’। এই রসলীলার স্তর বিন্যাস: ক. অভিসারিকা, খ. বাসক সজ্জিকা, গ. উৎকণ্ঠিতা, ঘ. বিপ্রলব্ধা, ঙ. খণ্ডিতা, চ. কলহান্তরিতা, ছ. প্রোষিতভর্তৃকা, জ. স্বাধীন ভর্তৃকা, ঝ. প্রেম বৈচিত্ত্য, ঞ. ঝুলন। বৈষ্ণব পদাবলির রসময়তায় উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কীর্তনের মাধ্যমে স্তরগুলোর পরিবেশনে এক অপার্থিব রসোদগার ঘটে থাকে। বাংলাদেশের কীর্তনীয়াগণ

কীর্তনের আসরে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে কোথাও কোথাও 'পালা' আকারে পরিবেশন করে থাকেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিশ্রিত করে পরিবেশিত হতে দেখা যায়।

অভিসারিকা :

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
যা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেষাভিসারিকা ॥
অর্থাৎ, যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন, তাকেই বলা হয় অভিসারিকা।[২]

গোবিন্দের বংশীধ্বনি শোনামাত্র সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে (ভূষণাদি যথাস্থানে পরিধান করার পূর্বেই)

১. ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তনগান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২০৭
২. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৫৬

বিভ্রম অবস্থায় শ্রীমতী রাধারাণী সখী পরিবৃতা হয়ে যাত্রা করেন প্রাণবঁধুর সঙ্গসুখ আশায়। গোবিন্দ-সন্নিধানে গমনের এই মুহূর্তই অভিসার। ঋতুভেদে রসশাস্ত্রানুসারে অভিসার লীলার আটটি প্রকরণ রয়েছে। যথা:

ক. জ্যোৎস্নাভিসার
খ. তামসাভিসার
গ. বর্ষাভিসার
ঘ. দিবাভিসার
ঙ. কুজ্ঝটিকাভিসার
চ. তীর্থযাত্রাভিসার
ছ. উন্মত্তাভিসার
জ. অসমঞ্জসাভিসার

উল্লেখ্য, অভিসারের ক্ষেত্রে নায়কা-নায়িকা উভয়ই যুক্ত থাকে। তবে রাধার অভিসারে রসের আধিক্য বেশি দেখা যায়। কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করেছেন অথবা অন্য কোনো সংকেত প্রদান করেছেন। সেই সংকেত পেয়ে মিলনাকাঙ্ক্ষায় সংকেতপ্রাপ্ত কুঞ্জের দিকে ধাবমান হয়েছেন সখীপরিবৃতা রাধা। তাঁদের এই গমনভঙ্গি বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দৃশ্যমান। এই অপূর্ব অভিসার-যাত্রা বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের রসময়তায় এক অনন্য স্থান-অধিকারী। অভিসার লীলার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি:[১][ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত]

ক. জ্যোৎস্নাভিসার

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

১. ব্রজ অভিসারিণী, ভাবে বিভাবিত, নবদ্বীপ চাঁদ বিভোর।
অভিনয় তৈছন, করত পুলকি তনু, নয়নহি আনন্দ লোর ॥

দেখ দেখ প্রেম সিন্ধু অবতার।
তহিঁ পুন নিমগন, নাহি জানে রাতি দিন, বুঝি সো মহাভাব সার ॥ ...
(তাল : জৈতি, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২১৫)

<u>ব্রজলীলা</u>

২. ললিতা উল্লাস প্রাণী, সবুর্ণের চিরুণী আনি, মনসাধে আঁচরিল চুল।
বিশাখা কবরী বান্ধে, করি মনোহর ছান্দে, সারি সারি দিল নানা ফুল ॥ ...
(তাল : দশকোশি, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*: পৃষ্ঠা-২১৬)

---

১. উদ্ধৃত পদগুলির মূল সূত্র বর্তমান গবেষকের ক্ষেত্র-গবেষণায় বিভিন্ন কীর্তনের আসর থেকে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং মূল পদের উৎস হিসেবে শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, (?) কলিকাতা; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *পদামৃত লহরী*, জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ; শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-২০১৫, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (১ম খণ্ড)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে।

৩. সাজল ধনি, চন্দ্রবদনী, শ্যাম দরশ আশে।
সঙ্গিনীগণ, রঙ্গিণী সব, ঘেরল চারিপাশে ॥
তরুণারুণ, চরণযুগল, মঞ্জীর তঁহি শোভে।
ভৃঙ্গাবলী, পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জরে মধুলোভে ॥ ...
(তাল: চঞ্চুপুট, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২১৮)

৪. আদরে আগুসরি, রাই হৃদয়ে ধরি, জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর কমলে, চরণযুগ মোছই, হেরইতে চির থির আঁখি ॥
পিরীতি মূরতি আধি দেবা।
যাকর দরশনে, সব দুঃখ মীটই, সোই আপনে করু সেবা ॥ ...
(তাল: কন্দর্প, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২২১)

৫. দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা ॥
কাজরে মিশাল কিয়ে নব গোরোচনা।
নীলমণি ভিতরে পশিল কাঁচা সোনা ॥ ...
(তাল: একতালা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২২২)

খ. তামসাভিসার

১. ধনি কানড়া ছান্দে বান্ধে কবরী।
নব মালতী মাল তহি উপরি ॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জকলা করবী।
খেসে উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী ॥ ...
(তাল: রূপক, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২২৪)

২. রাই কনকমুকুর কাঁতি।

শ্যাম বিলাসের, সুন্দর তনু, সাজয়ে কতেক ভাতি ॥
নীল বসন, রতন ভূষণ, জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের, বিচিত্র বেণী, দোলিছে হিয়ার মাঝে ॥ ...
(তাল: একতালা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২২৫)

গ. বর্ষাভিসার

১. অম্বরে ডম্বরু ভরু নবমেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥
অন্তরে উড়াল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব সিন্ধু ॥ ...
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২২৫)

২. অবিরত বাদর, বরিখত দরদর, বহই তরলতর বাত।
বিষধর নিকর, ভরল পথ অরুকত, অজর বজর বিনিপাত ॥
হরি হরি কৈছে চলব কুহু রাতি।
না বুঝত কণ্টক, সঙ্কট বাটহি, মার গোঙার বর রাতি ॥ ...
(তাল: একতালা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২২৮)

৩. চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার ॥ ...
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২২৯)

ঘ. দিবাভিসার

১. যে পথে নাগর শিরোমণি।
সে পথে চলিলা সুবদনি ॥
নাগর সহচর মেলি। ...
(তাল : একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-২৯৫)

২. বিরা বৃন্দাদেবী তবে তথাই আইলা।
রাইকে বিরস দেখি কহিতে লাগিলা ॥
কহ ধনি কাহে লাগি মলিন বয়ান।
কুঞ্জক তীরে মিলহ বর কান ॥ ...
(তাল: একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*-পৃষ্ঠা-২৯৫)

৩. দেব আরাধন ছলে চলু গোরী।

সঙ্গহি সমবয় নবীন কিশোরী ॥
চন্দন কুমকুম আর ফুল মাল।
লেয়ল বহু উপহার রসাল ॥
চলু বরানাগরি সঙ্গব মাহ।
সচকিত নয়নে দিগ দশ চাহ ॥ ...
(তাল: বরাড়ী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩২২)

ঙ. কুজ্ঝটিকাভিসার

১. দুতিক বচন শুনি নাগর রাজ।
অন্তরে পায়ল বহু তর লাজ ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মন মাহা হোয়ল বহুত উলাস। ...
(তাল: ধানশি, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৪০৮)
২. রাধামাধব দোঁহে অতি মনোহর।
উঠিয়া বসিলা পুষ্পশয্যার উপর ॥ ...
(তাল: লোফা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৪০৮)

চ. তীর্থযাত্রাভিসার

১. ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনি রঙ্গিনি প্রেম-তরঙ্গিণি
সাজলি শ্যাম-বিহারে।
চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণি চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে ॥ ...
(তালা : একতালা, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৭)

ছ. উন্মত্তাভিসার

১. কানু অনুরূপে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহে।
গুরুদুরুজনভয় কিছু নাহি মানায়
চীর নাহি সম্বরু দেহে ॥ ...
(তাল: একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৪০৬)

২. বাই সাজে বাঁশি বাজে, না পরিল উল।
কি করিতে, কিনা করে সব হৈল ভুল ॥
মুকুরে আঁচরে বাই বান্ধে কেশভার।

পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥ ...
(তাল: একতালা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৩৬)

জ. অসমঞ্জসাভিসার

সুন্দরি ঝাট কর মনোহর বেশ।
সময় হইল আসি, বাজিবে সঙ্কেত বাঁশি, ধৈরজের না রহিতে লেশ ॥
গমন মন্থরভাবে, কবরী আলুয়া যাবে, ঝাট কর বেণীর রচনা।
শ্রম জলে যাবে ভাসি, মলিন হবে মুখশশী, কাজর পরিতে করি মানা ॥
নীল অট্ট পট্ট শাড়ী, আটিয়া পড়হ গোরি, খসিয়া না পড়ে সেই কালে।
কাঁচুলি পরিয়া হার, ভিতরে রাখহ তার, ছিঁড়িলে থাকয়ে যেন গলে ॥ ...
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২১৪)

বাসকসজ্জিকা

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসক সজ্জিকা ॥
নিজ আবাসে প্রিয়তম আসবেন, এই ভেবে যিনি নিজ দেহ এবং বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন, তিনিই বাসকসজ্জিকা।[১]

বাসকসজ্জিকা সর্বদাই প্রিয়তমের আগমনের প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করেন। উৎসুক এই নায়িকা সখীপরিবৃতা হয়ে পারস্পরিক বিনোদনমূলক বাক্য বিনিময় করেন। দূতীর অপেক্ষায় অপেক্ষমাণা এই নায়িকা উৎকণ্ঠিত হয়ে দূতীর পথ নিরীক্ষণ করে থাকেন।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

অরুণ নয়নে ধারা বহে।
অবনত মাথে গোরা রহে ॥
ছায়া দেখি সচকিত মনে।
ভূমে গড়ি বায় খেনে খেনে ॥ ...
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।
বাসকসজ্জারভাব করে ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-১৯৮)

ব্রজলীলা

১. অনুপম মন অভিলাষ।
সঙ্কেত-কুঞ্জহি শেজ বিছায়ই
কানু মিলব প্রতি আশ ॥
মৃগমদ চন্দন গন্ধ-সুলেপন
বিকশিত-চম্পক-দাম।
কর্পূর তাম্বুল সম্পুট ভরি রাখয়ে
পূরব মনরথ কাম ॥ ...
(তাল: চঞ্চুপুট, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-১৯৮)

২. নিকুঞ্জ-মন্দিরে শেজ বিছায়ই
সঘনে কাঁপয়ে দেহ।
নীল নিচোল সো তনু ঝাঁপল
পবনে না সহে সেহ ॥
সুকুমারি কত না সহিবে দুখ।
মন্দিরে রচিত তুলি পরিযঙ্ক
তেজিয়া সেসব সুখ ॥
কপট কানুক পিরিতি লাগিয়া
আয়ল সঙ্কেত গেহা। ...
(তালা: একতালা, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-১৮৪

---

১. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৫৮, ৩১

৩. সাজল কুসুম শেজপুন সাজই
জারই চারল বাতি।
বাসিত খপুরে কপুরে পুন বাসই
ভৈগল মদন ভরাঁতি ॥
আজু রাই সাজলি বাসকশেজ।
মনমথ লাখ মনোরথে ধাবই
অঙ্গেঁ অনঙ্গ নাহি তেজ ॥ ...
(তাল : একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৩৪)

উৎকণ্ঠিতা

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা।
নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবত না আসলে যে নায়িকা উৎসুক হয়ে থাকেন, ভাববেত্তা কবিগণ তাঁকেই 'বিরহোৎকণ্ঠিতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১]

উৎকণ্ঠিতা নায়িকা বিরহ প্রধান, অর্থাৎ তিনি বিশেষ বিরহ অনুভব করেন এবং হৃত্তাপ, কম্প, হেতু বিতর্ক, অরতি, বাষ্পমোচন; নিজ অবস্থা বর্ণনের চেষ্টা প্রভৃতি বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

এ হেন সুন্দর বেশ কেনে বানাইলুঁ।
নিরূপম গোরা-রূপ দেখিতে নারিলু ॥
অকাজে রজনী যায় কিবা মোর হৈল।
নিশ্চয়ে জানিলুঁ মোরে বিধি বিড়ম্বিল ॥
সুবাসিত গন্ধ আদি অগোর চন্দন।
গোরা বিনু কার অঙ্গে করি লেপন ॥

কর্পূর তাম্বুল গুয়া দিব কার মুখে।
বাসুঘোষ কহে নিশি যায় বড় দুখে ॥ ...
(তাল: লোফা, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-২০০)

ব্রজলীলা

১. কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়লুঁ
সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জ
মাধবি-পরিমলে ভরি তনু জারই
ফুকরই মধুকর-পুঞ্জ ॥
সজনি না মিলিল দারুণ কান।
নীলজ চীত পিরিতি অনুরোধই
তে নাহি জাত পরাণ ॥ ...
(তাল: একতালা, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-২০১)

১. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৫৯, ৩১

২. বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইলু
গাথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা ॥
সই পাছে-এসব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান ॥
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলব বঁধুর সনে ॥ ...
(তাল: লোফা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৫৫)

বিপ্রলব্ধা

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ॥
সঙ্কেত প্রদান করেও যদি দৈবাৎ প্রাণনাথ কুঞ্জে না আসেন, মনীষীগণ ব্যথিতান্তরা সেই নায়িকাকে বিপ্রলবদ্ধ বলেন। তাঁর চেষ্টায় থাকে নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত, মূর্চ্ছা এবং নিঃশ্বাসাদি।[১]

বিপ্রলব্ধা-নায়িকাকে বঞ্চিতা বিরহিতাও বলা হয়ে থাকে।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

আজু রজনী হাম কৈছে বঞ্চত রে
মোহে বিমুখ নট-রাজ।
নব অনুরাগ আশা নাহি পূরল
বিফল ভেল সব কাজ ॥
সজনি কাহে বনায়লুঁ বেশ।
আধ পলকে কত যুগ বহি যাওত
পথ হেরি পাঁজর ভেল শেষ ॥
গুরুজন-গৌরব দূরহি তারলুঁ
গৌর প্রেমরস লাগি।
দুর্লভ প্রেম মোহে বিহি বঞ্চল
দেওল মঝু মুখে আগি ॥
প্রেম-রতন-ফল জগ ভরি বিথারল

১. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৬১, ৩২

হাম তাহে ভেল নৈরাশ।
নব অনুরাগে ভরসে হাম ভুললুঁ
বাসুঘোষ না পূরল আশ ॥
(তাল: লোফা, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-২০৪)

ব্রজলীলা

১. তেজ সখী কানু আগমন-আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহি ডারহ যমুনা পার ॥ ...
ধিক ধিক রে বিধি তোহারি বিধান।
এহেন রজনী মোহে বঞ্চল কান ॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস ॥ ...
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-২০৫)

২. শুন শুন মধাব নিরদয়-দেহ।
ধিক রহুঁ ঐছন তোহারি সুলেহ ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেত-বাত।
যামিনি বঞ্চলি আনহি সাথ ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণি সহে বিলাস ॥ ...
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-২০৬)

খণ্ডিতা

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্ ।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ যা হি খণ্ডিতা ॥
খণ্ডিতা নায়িকা হলো সেই যে পূর্ব সঙ্কেতের কাল অতিক্রমকারী প্রিয়তমকে অন্য নায়িকার সম্ভোগচিহ্ন সম্বলিত অবস্থার দর্শন করেন এবং বর্হিরূপে ক্রোধ, দীর্ঘ নিশ্বাস, মৌনাদি প্রকাশ করেন।[১]

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

সহজে গৌর প্রেমে গর-গর
ফিরাইয়া যুগল আঁখি।
দামিনী সহিতে সুন্দর জলদে
অরুণ-কিরণ দেখি ॥
উঠিল ভাবের তরঙ্গে রঙ্গ
সম্বরি না পারি চিতে।
কহে কি লাগিয়া কিবা সাজাইয়া
কেন কৈল হেন রীতে ॥
এ রাধামোহন কহে বৃষভানু–
সুতা-রসে ভেল ভোর।
হেন ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে
কিছু না হইল মোর।
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-২০৬)

ব্রজলীলা

১. যামিনি জাগি অলস দিঠি কুঞ্চিত
কামিনি অধরক রাগ।
বান্ধুলি-অরুণ অধর ভরি কাজর
ভালোপরি অলকত দাগ ॥ ...
(তাল : লোফা, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-২৩০)

২. ভালো হইল আরে বঁধু আইলা সকালে।
প্রভাতে হেরিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥
বন্ধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও আগে চাঁদমুখ চাই ॥ ...
(তাল: মধ্যম দশকোশী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৫১)

৩. দূর কর মধাব কপট সোহাগ।

---
১. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৬৩, ৩২

হাম সমুঝল সব তুয়া অনুরাগ ॥
ভাল ভেল অলপে মিটল সব দ্বন্দ্ব।
ভাল নহে করহি আশ-পরিবন্ধ ॥ ...
(তাল: তেওট, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-২৩৩)

৪. অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
কর যোড়ে মাধব মাগয়ে পরসাদ।
নয়নে গলয়ে লোর গদ গদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল দুহুঁ পাণি ॥ ...
(তাল: তেওট, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, পৃষ্ঠা-২২৬)

৫. রাধে জয় রাজপুতি
মম জীবনদয়িতে।
যাও যাও বঁধু যত বড় তুমি
জানা গেল তুয়া চরিতে ॥ ...
(তাল : মধ্যম দশকোশী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-১০৪৯)

৬. রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণি লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব
তবহুঁ বিমুখি ভেল রাই ॥
পুনহি মিনতি করু কান ।
হামতুয়া অনুগত তুহুঁ ভালে জানত
কাহে দগ্ধ মঝু প্রাণ ॥ ...
(তাল : মধ্যম দশকোশী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৮৬)

কলহান্তরিতা

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
অস্যাঃ প্রলাপসন্তাপগ্লানি-নিঃশ্বসিতাদয়ঃ ॥
যে নায়িকা, সখীজনসমক্ষে পাদপতিত প্রিয়তমকে নিরসন করত পশ্চাৎ অনুতাপ করেন, তাঁকে 'কলহান্তরিতা নায়িকা' বলে।[১]

প্রাণবল্লভ রসরাজ গোবিন্দ খণ্ডিতা অবস্থায় রাধাচরণে পতিত হয়েছেন। কিন্তু শ্রীমতিরাধা পাদপতিত বল্লভের ওপর অভিমানবশত রুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে পরিত্যাগও করেছেন। গোবিন্দ বিরস বদনে স্থান ত্যাগ করার পরে শ্রীরাধার যে তীব্র অনুতাপ তা প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘ নিশ্বাস ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ হওয়াই কলহান্তরিতার বিষয়ভাব।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

মান বিরহজ্বরে পহুঁ ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহি লোর ॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাঁদ।
অখিল জীবের মনোলোচন ফাঁদ ॥
প্রেমজলে ডুবু ডুব লোচন তারা।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা ॥...
(তাল: বড় দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৬৬)

---

১. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৬৪, ৩২

ব্রজলীলা

১. সারী প্রতি শুক তখন কহিছে বচন।
এই রাধার গুণ তুমি করিছ বর্ণন ॥
জগত জীবন কৃষ্ণ চরণ ধরিয়া।
ফিরিয়া না চাহলি কি কুলিশ হিয়া ॥ ...
(তাল: দাসপ্যারি, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৬৬)

২. কুঞ্জস নিকসই মানিনী রাই।
অরুনিম লোচনে সখী মুখ চাই ॥
(তাল : লোফা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৬৭)

৩. আঁধল প্রেম, পহিলে নাহি হেরিনু, সোবহু বল্লভ কান।
আদর সাধে, বাদ করি তা সঞে, অহর্নিশি জ্বলত পরাণ ॥ ...
(তাল : ধরা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৬৭)

৪. তিল এক শয়নে, স্বপনে যো মঝুবিনে, চমকি, চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে, গাঢ় আলিঙ্গনে, নিঝরে ঝরায় বহু লোর ॥
সজনি সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি, নিধি দেই লেয়ন, সো সুখ করি বিচ্ছুরাই ॥ ...
(তাল : ধরা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৬৯)

৫. দূরে হেরি নাগর, চতুরা সহচরী, ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
জনু আন কাজে, চলত বর রঙ্গিনী, ডাহিন বামেতে নাহি চায় ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৭১)

৬. বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী, হরতি দত্ত তিমির মতি ঘোরং।
স্ফূরদরধ সীধবে, তব বদনচন্দ্রমা, রোচয়তি লোচন চকোরং ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমণি দানং।

সপদি মদনানলো, দহতি মম মানসং, দেহি মুখ কমল মধুপানং॥[১]
(তাল : অষ্ট, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৭৪)

প্রোষিতভর্তৃকা

দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা।
প্রিয় সঙ্কীর্ত্তনং দৈন্যমস্যাস্তানবজাগরৌ।
মালিন্যমনবস্থানং জাড্যচিন্তাপয়ো মতাঃ ॥
যে নায়িকার নায়ক দূরদেশে অবস্থান করেন তাঁকেই 'প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা' বলে।[২]

---

১. দ্রষ্টব্য : অষ্টতাল অর্থাৎ পরপর আটটি তালে উপর্যুক্ত পদটি হাওয়া হয়। আটটি তাল হলোঃ আড়, দোজ, যতি, শশিশেখর, গঞ্জন, পঞ্চম, রূপক, সম।
২. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৬২, ৩২

সংস্কৃতের 'প্রোষিত' শব্দটি বাংলায় প্রবাসগত বা প্রবাসী অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার প্রিয়তম প্রবাসে অবস্থান করে থাকেন। ব্রজলীলায় রাধার যে বিরহ তা জগৎশ্রেষ্ঠ প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার লক্ষণাক্রান্ত। লীলাবিস্তারে প্রবাসের স্তর দুইটি।

ক. নিকট প্রবাস
খ. দূর প্রবাস

ব্রজলীলায় কৃষ্ণের নিকট প্রবাস প্রভাস বা অন্যান্য স্থানে স্থিতি আর দূর প্রবাস হলো মথুরা বা অন্যান্য স্থানে স্থিতি। কৃষ্ণ যখন মথুরায় অবস্থান করেন, সেই অবস্থানজনিত রাধার যে বিরহ, তা 'মাথুর লীলা' নামে পরিচিত। মাথুর লীলায় বিরহজর্জরিত রাধার আটটি লক্ষণ, যথাঃ দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অস্বাস্থ্য, জাড্য, চিন্তা এবং প্রিয়সংকীর্তন। প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার দশম দশা। বিরহসন্তাপে জর্জরিত রাধার মনস্তত্ত্বে তখন কান্তদর্শনজনিত লালসা, কান্তের আগমনে বিলম্বহেতু উদ্বেগ, নিদ্রাহীন ও নিরন্তর নিশিযাপন, বিচ্ছেদজনিত ভাবনায় শরীরের ভগ্নদশাপ্রাপ্তি, দৈহিক জড়তা, নিরবিচ্ছিন্ন ব্যাকুলতা, সারা দেহে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ, মোহগ্রস্ত অবস্থাপ্রাপ্তি, সমাজ জীবনে তীব্র উন্মত্ততা এবং প্রিয়তমের বিচ্ছেদজনিত বেদানয় মৃত্যুসম অবস্থা প্রাপ্তির লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

১. নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
ডুবল ভকত সব শোকের সায়রে ॥ ...
(তাল : সোম, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৩১১)

২. আজু বিরহভাবে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভূমে গড়ি কান্দে বোলে কাঁহা প্রাণেশ্বর ॥

পুন মূরাছিত ভেল অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে হয় বড় ত্রাস ॥
উচ্চ করি ভকত করয়ে হরি বোল।
শুনিয়া চেতন পাই আঁখি ঝরু লোর ॥
ঐছন হেরইতে কান্দে নরনারী।
রাধামোহন মরু যাই বলিহারি।
(তাল: বড় দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৩১১)

৩. নিরমল গোরা তনু, কষিত কাঞ্চন জনু, হেরইতে পড়ি গেনু ভোর।
ভাঙ ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মনে, অন্তর কাঁপায়ে মোর ॥
সজনি যব হাম পেখলু গোরা।
আকুল দিগ, বিদিগ নাহি পাইয়ে, মদন লালসে মন ভোরা ॥ ...
(তাল : বড় দশকেশী, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৫)

ব্রজলীলা

১. কহিতে কহিতে ধনি মূরছিত ভেল।
আই সহচরী কোর পর নেল ॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ ক্ষীণ বহে শ্বাস।
নাসাগ্রাতে তুলা ধরি দেখয়ে নিশ্বাস ॥
শ্রবণে বদন দেই কহে কৃষ্ণ নাম।
চেতন পাইয়া কহে কাঁহা ঘনশ্যাম ॥ ...
(তাল : দাসপ্যারী, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৩১৫)
২. অপরূপ তুয়া মুরলি ধ্বনি।/ লালসা বাড়াল শব্দ শুনি ॥
কিরূপে এরূপ দেখিয়া সেহ। / উদবেগে ধনি না ধরে দেহ ॥
জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন। / অসিত চান্দের উদয় দিন ॥
জড়িত হৃদয়ে ঝরায় স্বেদ। / অতি বেয়াকুল করয়ে খেদ ॥
পাণ্ডুর বরণ বিয়াধি-বাধা। / মূরছি নিশ্বাস হরল রাধা ॥
অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়। / গোকুল-মঙ্গল সভাই গায় ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন হে শ্যাম। / জীবন-ঔষধি তোহারি নাম ॥
(তাল : দুঠুকী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৪০৫)

স্বাধীনভর্তৃকা

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়া-কুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥
কান্ত যে নায়িকার অধীন হয়ে সতত তাঁর সমীপে অবস্থান করেন, সে নায়িকাই 'স্বাধীন ভর্তৃকা'।[১]

স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার নিকট স্বীয় কান্ত অবস্থান করেন এবং প্রেমময় কান্ত নিজ হাতে নায়িকার মনঃপূত বেশ, ভূষণ, অলঙ্কার, সজ্জা ইত্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন। এক্ষেত্রে নায়ক নায়িকার আনন্দবিধানহেতু তাঁরই আদেশে বনক্রিয়া, জলক্রিয়া, কুসুমচয়ন ও ফুলশয্যা প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি কর্ম সম্পাদন করে থাকেন।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

ভাবাবেশে গৌর কিশোর।
স্বরূপের মুখে শুনি, মানলীলা দ্বিজমনি, ভাবিনীর ভাবেতে বিভোর ॥ ...
(তাল: দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৬৩)

---

১. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৬৯, ৩৩

ব্রজলীলা

১. চিরণী নিরখি, চমকি ঘন পুলকিত, কাজরে কাঁপয়ে কান।
হেরইতে সিন্ধুর, লোরে সিনায়ল, কি করব বেশ বনান ॥
এ সখি সোঙরিতে মঝু মন ঝুরে।
নিয়ড়হি গোরি, নাহ ভেল তৈছন, কিয়ে জানি হোয়ত বিদূরে ॥ ...
কিরে বিহি রাইক, প্রেম দেই নিরমিল, রসময় নাগর শ্যাম।
কনক মুঞ্জরী, রতি মুঞ্জরী রোয়নে, রোয় বলরাম ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৬৩)

২. রাই মুখপঙ্কজ, কুমকুমে মাজল, বসনহি পুলক আগোর।
নিরমিতে সিন্দুর, যতনে নিবারই নিঝরই নয়নক লোর ॥
এ সখি চতুর শিরোমণি কান।
নিরমজি উনমজি, আরতি সায়রে, করতাহি বেশ নিরমাণ ॥ ...
(তাল: দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৫৮)

৩. হরি নিজ আঁচরে, রাই মুখ মোছই, কুমকুমে তনু পুনঃ মাজি।
অলকা তিলক দেই, সিঁথি বনায়ই, চিকুরে করবী পুনঃ সাজি ॥
সিন্দুর দেয়ল সিঁথে।
কতহুঁ যতন করি, উরপর লেখই, মৃগসদ চিত্রক পাঁতে ॥
মণি মঞ্জীর, চরণে পরায়লি, উরপর দেয়লি হার।
কর্পূর তাম্বুল, বদন ভরি দেয়লি, নিছই তনু আপনার ॥
নয়নক অঞ্জন করল সুরাঞ্জন, চিবুকহি মৃগমদ বিন্দু।
চরণকমল-তলে, যাবক লেখই, কি কহব দাস গোবিন্দ ॥ ...

(তাল : একতালা/ লোফা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৫৯)

বৈষ্ণব পদাবলির রসপ্রকরণে উপর্যুক্ত অষ্ট নায়িকার রসবর্ণণা ও তার লক্ষণ মূল আলোচ্য বিষয়। কীর্তনে এই আট নায়িকার রসবর্ণনার লক্ষণ গীত হয়ে থাকে। এছাড়া আরও রসলক্ষণাক্রান্ত বিষয় রসপ্রকরণের মধ্যে ধরা হয় এবং কীর্তন গানের সূত্রে তা প্রচারিত হয়ে থাকে।

প্রেমবৈচিত্ত্য

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্য মুচ্যতে ॥
প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবে প্রিয়তমের সন্নিকটে থেকেও বিরহ-ভয়ে যে আর্তি, তাই-প্রেমবৈচিত্ত্য।[১]

---

১. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭, পৃষ্ঠা-৩২৪, ১৪৭

বৈষ্ণব রসিক মহাজন ও আলংকারিকেরা প্রেমবৈচিত্ত্যকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বা বিরহের একটি বিশেষ ভাব হিসেবে প্রকাশ করেছেন। মূলত কৃষ্ণপ্রেমের নিতান্ত সূক্ষ্মতাকে এবং চির অতৃপ্ততাকেই রসপর্যায়ভুক্ত প্রেমবৈচিত্ত্য অংশে বিধৃত করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের মিলন সংগঠিত হয়েছে, কৃষ্ণ রাধার সন্নিকটেই আছেন, তবুও মনে হচ্ছে এ মিলন ক্ষণিকের, তাতে যেন রাধা-অন্তরে বিরহকেই ঘনীভূত করে তুলেছে। রাধা যেন কৃষ্ণ-অন্তর থেকে বাইরে বিনির্গত হয়ে পড়েছেন। প্রত্যাশা তাই অধিক; বিরহের মধ্যেই পুর্নমিলনের তীব্র প্রতিধ্বনি।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

হরি হরি গোরা কেন কান্দে।
নিজ সহচরগণ, পুছই কারণ, হেরইতে গোরামুখ চান্দে ॥
অরুণিত লোচন, প্রেমভরে ভেল দুন, ঝর ঝর ঝরে প্রেম বারি।
যৈছন শিথিল, গায়নি মতিফল, খসি পড়ে উপরি উপরি ॥
সোঙরি বৃন্দাবন, নিশা সই পুনঃ পুন, আপনক অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে মারি, রাই রাই করি, অবনী পড়ল মূরছিয়া ॥
তহি প্রিয় গদাধর, ধরিয়া করল কোর, কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া
পুনঃ অট্ট অট্ট হাসে, জগজন মন তোষে, বাসু ঘোষ মরম বুঝিয়া॥ ...
(তাল : সোম, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৫০)

ব্রজলীলা

১. রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর ॥
জানলুরে সখি প্রেম আগেয়ান।

নাগর কোরে নাগরী নাহি জান ॥
মূরছিল নাগর মূরছিল রাই।
বিরহে বেয়াকুল কূল না পাই। ...
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৫১)

২. শ্যামক কোরে, যতনে ধনি শুতলি, মদন মদালসে ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন, জনু কাঞ্চন মণি জোর,
কোরহি শ্যাম, চমকি ধনি বোলত, কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ, কবহু মঝু মিটব, অমিয়া করব সিনান ॥ ...
(তাল : দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৫০)

৩. রাধা মাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
তনু তনু সরস, পরশ রস পিবই, কমলিনী মধুকর রাজ ॥
সচকিত নাগর, কাঁপই থর থর, শিথিল কয়ল সব অঙ্গ।
গদ গদ কহয়ে, রাই ভেল অদরশ, কবে হোয়ব তছু সঙ্গ ॥ ...
(তাল : দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৫১)

ঝুলন

বৃষভানুপুরে শ্রাবণী শুক্লা তৃতীয়া হতে পূর্ণিমা পর্যন্ত শ্রীরাধা নিত্যকর্ম সমাপন-অন্তে নন্দালয়ে গমন করেন। সেখানে রন্ধন-ভোজন শেষে যোগপীঠ-মিলন-লীলা সংগঠিত করে বৃষভানুপুরে গমন করে বিশ্রামান্তে সূর্য পূজার নৈবেদ্য প্রস্তুত এবং সখী সহযোগে বেশভূষা সম্পন্ন করে ঝুলা-খেলা করার নিমিত্তে বর্ষণার নৈঋত কোণে অবস্থিত 'কদম্বখণ্ডিতে' গমন করেন। শ্রীমতিরাধারাণী ও গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলা-খেলাই 'ঝুলন' পর্যায়ের রসময় কীর্তন। রসের প্রধানত আট প্রকরণের বাইরে ঝুলন লীলা হলেও বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনে বা তার রসময়তায় এই লীলাকে আমরা প্রকরণের মধ্যে যুক্ত করার পক্ষপাতী। রসের প্রবহমানতায় এই লীলার সৌকর্য বস্তুত রসপ্রকরণের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে থাকে। কারণ, পূর্বোক্ত মূল আটটি প্রকরণের মধ্যে লীলাবিস্তারে যে রসের সঞ্চার হতে দেখা যায়, আলঙ্কারিকেরা যাকে পূর্ণ রসপর্যায়ভুক্ত করেছেন; কিন্তু এই ঝুলন লীলার রসভাষ্য যথার্থ অনুধাবন করলেও তার বিষয়ভাবে ও রসবিস্তারের ক্ষেত্রে আমাদের একই অনুভব হয়ে থাকে। সুতরাং, আমরা যৌক্তিকভাবে ঝুলন-পর্যায়কে রসপ্রকরণের মধ্যে প্রয়োগ করার প্রয়াস পেয়েছি। চৈতন্যকৃপাধন্য বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা প্রথাগতভাবে আলঙ্কারিক দর্শনের দৃষ্টিতে রসপ্রকরণের ধারায় অষ্টনায়িকার রসবিন্যাসই করেছেন। 'ঝুলন' বা এ জাতীয় অন্যান্য রসময় লীলাকে নায়িকার রস বিন্যাসের তালিকাতে আনেননি। সংস্কৃত অলঙ্কারে অষ্ট নায়িকার যে রসরূপ তা এসব লীলাতেও দুর্লক্ষ্যণীয় নয়। এ-পর্যায়ে ঝুলন লীলার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের কিছু দিক উল্লেখ করছি।

বৃষভানুমহারাজ নির্মিত রত্নময় হিন্দোলায় সখীপরিবৃতা শ্রীরাধা। উৎকণ্ঠিতা নায়িকার মতো শ্রীকৃষ্ণের আগমন-পথপানে চেয়ে রয়েছেন। লীলার এ-স্তরে মাধুর্যময় দিক হচ্ছে প্রতীক্ষায় আক্ষেপরতা রাধার

'মনতৎপরতা'! পূর্বসঙ্কেত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের হাতে ধেনুবৎস ও গোপরাখালদের সমর্পণ করে ঝুলন স্থানে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করে বিভিন্ন বিলাস উপভোগ করেন এবং তাঁরা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে ঝুলন বেদিতে অধিষ্ঠান করেন। অষ্টসখী পরিবৃত হয়ে বৃন্দাদেবীর পুষ্পারতিতে এই মাধুর্যময় লীলার কার্য সম্পন্ন হয়। এই লীলার মধ্যেও প্রতীক্ষা, উৎকণ্ঠা, অভিসার মিলনোৎকণ্ঠা, মান, মিলন প্রভৃতি বিষয় যথাযথ পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত লীলার বর্ণনায় অর্থাৎ কীর্তন গানের মাধ্যমে 'কিলকিঞ্চিৎ' ভাবের প্রকাশ ঘটে থাকে। এ-হচ্ছে পূর্ণ আনন্দ আস্বাদনের হেতু। এই আস্বাদনে ভাবের ক্ষেত্রে সাতটি লক্ষণ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। পর্ব, অভিলাষ, হাস্য, রোদন, অসূয়া, ভয় এবং ক্রোধ–এই সাতটি লক্ষণ একই সাথে বা কয়েকটি লক্ষণ সমন্বিতভাবে নায়িকার মধ্যে প্রকাশিত হয়। কিলকিঞ্চিৎভাবযুক্ত লীলাও বস্তুত রসপ্রকরণেই পর্যায়ভুক্ত।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর। সুরধনী তীরে, গদাধর সঙ্গহি, চাঁদনী রজনী উজোর ॥
মাহ শাওন, গগনে ঘোর গরজন, নলপিত দামিনী মাল।
বরিখত বারি, পবন মৃদু মন্দহি, গঙ্গা তরঙ্গ বিশাল ॥ ...
বৈঠল গৌর বামে প্রিয় গদাধর, ঝুলন রঙ্গে রসে ভাস।
সহচর মেলি, ঝুলায়ত মৃদু মৃদু, দোলা ধরিয়া চৌপাশ। ...
(তাল : তেওট, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১৩৯)

ব্রজলীলা

১. বৃষভানুনন্দিনী, নব অনুরাগিনী, তুরিতে করল অভিসার।
সঙ্গিনী, রঙ্গিণী, প্রেম তরঙ্গিণী, মন্দির হই বাহার ॥
চলইতে চরণ, নূপুর তহিঁ বোলত, সুমধুর রসাল।
হংসে গমন ধনী, আওল বিনোদিনী, সখীগণ করি সেই সাথ ॥ ...
(তাল : তেওট, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১৪০)

২. ঝুলত শ্যাম, গৌর বাম, আনন্দ রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষৎ হসিত রভস কেলি, ঝুলায়ত সব সখিগণ মেলি, গাওত কত ভাঁতিয়া ॥ ...
(তাল : লোফা, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১৪১)

৩. ঝুলে ঝুলে বিনোদিনী, আরে ও বিনোদিয়া।
যব দুইঁ নিজ পদে চলে হিঁডোর।
সখি নাহি ঝুলায়ত তেজল ডোর ॥
হেরইতে দুহুঁ দোহার নয়ন বিভঙ্গ।

দুহুঁ তনু মুকুরে হেরই দুহুঁ অঙ্গ ॥ ...
(তাল : দোঠুকি, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১৮৩)

৪. ঝুলনা হইতে নামিল তুরিতে, রসবতী রসরাজ।
রতন আসনে, বসিয়া দুজনে, রতন মন্দির মাঝ ॥
সুচামর লেই, বীজন বীজই, সেবা পরায়ণা সখী।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে, বসনে মোছায় আঁখি।
কুসুম তলপে, অলপে অলপে, বসিলা রাধিকা-শ্যাম।
অলসে ঈষৎ, নয়ন মুদিত, হেরিয়া মোহিত কাম॥ ...
(তাল : দশকোশী, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১৪৫)

বস্তুত বৈষ্ণবপদাবলি কীর্তনে বহিরঙ্গে থাকে ব্যবহারিক তত্ত্ব আর অন্তরঙ্গে থাকে অনুভব-জারিত রস। কীর্তনীয়া-শ্রোতার অনুভব তত্ত্বের রসরসায়নে কীর্তন হয়ে ওঠে মাধুর্যমণ্ডিত রসের ভাণ্ডার। সুতরাং রসের বিন্যাসে, অনুভবে, বিকারে এবং উপলব্ধিতে রসময়তার মূল সূত্র হচ্ছে – নামী-নামী অভেদ হয়ে ওঠা; মহাভাবস্পর্শে রসের বোধনে প্রেমের অপূর্ব নির্যাস আস্বাদন করা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পরিচয়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পরিচয়

চৈতন্যদেবের অনুগামী আচার্যগণ কর্তৃক প্রবর্তিত লীলাচক্রের স্মরণকালই অষ্টকালীয় নিত্যলীলা। অষ্টকাল, যথা : প্রাতঃ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়ং, প্রদোষ, মধ্যরাত্রি ও নিশান্ত।[১] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এ-বিষয়ে অভিমত :

> শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মতানুবর্তী আচার্যগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ মনন জন্য যে লীলা ক্রমের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই অষ্টকালীয় নিত্যলীলা নামে পরিচিত।[২]

নিত্যলীলা এই অর্থে ব্যবহৃত ‘ যে, নিত্যলীলাদি প্রকটনের মধ্য দিয়েই বা প্রকটনের সূত্র ধরেই ভক্তগণের প্রতি ভগবান নিত্যই অনুগ্রহ করে থাকেন। এই অনুগ্রহজনিত সুখ লাভ হয় প্রাকৃত পরিবেশে অপ্রাকৃত লীলা স্মরণ ও মননের মধ্য দিয়ে। লীলাস্মরণ-মননের মধ্যেই ভক্তকুল অপ্রাকৃত আনন্দরাজ্যে প্রবেশ করেন এবং গুরুর করুণায় সিক্ত হয়ে আনন্দের পূর্ণমুরতিতে আস্বাদন করেন অপূর্ব লীলামধুরিমা। এই লীলাস্মরণ তখনই পূর্ণতা পায় যখন ভক্তের অন্তরে ভক্তিঅঙ্গের যাজন পরিপূর্ণ হয়। লীলা অনন্ত এবং তার গতি নিরন্তর। শুধু বৃদ্ধি আছে, হ্রাস নেই। গতির বাঁকে বাঁকে পূর্ণায়ত আস্বাদনের তৃপ্তি আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু তৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষাজনিত অতৃপ্তি নেই। এই-ই ভোগ আস্বাদনের চরমতম মাত্রা এবং তা ক্রমবর্ধনশীল, অর্থাৎ স্পৃহাবৃদ্ধি যত, আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষাজনিত স্পৃহাও তত। এই অনুগ্রহই নিত্যলীলার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অষ্টকালীয় অর্থাৎ আটটি কালে বা সময়ে রাধাকৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক গান স্মরণ করা হয়। এই স্মরণের বিষয়ই লীলামৃতে স্বরূপতত্ত্বের অপূর্ব কথন।

অপ্রাকৃত লীলা বলতে বোঝায় মায়াতীত কোন নির্দিষ্ট লোকে প্রকটিত নিত্যলীলা। এই লোক হচ্ছে – বৈকুণ্ঠলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায় ‘কৃষ্ণলোক’। কৃষ্ণলোক ত্রিধারায় বিন্যস্ত – গোকুল, দ্বারকা ও মথুরা। গোকুল অর্থে – গোলক, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন। এই ত্রিলোকেই ঘটে নিত্য অপ্রাকৃতলীলার স্থিতি। যেমন : বৈকুণ্ঠলীলায় দেখা যায় পুত্ররূপী ভগবানকে মা যশোদা রজ্জু দিয়ে আবদ্ধ করেছেন, রুষ্ট হয়ে ভর্ৎসনা করছেন। বাৎসল্য প্রেমরসের এক অপূর্ব নিদর্শন এতে প্রকাশিত হলো। আবার গোকুলের রাখাল বালক শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি সখাবৃন্দ ভগবানকে সখারূপে ভেবে তাঁর স্কন্ধে আরোহন করেছেন, গোচারণে সর্বোচ্চ সখাসুলভ আচরণ করেছেন, এমনকি উচ্ছিষ্টও খাইয়েছেন। গোকুলবাসীগণ ভগবানরূপী কানাই বা কৃষ্ণকে প্রিয় হিসেবে জেনেছেন, ভালোবেসেছেন, মান-অভিমান করেছেন আবার রাধা তাঁর ভগবানরূপী প্রাণবন্ধুর প্রতি মান করেছেন এবং রুষ্ট হয়ে তীব্র ভর্ৎসনাও করেছেন। এই যে লীলার সংগঠন সেখানেই রয়েছে লীলারসের উৎকর্ষতা। এই সংগঠনে রয়েছে লীলার চমৎকারিত্ব ও বিবিধ প্রকরণে তার বহিঃপ্রকাশ। যেমন : বৈকুণ্ঠলীলা অপেক্ষা ব্রজলীলার উৎকর্ষ ভিন্নতর। কারণ, এই লীলায় শুধুমাত্র ভক্তিই একমাত্র মুখ্য, অন্যসব গৌণ। ব্রজলীলা ভক্তিময়. প্রেমময় ও সর্বার্থ প্রেমময় লীলা। এই প্রেমের কার্যকারণ – নির্মল রাগসমৃদ্ধ রস এবং রসের হেতু মাধুর্য আস্বাদন, নেপথ্যের বিষয় – কৃষ্ণসুখ সম্পাদন। আত্মেন্দ্রিয় বাঞ্ছা নয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই মুখ্য।

---

১. শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, (?) কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৩২৬

২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৬৭

এই মুখ্য বিষয় অর্থাৎ ধাম বৃন্দাবনে প্রকটিত লীলাই বৈষ্ণব ভক্ত-হৃদয়ে আস্বাদিত হয়ে থাকে বিভিন্ন ও বিচিত্র অনুধ্যানে। উল্লিখিত বিষয়ই অষ্টকালীয় নিত্যলীলায় প্রকাশিত হয়ে থাকে কীর্তনের মধ্য দিয়ে। রাধাশ্যামের অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করার পূর্বে শিষ্টাচার পরম্পরায় কীর্তন-সাধকের গৌরাঙ্গের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ অবশ্য কর্তব্য। কীর্তনের পরিভাষায় যাকে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয়ে থাকে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর *শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্* গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় নিত্যলীলার সূত্র উল্লেখ করেছেন :

> রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎস্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
> পূর্বাহ্নে স্বগণৈর্লসত্যুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
> যঃ পুর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেহথাঙ্গনে
> শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু ॥
>
> অর্থাৎ, নিশান্তে যিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন, প্রভাতে সুরধনীতে গিয়া স্নান করেন, পূর্বাহ্নে নিজ জনগণসহ হরিনাম-সঙ্কীর্তনে নিমগ্ন থাকেন, মধ্যাহ্নে ভক্তগণসহ সুরধনীতীরস্থ উপবনে কৃষ্ণকথালাপসহকারে বিরাজ করেন, অপরাহ্নে নগর ভ্রমণ করিয়া নিজ ভবনে গমন করেন। সায়ংকালে স্বগৃহে ভোজনানন্তর প্রাঙ্গণে উপবেশন করেন, প্রদোষে এবং নিশীথে শ্রীবাসের গৃহে হরিনাম-সঙ্কীর্তন করিয়া নিশাশেষে নিজ শয়ন মন্দিরে গিয়া শয়ন করেন, সেই শ্রীগৌর-ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করুন।[১]

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর *পদাবলী পরিচয়* গ্রন্থে অষ্টকালীয় নিত্যলীলার সময় প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রীগোবিন্দলীলামৃত* গ্রন্থ হতে - নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়ং, প্রদোষ ও নক্ত এই আটটি কাল উল্লেখ করেছেন। এই আটটি কালের মধ্যে প্রভাত, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নকে দিবাভাগের মধ্যে এবং সায়ং, প্রদোষ, নক্ত ও নিশান্তকে রাত্রিকালের অন্তর্গত করেছেন এবং প্রতিটি লীলাকালের পরিমাণ ছয় দণ্ডকাল এবং মধ্যাহ্ন ও নক্ত লীলার সময় বারো দণ্ড কাল বলে উল্লেখ করেছেন।[২] এই আটটি কালে লীলার বিষয়বস্তু নির্ধারিত। যথা:

নিশান্ত

নিশান্তে থাকে রাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য বৃন্দা কর্তৃক শুক-সারী প্রেরণ, উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ। এইই নিশান্ত লীলা যার মধ্যে আরো থাকে, গৃহে গমন ও স্ব স্ব শয্যায় শয়ন। এই লীলাটি কীর্তনে 'কুঞ্জভঙ্গ' নামে পরিচিত। নিশান্ত লীলার (নবদ্বীপ লীলা ও ব্রজলীলা) সময়কাল ৬ দণ্ড, অর্থাৎ রাত ৩ টা ৩৬ মিনিট হতে ভোর ৬টা পর্যন্ত।

---

১. শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীভৃগুনাথ মিশ্র সম্পাদিত, *শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্*, জীব, বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৪-৫

২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৬৬-৬৯

নবদ্বীপলীলার বিষয়ভাব

রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদিনিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ তাম্ ।
গত্বান্যত্র ধরাসনোপরি বসন্ স্বদ্ভিঃ সুধৌতাননো
যে মাত্রাদিভিরীক্ষিতোহতিমুদিতস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥

অর্থাৎ, রজনী শেষে কোকিল-কুক্কুটাদি-পক্ষিগণের কলধ্বনি শ্রবণ-পূর্বক নিজ শয্যা হতে উত্থিত হয়ে মধুর রসপরিহাস-সম্ভাষণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সন্তোষ-বিধান করেন এবং অন্যত্র গমনপূর্বক ধরাসনে উপবেশন করে ভক্তগণ প্রদত্ত সুন্দর সলিলে মুখচন্দ্র সুধৌত করেন, সেই সময়ে শ্রীশচীদেবীসহ গুর্বঙ্গণাগণ স্নেহভরে নিরীক্ষণ করতে থাকেন, এরূপে সেই অত্যানন্দযুক্ত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমি হৃদয়মধ্যে চিন্তা করি।[১]

সুরধনীবেষ্টিত নবদ্বীপ ধামে গৌরাঙ্গের আলয়। তাঁর আলয়ের ঈশান কোণে শ্রীবাস-এর আলয়। এর মধ্যে রয়েছে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং গৌরাঙ্গ ও শ্রীবাসের সজ্জিত মণ্ডপ। রজনীতে উপর্যুক্তগণ নিজ নিজ মণ্ডপে শয়ন করলেন একই সাথে পরিকরবৃন্দও (গদাধর, হরিদাস, স্বরূপ দামোদর, আট মোহন্ত, নরহরি সরকার, মুরারী গুপ্ত, রূপ-সনাতনসহ অষ্ট গোস্বামী, বীরচন্দ্র, রামদাস, উদ্ধারণ দত্ত, অচ্যুতানন্দ, যদুনন্দন প্রমুখ) শয়ন করেছেন। নিশান্তের সময় শ্রীবাস-উদ্যানের শোভা অপূর্ব হয়ে উঠলো। গৌরাঙ্গ সাধক সেবাসম্ভার নিয়ে আয়োজন সুসজ্জিত করে রাখলেন। ইতোমধ্যে গৌরাঙ্গের বৃন্দাবনের মধুর স্মৃতিতে প্রেমাবেশ হলো। তাঁর আবেশে মহাভাবের ছটায় ব্রজনিকুঞ্জের রাধামাধবের শয়ন-রূপ ফুটে উঠলো। বহুরূপমাধুর্যময় সেই অপ্রাকৃত শয়ন-রূপ নবদ্বীপে প্রকটিত হতে লাগল। স্বর্ণখাঁচায় শুক-সারীর ন্যায় দৃশ্যমান অনেক পাখির কূজনে তখন নিশার অন্ত। শুকের উক্তিতে গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ আরও প্রকট হয়ে উঠলো। এ-অবস্থায় শ্রীরূপ গোস্বামী ব্রজনিকুঞ্জের রাধাকৃষ্ণের নিশান্তলীলার পদ গাইতে লাগলেন। পদের রসময়তায় গৌরাঙ্গের মধ্যে রাধাভাবের আবেশ হলো এবং তিনি ব্রজলীলায় আবিষ্ট হলেন।

কীর্তনীয়াগণ নিম্নোক্ত পদগুলো আসরে পরিবেশন করে থাকেন। (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত)

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

ক.	শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন-মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শেজ অতি মনোহরে ॥
অলসে অবশ তনু গোরা নট রায়
কি কহিব সে না শোভা কহনে না যায় ॥
মেঘের বিজুরি কিবা ছানিয়া যতনে।
কত রস দিয়া বিধি কৈল নিরমানে ॥
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিশে
বাসুদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে ॥
(তাল : সোম, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৫২)

১. শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীভৃগুনাথ মিশ্র সম্পাদিত, *শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্*, জীব, বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৫

খ. রজনিক শেষে, জাগি শচীনন্দন, শুনইতে অলি পিকু-রাব।
সহজহি নিজ ভাবে, গর গর অন্তর, তহি উঠু দ্বিতীয় বিভাব ॥
বেকত গৌর অনুভাব।
পুরুব রজনী শেষে, জাগি দুহুঁ যৈছন, উপজল তৈছন ভাব ॥ ...
(তাল : তেওট, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী, পৃষ্ঠা-২৫২, ২৫৩)*[১]

ব্রজলীলার বিষয়ভাব

রাধাকৃষ্ণ রাসবিলাস শেষে হেমাম্বুজকুঞ্জে শয়নে রয়েছেন।[২] নিশান্তকাল আগত হলে মঞ্জরীগণ নিশান্তের সেবা করতে লাগলেন। বৃন্দাদেবী যথাসময়ে জাগরিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের জাগরণের সময় চিহ্নিত করে পাখিগণকে কলকাকলি ধ্বনি করতে নির্দেশ দিলেন। সখীগণ রাধাকৃষ্ণের শয়ন মন্দিরে তাঁদের নয়ন অর্পণ করে তাঁদের মাধুর্যমণ্ডিত শয়নশোভা দর্শন করতে লাগলেন। সখী-বর্ণনায় রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব শয়ন-মাধুর্য প্রতিভাত হয়ে উঠলো। যুগলের অপূর্ব শোভাসিন্ধু দর্শন করে রসোদগারে ভাসলেন। শুক-সারী প্রবোধনী গীত গাইতে লাগল। রাধাকৃষ্ণের গাত্রোত্থান হলে পরস্পর পরস্পরের মাধুর্যরস আস্বাদন করতে লাগলেন এবং রূপমাধুর্য দর্শনে বিলাস-লালসায় উভয়েই অধীর উঠলেন। সখীগণ রাধাকৃষ্ণে বিলাসচিহ্ন দর্শন করে অপূর্ব আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। সখীগণের প্ররোচনা তথা অনুরোধে কৃষ্ণ রাধার বেশ রচনা করলেন, তাতে রাধার ভাবসমূহের প্রকাশ ঘটলো। কৃষ্ণ রাধার ভাবশাবল্য দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় সখীগণের কাছে রজনীবিলাসকালীন অপূর্ব মাধুর্যময় মুহূর্তের বর্ণনা করতে লাগলেন। সখী এবং মঞ্জরীবৃন্দ রাধাকৃষ্ণের মাধুর্যমণ্ডিত রূপমাধুরী দর্শন করে পরমানন্দে নৃত্য-গীতে মগ্ন হলেন।

ক. নিশি অবশেষে, জাগি সব সখিগণ, বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতি রস আলসে, শুতি রহুঁ দুহুঁ জন, তুরিতহি দেহ জাগাই ॥ ...
বৃন্দার বচনে সকল পক্ষীগণে, মধুর মধুর করু ভাষ।
মন্দির নিকটে, ঝারি লই ঠারহি, হেরত গোবিন্দ দাস ॥
(তাল : লোফা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৫৩)

---

১. আলোচ্য পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত পদগুলি শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা সম্পাদিত *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা, (?) ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৫, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *পদামৃতলহরী*, জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, কাঞ্চন বসু (সম্পাদিত) *বৈষ্ণব পদাবলী*, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৯৭; সতীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত) *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ থেকে সংকলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে উদ্ধৃত পদগুলিতে শুধু গ্রন্থ এবং পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

২. চির মধুর বৃন্দাবন অচিন্ত্য মহাযোগ পীঠ। প্রকট বৃন্দাবনের চারদিকে চারটি মণ্ডপ—মাধবী, মালতী, নবমল্লিকা এবং স্বর্ণযূথী। আবার চারটি কুঞ্জ চারপাশের চারটি কল্পবৃক্ষের অভ্যন্তরে—উত্তরে শ্বেতাম্বুজ কুঞ্জ (রাধাকৃষ্ণের পাশাক্রীড়ার স্থান), পূর্বে নিলাম্বুজকুঞ্জ (বেশভূষা গ্রহণের স্থান), দক্ষিণে অরুণাম্বুজকুঞ্জ (ভোজন গ্রহণের স্থান),

পশ্চিমে হেমাম্বুজকুঞ্জ (রাধাগোবিন্দের শয়নলীলার স্থান)। দ্র. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবা সদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৫-১০।

খ. জাগহ বৃষভানু নন্দিনী মোহন যুবরাজে।
অকরুণ পুনঃ বাল-অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদ বদন,
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদমীনক সদন সাজে ॥ ...
(তাল : বড় লোফা, *পদামৃতলহরী*, পৃষ্ঠা-১৮০)

গ. রাই জাগ রাই জাগ শুক সারী বলে।
কত নিদ্রা যাওহে কালো মাণিকের কোলে ॥
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে। ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীতরত্নাবলী*,পৃষ্ঠা-২৫৬)

ঘ. সময় জানি সখি মিলল আই।
আনন্দে মগন ভেল দুহুঁ মুখ চাই ॥
দুহুঁজন সেবন সখীগণ কেল।
চৌদিকে চাঁদ হেরি রহি গেল ॥
নীলগিরি বেড়ি কিয়ে কনকের মাল।
গোরিমুখ সুন্দর ঝলকে রসাল ॥
বানরী রব দেই কক্‌খটি নাদ।
গোবিন্দ দাস কহ শুনি পরমাদ ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৫৭)

ঙ. হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মোছই, কুঙ্কুমে তনু পুনঃ মাজি।
অলকা তিলক দেই, সিঁথি বনায়ই, চিকুর কবরী পুনঃ সাজি ॥ ...
কর্পূর তাম্বুল, বদন ভরি দেওলি, নিছই তনু আপনার ॥
নয়নক অঞ্জন, করল সুরঞ্জন, চিবুকহি মৃগমদ বিন্দু।
চরণ-কমল তলে, যবক লেখই, কি কহব দাস গোবিন্দ ॥
(তাল : মধ্যম দশকোশী, *পদামৃতলহরী*, পৃষ্ঠা-১৮২)

ব্রজনিকুঞ্জে সখীগণ রাধাকৃষ্ণের আরাত্রিক সম্পন্ন করে নৃত্য-কীর্তনে বিভোর হয়ে রইলেন। রজনী শেষে প্রভাত হয়ে এল। শঙ্কিতা বৃন্দাদেবী রাধাকৃষ্ণকে স্বগৃহে প্রেরণের জন্য শুভা নামের সারীকে ইঙ্গিত প্রদান করলেন। সারীর বাক্যে রাধা-হৃদয় বিরহানলে দগ্ধ হতে লাগল। অতঃপর কৃষ্ণ রাধার নীল রঙের উত্তরীয় বক্ষে ধারণ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাধাও কৃষ্ণের পীত উত্তরীয় ধারণ করে ফিরে আসলেন। পরস্পরের বিচ্ছেদ ভয়ে সাতিশয় মলিন হয়ে পড়ল রাধাবল্লভের বদনকমল। গৃহে ফিরে রাধার সখীবৃন্দ

নানান সেবায় তাঁকে শয্যায় শয়নের নিমিত্তে নিয়ে এলেন। কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলিতা রাধা কৃষ্ণের অদর্শনজনিত বিরহ বুকে ধারণ করে শয়ন করলেন।

প্রাতঃলীলা

প্রাতঃসর্গে থাকে প্রভাতকালীন লীলা, নন্দালয়ে পৌর্ণমসীর আগমন, রাধার নিদ্রাভঙ্গের জন্য নানাবিধ প্রয়াস, কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য নানাবিধ প্রয়াস, কৃষ্ণাঙ্গে নীলবসন ও ক্ষতচিহ্ন দেখে মাতা যশোদার বিলাপ, কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ, রাধার নিদ্রাভঙ্গ। সখাগণের উক্তি-প্রত্যুক্তি; কৃষ্ণের স্নানাদি সমাপনান্তে সখাগণের সাথে ভোজন ও গোচারণের জন্য গোষ্ঠে গমনের প্রস্তুতি ও গমন। উল্লেখ্য এই লীলাটি ‘রসোদ্‌গার’ হিসেবে পরিচিত এবং প্রাতঃকালীন সময়ে কীর্তনীয়াগণ গেয়ে থাকেন।

প্রাতঃলীলার সময়কাল : নবদ্বীপ ও ব্রজলীলা ৬ দণ্ড অর্থাৎ প্রাতঃ ৬ টা হতে সকাল ৮:২৪ মিনিট পর্যন্ত।

লীলার বিষয় : জাগরণ ও রসোদ্‌গার। সম্ভোগলীলার পরে কেলিকুঞ্জের বিলাস-বৈভবের ‘বিষয়’ প্রিয়জনের নিকট অনুবাগের সাথে প্রকটনের নাম রসোদ্‌গার। এটি একটি বিশেষ লীলা। নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ – এই উভয়ের মধ্যেই রসোদ্‌গার সুচিত হয়ে থাকে। চার প্রকার সম্ভোগ। যথা: সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সমান্ন এবং সমৃদ্ধিমান – সম্ভোগের পরে রসোদ্‌গারও চার প্রকার হয়ে থাকে।

নবদ্বীপলীলার বিষয়ভাব

> প্রাতঃ স্বঃ সরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রসূনাদিভি –
> স্তাং সংপূজ্য গৃহীত-চারুবসনঃ স্রক্‌চন্দনালঙ্কৃতঃ।
> কৃত্বা বিষ্ণু-সমর্চ্চনাদি সগণো ভুক্তান্নমাচম্য চ,
> দ্বিত্রং চান্যগৃহে ক্ষণং স্বপিতি গুস্তং গৌরমধ্যোম্যহম্ ॥
> অর্থাৎ, যিনি প্রাতঃকালে স্বীয়পার্ষদগণে পরিবৃত হয়ে গঙ্গাস্নানে গমন করেন এবং গন্ধপুষ্পাদি উপচারে গঙ্গা-পূজা ও গঙ্গাস্তবপাঠাদি সমাপন করে কোনো এক সঙ্গী সেবকের থেকে দিব্য পট্টবাস গ্রহণ-অন্তে পরিধান করে স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং যিনি মাল্যচন্দনে শোভিতাঙ্গ হয়ে ‘শ্রীশ্রীদামোদর’ নামক শ্রীশালগ্রাম-শিলার্চন ও শ্রীতুলসী-সেবন করে স্বগণ-সহিত প্রসাদান্ন গ্রহণ করেন ও ভোজন শেষে আচমন-পূর্বক অন্য গৃহে গিয়ে দুই তিন ক্ষণ শয়ন করে বিশ্রাম করেন, আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে হৃদমধ্যে চিন্তা করি।[১]

প্রাতঃকালে ভগবতী শচীমাতা গৌরাঙ্গকে সংকীর্তনে বিক্ষত অঙ্গ দেখে অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন। বারবার বিলাপ ধ্বনি প্রকাশ পেতে লাগল! অতিশয় ব্যগ্রভাবে গৌর-তনু স্পর্শ করে বাৎসল্যময় অনুরাগের পুনঃপুনঃ লালন করতে করতে তাঁকে শয্যা হতে জাগরিত করলেন। সপার্ষদ গৌরাঙ্গের জাগরণ হলো। শ্রীবাস, মুরারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ গৌরসুন্দরের কুশল জিজ্ঞাসা করলে রাধাভাবে ভাবিত গৌর বিহ্বল হয়ে পড়লেন। স্বরূপ গোস্বামী গৌরবদন দর্শন করে অর্থাৎ ঐকান্তিক ভাব বুঝে রাধার জাগরণ, সখীবৃন্দের সাথে রসোদ্‌গার, বনগমনস্মৃতি প্রভৃতি বিষয়ক পদ গাইতে লাগলেন। কীর্তন শ্রবণে গৌরাঙ্গের শরীরে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হলো। রাধাভাবের পূর্ণতায় তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

কীর্তনীয়াগণ নিম্নবর্ণিত পদগুলো আসরে গেয়ে থাকেন। (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত)

১. শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীভৃগুনাথ মিশ্র সম্পাদিত, *শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্*, জীব, বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৪

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

ক. উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া উঠিল ॥
কোকিলার কুহুরব সুললিত ধ্বনি।
কত নিদ্রা যাও ওহে গোরা গুণমণি ॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
শশধর তেজল কুমুদিনী বাস ॥
বাসুদেব ঘোষে কহে মনের হরিষে।
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের আলসে ॥
(তাল : দশকোশী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-১৭২)

খ. আরে মোর গৌর কিশোর।
রজনী বিলাস রস ভাবে বিভোর।
কহইতে গদগদ কহই না পার।
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার ॥
প্রেমালসে ঢুলুঢুলু অরুণ নয়ান।
কহইতে রস রহু বিরস বয়ান ॥
চকিত নয়নে পহু চৌদিশে নেহারে।
চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে ॥
কি আছে মনের কথা কহনে না যায়।
এ রাধামোহন পহু গোরা গুণ গায় ॥
(তাল : দশকোশী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৯২৭)

ব্রজলীলার বিষয়ভাব

প্রাতঃকালে যাবটে সখীগণ নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে রাধাকে জাগরিত করে তুললেন। প্রাতঃকালের যাবট নগরী অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে উঠছে। প্রকৃতির রূপময়তায় চার দ্বারে অপূর্ব শোভা বিরাজ করছে। রাধার লাবণ্যেই যেন বৃষভানুপুর শোভা-স্মরণীয় হয়ে উঠেছে। সখীগণ মুগ্ধ নয়নে রাধার শয়নশোভা দর্শন করতে লাগলেন এবং রাধাকৃষ্ণের লীলারূপ রসোদ্‌গারে ভাসতে লাগলেন। রাধার অঙ্গে পীত উত্তরীয় দেখে সখী মুখরা সন্দেহ পোষণ করলেন এবং পরিস্থিতি বুঝে সখী বিশাখা দ্রুত কিঙ্করী দ্বারা রাধা অঙ্গে নীল উত্তরীয় দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। ইত্যবসরে রাধা সখীগণের সাথে হাস্যপরিহাসে মেতে উঠলেন। শ্যামল সখীর আগমন ঘটলে রাধার কৃষ্ণবিরহ জাগলো। বিগত রজনী বিলাসের স্মৃতি

জেগে উঠলো মনমন্দিরে। ইতোমধ্যে সেখানে মধুরিকা সখীর আগমন ঘটলো এবং তিনি রাধা এবং অন্যান্য সখীর নিকট কৃষ্ণের জাগরণ বিষয়ের বর্ণনা দিতে লাগলেন। মাতা যশোদা নানান প্রিয়বাক্যে কৃষ্ণগোপালকে নিদ্রা থেকে জাগালেন। নন্দালয়ে সখাবৃন্দের আগমন ঘটলো। মাতা যশোদা কৃষ্ণদেহে নখক্ষতচিহ্ন এবং নীল উত্তরীয় দেখে ভীত ও বিস্মিত হলেন। মাতা স্বস্নেহে কৃষ্ণ-বলরামকে জাগিয়ে মুখ প্রক্ষালণশেষে মাখন-মিশ্রি ভোজন করিয়ে গোষ্ঠাভিমুখে গমনের প্রাসঙ্গিক আয়োজন সম্পন্ন করতে লাগলেন। রাধা প্রিয়বিরহের ক্ষণকালকে যুগসম মনে করতে লাগলেন। কৃষ্ণ পরমানন্দ-প্রদায়ী শ্রীরূপ-বিরহে অস্থির হয়ে উঠলেন। বিরহ-সন্তাপের মধ্য দিয়ে রাধা-অন্তর রসান্তরিতা হয়ে সখীগণসহ লীলারস আস্বাদন করতে লাগলেন এবং কৃষ্ণের পথ-অভিমুখে নয়নযুগলকে স্থির রাখলেন।

সখীগণের নানান সেবায় রাধার প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন হলো। সখীগণ কৃষ্ণবিরহিনী রাধার ভাবান্তর আনয়ন ঘটানোর জন্য ক্রীড়াবিহঙ্গমের সাহায্যে তাঁর সমুখে নানান ক্রীড়া করাতে লাগলেন। রাধা ক্রমেই রসান্তরিতা হয়ে সখীগণসহ পরমানন্দ অনুভব করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে রাধার স্নান ও শৃঙ্গার সম্পন্ন হলো এবং সখী হিরণ্যাঙ্গীর মুখে কৃষ্ণের স্নানাদির কথা শুনতে পেয়ে অপূর্ব আনন্দ লাভ করলেন। কৃষ্ণ-বলরামের স্নানাদি সম্পন্ন হলে মা যশোদা ও মা রোহিণী কৃষ্ণ-বলরামকে নানাভাবে প্রীত করলেন। সখাগণও মায়ের বাৎসল্য সেবা থেকে বঞ্চিত হলেন না। সখী ধনিষ্ঠার হাতে মা যশোদা রাধার জন্য স্নেহভরে মিষ্টান্ন পাঠালেন, যাতে ছিল কৃষ্ণাধরামৃত। রাধা ও সখীগণ পরমানন্দে সেই মিষ্টান্ন গ্রহণ করলেন। এদিকে কুন্দলতা রাধার শ্বাশুড়ি জটিলাকে যশোদা-সংবাদ প্রেরণ করলেন। মন্দরুচির জন্য গোপালকৃষ্ণ ভোজন করতে পারছেন না। জটিলা যেন রাধাকে নন্দালয়ে রান্না করতে পাঠায়। নানান আলোচনায় জটিলা রাধাকে নন্দালয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। কুন্দলতা-রাধার সংলাপে উৎকণ্ঠাভাব দূর হলো। জটিলা সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন এবং কুন্দলতা-রাধা নন্দালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কুন্দলতার সাথে রাধা নন্দালয়ে গমন করলে তাঁর সমীপে কৃষ্ণের মাধুর্য বর্ণনা করা হলো। রাধা ললিতার সাথে নন্দালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রাক্কালে অবগুণ্ঠণ টানার ছলে কৃষ্ণবদন এবং অঙ্গসুষমা দর্শন করলেন; কৃষ্ণও রাধার অমিয়রূপমধুরিমা দর্শন করলেন। সখী তুঙ্গবিদ্যা নন্দীশ্বরের শোভা বর্ণনা করতে লাগলেন। মাতা যশোদা রাধার প্রতি তীব্র বাৎসল্য প্রেম অনুভব করে তাঁকে স্বস্নেহে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে রন্ধনের আদেশ দিলেন। রন্ধনশালায় কৃষ্ণ রাধাকে দর্শন করলেন। রাধার রন্ধনশৈলীতে মাতা যশোদা ও রোহিণী পরম বিস্মিত হলেন এবং নানা উপচারে নারায়ণের ভোগ সম্পন্ন হলো। সখাসঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম ভোজন সম্পন্ন করলেন। মধুমঙ্গল পরিহাসরস পরিবেশন করতে লাগলেন এবং অভিনব রসসিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। রাধা-অদর্শনে কৃষ্ণের ভাববিকার দেখা গেল এবং ভোজানান্তে রাধা-কৃষ্ণ সখা ও সখী পরিবৃত হয়ে বিশ্রামে গেলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে রাধা-কৃষ্ণ যুগল গুপ্তকুণ্ডে গমন করলেন। নন্দীশ্বর পর্বতের উপত্যকায় অবস্থিত গুপ্তকুণ্ড রাধা-কৃষ্ণ স্পর্শে অপূর্ব শোভাময় হয়ে উঠল। গুপ্তকুণ্ড যোগপীঠে রাধা-কৃষ্ণের মিলন সংগঠিত হলো এবং মিলন অন্তে সখী ও মঞ্জুরীগণ রাধাকৃষ্ণের যুগল-সেবা করতে লাগলেন।

বাংলাদেশের কীর্তনের আসরে উপর্যুক্ত পালা-সংশ্লিষ্ট যে-পদগুলো গাওয়া হয় তার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত) :

ক. নিশি অবশেষে জাগি সব সখীগণ
বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতি রস আলসে শুতি রহল দুহুঁ
তুরিতহিঁ দেহ জাগাই ॥ ...
(তাল : সোম, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৬৯)

খ. ভগবতি আসি, ঘর মাঝে বসি, শয়নে দেখিয়া কান।
গায়ে হাত দিয়া, তারে জাগাইয়া, করাইল সাবধান ॥
সত্বরে উঠিয়া, তাহারে বন্দিয়া, নয়ান কচালে হাতে।
আশীষ পাইয়া, বাহির হইয়া, মিলিলা সখার সাথে ॥
যত দাসগণ, করিয়া যতন, ধোয়াইল মুখ চাঁদে।
দেখিয়া বদন, মরয়ে মদন, ফাঁপড়ে পড়িয়া কাঁদে ॥ ...
(তাল : লোফা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৩২৮)

গ. ভগবতী দেবী সময় সে জানি।
বাইক মন্দিরে কয়ল পয়ানি ॥
শুতলি দেখলি অতি বিপরীত।
গুরুজন বচন না মানয়ে ভীত ॥ ...
(তাল : লোফা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৩২৮)

ঘ. শ্যামলা, বিমলা, মঙ্গলা, অবলা, আইলা রাধিকা পাশে।
যদি স্বতন্ত্র, তথাপি বাধারে, পরাণ অধিক বাসে ॥
দেখি সুবদনী উঠিলা অমনি, মিলিলা গলায় ধরি।
কত না যতনে রতন আসনে বৈসয়ে আদর করি ॥ ...
হাস পরিহাসে, রসের আবেশে মগন হইল রাধা।
চণ্ডীদাসে কহে নিশির কাহিনী শুনিতে লাগয়ে ধাঁধা ॥[১]

ঙ. আজি কেনে তোমায় এমন দেখি। সঘনে তুলিছে অরুণ আঁখি ॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা। না জানি অন্তরে কি ভেল বেথা ॥
কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ। বহু পরমাদ তোহে কয়ল অনঙ্গ ॥
মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ। জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ ॥
(তাল : একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৪১০)

চ. হাম অবলা সখী কিয়ে গুণ জান।
সো রসনায় তনু রসিক সুজান ॥
(তাল : লোফা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৩০)

ছ. শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে, পরাণে পরাণে লেহা।
না জানি কি লাগি কো বিধি গঢ়ল ভিন ভিন করি দেহা ॥
সই কিবা সেই পিরীতি তার।
জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে কি দিয়া শোধিব ধার ॥
(তাল : লোফা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৪১৫)

জ. কানু সে ছৈল সোনার। মঝু মন কাঞ্চন, আপন প্রেমমণি জোড়ি পিন্ধাতল হার ॥

বেণুক ফুক, বুক মদনানল, কুল হৈল ইন্ধন যাহা জাড়ি।
দরশন পানি, পরশ মোহাগল, শ্রম জলে রাখল ডারি ॥[২]
(তাল : লোফা)

---

১. বাংলাদেশের বিখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীঅশোক কুমার গোস্বামী-হতে পদটি শ্রুত। শব্দযন্ত্রে ধারণ : ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী
২. পূর্বোক্ত

ঝ. আমার বঁধু সে পরশমণি। সে অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার সোনার বরণ খনি ॥
কত না আদর, করয়ে নাগর, কত উঠে তার মনে।
পালঙ্ক শয়নে, না রাখে কখনো, আপন হৃদয় বিনে ॥ ...
(তাল : দশকোশী, *পদামৃতলহরী*, পৃষ্ঠা-১৮৬)

ঞ. রাধাবদন চাঁদ হেরি ভুলল শ্যামর নয়ন চাকোর।
ছন্দ বন্ধ বিনু ধবলী ধাওত বাছুরি কোরে আগোর ॥ ...
(তাল : লোফা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৭১)

ট. সুগন্ধি ওদন, বিবিধ ব্যঞ্জন, রাধিকা বন্ধন করি।
শাক পারসয়াদি, পিষ্টক অবধি, বেদির উপরে ধরি ॥ ...
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৩৫)

প্রাতঃলীলা বা জাগরণ পালায় উপর্যুক্ত পদ ছাড়াও বেশ কিছু তুক ও ছুট গান গাওয়া হয়ে থাকে। পদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কীর্তনীয়াগণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ ও তালের ব্যবহার করে থাকেন।

পূর্বাহ্নলীলা : কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন, নন্দ-যশোদার খেদ ও কৃষ্ণের বিনয়-বাক্য প্রকাশ, কৃষ্ণের জন্য রাধার উৎকণ্ঠা, গোষ্ঠে সখাগণের নৃত্য-গীত, কৃষ্ণের মানস গঙ্গায় জলকেলি ও সখাগণের সাথে ভোজন। রাধার তীব্র উৎকণ্ঠা, সখিগণের কুঞ্জ দর্শনে কৃষ্ণের আনন্দ, বৃন্দা-ললিতার কথোপকথন, কৃষ্ণের মধুমঙ্গলের প্রতি পরিহাস, ইত্যাদি। লীলাটি 'গোষ্ঠলীলা' নামে পরিচিত। এই লীলার সময় ৬ দণ্ড অর্থাৎ, সকাল ৮.২৪ মিনিট থেকে ১০.৪৮ মিনিট পর্যন্ত।

নবদ্বীপলীলার বিষয়ভাব

হরি বনগতি লীলাং ব্যাকুলীভূত গোষ্ঠং
স্মৃতি বিষয়গতাং যঃ কারয়ামাস সাক্ষাৎ
তদনুকরণকারী ভক্তবৃন্দস্য মধ্যে
তমহমিহ ভজামি গৌরচন্দ্রং হি নিত্যম্ ॥

অর্থাৎ, পূর্বাহ্নে সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বনগমনকালে ব্রজবাসীগণের ব্যাকুলতার স্মৃতিতে যে গৌরসুন্দর অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারে ব্যাপ্ত হয়ে ভক্তগণমধ্যে সেই লীলার অনুকরণ করেন, ভক্তবৃন্দসহ সেই গৌরচন্দ্রকে আমি নিত্যই ভজন করি।[১]

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ নিজ আলয়ে শয্যালয়ের পাশে বারান্দায় ভক্তবৃন্দসঙ্গে ব্রজরসাভাসে আবিষ্ট রয়েছেন। ইতোমধ্যে তাঁর মধ্যে ব্রজভাবোদ্দীপন হলো এবং স্বপার্ষদ ব্রজলীলায় আবিষ্ট হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন। কিছুটা বাহ্যদশাপ্রাপ্ত হলে স্বরূপের কাছে কৃষ্ণ-বলরামের গোষ্ঠলীলার বর্ণনা শ্রবণ করে গৌরাঙ্গ ব্রজলীলার আবেশে কৃষ্ণভাবে ত্রিভঙ্গ ঠামে ললিত ভঙ্গিতে কৃষ্ণের মুরলীধ্বনির অনুকরণ করতে লাগলেন। নিত্যানন্দও বলরাম আবেশে শিঙার ধ্বনির অনুকরণ করলেন। ভক্তগণের মধ্যেও ব্রজআবেশ সংঘটিত

১. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৪৫

হলো; তাঁরাও আবেশে সখ্যভাবে হাতে যষ্ঠি নিয়ে ধবলী, শ্যামলী প্রভৃতি গাভীর নাম ডেকে হৈ হৈ রব করতে লাগলেন। নবদ্বীপের পথ-প্রকৃতি যেন বৃন্দাবনের গোচারণ-ভূমি হয়ে উঠল। কৃষ্ণের গোচারণলীলার স্মৃতিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন গৌরাঙ্গ। স্বরূপ গোস্বামী অবস্থার প্রেক্ষিতে কৃষ্ণের গোচারণে গমন, নন্দ-যশোদার বিরহদশা, বল্লরীগণের বিদায়, বনপ্রবেশ, রাধার সখীগণের সাথে গৃহে গমন, নর্মদা সখীর আগমন এবং বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ের কীর্তন করতে লাগলেন। ভক্তগণসহ গৌরাঙ্গ কীর্তন শ্রবণে ভাবতন্ময় হয়ে ব্রজলীলায় মগ্ন হলেন।

একাধিক গৌরচন্দ্রিকা উপর্যুক্ত পালার ক্ষেত্রে কীর্তনীয়াদের গাইতে দেখা যায়। বহুল ব্যবহৃত দুটি গৌরচন্দ্রিকা উল্লেখ করছি (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত)।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

ক. আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
ধবলী শাঙলী বলি সঘনে ডাকিল ॥
শিঙ্গাবেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ বলিয়া গোরা ফিরায় পাঁচনী ॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস অভিরাম সভার আনন্দ ॥
বাসুদেব ঘোষে কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠ্যলীলা গোরা চাঁদ করিলা প্রকাশে ॥
(তাল : বড় দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬২-৬৩)

উপর্যুক্ত গৌরচন্দ্রিকাটিই বাংলাদেশের অধিকাংশ কীর্তনীয়া আসরে আখর ও তুক সহকারে গেয়ে থাকেন, তবে কোনো কোনো কীর্তনীয়া নিম্নে উদ্ধৃত পদটিও গেয়ে থাকেন। ভিন্ন গৌরচন্দ্রিকাও গাওয়া হয়ে থাকে। যেমন :

খ. শচীরনন্দন গোরা চাঁদ বয়ানে।
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙার শবদ করি বদন বাজায় ॥

নিতাইচাঁদের মুখে শিঙার নিশান।
শুনিয়া ভক্তগণে প্রেমে আগোয়ান ॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরাম ॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমের আবেশ।
শিরে চূড়া শিখি পাখা নটবর বেশ ॥
চরণে নূপুর বাজে সর্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদনে কহে চল গোবর্দ্ধন ॥
(তাল : বড় দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬২)

ব্রজলীলার বিষয়ভাব

পূর্বাহ্ণে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুজাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যায়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণ প্রবৃত্তৈ প্রহিত নিজ সখীবর্ত্মনেত্রাং স্মরামি ॥

অর্থাৎ, যিনি পূর্বাহ্ণে ধেনু ও মিত্রগণের সাথে বনে গমন করলে শ্রীনন্দ-যশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। যিনি শ্রীরাধার প্রাপ্তিবিষয়ে সতৃষ্ণ এবং যিনি শ্রীরাধার অভিসারার্থ শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে উপস্থিত হন—সেই শ্রীকৃষ্ণকে অমি স্মরণ করি। আবার যে রাধা নন্দালয় হতে গৃহে গমন করলে আর্যা জটিলাকর্তৃক সূর্যদেবের অর্চনার্থ আদিষ্টা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা প্রাপ্তির জন্য প্রেরিত নিজসখীর আগমন-পথপানে উৎকণ্ঠিত-নেত্রে চেয়ে থাকেন – সেই শ্রীরাধাকে আমি স্মরণ করি।[১]

ব্রজধামে নন্দালয়ে রাধাকৃষ্ণ নিজ নিজ শয়নকক্ষে নিদ্রিত আছেন। সখীগণ রাধাকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করলেন এবং সখীপরিবৃতা হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। সখী ধনিষ্ঠার কাছে মা যশোদা সংগৃহীত নানান উপকরণ রাধাকে ভূষিত করার নিমিত্তে প্রদান করলেন। সখীগণ যশোদা-প্রাপ্ত ভূষণাদি দ্বারা রাধাকে সজ্জিত করলেন। অন্যদিকে ব্রজরাখালগণ গোচারণে যাবার লক্ষ্যে উপযোগী বেশ ধারণ করে নন্দভবনে এসে উপস্থিত হলেন। সুবলসহ অন্যান্য সখাগণ কৃষ্ণকে নিদ্রা থেকে জাগরিত করলেন। কৃষ্ণ-বলরাম অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে মাতা যশোদা ও রোহিণী রামকৃষ্ণকে গোচারণ-উপযোগী ভূষণে সজ্জিত করলেন। অদূরে রাধা কৃষ্ণের গোঠের বেশ দেখে পরমানন্দ লাভ করলেন। গোঠের প্রাক্কালে মাতা যশোদা ও রোহিণী কর্পূর প্রদীপ দ্বারা কৃষ্ণ-বলরামকে আরাত্রিক করলেন মঙ্গল কামনায়। মাতাদ্বয় গোঠের জন্য কৃষ্ণ-বলরামের নিমিত্তে নানান উপাদেয় খাবার প্রস্তুত করে সখাদের হাতে তুলে দিলেন। কৃষ্ণ বংশী, বিষাণ ও যষ্ঠি নিয়ে গোঠে যাবার প্রস্তুতি নিলেন। গাভীরাও (শ্যামলা, মঙ্গলা, ভদ্রা, পালী, ধবলী প্রভৃতি) গোষ্ঠে যাবার জন্য দ্বারে এসে দাঁড়াল। মা যশোদা কৃষ্ণের গোষ্ঠগমনের সময় বিরহাতুরা হয়ে পড়লেন। বাৎসল্য প্রেমের এক অনির্বচনীয় সুধারসে জারিত হয়ে যশোমতি বিরহ-উক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন এবং কূলদেবতা শ্রীনারায়ণ-সমীপে কৃষ্ণ-বলরামের মঙ্গল প্রার্থনা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন। মাতাদ্বয় ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে রক্ষাবন্ধন দিয়ে রামকৃষ্ণকে সখাদের হাতে সমর্পণ করলেন। অদূরে দণ্ডায়মান রাধার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ইঙ্গিতে রাধাকুণ্ড-তীরে গমন করতে বললেন এবং মিলনের আহ্বান জানিয়ে রাখলেন। ব্রজরসপুরে গোঠের বাজনা বেজে উঠল। কৃষ্ণ-বলরাম-ব্রজসখাগণ গোঠাভিমুখে যাত্রা করলেন। ব্রজবাসীগণও বিরহে তাঁদের পথ অনুসরণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণের প্রবোধবাক্যে ব্রজবাসীগণ গৃহে গমন করলেন এবং সখাগণসহ কৃষ্ণ-বলরাম বনমধ্যে

গমন করলেন। কৃষ্ণবিরহে রাধা অচেতন হয়ে পড়লেন। সখীগণ অচেতনা রাধাকে অতি সত্ত্বর কৃষ্ণ মিলনের আশ্বাস দিয়ে চেতনা ফিরিয়ে যাবট নগরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। সখী কুন্দলতা জটিলা সমীপে গিয়ে রাধার প্রত্যাবর্তন এবং যশোদা হতে প্রাপ্ত নানান রত্ন অলঙ্কারের বর্ণনা দিতে লাগলেন। জটিলা প্রসন্ন হয়ে স্বীয়পুত্রের মঙ্গল কামনায় রাধাকে সূর্যপূজায় নিযুক্ত হতে বললেন। ইতোমধ্যে যোগমায়া কর্তৃক রাধার নিকট প্রেরিত হলেন মালীকন্যা নর্মদা। নর্মদা রাধার নিকটে কৃষ্ণের বার্তা পৌঁছে দিলেন। রাধাকৃষ্ণের মিলন-হেতু যোগমায়ার নির্দেশে বৃন্দাবন অপূর্ব সাজে সেজে উঠল। কৃষ্ণ রাধাবিরহ অন্তরে

১. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬

ধারণ করে বংশীধ্বনি করলেন। কৃষ্ণের অন্তরে রাধা-উদ্দীপন ভাবের জাগরণ হলো। এদিকে মালীকন্যা নর্মদার বার্তা শুনে রাধাঅন্তর পুলকিত হলো। সখী বৃন্দা প্রদত্ত বৈজয়ন্তীমালা রচনা করে কর্পূর মিশ্রিত তাম্বুল ও নানান উপচার সখী তুলসীর কাছে কৃষ্ণচরণে পৌঁছে দেবার জন্য অর্পণ করলেন রাধা। রাধা তাঁর বল্লভের নিকট গমাকাঙ্ক্ষায় নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করতে লাগলেন। সখীগণ নানান ভূষণে রাধাকে ভূষিত করলেন। দর্পণে রাধা স্বীয় প্রাণবল্লভ-বিলাস-যোগ্য অপূর্ব রূপমাধুরী দর্শন করে সত্ত্বর কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় বিবশা হয়ে রইলেন এবং সখী তুলসীর আগমন-পথে দৃষ্টি নির্বন্ধ রাখলেন।

গোষ্ঠীলীলায় কীর্তনীয়াগণ আসরে যে সব পদ গেয়ে থাকেন তার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত) :

ক. আওত শ্রীদামচন্দ্র, রঙ্গিয়া পাগড়ি মাথে।
তোক অর্জুন, অংশুমান, দাম বসুদাম সাথে ॥
কটি কাছনি, বঙ্কিম ধটি, বেণুবর বাম হাতে।
জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, ভায়্যা ভায়্যা বলে ডাকে ॥
গলে লম্বিত, গুঞ্জামালা, ভুজে অঙ্গদ বালা।
গো ছান্দন, ডোরি কান্ধহি, কানে কুণ্ডল খেলা ॥
স্ফূট চম্পক, দল নিন্দিত, উজ্জ্বল তনু শোভা।
পদ পঙ্কজে, নূপুর বাজে, শেখর মনলোভা ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৪)

খ. শ্রীদাম সুবল নিকটে যাইয়া।
কহে শুন ওহে সুবল ভাইয়া ॥
যশোদা যোগায় মাখন মুখে।
আছয়ে মায়ের কোলেতে সুখে ॥ ...
শ্রীদাম সুবল মঙ্গল ধাইয়া।
কহে শুন ওহে কানাই ভাইয়া ॥
গোধন সকল বাথানে রইল।
দেখ দেখ বেলা কতেক হইল ॥
রাখাল সকল দাঁড়াঞা পথে।
যদুনাথ কহে যাইব সাথে ॥

(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৪)

গ. শ্রীদাম যাইয়া কহে নন্দের নন্দনা।
বুঝিতে না পারি কানাই তোমার মন্ত্রণা ॥
তুমি রইলা ঘরে বসি মাঠে গেল পাল।
উনমত্ত হৈয়া বেড়ায় যতেক রাখাল ॥ ...
মরিলে না মরি কত আপদ এড়াই।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমা হেন ভাই ॥
তোমা ছাড়া মায়ের কোলেতে শুইয়া থাকি।
ঘুমাইতে ঘুমাইতে কানাই কানাই বলি ডাকি ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৫)

ঘ. মোরা স্বপনে কখন, মধুর বচন, তুমি বলি নাই মোরা রে।
ওরেরে হারেরে, বলিয়ে ডাকিরে, গোপশিশুর এই ধারা রে ॥ ...
কি করিব ওরে শ্রীদাম করিব আমি কি।
চূড়া বান্ধি ধরা পড়ি বসি রয়েছি ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৫)

ঙ. বাজত সব, গোঠ বাজনা, সাজত বল বীরে।
মদে ঘূর্ণিত নয়নযুগল, পাগনটপটি ফিরে ॥
বলাইয়ের মুখ নয় যেন বিধুরে। ...
গলে বনমালা বাহে ওড়িবালা, কানে কুণ্ডল সাজে।
ধব ধব ধবলী বলিয়া ঘন ঘন শিঙা বাজে ॥ ...
পদাঘাত মারি কহে বেরি বেরি সুস্থিরা ভব ধরণী।
শশিশেখর কহে হলধর পদতলে যাও নিছনি ॥
(তাল : জৈতি, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-১০৪৫)

চ. কানুতে শ্রীদামে কথা, বলরাম আমি তথা, যুগল বিষাণে শান দিল।
শুনিয়া রাখাল সব, দিয়া আবা আবা রব, রাম কানুর দুই দিগে দাঁড়াইল ॥ ...
প্রণতি করিয়া মায়, কহিছে রাখাল রায়, কানুরে লইয়া যাব গোঠে ॥
শুনিয়া বলরামের বাণী, মূরছিত নন্দরাণী, লোটায়া পড়িলা ভূমিতলে। ...
রাণী কহে বলরাম, বুঝি যশোদার প্রাণ, বধিতে আইলি সবে তোরা।
যাউক প্রাণ বাহির হৈয়া, তবে তোরা যাস লৈয়া, এ যদুনাথের নয়ন তারা ॥
(তাল : মধ্যম দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৬)

ছ. যাদু আমার নবীন রাখাল।
নাহি জানে হিতাহিত, গোধনে পালনে প্রীত, জানে না যে কার কত পাল
এলাইয়া কটির ধরা, দুই চরণে লাগে বেড়া, অপনা আপনি পড়ে ফান্দে।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে, ঘরে যাইতে পথ ভুলে

দুটি হাত মুখে দিয়া কান্দে ॥ ...
(তাল : ছোট দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৬)

জ. শ্রীদাম কহিছে বাণী, শুন ওগো নন্দরাণী, নিতি নিতি যাই মোরা বনে।
যতেক রাখাল মেলি, মাঝে রাখি বনমালি, ধেনু বৎস চড়াই কাননে ॥ ...
(তাল : গড় খেমটা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৬-৬৭)

ঝ. কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী।
হেরি হলধর পানে, ধারা বহে দুনয়ানে, মুখে না নিঃসরে বাণী ॥
অলকা তিলকা দিতে, মুখ ঘামে আচম্বিতে, ফেলিয়া বিভোর যশোমতি।
নারিলু পাঠাইতে বনে, দেখিয়া সে মুখপানে, শিশুগণ করয়ে মিনতি ॥ ...
(তাল : তেওট, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৭)

ঞ. আমার শপথি লাগে, না ধাইও ধেনুর আগে, পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু, পূরিও মোহন বেণু, ঘরে বসি যেন শুনি ॥
থাকিও তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়, রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও, বাধা পানই হাতে থুইও, বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায় ॥
(তাল : মধ্যম দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৮)

ট. বিপিন গমন দেখি, হৈয়া সকরুণ আঁখি, কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া, প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া, রক্ষামন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥ ...
(তাল : গড় খেমটা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৬৯)

ঠ. দণ্ডবৎ করি মায়, চলিলা যাদব রায়, সঙ্গহি বঙ্গিয়া রাখাল।
বরজে পড়িল ধ্বনি, শিঙ্গা বেণুরব শুনি, আগে যায় গোধনের পাল ॥
(তাল : গড় খেমটা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৭০)

ড. গোঠের মুরলীধ্বনি শ্রবণে শুনিল।
নীবিবন্ধ খসি বস্ত্র নিতম্বে রহিল ॥
এলালো মাথার বেণী তাহা নাহি বান্ধে।
উপক্ষো না করে গোপী কৃষ্ণ বলি কান্দে ॥ ...
কৃষ্ণ অঙ্গ সুধাসিন্ধু অমিয়া পাথারে।
শ্রীরাধিকার হংস চিত্ত তাহাতে বিহরে ॥ ...
(তাল : তেওট, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৭১)

ঢ. ব্রজ-নন্দ কি নন্দন নীলমণি।
হরি-চন্দন-তিলক ভালে বণী ॥
শিখি-পুচ্ছকি বন্ধনি বামে টলি।

ফুল-দাম লেহারিতে কাম ঢলি ॥
সুর অসুর লজ্জিত শান্ত মনে।
পদ-সেবক দেব-নৃসিংহ ভণে ॥
(তাল : রূপক, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-১০৯৫)

উপর্যুক্ত পদ ছাড়াও কীর্তনীয়াগণ অতিরিক্ত পদ-সংযোজন করে পূর্বাহ্ণ লীলার মিলন গেয়ে থাকেন।

মধ্যাহ্ন লীলা

রাধার উৎকণ্ঠা, সখীর সাথে রাধার কথোপকথন, রাধার সূর্যপূজাচ্ছলে বনে গমন, রাধাকৃষ্ণের মিলন, কৃষ্ণ কর্তৃক সখীগণকে আলিঙ্গন, বংশীহরণ, বিলাসান্তে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাকে অলংকৃতকরণ, রাধার প্রেমবৈচিত্ত্যের প্রকাশ, রাধার সূর্যপূজা, কৃষ্ণের গ্রহাচার্যবেশ ধারণ ও পূজার নৈবেদ্য গ্রহণ ইত্যাদি। লীলাটি 'সূর্যপূজা' নামে পরিচিত। মধ্যাহ্নকালীন লীলার সময় ১২ দণ্ড অর্থাৎ, দিবা ১০.৪৮ মিনিট হতে বিকাল ৩.৩৬ মিনিট পর্যন্ত।

নবদ্বীপ লীলার বিষয়ভাব

সহালি-শ্রীরাধা সহিত-হরিলীলাং বহুবিধাং
স্মরণ্ মধ্যাহ্নীয়াং পুলকিততনুর্গদগদবচাঃ।
ব্রুবন্ ব্যক্তং তাঞ্চ স্বজনগণমধ্যেহনুকুরুতে
শচীসূনুর্যস্তং ভজ মম মনস্তং বত সদা ॥

অর্থাৎ যিনি স-সখী শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যাহ্নকালীন বহুপ্রকার লীলা স্মরণ করে, পুলকিত দেহে ও গদগদ কণ্ঠে তা ভক্তগণমধ্যে বর্ণন ও অনুকরণ করেন; হে মন তুমি সেই মহাভাব-রসময়-মূর্তি শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে সর্বদা ভজন করো।[১]

নবদ্বীপের গঙ্গাতটে ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে গৌরাঙ্গ বসে রয়েছেন। আলোচনারত অবস্থায় তাঁর শ্রীরাধাভাবের আবেশ হলো। আবেশাবস্থায় উত্তরীয় দিয়ে মস্তক ঢেকে বাম পা আগে চলনা করে হংসগমনে বের হলেন। পরিকরবৃন্দও ধ্বনি সহযোগে মধুর সংকীর্তন করতে করতে গৌরসুন্দরের অনুগমন করতে লাগলেন । সংকীর্তনযোগে পরিকরসহ তিনি শ্রীবাসের পুষ্পউদ্যানে প্রবেশ করলেন। যেন মনে হলো প্রেমের ঘনীভূত মুরতি স্বরূপে বিরাজ করছে। পুষ্পরাগে আচ্ছন্ন উদ্যানে গৌরাঙ্গভক্তপরিবেষ্টিত হয়ে উপবেশন করলেন। ভাবে বিভোর গৌরসুন্দর ; শ্রীস্বরূপ গোস্বামী গৌরের ভাব জেনে তাঁর সমীপে রাধার নিকট তুলসীর আগমন, কৃষ্ণলীলা বর্ণন, রাধার পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ, ধনিষ্ঠা-আগমন, রাধার অভিসার, কৃষ্ণের মিলনের বিষয় ইত্যাদি পদ ক্রমানুসারে গাইতে লাগলেন। শ্রবণে গৌরাঙ্গ রাধাভাবে ব্রজরসে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হলেন ; পরিকরবৃন্দ স্ব-স্ব ব্রজভাবে আবেশাশ্রিত হলেন।

বাংলাদেশের কীর্তনের আসরে উপর্যুক্ত পালা-সংশ্লিষ্ট যে-পদগুলো গাওয়া হয় তার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়: (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত)

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

হেম সঞে অতি গোরা সুমধুর হাস থোরা
জগ-জন-নয়ন* আনন্দ।
পিরীতি মুরতি কিয়ে রূপ স্বরূপ-ধর
ঐছন প্রতি অঙ্গ-বন্ধ ॥
আজু কিয়ে নবদ্বীপ চন্দ।
কামিনিকাম-কলিত তছু মানস
গতি অছু গজ জিতি (যিনি) মন্দ ॥

১. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৫৫

* টীকা : নয়ন / নয়ান - উভয় শব্দই কীর্তনীয়ারা প্রয়োগ করে থাকেন।

মাঝ দিনহি পুন বসন আবৃত তনু
কহতহি পূজব সূর।
কম্প পুলক ঘাম স্বরভঙ্গ অনুপাম
নয়নহি জল পরিপূর ॥
বাম ভুজঁহি বসনে মুখ ঝাঁপই
বাম নয়নে ঘন চায়।
রাধামোহন দাস চিতে অভিলাষই
সোই চরণ জনু পাই ॥(তাল : দশকোশী বৈষ্ণব পদাবলী, পৃষ্ঠা - ৯৩২)

ব্রজলীলার বিষয়ভাব

মধ্যাহ্নে হন্যোন্যসঙ্গোদিত-বিবিধবিকারাদি-ভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বামোৎ কণ্ঠা তিলোলৌ স্মরমখ-ললিতাদ্যালি-নর্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতি-রতি-মধুপানার্ক পুজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সুতৃপ্তৌ–পরিজন ঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

অর্থাৎ, মধ্যাহ্ন সময়ে যাঁরা পরস্পর সঙ্গজনিত বিকাররূপ (সাত্ত্বিক, ব্যাভিচারী প্রভৃতি) ভাবভূষণ সমুদয়ে অতি মনোহর, বাম্য ও উৎকণ্ঠায় অতিশয় চপল, কন্দর্পযজ্ঞে ললিতাদি সখীগণের পরিহাসবাক্যে পরম সুখী এবং দোলা, বনবিহার, জলকেলি, বংশীহরণ, রতিক্রীড়া, মধুপাণ, সূর্যপূজাদি বিবিধ লীলায় তৎপর হয়ে যাঁরা প্রিয় পরিজন-কর্তৃক সেবিত হচ্ছেন সেই রাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি।[১]

এই লীলার মূল তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে রাধা এবং তাঁর সখী কর্তৃক সূর্যপূজার ছলে কৃষ্ণের সাথে মিলনের ধারায়। ব্রজধামে রাধা অভিসারের আশায় উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। যাবটে তিনি দর্পণে নিজেকে দেখে প্রাণনাথকে আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। উদ্বিগ্না রাধা সখীগণের মধ্যে বসে রয়েছেন, ঠিক সেই মূহূর্তে সখী তুলসী এসে কৃষ্ণপ্রদত্ত গুঞ্জামালা ও চম্পককলিকা সখী ললিতার হাতে দিলেন। ললিতা পরমানন্দে রাধার গলায় ও কর্ণে গোবিন্দপ্রদত্ত উপহার পড়িয়ে দিলেন। বনবিহারে কৃষ্ণের অবস্থান, কার্যাবলি, কৃষ্ণের অনুরাগ প্রভৃতি বিষয় তুলসী রাধার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করতে লাগলেন। রাধার উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল। নন্দ মহারাজ ও মাতা যশোদা তাঁদের আদরের রামকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য রসে জারিত হয়ে ধনিষ্ঠাকে বনমধ্যে প্রেরণ করলেন। (এই লীলা সংগঠনে ধনিষ্ঠা এবং অঘটনঘটনপটিয়সী যোগমায়া অনুঘটকের কাজ করেছিলেন।) আহারাদি সমাপ্তিতে বৃন্দাদেবী এসে

কৃষ্ণসমীপে চম্পকপুষ্প দেবার ছলে কৃষ্ণ-অন্তরে রাধা দর্শনের অনুরাগ বাড়িয়ে দিল। ইতোমধ্যে চন্দ্রাবলীকে সংকেত স্থানে রেখে সখী শৈব্যা কৃষ্ণসমীপে আসলেন এবং চন্দ্রাবলী প্রদত্ত গুঞ্জাহার কৃষ্ণের গলায় পড়িয়ে দিলেন। এতে উভয় পক্ষের মধ্যেই মান-অভিমানের জন্ম হলো। কৃষ্ণ মধুর বচনে শৈব্যাকে প্রীত করলেন এবং সংবাদ প্রেরণ করলেন যে চন্দ্রাবলী যেন অপেক্ষমান থাকে। অন্যদিকে কৃষ্ণ রাধাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। সখী তুলসীর কাছে রাধার সংবাদ পাবার পরে তাঁর হাতে রাধার জন্য স্বীয় কর্ণ হতে চম্পকপুষ্প এবং গলা থেকে গুঞ্জামালা প্রদান করলেন। যোগমায়ার বাঁধা ছকে জটিলা কর্তৃক শ্রীরাধা আদৃষ্ট হলেন সূর্যদেবের অর্চনার নিমিত্তে। কুন্দলতা এবং অন্যান্য সখীগণের সাথে রাধা দ্রুত পদে 'মদনসুখদা' কুঞ্জে গমন করলেন। সখী তুলসীর মুখে কৃষ্ণবার্তা শুনে রাধার দেহ

---

১. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৫৬

পুলকিত ও কম্পিত হতে লাগল। কিন্তু চন্দ্রাবলীর ভয়ে রাধা ভীত হয়ে রইলেন, পাছে কৃষ্ণদর্শন সুখ থেকে বঞ্চিত হয়। ললিতার নানাবিধ কথায় কৃষ্ণসঙ্গ অতি দুর্লভ মনে হলো এবং রাধারানি বিরহ-হুতাশে খেদ করতে লাগলেন, কিন্তু উৎকণ্ঠা বাড়তেই লাগল। কৃষ্ণমিলন-জন্য রূপ-রস দ্বারা রাধার পঞ্চইন্দ্রিয় আকর্ষিত হতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে ধনিষ্ঠা সেখানে কৃষ্ণের মধুময়ী বার্তা নিয়ে আসলেন। রাধার কাছে বসন্ত ঋতু, গিরিরাজ গোবর্ধনের শোভা ইত্যাদি বর্ণনার ছলে কৃষ্ণমাধুর্য বর্ণনা করলেন। ফলে, রাধার অনুরাগ মিলনসুখ-আকাঙ্ক্ষায় বেগবান হলো। ধনিষ্ঠা-মুখে কৃষ্ণের সমুদয় বার্তা শুনে নিঃসংশয় চিত্তে রাধা কৃষ্ণ-অভিসারের পথে ছুটলেন। সখী কুন্দলতা সূর্যপূজার আয়োজনকে ত্বরান্বিত করতে লাগলেন। বনমধ্যে রাধার বিচিত্র বনশোভায় অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্তি জাগলো, নানান প্রেমভ্রান্তিও হতে লাগল, এভাবে রাধা সখীগণসহ 'মদরণবাটিকা' নামক কেলিকুসুমকাননের কুঞ্জস্থিত সূর্যপ্রতিমার কাছে উপস্থিত হলেন।

সূর্য-সকাশে অভিষ্ট বর প্রার্থনা করলেন। সূর্যপূজার আয়োজন চলতে লাগল। বৃন্দাদেবী সেখানে উপস্থিত রাধাসমীপে কৃষ্ণ সম্মন্ধে বলতে লাগলেন। বৃন্দার সাথে রাধার নানাবিধ হাস্যপরিহাস সংগঠিত হতে থাকলো। সুচতুরা বৃন্দা রাধাকৃষ্ণের মিলনকে নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে বেগবতী দুটি সারীকে (সূক্ষ্মধী এবং শুভা) যাবটে জটিলার এবং গৌরীতীর্থে চন্দ্রাবলীর গতিপ্রকৃতি জানতে পাঠালেন। অনন্তর বহুল প্রতীক্ষিত রাধা-কৃষ্ণের পারস্পরিক দর্শন হলো। দর্শন-অন্তে তাঁরা নানান বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। অতঃপর কৃষ্ণদর্শনে ভাবভূষায় ভূষিতা হলেন রাধারানি। নানাবিধ বিলাস অলঙ্কারে (ললিতালঙ্কার, বিভ্রমালঙ্কার, কিলাকিঞ্চিৎ ইত্যাদি অলঙ্কার) পরস্পরকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। মধ্যাহ্নলীলায় কীর্তনীয়াগণ সখীগণসহ রাধাকৃষ্ণের চিদ্বিলাসীমিথুনের মহারস্যময় বিলাস[২] বর্ণনা করে থাকেন।

বিলাস

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্ ॥
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয় সঙ্গজম্ ॥

অর্থাৎ, বিলাস হচ্ছে, গতি, স্থান, আসনাদির এবং মুখ ও নেত্রের ক্রিয়াদির প্রিয়দর্শনজনিত তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য।[২]

এই বর্ণনা মঞ্জরীভাবাবিষ্ট রাগানুগীয় সাধক-ভক্তগণের আস্বাদ্য চির আকাঙ্ক্ষিত ভাবসম্পদ। একে একে ব্যাজস্তুতিতে রাধার অঙ্গশোভা বর্ণনা, পরিহাসামৃত রস ইত্যাদি বিষয়ের উপস্থাপন করা হয়। এরপর কৃষ্ণকে পৌরোহিত্যে বরণ করে নেওয়া, কুন্দলতা-কর্তৃক পঞ্চদেবতার অর্চনা, নবগ্রহের অর্চনার আহ্বান, ললিতা-কর্তৃক বস্ত্রগ্রন্থিমোচন, দিকপালগণের অধিষ্ঠান বিষয়ক ক্রিয়াদির আহ্বান ইত্যাদি বিষয় ঘটতে থাকে। কৃষ্ণও আহ্বান-অনুযায়ী নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম করতে লাগলেন। পূজাঅন্তে ভৃঙ্গের ভয়ে রাধা কান্ত-কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। সখীগণ পরম আনন্দে যুগলমাধুরী আস্বাদন করলেন। সখীর সহায়তাতেই রাধাকৃষ্ণের ভাবপুষ্টি সাধিত হলো। মিলন-শেষে নানান কৌতুকে মগ্ন হলেন তাঁরা। ইতোমধ্যে কৃষ্ণের বংশীহরণ করা হলো। বনমধ্যে চমৎকার বংশী অন্বেষণ লীলা সংগঠিত হলো। রাধা

১. 'প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেষক্রিয়াদিভিঃ'–অর্থাৎ, লীলা হচ্ছে রমনীয় বেশ ও ক্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়তমের ন্যায় আচরণ করা।

২. শ্রীরূপ গোস্বামী, হরিদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৮০

গোপনে কুঞ্জে প্রবেশ করলেন এবং কৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে রাধার অন্বেষণ করতে লাগলেন। কুন্দলতার ইঙ্গিতে কৃষ্ণ কুঞ্জে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের যুগল-বিলাস সম্পন্ন হলো। রাধার সাথে সখীগণ নানান হাস্যপরিহাসে মেতে উঠলেন। তখন সখীগণ কর্তৃক রাধার রূপমাধুরী বর্ণিত হতে লাগল। রাধার প্রেমবৈচিত্ত্যের অভিনব প্রকাশ ঘটলো। রাধার সূর্যপূজার ছলে প্রাণনাথ কৃষ্ণের সাথে সাক্ষাৎ মিলনই এই পালার মূল বিষয়। কীর্তনীয়াগণ আসরে নানাবিধ আখর, তুক, ছুট, ঝুমুর দিয়ে পালাটিকে আস্বাদ্য করে তোলেন।

সূর্যপূজালীলায় অধিকাংশ কীর্তনীয়াগণ আসরে যেসব পদ গেয়ে থাকেন তার কিছু সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত)

ক. রাধিকা রূপসী লইয়া তুলসী / কহয়ে মধুর কথা।
কাননে গমন করহ এখন / নাগরশেখর যথা ॥
সময় বুঝিয়া সরস হইয়া / মিলিবে নাগর কান।
চতুর নিকটে কহিবে কপটে / রাখিবি আপন মান ॥
তুলসী উলসী মনেতে হরষি / চলিলা রাইয়ের বোলে।
তাম্বুল কর্পূর লৈয়া ফুলহার / মিলিলা সরসী কূলে ॥ ...
(তাল : রূপক, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৫৫-৩৫৬)

খ. তুলসী চতুর কহয়ে মধুর কাতর দেখিয়া কান্ ।
তুষিয়া তাহারে চলিলা সত্বরে রাখিয়া আপন মান ॥
তুলসী আসিয়া সব সমাচার কহে।
শুনি ধনি সুবদনী হরষিত হয়ে ॥
রাইহস্তে গুঞ্জামালা দিলেন ললিতা।
চম্পক যুগল দুই কর্ণে অবতংসীতা ॥[১]
(তাল : একতালা)

গ. তুলসী বচনে সব সখীগণে / দেব পূজিবার তরে।
বিধি অগোচর নানা উপহার / পূজন ভাজন ভরে ॥
চিনি ফেনী কলা মাখন রসালা / রেউড়ি কদম্বা তিলা।
পুরি পুয়া খাজা পেড়া সরভাজা / রাধিকা করিয়াছিলা ॥

অমৃত কেলিকা আদি সে লাড্ডুকা / সঘৃত মুগদ ঝুরি।
দেবতা পূজনে করিয়া যতনে / বুঁদি রসকরা খিরি ॥ ...
(তাল : রূপক, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৫৬)

ঘ. জটিলা নিকটে আসি বিনোদনী রাই । / কাঁদিতে কাঁদিতে কহে কি কহব মাই ॥
নিশিথে দেখিনু স্বপন অতি অমঙ্গল। / পতি মোর পতিত কাল কবল ॥
শুনিয়া জটিলা ভীতা সজল নয়ন। / পুনঃ রাই বিনোদিনী কহিছে বচন ॥
স্বপনেই সূর্যপূজিত আশীর্বাদ ফলে। / পতি মুক্ত কইনু মোর কাল কবলে ॥
আদেশ যদি হয় গো মাতা সূর্যপূজায় যাই। / মনোহরা কয় সত্ত্বরা বিলম্বে কাজ নাই ॥[২] ...
(তাল : লোফা)

---

১. বাংলাদেশের বিখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীঅশোক কুমার গোস্বামী-হতে পদটি শ্রুত। শব্দযন্ত্রে ধারণ : ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী

২. পূর্বোক্ত

ঙ. রেগে কয় কুটিলা, সব ঝুটিলা, কুল খাগিরা যত।
আমার দাদার মুখে দিয়ে কালি সব কৃষ্ণ সেবায় রত ॥
আমি তোদের সনে যাব বনে দেখব তোদের কাজ।
মনোহরা যায় সত্ত্বরা লেই কুটিলার সাজ ॥[১] ...
(তাল : দশকোশী)

চ. স্মরিয়া গোবিন্দ বন্ধু, ইন্দুমতি বের হলো / বিবাদিনী ননদিনী সঙ্গে।
ললিতাদি ভাবে মনে বনে প্রবেশিয়া / কুটিলা হেরত মন রঙ্গে ॥
এমন সুন্দর বন কভু নাহি হেরইয়ে / শুনি রাই কহে মৃদু ভাষ।
কহিবার নয় কথা, বলরামের আশ্রয় হেথা / এই বনে বলদেবের বাস ॥[২] ...
(তাল : লোফা)

ছ. বিরা বৃন্দাদেবী তবে তথাই আইলা। / রাইকে বিরস দেখি কহিতে লাগিলা ॥
কহ ধনি কাহে লাগি মলিন বয়ান। / কুণ্ডক তীরে মিলহ বর কান ॥
শুনি উলসিত ধনি দুখ গেল দূর। / তবহিঁ ভকতি করি প্রণমিল সূর ॥ ...
(তাল : একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-২৯৫)

জ. দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ধন্দ। / রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ ॥
চীত পুতলি যেন রহু দুহুঁ দেহ। না জানিয়ে প্রেম কেমন অছু নেহ ॥
এ সখি দেখ দেখি দুহুঁক বিচার। / ঠামহি কেহ লখই নাহি পার ॥
ধনি কহে কাননময় দেখি শ্যাম। / সো কিয়ে গুণব মঝু পরিণাম ॥ ...
(তাল : মধ্যম দশকোশী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৫৮)

ঝ. দুহুঁ প্রেম গুরু ভেল শিষ্য তনুমন। / শিখায় দোঁহারে নৃত্য অতি মনোরম ॥
চাপল্য ঔৎসুক্য হর্ষ ভাব অলঙ্কার। / দুহুঁমন শিষ্য পরে ভূষণের ভার। ...
অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত অলংকার। স্বভাবজ বিলাসাদি দশ পরকার ॥
ভাবাদি অঙ্গজা তিন মৌগ্ধ্য চকিত। / দ্বাবিংশতি অলংকারে রাধাঙ্গ ভূষিত ॥ ...
(তাল : গড়ঘেমটা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-২৩৮-৩৯)

ঞ. সখিগণে দুহুঁ লেই কুঞ্জহি গেল। / কত রস কৌতুক তহি ভৈ গেল ॥
অতনু যাগ তব রচইতে কান। / কুন্দলতায়ে করু পুরোহিত ভান ॥
যাগভূমি ভেল শশিমুখি দেহ। / পুরোহিত করি তব মন্ত কথেহ ॥ ...

ঐ ছন কত কত করয়ে বিলাস। / যদুনন্দন রস সায়রে ভাস ॥ ...
(তাল : লোফা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-২৩৯)

ট. কানন দেবতী বৃন্দা সখী তথি / রাই এর সরসী কূলে।
বিচিত্র ঝুলনা করিল রচনা / সুখদ বকুল মূলে ॥
ঝুলনা উপরি নাগর নাগরী / আসিয়া বসিল রঙ্গে ।
ঝুলায় ঝুলনা সকল ললনা / ভাবে গদ গদ অঙ্গে ॥ ...
(তাল : একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৫৮)

---

১. বাংলাদেশের বিখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীঅশোক কুমার গোস্বামী-হতে পদটি শ্রুত। শব্দযন্ত্রে ধারণ : ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী
২. পূর্বোক্ত

ঠ. ঝুলনা হইতে নামিলা তুরিতে / গগনে নিরখি বেলা।
ফুল তুলিবারে চলিলা সত্বরে / সকল আভীর বালা ॥
ভরি ফল ফুলে শাখা সব লোলে / আসিয়া পরশে মূল।
সখি সব মেলি করিয়া ধামালি / তোলয়ে বিবিধ ফুল ॥ ...
(তাল : একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৫৯)

ড. এ ধ্বনি সুন্দরী কী কহব তোয়। / দেহ মুরলী ধনি রাখহ মোয় ॥
যতদিন জীয়ব নাগর কান । / ততদিন গাওব তুহারি নাম ॥
জীবন অবধি ধনি তুয়াবশ হাম। / গাইয়ে মুরলীতে তুয়া যশ নাম ॥ ...
ধাধসে ধরি ধনি নাগরপণি। / ইঙ্গিতে শেখর বাঁশি দিল আনি ॥ ...
(তাল : লোফা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৬০)

ঢ. পাইয়া বাঁশি নাগর হাসি / বসিলা সভার পাশে।
সকল বালা চাঁদের মালা / মুচকি মুচকি হাসে ॥ ...
ভর যুবতী নাগরি তথি / নাগর করি কোরে।
মদন দুখী শেখর সুখী / তিতিল আঁখির লোরে ॥ ...
(তাল : একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৬০)

ণ. সখীগণ হেরইতে করল পয়ান। / কৌতুক কেলি কুণ্ডে করে অবগাহন ॥
জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি। / দুহু সমর করত জল কেলি ॥
গব সখী বেড়ল শ্যামর চন্দ। / গোবিন্দ দাস হেরি রহুঁ ধন্ধ ॥
স্নান করি অঙ্গ মুছি পড়ল বেশ। সবে মিলি করে রাধাকুণ্ডে প্রবেশ ॥ ...
(তাল : লোফা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৬০)

ত. কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ। / বহুবিধ ভোজন করয়ে আনন্দ ॥
আচমন করি তাহে নাগর রাজ। / রসভরে বৈঠল কুঞ্জক মাঝ ॥
সুখদ শেজো পরি বৈঠল কান। / ধনি অবশেষ করু ভোজন পান ॥ ...
দুহুঁ অঙ্গে শুবেকত মদন বিকার। / সহচরী হেরি ভেল বাহার ॥
দুহুঁ মেলি শুতল অলস গায়। / দুহুঁ পদ সেবয়ে শেখর রায় ॥
(তাল : লোফা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৫০-৫১)

থ. রাধামাধব পাশক খেলত করি কত বিবিধ বিধান।

দুহুঁক বচন-রীতি কেবল পিরীতি দুহুঁ বর-রসক নিধান ॥ ...
ঐছন সময়ে নিয়োজিত শুক কহে জটিলা-গমন অকাজ।
রাধামোহন পহু চতুর শিরোমণি সাজল দ্বিজবর-রাজ।
(তাল : একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৯৫৩)

দ. জটিলাগমন কথা শুনি সশঙ্কিত। / সূর্যের মন্দিরে সভে হৈলা উপনীত ॥
প্রবেশিলা সবে সূর্যমন্দির ভিতরে। / হেনকালে তথা আসি জটিলা উতরে ॥
দিনমণি প্রণমিতে আইলা জটিলা। / দেখে বসিয়াছে যত আভীরীর বালা ॥ ...
শুনি কুন্দলতা গেল ব্রাহ্মণ আনিতে। / মাধব চলিল তার পাছেতে পাছেতে ॥
(তাল : একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-২৯৯)

ধ. জটিলা আসিয়া তবে কহয়ে সভারে এ বে পুরোহিত আনহ যাইয়া।
শুনি পুন কুন্দলতা হৈলা অতি হর্ষচিতা সেইক্ষণে চলিলা ধাইয়া ॥
দেখ কৃষ্ণের অপরূপ লীলা।
ধীর শান্ত কলেবর সাক্ষাৎ বিপ্রবেশ-ধর কেহ নাহি লখিতে পারিলা ॥ ...
তবে সেই তুষ্ট হইয়া রতন মুদ্রাদি দিয়া কহে নিত্য করাবে পূজন।
দণ্ডবৎ প্রণতি কৈলা রাইকে লইয়া গেলা
সঙ্গে চলু এ যদুনন্দন ॥
(তাল : লোফা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-২৪০)

ন. মিত্র পূজাইয়া বিশ্বশর্মা দ্বিজরাজ। / বটুরে লইয়া সাধিলেন নিজ কাজ ॥
মুদ্রা সহিতে বটু নৈবেদ্য বান্ধিলা। / বিদায় হইয়া দোঁহে কাননে চলিলা ॥
সখাগণ মাঝে কৃষ্ণ যাইবার তরে। / ব্রাহ্মণের বেশ সব করিলেন দূরে ॥ ...
কৃষ্ণ লৈয়া সখাগণ নানা ক্রীড়া করে। / অপরাহ্ন হৈল বলি মাধব ফুকারে ॥
(তাল : একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-২৯৯)

উপর্যুক্ত পদ ছাড়াও কীর্তনীয়াগণ আরও কিছু পদ-সংযোজন, তুক-সংযোজন করে পালাটিকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। লীলা-বিস্তারে মধ্যাহ্নকালীন লীলা গভীর তাৎপর্যময়। কারণ, এই লীলায় একাধারে বৈধীভক্তি, রাগানুগাভক্তি, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং মধুররসের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

অপরাহ্ন লীলা বা উত্তরাগোষ্ঠ লীলা

অপরাহ্নলীলার বিষয়বস্তু রাধার গৃহে আগমন, কৃষ্ণের জন্য বিবিধ ভোজদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, ব্রজপথে রাধার কৃষ্ণ দর্শন, রাধার বিরহ ইত্যাদি। লীলার সময়কাল বিকাল ৩.৬৬ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ দণ্ডকাল। লীলাটি আসরে কীর্তনীয়াগণ ‘ উত্তরাগোষ্ঠ’ বা ‘ফিরা গোষ্ঠ’ নামে পরিবেশন করে থাকেন।

নবদ্বীপলীলার বিষয়ভাব

পরাবৃত্তিং গোষ্ঠে ব্রজনৃপতিসূনোর্বিপিনতো
মহানন্দাম্বোধেঃ সপদি জনয়িত্রীং স্বহৃদয়ে।
স্মরণ্ শ্রীগৌরাঙ্গ নটতি বলতে নিঃশ্বসিতি চ

ক্ষণং মুহ্যন্ সর্ব্বান্ বিবশয়তি যস্তং ভজ মনঃ ॥

অর্থাৎ – শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াসখাগণ ও ধেনুগণ সমভিব্যাহারে বন থেকে ব্রজে আগমন করছেন সানন্দচিত্তে। মনোহর নটবরবেশ, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, গলে বনমালা, কর্ণে শোভা পাচ্ছে অশোকগুচ্ছের অবতংস। পরাগে ধূসরিত নীলাম্বুজের মতো গো-রূপে ধূসর মুখাম্বুজ। সর্বাচিত্তাকর্ষি মুরলী নিনাদিত হচ্ছে অধর-কিশলয়ে। বেণু - শৃঙ্গাদি নানাবাদ্য বাজাচ্ছেন সখাগণ। গাভীসমূহ ঊর্ধ্বপুচ্ছে 'হাম্বা' রবে ইতস্তত ধাবিত হচ্ছে জলদ-নিঃস্বনে। শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের এই মনোহর শোভা দর্শনের ভাবাবেশে যে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ স্তম্ভ-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিত হয়ে ভক্তবৃন্দকে ভাবসায়রে নিমজ্জিত করছেন – 'হে মন ! তুমি সেই দিব্যলীলানিধি শ্রীল গৌরসুন্দরের ভজন কর।'[১]

---

১. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১২৬

নবদ্বীপে শ্রীবাসের পুষ্পোদ্যানে গৌরাঙ্গ কৃষ্ণের উত্তরগোষ্ঠ লীলার উদ্দীপনে ভাবাবেশে রয়েছেন। তাঁর ভাবাবেশ জেনে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কৃষ্ণের সখাগণ ও গো-পালসহ ব্রজধামের আগমনী পদ গাইতে লাগলেন। গৌরাঙ্গের অষ্টসাত্ত্বিক ভাব জাগলো; শ্রবণ-অন্তে পরিকরসহ তিনি নগর ভ্রমণে বের হলেন। পরিকর ভক্তবৃন্দ গৌরাঙ্গকে ঘিরে কীর্তন করতে লাগল। ভক্তবৃন্দসহ গৌরাঙ্গ নবদ্বীপের বিভিন্ন গৃহে গিয়ে সেবিত বিগ্রহের আরাত্রিক দর্শন করতে লাগলেন। তিনি সপরিকরে চন্দ্রশেখর আচার্য, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, বনমালী, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, রাম রায়, স্বরূপ দামোদর, বিদ্যানিধি, নরহরি সরকার ঠাকুর, দাস গদাধর, গদাধর পণ্ডিত, রূপ গোস্বামী, অভিরাম, গৌরীদাস, হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তের গৃহে গিয়ে আরাত্রিক দর্শন ও মাল্য-চন্দনে ভূষিত হলেন। সংকীর্তন ধ্বনি শ্রবণ-অন্তে শচীমাতা মাতা যশোদার ভাবে গৌরাঙ্গসহ অন্য পরিকরদের রত্নবেদীতে বসিয়ে আরাত্রিক করেন। তাঁদের স্নান ও বেশভূষার ব্যবস্থা করেন। স্নানান্তে নানা উপচারে তাঁদের সেবা-উপকরণ নিবেদিত হলো। গৌরাঙ্গ তখন ব্রজভাবে বিভোর হয়ে যাবটে রাধার কৃষ্ণবিরহ, চন্দনকলার সংবাদ-কথন, রাধার লাড্ডুকাদি প্রস্তুতকরণ ও স্নান প্রভৃতি বিষয় অনুশীলন করতে লাগলেন। ভক্তবৃন্দও স্ব-স্ব ব্রজরসে নিমগ্ন হলেন।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

ক. সুরধনী তীরে আজু গৌর কিশোর।
সহচর মেলি আনন্দে বিভোর ॥
খেলায় বিনোদখেলা গোরা বনমালী।
পুলিন বিহার করি ভকত মণ্ডলী ॥
দিন অবসান দেখি গৃহেতে চলিলা।
জননী-চরণে আসি প্রণাম করিলা ॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ গদগদ ভাব।
এ রাধামোহন পদ করতহিঁ আফা।
(তাল : বড় দশকোশী / রূপক, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৩৬)

কোনো কোনো কীর্তনীয়া নিম্নলিখিত গৌরচন্দ্রিকাটিও গেয়ে থাকেন।

বেলি অবসান, হেরি শচীনন্দন, ভাবহি গদগদ বোল।

কানুক গমন, সময় অব হোয়ল, শুনিয়ে বেণুক বোল ॥
সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস।
প্রেমহি নিমগণ, রহ তহি অনুখন, কতিহুঁ নাহি অবকাশ ॥
ক্ষণে পুন কহই, নিকটহিঁ শুনিয়ে, ঘন হাম্বা রব রাব।
হেরইতে শ্যাম, চন্দ্র অনুমানিয়ে, গোকুল জন যত ধাব ॥
ঐছন ভাতি, করত কত অনুভব, যো রসে কৃত অবতার।
রাধামোহন পহুঁ, সো রস-শেখর, তৈছন সতত বিহার ॥
(তাল : বড় দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৩৬)

ব্রজলীলার বিষয়ভাব

শ্রীরাধাং প্রাপ্ত গেহাং নিজরমণকৃত ক্‌প্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখ কমলালোক-পূর্ণ-প্রমোদাম্।
কৃষ্ণং চৈবাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধৈণুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি ॥

অর্থাৎ–অপরাহ্নে শ্রীরাধা নিজগৃহে এসে স্নান ও বেশভূষা পরিধান করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীযশোমতিমাতার আদেশে প্রস্তুত করলেন কর্পূরকেলি, অমৃতকেলি প্রভৃতি নানাবিধ উপহার এবং বন থেকে গোষ্ঠে আগমন কালে আনন্দে বিভোরা হলেন প্রিয়তমের বদনকমল দর্শনে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও ধেনুবৃন্দ বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে ব্রজাগমন পথে শ্রীরাধা-সন্দর্শনে পরিতৃপ্ত, নন্দাদি পিতৃগণের সঙ্গে মিলিত এবং মাতৃগণকর্তৃক স্নানাদি দ্বারা মার্জিত হলেন–এতাদৃশ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি।[১]

ব্রজের যাবটে কৃষ্ণের অদর্শনজনিত বিরহতাপানলে দগ্ধ হচ্ছেন রাধা ; প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পতিত রয়েছেন। প্রিয়সখীগণ তাঁর তাপশান্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যে চন্দনকলা নামক এক সখী এসে বৃন্দাবন এবং কৃষ্ণের সংবাদ প্রেরণ করলেন এবং তিনি জানালেন যে, কৃষ্ণের নিমিত্তে রাধা দ্বারা মিষ্টাদি প্রস্তুত করানোর জন্য যশোদা কর্তৃক আদৃষ্ট হয়েছেন একথা শুনে রাধা ও সখীগণ প্রীত হলেন।

বৃন্দাবনে ধেনুবৎস চড়াতে চড়াতে অপরাহ্নকাল এসে উপস্থিত হলো। সখাগণের সাথে কৃষ্ণের মিলন হলো এবং তাঁরা নানা হাস্যরসে রত হলেন। সূর্যপূজায় বটু বা মধুমঙ্গল যে নৈবেদ্য এনেছিলেন তা নিয়ে রাখালগণের সাথে নানান হাস্য-পরিহাস সম্পন্ন হলো। কৃষ্ণ তাঁর মুরলীতে সুর সাধলেন, যাতে ধ্বনিত হতে লাগলো গাভীদের একত্রিত হবার আহ্বান। গোষ্ঠ থেকে ফেরার পথে কৃষ্ণের প্রতি দেবগণ স্তব করতে লাগলেন। এদিকে চন্দনকলা-প্রদত্ত সংবাদ শুনে রাধার বিরহতাপ প্রশমিত হলো। তিনি পরম আনন্দে কৃষ্ণ-সেবার্থে নানান মিষ্টান্ন প্রস্তুত করলেন এবং কৃষ্ণের সায়ংকালীন এবং নৈশলীলার কুঞ্জে ভোজনের নিমিত্তে পৃথক পৃথক ভাবে থালা সাজিয়ে রাখলেন। রন্ধন কার্য সমাপ্ত হলে রাধা বৈকালিক স্নান-শৃঙ্গার অর্থাৎ ষোড়শ শৃঙ্গার এবং দ্বাদশ আভরণ দ্বারা ভূষিতা হলেন। কৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষা বাড়তে

লাগল। প্রাসাদটিলায় দাঁড়িয়ে সখীগণকে নিয়ে প্রাকৃতিক গোধূলি দেখতে লাগলেন। গোধূলির সময়ে কৃষ্ণের মন্থর গতি পরিলক্ষিত হলো এবং এই গতি দর্শনে কতক্ষণে প্রাণনাথ আসবেন ভেবে রাধার অন্তরে বিরহ জাগলো। ইতোমধ্যে সেখানে নন্দালয় থেকে সখী হিরণ্যাঙ্গী এসে রাধাসমীপে কৃষ্ণবার্তা শোনাতে লাগলেন। ও দিকে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি সবার কর্ণগোচর হতে লাগল। বংশীনাদ শ্রবণে মদনোদ্বোধিতা চন্দ্রাবলী, শ্যামলা, মঙ্গলা, ভদ্রা, পালী প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ গদগদভাবে সখী সঙ্গে কৃষ্ণদর্শনে ধাবিত হলেন। সখীগণসহ রাধা কুসুম চয়নের ছলে জটিলাকে আশ্বস্ত করে কৃষ্ণদর্শনার্থে যাবট-সন্নিহিত উদ্যানে প্রবেশ করলেন। রাধা ও শ্যামলার মধ্যে নানান রসালাপ হতে লাগল। এদিকে রাধার অদর্শনে কৃষ্ণের বিষাদ হলো। অতঃপর লতান্তরাল থেকে মর্মাজ্ঞা সুচতুর সখীগণ রাধাকে আকর্ষণ করে কৃষ্ণের নয়নপথবর্তিনী করলেন।

১. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১২৭

তখন চকিত দৃষ্টিতে প্রাণনাথের প্রিয়মুখ-মাধুরী দর্শন করতে লাগলেন। রাধাকৃষ্ণের পরস্পর দর্শনানন্দ সুখ অনুভব হলো। ললিতাদি সখীগণ রাধাকে এবং সুবলাদি সখাগণ কৃষ্ণকে 'অচিরেই মিলন সম্পাদন হবে' আশ্বাস দিয়ে স্ব-স্ব পুর-প্রবেশ পথে নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণ নয়ন-অগোচন হতেই রাধা বিরহ-তাপানলে দগ্ধ হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। অতঃপর রামকৃষ্ণের সাথে নন্দযশোদাদির মিলন সংঘটিত হলো। অপরাহ্নলীলা বা উত্তর গোষ্ঠলীলায় যে-সব পদ কীর্তনীয়ারা গেয়ে থাকেন তার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত)

ক. পাল জড় কর শ্রীদাম শান দেও শিঙায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায় ॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মা পথপানে চাঞা ॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে ॥
বলরাম দাসে কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল ॥
(তাল : লোফা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৩৬)

খ. চান্দ মুখে দিয়া বেণু, নাম লৈয়া সব ধেনু, ডাকিতে লাগিল উচ্চৈঃ স্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু, উর্দ্ধ মুখে ধায় ধেনু পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ ...
শ্বেতকান্তি অনুপাম, আগে ধায় বলরাম। আর শিশু চলে ডাহিন বামে।
শ্রীদাম সুদাম পাছে, ভাল শোভা করিয়াছে, তার মাঝে নবঘন শ্যামে ॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোখুর রেণু পথে চলে করি কত রঙ্গে।
যতেক রাখালগণ, আবা আবা দিয়া ঘন, বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥
(তাল : বড় দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৩৭)

গ. জানি দিন অবসান, চলিলা চতুর কান, প্রবেশিলা কদলী কাননে।
সুবল মঙ্গল সঙ্গে, যায় নানা রসরঙ্গে, কদলী লইয়া জনে জনে ॥ ...
শিঙ্গা বেণু একতান, করিয়া দেওল শান, শুনল ব্রজের সব লোক।
মাতা পিতা হরষিত কুলবধূ পুলকিত , ঘুচিল সবার দুঃখ শোক ॥

যাবট গ্রামের কাছে, সবে নিজ ধেনু বাছে, বিদায় হইল জনে জনে।
শেখর সত্তর করি, কহে শুন সুন্দরী, মিলহ নাগর এহিখানে ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৩৭)

ঘ. দূরেতে আওত নাগর রায়।
যুবতী উমতি উন্নত চায় ॥
বিরস বদন সরস ভেল।
হিয়ার আগুনি তখনি গেল ॥
হসিত বেকত বচন মিঠ।
সজল ছুটল তলর দিঠ ॥
মুরলী খুরলী শুনিতে পাই।
অতুল আনন্দে আকুল রাই ॥ ...
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৩৮)

ঙ. ঐ না বেশে আইস আমার ঘরে ।
ঐ বেশে আইস তুমি, দাঁড়াঞা রৈয়াছি আমি, তুয়া বন্ধু লইবার তরে ॥
রবি যখন বৈসে পাটে, মুঞি গেনু যমুনার ঘাটে, তুয়া লাগি চাহি চারি পানে।
ব্রজের বালক যত, সবে চলি যাওত, আজু তুমি সবার পাছে কেনে ॥
চঞ্চল ধবলী সনে, কত না হেঁটেছ বনে, চাঁদমুখ গেছে শুকাইয়া।
আমার মন্দিরে যাইয়া, কর্পূর তাম্বুল খাইয়া, আলিস করহ তাহা গিয়া ॥ ...
(তাল : তেওট, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৩৯)

চ. বন সঞে আওত নন্দদুলাল।
গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর, আজানুলম্বিত বনমাল ॥
ঘন ঘন শৃঙ্গ, বেণুরব শুনইতে, ব্রজবাসীগণ ধায়।
মঙ্গল থারি, দীপ করে বধুগণ, মন্দির দ্বারে দাঁড়ায় ॥
পীতাম্বর ধর, মুখ জিনি বিধুবর, নব মঞ্জুরী অবতংশ।
চূড়া ময়ূর শিখণ্ডকমণ্ডিত, বাওই মোহন বংশ ॥
(তাল : দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৩৯)

অথবা,

ছ. নন্দ দুলাল বাছা যশোদা দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহারও ছাওয়াল ॥
রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
গদগদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী ॥
কোরে লইয়া নিরখয়ে যুগল পানি।
এক দিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥
নেতের অঞ্চলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার নিছনি লইয়া মরে যাউক মা।
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত কত চুম্ব দেয় বদন কমলে ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৪০)

জ. কোন বনে গিয়েছিলা ওরে রাম কানু।

আজি কেন চাঁদ মুখের শুনি নাই বেণু ॥
খির সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই সুখাঞাছে হিয়া ॥
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ফিরিলা কোন গহন কাননে ॥
নব তৃণাঙ্কুর কত ভুঁকিল চরণে।
এক দিঠ হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে ॥
(তাল : তেওট, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৪০)

ঝ. বদন নিছই মোছি মুখমণ্ডল, বোলত সুমধুর বাণী।
বেলি অবসানে তুরিতে নাহি আয়সি, তুয়া লাগি বিকল পরাণি ॥
ক্রন্দন করে ধরি রাণী।
কতহুঁ যতন করি, যশোমতী সুন্দরী, মন্দিরে বৈসায়ল আনি ॥
সুবাসিত তৈল, সুশীতল জল দেই, মাজল যতনহি অব্দ।
কুন্তল মাজি, সাজ পুন বান্ধল, চূড় শিখণ্ডক রঙ্গ ॥
মৃগমদ চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, যতনে পিন্ধায়ল বাস।
বাসিত কুমকুম, হার উরে লম্বিত, কি কহব গোবিন্দ দাস॥
(তাল : তেওট, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৪১)

ঞ. আরতি করে, নন্দরাণী, বালকমুখ হেরি।
গায়ত নব, নায়রিগণ, রাখাল সব ঘেরি ॥
রম্ভাফল, ঘৃত প্রদীপ, পুষ্প রচিত থারি।
সুন্দরীগণ, উলত দেয়, শিশুগণ করতারি ॥
রাখি শিঙ্গা বেণু, যশোদা মাই, কোলে নিল দোন ভাই।
মাখন দধি, দেই খির, খাওয়ে রাম কানাই ॥
সকল শিশুর, চাঁদমুখ তুলি, যশোমতী চুম্ব খাই।
মঙ্গল পুছে, নন্দঘোষে, শ্রীজগদানন্দ গাই ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৪২)

ট. রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে,
বামে বসাইয়া শ্যাম, দক্ষিণে বসাইয়া রাম, চুম্ব দেয় মুখ সুধা করে ॥
ক্ষীর ননী ছেনা সর, আনিয়া সে থরে থর, আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে, দেয় রাণী মহাসুখে, নিরখয়ে চাঁদমুখ পানে ॥
গোপের রমণী যত, চৌদিকে শত শত, মুখ হেরি লহু লহু বোলে।
মাতা যশোমতী মেলি, মঙ্গল হুলাহুলি, আরতি করয়ে কুতূহলে ॥
জ্বালিয়া রতন বাতি, করে সবে আরতি, হরষিত যশোমতী মাই।
কহে বলরাম দাসে আনন্দ সাগরে ভাসে, দুহু রূপের বলিহারি যাই ॥
(তাল : দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৪২)

কীর্তনের আসরে উপর্যুক্ত পালাটি চলাকালে কোনো কোনো জায়গায় ভক্তগণ একযোগে গীত-নৃত্যসহ আরাত্রিক করে থাকেন। বিশেষ ঝুমুরের মধ্য দিয়ে পালাটি শেষ হয়।

সায়াহ্ন লীলা

কৃষ্ণের গোদোহন সম্পন্নকরণ, রাধা হতে কৃষ্ণের কাছে ভোজ্য দ্রব্য প্রেরণ, কৃষ্ণের ভোজন এবং রাধার কৃষ্ণের ভোজনাবশেষ গ্রহণ, প্রত্যাবর্তন, মাতা কর্তৃক যত্ন ও আরতি গ্রহণ প্রভৃতি। লীলাটি 'উত্তর গোষ্ঠ' নামে পরিচিত। সায়াহ্নলীলার সময়কাল সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৮ টা ২৪ মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ দণ্ড।

নবদ্বীপলীলার বিষয়ভাব

সায়ন্তনীং কৃষ্ণ-মনোজ্ঞ লীলাং
স্নানাশনাদ্যাং হি মুহুর্বিচিন্ত্য।
স্বভক্তমধ্যেহনু করোতি নিত্যং
তাং যে মনস্তং ভজ গৌরচন্দ্রম্ ॥

অর্থাৎ, সায়ংকালে যে গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের স্নান, ভোজনাদি মনোজ্ঞলীলাবলি পুনঃপুন স্মরণ করে অশ্রু-পুলকাদি ভাব-ভূষণে বিভূষিত হয়ে ভক্তগণমধ্যে ভাবাবেশে তার অনুকরণ করেন—হে মন ! তুমি সেই গৌরচন্দ্রের ভজনা করো।[১]

অট্টালিকার উপরে গৌরাঙ্গ সপরিকরে কালোচিত সায়াহ্নলীলার ভাবাবেশে রয়েছেন। ভাবাবেশ দেখে স্বরূপ গোস্বামী রাধার নিকট ধনিষ্ঠার আগমন কৃষ্ণবলরামের স্নান, শৃঙ্গার, ভোজন, সখীগণসহ রাধার কৃষ্ণের অধরামৃত পান ইত্যাদি বিষয়ে কীর্তন করতে লাগলেন এবং গৌরচন্দ্রও সেই ভাবে আবিষ্ট হলেন। পরিকরবৃন্দও ব্রজের স্ব-স্ব ভাবে আবিষ্ট হলেন।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

জয় শচীনন্দন ভুবন আনন্দ।
আনন্দ-শকতি মিলিত নবদ্বীপে উয়ল নব-রস-কন্দ ॥
গোখুর-ধূলি দিশই উহ অম্বর শুনি রব বেণু-নিশান।
অপরূপ শ্যাম মধুর মধুরাধর মৃদু মৃদু মুরলীক গান ॥
এত কহি ভাবে বিবশ গৌর-তনু পুন কহ গদ গদ বাত।
শ্যাম সুনাগর বন সঞে আওল সম-বয় সহচর সাথ ॥
মঝু মন নয়ন জুড়ায়ল কলেবর সফল ভেল ইহ দেহ।
রাধামোহন হই অপরূপ নহ মুরতিমন্ত সোই নেহ ॥
(তাল : দশকোশী *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৯৩২)

ব্রজলীলার বিষয়ভাব

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেক-ভোজ্যাং
সখ্যানীতেশ-শেষাশান-মুদিতহৃদং তাং চ তাং চ ব্রজেন্দুম্ ॥
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননী-লালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্বূঢ়োস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥

অর্থাৎ, যিনি সায়ংকালে স্বীয় সখী দ্বারা স্বরমণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য নানাবিধ ভোজ্যবস্তু প্রেরণকরেন এবং সখীগণকর্তৃক পুনরানীত শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করে যিনি আনন্দিতা হন, সেই শ্রীরাধাকে এবং

সুস্নাত, রম্যবেশধারী, গৃহমধ্যে জননী কর্তৃক সংলালিত, গোষ্ঠগত, তথায় গো-দহন-ক্রিয়া সমাপ্তির পর সেখান থেকে গৃহে এসে যিনি পুনরায় ভোজন করেন – সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি।[২]

ব্রজধামের যাবটে রাধার নিকট সখী ধনিষ্ঠা এবং গুণমালা কৃষ্ণ-বলরামের সাথে নন্দ, যশোদা, রোহণী প্রমুখের মিলনের বর্ণনা করলেন। বাৎসল্যঅন্তরকৃষ্ণ বিরহে বেদনার্ত ছিল। রামকৃষ্ণের দর্শন ও সঙ্গ পেয়ে পিতামাতা এবং ব্রজবাসীদের হৃদয় মিলনরসে হলো পরমানন্দময়। রামকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্তে মাতা যশোদা নানা উপাচারে আরাত্রিক করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ-বলরাম গাভী রক্ষণে নিমগ্ন হলেন। রাধা

---

১. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৩৫

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫-১৩৬

যশোদা-আদেশে যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেছিলেন তা নন্দালয়ে প্রেরণ করলেন। নন্দালয় থেকে সখী গুণমালা কৃষ্ণের অধরামৃত এনে দিলেন। যথাযথ প্রক্রিয়ায় কৃষ্ণ-বলরামের স্নান শৃঙ্গার ও ভোজন সম্পন্ন হলো। ভোজন সমাপ্তিতে কৃষ্ণ কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে গোদোহন নিমিত্তে গোশালায় গমন করলেন। রাধা সখীগণসহ পরমোৎকণ্ঠাভরে গোশালার শোভা দর্শন করতে লাগলেন এবং ভাববিহ্বলা হয়ে সখীগণের কাছে কৃষ্ণের মাধুর্য বর্ণনা করতে লাগলেন। গভীর অনুরাগে কৃষ্ণের গাভী-দোহন দেখতে লাগলেন রাধা। কৃষ্ণ তখন ক্রীড়ার ছলে চন্দ্রশালিকায় এসে রাধার সাথে মিলিত হলেন। মিলন-অন্তে রাধাকৃষ্ণের সায়াহ্নভোজন সম্পন্ন হলো এবং সসখী রাধা কৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদন করলেন।

নিম্নোক্ত পদগুলো বাংলাদেশের কীর্তনীয়াগণ আসরে পরিবেশন করে থাকেন। (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত)

ক.
যশোমতি আরতি কর বিধানে।
গুরুকূল মঙ্গল করতহি গানে ॥
সুখভরে দ্বিজগণে করু বহু দানে।
দাসগণে তৈখনে করল সোপানে ॥ ...
নীল বসন পরলি দুহুঁ রঙ্গে।
সুগন্ধি চন্দন কেহো লেপই অঙ্গে ॥
কহে কবি শেখর করি অনুমানে।
বৈঠল দুহুঁ তব করিয়া সিনানে ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৫৮)

খ.
সময় জানিয়া তুরিত হইয়া আসিয়া ধনিষ্ঠা নারী।
যশোদা-মন্দিরে পীঁড়ার উপরে সুখদ আসন করি ॥
সুগন্ধি সলিল করিয়া শীতল পূরিয়া আনল ঝারি।
রাইক পক্কান্ন আনিয়া তখন রাখল পৃথক করি ॥
এ সূপ মুদ্গা মরিচ সুখদ যে কিছু আছিল ঘরে।
যশোদা-বচনে আনিলা তখনে কানুর ভোজন-তরে ॥
নানা রসগান করি সখিগণ চলিলা আপন ঘরে।
সময় জানিয়া থালা-মালা লৈয়া শেখর গোপন করে ॥

(তাল : তেওট, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৭১)

গ. জলপান করি কান মুখে দিয়া গুয়াপান খড়িকে চলিলা গো-দোহনে ॥
গাভীগণ স্তণভরে ঘন হাম্বারব করে কানুপথ নিরখে সখনে ॥
আইলা গোকুলচাঁদ করে ধরি ডোরি ছাঁদ আর গোপ আসি তার সঙ্গে।
ছাড়ি দিলা বৎসসব গোঠে ওঠে হাম্বারব শুনিতে বাড়িল বহু রঙ্গে ॥
দেখিয়া কানুর মুখ ধেনুর হইল সুখ বৎস পিয়ে হরষিত মনে।
পিশঙ্গী মানিকস্তনী দোহে কানু গুণমণি আর গাভী দোহে গোপগণে ॥ ...
(তাল : একতালা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৭১)

উল্লেখ্য, অপরাহ্নলীলা ও সায়াহ্নলীলা কীর্তনীয়াগণ সমন্বিতভাবে গেয়ে থাকেন। স্বতন্ত্রভাবে সাধারণত গাওয়া হয় না। তবে ষোলোকালীন (৮ + ৮ প্রহর) কীর্তন অনুষ্ঠিত হলে সেখানে উপর্যুক্ত লীলাদ্বয় আলাদা করেই গাওয়া হয়ে থাকে। অষ্টাকালীয় নিত্যলীলা উপস্থাপনে পালা দুটি একত্রে 'উত্তরা গোষ্ঠ' বা 'ফিরা গোষ্ঠ' নামে পরিচিত।

প্রদোষলীলা

ব্রজরাজ সভায় নৃত্যগীতাদি, কৃষ্ণের গৃহাগমন ও বিশ্রাম, কুঞ্জে গমন, রাধার সখীসহ অভিসার, আক্ষেপ এবং কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের মিলন। লীলাটি 'রূপানুরাগ' নামে পরিচিত। লীলাটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমত 'রূপ' এবং পরে 'অনুরাগ বা অভিসার'। প্রদোষলীলার সময়কাল রাত্রি ৮:২৪ মিনিট হতে ১০:৪৮ মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ দণ্ড। লীলাটি রূপ ও অনুরাগ পর্যায়ে বিভক্ত থাকে।

নবদ্বীপলীলার বিষয়ভাব

সমুৎকণ্ঠাসন্নাকলিতহরিবার্ত্তা বত যথা –
ভিসৃত্যাসৌ রাধা হরিমপি নিকুঞ্জে গতবতী।
তথাত্মানং মত্বা কটিনিহিত পাণির্বিশতি চ
স্খলন্ গচ্ছন্ গৌরো নটতি ধৃতকম্প্রাশ্রু-পুলকঃ ॥

অর্থাৎ, প্রদোষকালে যে গৌরসুন্দর পরমোৎকণ্ঠাভরে অভিসারিকা শ্রীরাধার ভাবে ব্যাকুলিত চিত্তে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিকভাব-ব্যাপ্ত-কলেবরে স্খলিত গতিতে কটি দেশে হস্ত নিহিত করে ভক্তগণসহ শ্রীবাস-অঙ্গনে মাধবীমণ্ডপে গমন করেন – "হে মন্ ! তুমি সেই ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের স্মরণ করো।"[১]

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ নিজ শয়ন-মন্দিরে শায়িত আছেন। প্রকৃতি নানা বর্ণে-গন্ধে সুসজ্জিত যেন ব্রজধামের আবহ প্রকাশ করছে। কুসুমের গন্ধ ও নানাবিধ পাখির কূজনে গৌরাঙ্গ হুংকার দিয়ে জাগরিত হলেন এবং ব্রজভাবে ভাবিত হয়ে পড়লেন। গৌরাঙ্গের হুংকারে পরিকরবৃন্দ জাগরিত হলেন এবং হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন শেষে দ্রুত মহাপ্রভুর শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করলেন। গৌরাঙ্গের মুখ-হস্ত প্রক্ষালন সমাপ্তিতে পূর্ব লীলার আবেশে রাধার নিকট নন্দালয় থেকে ইন্দুপ্রভা সখীর আগমন, প্রাণনাথ কৃষ্ণের অপূর্ব রূপ বর্ণন এবং অনুরাগে জর্জরিত হবার বিষয় স্মরণ করলেন। পরিকরবৃন্দও ব্রজভাবে আবিষ্ট হয়ে ব্রজলীলায়

গোবিন্দের রূপ ও অনুরাগ পর্যায়ের রসাস্বাদন করতে লাগলেন। নিম্নবর্ণিত পদগুলো কীর্তনীয়ারা আসরে গেয়ে থাকেন (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত)।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

রূপ

ক. মরমে লেগেছে গোরা না যায় পাশরা।
নয়ানে অঞ্জন হইয়া লাগিয়াছে পারা ॥
জলের ভিতরে ডুবি যেথা দেখি গোরা।

১. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৪৫

ত্রিভূবনময় গোরা চাঁদ হইল পারা ॥
তেঞি বলি গোরারূপ অমিয়া পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জেনে সাঁতার ॥
বাসুদেব ঘোষে কহে নব অনুরাগে।
সোনার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে ॥
(তাল : বড় দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৯৪)

খ. দামিনী দাম, দমন রুচি দরশনে, দূরে গেও দরপক দাপ।
শোন কুসুম তাহে, কোন গণিয়েরে, প্রাতর অরুণ সন্তাপ ॥
গোরা রূপের যাই বলিহারি।
হেরি সুধাকর, মুরছি চরণতলে, পড়ু দশনখ রূপ ধরি ॥
সুবরণ বরণ, হেরি নিজ কুবরণ, মানি আপন মনস্তাপে ॥
নিজ তনু জারি, ভসম সম করইতে, পৈঠল অনল সন্তাপে ॥
যা সম বিধিক, অধিক নাহি অনুভবি, তুলনা দিবার নাহি ঠোর।
জগদানন্দ কহু, পহুঁক তুলনা পহুঁ, নিরূপম গৌর কিশোর ॥
(তাল : বড় দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৯০)

অনুরাগ

ক. কি হেরিলাম অপরূপ গোরা রূপনিধি। / কতই চান্দ নিঙ্গাড়িয়া নিরমিল বিধি ॥
উগারই সুধা জনু গোরামুখের হাসি। / নিরখিতে গোরারূপ হৃদয়ে রইল পশি ॥
আঁখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি। / হিয়ার মাঝে গাঁথি থোব গোরার রূপখানি ॥
মনে অভিলাষ ক্ষমা নাহি হয় মোর। / গোবিন্দ দাস কহে মুঞি ভেল ভোর ॥
(তাল : বড় দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৯৩)

গ. গৌরাঙ্গ লাবণ্যরূপে, কি কহব এক মুখে, আর তাহে ফুলের কাঁচনি।
ও চাঁদ মুখের হাঁসি, জীবনা গো হেন বাসি, আর তাহে ভাতিয়া চাহনি ॥
বিহিসে গূঢ়লরূপ ছান্দে ।
কেমন কেমন করে মন, সব লাগে উচাটন, পরাণ পুতলী মোর কান্দে ॥
বিধিরে বলিব কি, করিল কুলের ঝি. আর তাহে নহি সতন্তরি।
গেল কুল লাজভয়, পরাণ রহিবার নয়, মনের অনলে পুড়ে মরি ॥
(তাল : ধরা / বড় দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-১৯২)

ব্রজলীলার বিষয়ভাব

রাধাং সালীগণান্তামসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃত-যমুনাতীর-কল্পাগকুঞ্জাম্ ॥
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥

অর্থাৎ, প্রদোষকালে যিনি কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষীয় রজনীর উপযোগী কৃষ্ণবর্ণ ও শুভ্রবর্ণ বেশভূষা ধারণ করত সখীগণসঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বৃন্দাদেবীর নির্দেশানুসারে দূতীর সহিত যমুনাতীরবর্তী কল্পতরু সুশোভিত কুঞ্জে করেন অভিসার সেই শ্রীরাধাকে এবং যিনি গোপবৃন্দের সঙ্গে শয্যোপরি শয়ন করেন ও গোপনভাবে সংকেতকুঞ্জে অভিসার করেন—সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি।[১]

---

১. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৪৬

যাবটে রত্নপালঙ্কে রাধা বিশ্রামসুখ অনুভব করছেন। বিশ্রাম-অন্তে কৃষ্ণমিলনাকাঙ্ক্ষায় বিশ্রামসুখ ত্যাগ করে উঠলেন। সখীবৃন্দও হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করে রাধাসমীপে আসলেন। ইতোমধ্যে নন্দীশ্বর থেকে সখী ইন্দুমতী এসে নন্দালয়ের বার্তা প্রেরণ করলেন। রাধা-গোবিন্দের মিলন উদ্দেশ্যে সখী ধনিষ্ঠা সখা সুবলকে তাম্বুলবীটিকা দিয়ে অভিসারের সঙ্কেত জানালেন। অতঃপর কৃষ্ণ কুসুমশয্যায় শয়নাবস্থায় সখা সুবলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে রাধার মাধুরী বর্ণনা করতে লাগলেন। মাধুর্য বর্ণনার মধ্যে কৃষ্ণ-অন্তরে রাধার অদর্শনজনিত বিরহ জন্মালো। সুবলের কাছে প্রীতিমাধুর্যময় কণ্ঠে রাধার বিরহ বর্ণনা করতে লাগলেন। এদিকে সখী ধনিষ্ঠার সংকেতবার্তা পেয়ে রাধা প্রাণনাথ গোবিন্দের রূপ-মাধুর্য বর্ণনা করতে লাগলেন। তাতে রাধা ও সখীগণের মধ্যে তীব্র অনুরাগের জন্ম হলো। অভিসারের পথে তাঁদের মন-শরীর তড়িৎ গতিতে যেতে চাইলো। কৃষ্ণ-মিলনাকাঙ্ক্ষায় তাঁদের প্রায় বাহ্যদশা লোপ পেতে লাগল। উৎকণ্ঠা, হর্ষ, বাম্য, ভয় ইত্যাদি নানা ভাবের উদয়ে প্রাণনাথ গোবিন্দের সাথে মিলনের ইচ্ছা অনিচ্ছায় ব্যাকুলিতা হয়ে পড়লেন রাধা। আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হলে গোবিন্দ-স্পর্শে রাধার অঙ্গে আনন্দ-আহ্লাদিত স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের সৃষ্টি হলো। কামাঙ্কুশধারী কৃষ্ণ ও চির প্রতীক্ষারতা রাধার মিলন সংগঠিত হলো। বৃন্দাদেবী বনপুষ্প, মাল্য, নানা আভরণের দ্বারা রাধাকৃষ্ণকে ভূষিত করলেন। যুগলরূপমাধুরী দর্শনে সকলেই পরমানন্দ লাভ করলেন এবং অপ্রাকৃত লীলা রসে নিমগ্ন হলেন।

বাংলাদেশের কীর্তনীয়াগণ আসরে নিম্নবর্ণিত পদগুলো আখরসহ পরিবেশন করে থাকেন। (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত)

ক. বেলি অবসান কালে, একা গিয়েছিলাম জলে, জলের ভিতরে শ্যামরায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে, মোহনমুরলী হাতে, পুনঃ শ্যাম জলেতে লুকায় ॥
পুনঃ জলে ঢেউ দিতে, বিম্ব ওঠে আচম্বিতে, বিম্বের মাঝারে শ্যামরায়।
পুনঃ জলে দিতে ঢেউ, কোথাও না দেখি কেউ, জল স্থির হলে দেখি তায় ॥
কর বাড়াইয়া যাই, শ্যামের নাগাল নাহি পাই, কান্দিতে কান্দিতে আইলাম ঘরে।
আমি অতি অভাগিনী, না পেলাম শ্যাম গুণমণি, সেই দুঃখে হৃদয় বিদরে ॥
বসু রামানন্দের বাণী, শুন শুন ঠাকুরাণী, অকারণে জলে নেবেছিলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া, জলে ছিল অঙ্গছায়া, শ্যাম ছিল কদম্বের তলে ॥

(তাল : মধ্যম দশকোশী, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১২০)

খ. কি রূপ হেরিনু / হেরিলাম কালিন্দী কুলে। / অপরূপ রূপ (মেঘ) কদম্ব মূলে ॥
অচলা চপলা মেঘেরি গায়। / মৃগাঙ্করহিত শশাঙ্ক উদয় ॥
নাচিছে ময়ূর জলদ'পরি। / অলিকূল আছে চাঁদেরে ঘেরি ॥
আর অপরূপ কহিল নহে। / যথা মেঘ তথা বারি না বহে ॥
হৃদয় আকাশে উদয় করি। / নয়নযুগলে বহায় বারি ॥
হেন মনে লয় বিজুরি হয়ে। জড়াইয়া থাকি মেঘের গায়ে ॥
জ্ঞানদাস কহে না কহ আন। / যে কহিলা ধনি সেই প্রমাণ ॥
(তাল : দাশপাহিড়া, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৩৯২-৩৯৩)

গ. সো বর নাগর রাজ। / তপনতনয়া তটে, নীপতরু নিকটে, হিলন নটবর সাজ ॥
মরকত মুকুর, রতন জিনি লাবণি, প্রতি তনু পীরিতি পশার।
শারদ চাঁদ, ফাঁদ মুখমণ্ডল, কুণ্ডল শ্রবণে বিহার ॥
নাচত ভাঙ, মদন ধনু ভঙ্গিম, নট খঞ্জন দিঠি জোর।
বাঁন্ধুলী অধরে, মুরলীরব মাধুরী, শ্রুতি মন মাতায়ল মোর ॥
উড়ত চূড়ে, চারু শিখি চন্দ্রক, মলয় পবন সনে মেল।
ভণে যদুনন্দন, সবহু রসায়ন, মন মন রাসায়ন কেল ॥
(তাল : তেওট, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১০৩)

ঘ. বিকচ সরোজ, জন মুখমণ্ডল, দিঠি ভঙ্গিম নটখঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরী, হাস উগারই, পি পি আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর ॥
বরণি না হয় রূপ বরণ ঠিকণিয়া ॥
কিয়ে ঘনপুঞ্জ, কিয়ে কুবলয়দল, কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া ॥ ...
কুঞ্চিত কেশ, বেশ কুসুমাবলি, শির পর শোভে শিখি চাঁদকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহুঁ অপরূপ লাবণি, সকল যুবতীমন পড়ি গেও ফান্দে ॥
(তাল : মধ্যম দশকোশী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-২৫৮-২৫৯)

ঙ. চিকন কালিয়া রূপ, মরমে লাগিয়াছে, ধরনে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙারিয়া, মুখানি মাজিয়াছে, না জানি তায় কত সুধা দিয়া ॥ ...
ভুরুযুগ সন্ধান, কামের কামান বাণ, হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটি আঁখি।
অরুণ নয়ান কোণে, চাঞাছিলে আমাপানে, সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি ॥ ...
(তাল : তেওট, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২০০-২০১)

চ. কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ, ব্যাধ ছলে কদম্বের তলে ॥
দিয়া হাস্য সুধাচার, অঙ্গ ছটা আঠা তার, আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।
মনমৃগী হেনকালে, পড়িল রূপের জালে, শূন্য দেহ পিঞ্জর রহিল ॥

কালিয়া কুটিল বাণে, কুলশীল ধরি টানে অতএব উঠিল ব্রজবাস।
প্রাণমাত্র আছে বাকি, তাহাও বুঝি যায় সখী, ভনয়ে জগদানন্দ দাস ॥
(তাল : দশকোশী, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১১৩)

ছ. অল্প বয়সে মোর, শ্যাম-রসে জর জর, না জানি কি হবে পরিণামে।
যদি নয়ন মুদে থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি, নয়ন মেলিলে দেখি শ্যামে ॥
যদি চলি যাই পথে, শ্যাম যায় মোর সাথে সাথে, চরণে চরণ ঠেকাইয়া ॥
ভ্রমেতে ফিরাই আঁখি, কোথা কিছু নাহি দেখি, মনে থাকি যেন মূরছিয়া ॥
কহিলাম তব আগে, দাগা পেলাম শ্যাম দাগে, এ ছার জীবনে কিবা দায়।
তিল তুলসী দিয়া, সমর্পণ কৈনু হিয়া, জনমের মতো রাঙা পায় ॥
(তাল : তেওট, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১২১)

জ. পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিতে, ফিরিয়া চাহিতে লাগিল দুঃখের বায় ॥ ...
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছাঁকিয়া খাইনু যদি।
অন্তরে বাহিরে, কুট কুট করে, সুখে দুঃখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী, সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি, দুঃখ যায় তার ঠাঁই ॥
(তাল : দোঠুকি, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১২৭)

ঝ. রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। / প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। / পরাণ পিরীত লাগি স্থির নাহি বান্ধে ॥ ...
গুরু গরবিত মাঝে বসি নানা রঙ্গে। / পুলকে পুরিয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥
ঘরের সকল লোক করে কানাকানি। / জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাও আগুনি ॥
(তাল : মধ্যম দশকোশী / মধ্যম একতাল, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১১৪)

ঞ. রূপের কথা কইতেছিল সখী সঙ্গে বসি। / হেনকালে রাধা বলে বাজে শ্যামের বাঁশি ॥
আর না বাজিহ বাঁশি করি অহঙ্কার। / সর্প দংশিল যেন শ্রবণে আমার ॥ ...
কি ধন পাইয়া বাঁশি কর দূতননা। / পার কি জানয়ে বাঁশি পরের বেদনা ॥
তরলে জনম তোর হৃদয় সরল। / খলের বদনে থাকি উগার গরল ॥ ...
(তাল : দাশপাহিড়া, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১০৬)

ট. বৃষভানুনন্দিনী, রমণীর শিরোমণি, নবনব সহচরী সঙ্গ।
চলিলা শ্রীবৃন্দাবনে, শ্যামচান্দ দরশনে, রসভরে ডগমগ অঙ্গ ॥
কত চান্দ জিনি শশী, মুখে মন্দ মধুর হাসি, পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী।
তার উপর সোনার ঝাঁপা, মাঝে মাঝে কনকচাঁপা, গোবিন্দের হৃদয় মোহিনী ॥ ...
ললিতা দক্ষিণ হাথে, বাম কর দিয়া তাথে, বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা।
রাইঅঙ্গের কান্তিমালা, দশদিগ কর‍্যাছে আলা, প্রেমদাস আনন্দে ভাসিলা ॥
(তাল : মধ্যম দশকোশী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-৭১৪)

ঠ. আবেশ সখীর সঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। / বৃন্দাবনে প্রবেশিল শ্যাম জয় দিয়া ॥
বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া চারিপানে চায়। / মাধবী তরুর তলে দেখে শ্যামরায় ॥ ...
এস এস ভালো হলো প্রেমময়ী রাধা । / দরশনে দূরে গেল মনসিজ বাধা ॥
নিজ কর-কমলে চরণের ধুলা ঝাড়ে। / ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে ॥
আনিয়া যমুনার জল চরণ ধোয়ায়। / নিজ পীত বাস দিয়ে চরণ মোছায় ॥
শ্যাম বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী। / জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী ॥

(তাল : দাশপাহিড়া, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১০৮)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে উপর্যুক্ত পালা দুটি স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত। একটি 'রূপ' অন্যটি 'অনুরাগ'। সাধারণত অষ্টকালীন কীর্তনে 'রূপ' ও 'অনুরাগ' আলাদাভাবে গাওয়া হয় না। দুটি বিষয়কে একত্র করে 'রূপানুরাগ' শিরোনামে গাওয়া হয়ে থাকে। অধুনা বাংলাদেশের অনেক জায়গায় ষোলোকালীন (ষোলো প্রহর অর্থাৎ দুই দিন ধরে) কীর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে 'রূপ' এবং 'অনুরাগ' পালা আলাদা করে গাওয়া হচ্ছে। তবে বিষয়টি অনেকক্ষেত্রে কীর্তনীয়ার সংখ্যার উপরেও নির্ভর করে থাকে। অষ্টকালীন কীর্তনে কীর্তনীয়া-সংখ্যা তিনজন হলে পালা দুটিকে একত্রিত করে গাওয়া হয়, আবার চারজন হলে স্বতন্ত্রভাবে গাওয়া হয়ে থাকে।[১]

---

১. ক্ষেত্র-গবেষণা-২০২১, রাধাবল্লভ অঙ্গন, বাণীবহ, রাজবাড়ী, সাক্ষাৎকারদাতা কীর্তনীয়া : অশোক কুমার গোস্বামী, গোপেশ মোহন্ত।

নক্তলীলা

রাধা-কৃষ্ণের পরস্পরের সাক্ষাৎ, আলাপ ও মিলন। কৃষ্ণের বর্ণশোভা বর্ণন, কৃষ্ণ ও রাধার সংগীতাদি ও রাসনৃত্য। উল্লেখ্য, এই লীলাটি 'রাসলীলা' নামে পরিচিত। নক্তলীলার সময় ১২ দণ্ড অর্থাৎ, রাত্রি ১০:৪৮ মিনিট থেকে ৩:৩৬ মিনিট পর্যন্ত।

নবদ্বীপলীলার বিষয়ভাব

শ্রীশ্রীবাসগৃহে মুদা পরিবৃতো ভক্তৈঃ স্বনামাবলীং
গায়দ্ভির্গলদশ্রুকম্পা-পুলকো গৌরো নটিত্বা প্রভুঃ।
পুষ্পারাম-গতে সুরত্নশয়নে জ্যোৎস্না যুতায়াং নিশি।
বিশ্রান্তঃ স শচীসুতঃ কৃতফলাহারো নিষেব্যো মম ॥

অর্থাৎ, জ্যোৎস্না-পুলকিত-নিশীথে যিনি শ্রীনাম-গান-পরায়ণ ভক্তগণে পরিবৃত হয়ে শ্রীবাসের গৃহে ব্রজের রাসলীলার ভাবে বিভাবিত-চিত্তে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক-বিকারাক্রান্ত হয়ে মধুর নৃত্য করেন এবং নৃত্য- অন্তে শ্রীবাসের পুষ্পোদ্যানে গমন করে ফল-মূলাদি ভোজন করে রত্নশয্যায় শয়ন ও বিশ্রাম করেন—সেই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গকেই আমি সেবন করি।[১]

নবদ্বীপে সপরিকরে গৌরাঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গনে পরম সুখ উপভোগ করছেন। ব্রজলীলায় আবিষ্ট হয়ে তিনি রাধাকৃষ্ণের যোগপীঠলীলার স্মৃতিতে শ্রীবাস-উদ্যানের যোগপীঠের এককোণে এসে দাঁড়ালেন। পঞ্চতত্ত্বের বাকিরা ভাব উপলব্ধি করে যাঁর যাঁর জায়গায়[২] এসে দাঁড়ালেন। অন্যান্য পরিকরবৃন্দও যাঁর যাঁর স্থান অনুযায়ী দাঁড়ালেন। সাধক পরিকরবৃন্দ তাঁদের উপযুক্ত সেবা প্রদান করলেন। অতঃপর শ্রীবাস যোগ্য উপচারে গৌরাঙ্গের সেবা ও ভজনা করলেন। স্বরূপ গোস্বামী ও পরিকরবৃন্দ বৃন্দাবনের নক্তলীলা অর্থাৎ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি, প্রিয়াসহ বন-বিহরণ ইত্যাদি বিষয়ে পদ গাইতে লাগলেন। লীলা শ্রবণে গৌরাঙ্গের অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হলো। ভক্তগণও ব্রজরসে মগ্ন হয়ে মানসপটে ব্রজলীলা দর্শন করতে লাগলেন। স্বরূপ গোস্বামী ক্রমান্বয়ে নর্মপ্রহেলী কথন-পদ, রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার পদ, রাধাকৃষ্ণের মধুপান, কুঞ্জবিলাস, জলবিহার পদ গাইতে লাগলেন এবং গৌরাঙ্গেরও লীলা-তরঙ্গ অনুযায়ী আবেশ হতে লাগল। ভক্তগণ আবেশের মধ্য দিয়ে এই পরমাদ্ভুদ লীলারস আস্বাদন করতে লাগলেন।

তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা

ক. বৃন্দবন লীলা গোরার মনে তে পড়িল
যমুনার ভাব সুরধনীরে করিল ॥
ফুলবন দেখি বৃন্দবনের সমান।
সহচরগণ গোপী সম অনুমান ॥
খোল করতাল গোরা সুমেল কবিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে গৌরাঙ্গ বিলাস।
রাসরস গোরাচাঁদ করিল প্রকাশ ॥
(তাল : বড় দশকোশী, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা ১৭৫)

---

১. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৫৫

২. টীকা : মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীগদাধর তাঁর বামে, ডানে শ্রীনিত্যানন্দ, গদাধরের বামে শ্রীবাস এবং শুরুতে অর্থাৎ নিত্যানন্দের ডানে শ্রীঅদ্বৈত

খ. আমার গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া।
অখিল ভুবনপতি বিহরে নদীয়া ॥
দিগ্বিদিক নাহি জানে নাচিতে নাচিতে।
চাঁদমুখে হরিবলে কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
গোলকের প্রেমধন দিল সবারে যাচিয়া ।
সংকীর্তন মাঝে নাচে হরিবোল বলিয়া ॥
রসে অঙ্গ ঢর ঢর মুখে মৃদু হাস।
একমুখে কি কহব বলরাম দাস ॥[১]
(তাল : দশকোশী)

ব্রজলীলার বিষয়ভাব

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ ॥

বস্ত্রহরণের সময় ভগবান গোপীগণকে যে রাত্রিসমূহের সংকেত দিয়েছিলেন, তারা সকলে পুঞ্জিভূত হয়ে যেন একটি রাত্রির রূপ ধরে এই শরতে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। শরতের যত সুগন্ধি ফুল – মল্লিকা, মালতী যূথী প্রভৃতি বিকশিত হয়ে দিব্য সৌরভে ভরিয়ে তুলেছিল আকাশ-বাতাস। মহোল্লাসময়ী সেই রাত্রি – বহু রাত্রি একীভূত হয়ে আছে যার মধ্যে – সেই আশ্চর্য সুন্দরী রজনী দেখলেন শ্রীভগবান, তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে সেটি হয়ে উঠল দিব্য, অলৌকিক এক রাত্রি। গোপীদের সাগ্রহ অধীর প্রতীক্ষা তো ছিলই, এইবার ভগবানও তাঁর অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়ার সাহায্যে তাঁকেই নিমিত্ত করে রাসক্রীড়ার সংকল্প করলেন। তিনি স্বয়ং 'অমনাঃ' (মনহীন) হয়েও নিজের প্রেমিক ভক্তগণের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য মন স্বীকার করলেন।[২]

তাবুৎকৌ, লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরনৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
গানৈর্নর্ম্ম-প্রহেলীলপন-সুনটনৈ রাসলাস্যাদি-রঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাধবীকপানৌ
ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধ-রতিরণৌদ্ধত্য-বিস্তারতান্তৌ ॥...

যাঁরা নিশীথে পরস্পর মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গ প্রাপ্ত হন, পরমপ্রিয় সখীবৃন্দসহ শ্রীবৃন্দাদেবী কর্তৃক নানা পরিচর্যায় আরাধিত হন, গান, নর্মপ্রহেলী, রাসনৃত্য, মধুপান ও নিভৃত নিকুঞ্জে বিবিধ রতিরণৌদ্ধত্য প্রকাশ করেন এবং প্রণয়িনী কিঙ্করীগণ কর্তৃক তাম্বূল, গন্ধ, মাল্য, বীজন, সুশীতল জল, পাদসম্বাহনাদিদ্বারা প্রীতির সাথে সেব্যমান হয়ে নিকুঞ্জ-নিলয়ে কুসুমশয্যায় নিদ্রা যান – সেই লীলা বিনোদী শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি।[৩]

বৃন্দাবনে নিকুঞ্জবনে রাধা ও কৃষ্ণ সখী-পরিবেষ্টিত হয়ে হাস্য-পরিহাসে মগ্ন রয়েছেন। শ্যামসুন্দর রত্নসিংহাসনের মাঝে রাধাকে বাম পার্শ্বে নিয়ে ললিত-ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়ালেন। সখী ও মঞ্জরীবৃন্দও এই

১. বাংলাদেশের বিখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীঅশোক কুমার গোস্বামী-হতে পদটি শ্রুত। শব্দযন্ত্রে ধারণ : ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী

২. গীতা প্রেস প্রকাশিত, *শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ*, গোরক্ষপুর, ২০১৯, পৃষ্ঠা-১২৮২

৩. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৫৬

অপূর্ব দৃশ্য দেখে যাঁর যাঁর অবস্থান নিলেন। আট সখী (ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইত্যাদি) আটটি দলে বিন্যস্ত হলেন। মঞ্জরীগণও আটটি উপদলে বিভক্ত হয়ে এই অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করতে লাগলেন। যুগলমাধুরী দর্শনজনিতরসনামাধুর্যে সবাই মগ্ন হলেন। শরৎকালীন পূর্ণিমা নিশিতে রাসেশ্বরী রাধারানির দর্শনে রাধামাধবের মনে রাসবিলাসমাধুরী আস্বাদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। প্রকৃতি নানাবিধ আয়োজনের মধ্য দিয়ে লীলা সহায়ক হিসেবে প্রস্তুতি নিল। এই সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা দর্শনহেতু বৃন্দাবনের প্রকৃতি, প্রাণিকূল তাদের সবটুকু উজার করে দিয়ে অপেক্ষমান রইল। ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে সেবাডালি নিয়ে প্রস্তুত রইল সবাই। শ্যাম-সুন্দর মদনমোহনের চিত্তে আনন্দের শিহরণ জাগলো। সুললিত ছন্দে তিনি আহ্বানসূচক বংশধ্বনি করতে লাগলেন। এই আবাহন মিলনের ইঙ্গিত। নিখিল বিশ্বের অনন্ত বিভু স্বীয় সৃষ্টির সাথে অর্থাৎ অনন্ত মহাবিশ্বের স্রষ্টা প্রেমকে উপলক্ষ্য করে প্রকৃতির সাথে মিলনাকাঙ্ক্ষায় আহ্বান জানালেন। এই মিলনোৎসব অনন্ত প্রেমের! মাধুর্যের! আস্বাদনের!

রাধামাধব প্রিয়াগণসহ বনবিহার করতে লাগলেন। গোবিন্দ-স্পর্শে বৃন্দাবনের নৈসর্গিক শোভা অপূর্ব হয়ে উঠলো। সজ্জিত প্রকৃতি রাধামাধবের পঞ্চেন্দ্রিয়ে আনন্দ বিধান করতে লাগল। সখীগণও এরূপ প্রকৃতি দর্শনে-স্পর্শে চরম পুলক অনুভব করতে লাগলেন এবং তাঁদের অন্তরে মদন-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত কলরব তুলল। কৃষ্ণ প্রকৃতি দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তার শোভা বর্ণনের গান গাইতে লাগলেন; সখীগণও সেই গানের ধুয়া তুলে রাধা গোবিন্দের লীলামাধুরীর গান করতে লাগলেন। পরমানন্দে রাধাবল্লভ সখীগণসহ বনভূমির শোভা দর্শন করতে করতে বংশীবটে উপস্থিত হয়ে রাধাকে বামে বসিয়ে যুগল হলেন। সখীগণ এই সুযোগে নানাবিধ সেবা করতে লাগলেন।

বংশীবটে বিশ্রাম-অন্তে রাধাবল্লভ রাধা ও সখীদের সাথে পরমানন্দে রসপরিহাসময় প্রহেলিকায় প্রশ্নোত্তরে মগ্ন হলেন। এই নর্মপ্রহেলীতে গোবিন্দের হার হলো, রাধা জয়ী হলেন। সখীগণ রাধার জয় দিতে লাগল। রাধা এই জয়ে প্রমোদিতা হলেন এবং গর্ব অনুভব করতে লাগলেন। এরপর বৃন্দাদেবী রাধাকৃষ্ণের নানাবিধ উপকরণে তৎকালোচিত সেবা করলেন। বৃন্দাদেবী রাধা-কৃষ্ণ সমীপে পুলিনশোভা বর্ণনা করতে লাগলেন যাতে গোবিন্দের মনে রাসের উদ্দীপন হয়। গোবিন্দ-মানসে রাসের উদ্দীপন হলো। বৃন্দাবচনে তাঁর হৃদয়ে উদিত হলো রাসরসের অনুপম আস্বাদন-মাধুরী! তিনি ব্যাকুল হয়ে

উঠলেন।[১] প্রিয়াগণসহ যমুনার কাছে আসলে রাধাগোবিন্দের তুষ্টিবিধানে স্বীয় জলতরঙ্গ দিয়ে চরণ স্পর্শ করে বন্দনা করলেন। রসশৃঙ্গারে গোপীগণের বিলাসবাসনা বর্ধিত হতে লাগল! যমুনাপুলিনে মদনরসাবেশে ভ্রমণ শেষে গোবিন্দ রাসচক্র-পুলিনে উপস্থিত হলেন। সখীগণসহ কৃষ্ণ 'চক্রভ্রমণ' চক্রে আরোহন করলেন। বিলাস চক্রের বিস্তৃতি – 'মধ্যস্থানে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণ এবং তিন মণ্ডলীতে আরোহন করলেন সখীমণ্ডলী। সখীগণ রাধাকর্তৃক আলিঙ্গিত কৃষ্ণকে বেষ্টন করলে স্বর্ণলতাবৃত তমালতরু যেন স্বর্ণলতায় বেষ্টিত হয়ে শোভা পায়, তদ্রুপ শোভার বিকাশ হলো'।[২] এভাবে রাধাকৃষ্ণ ও সখীগণের চক্রভ্রমণরাস সম্পন্ন হলো। চক্রভ্রমণ রাসে গোপীগণের সাথে বিলাস শেষে রাসলীলাবিশেষের জন্য

১. টীকা : অষ্টকালীন নিত্যলীলায় রাসলীলাকে মুকুটমণি বলা হয়, কারণ রসের বিস্তার এবং চৈতন্যপ্রবাহে যে দার্শনিক তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে তা অন্য লীলায় পরিলক্ষিত হয় না।

২. শ্রীল কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা রচিত, শ্রীমদ অনন্তদাস সম্পাদিত, *শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৬৪

মহারঙ্গে 'অনঙ্গোল্লাসরঙ্গ' পুলিনে উপস্থিত হয়ে রাসনৃত্য করতে লাগলেন। নিখিল বিশ্ব গোবিন্দের বংশীধ্বনি, রাধা ও সখীগণের কণ্ঠধ্বনি, সাথে নূপুর ও পদ তলে মহামাধুর্যে পূর্ণ হয়ে উঠলো। রাসলীলায় কৃষ্ণ ও প্রিয়াগণসহ রাধা অনিবদ্ধ, নিবদ্ধ–এই দুই প্রকার গানই বিশেষভাবে সপ্তস্বরের (সা, রি, গ, ম, প. ধ, নি) নিবদ্ধ পৃথক আলাপে গাইতে লাগলেন। প্রবন্ধ, বস্তু, রূপকে বিভক্ত নিবদ্ধ গান নানাবিধ ন্যাসযুক্ত করে গ্রহসমূহে বিভক্ত করে গাইলেন। ঘন, আনন্দ, তত, সুষির ইত্যাদি বাদ্য বাজতে লাগল। বিপঞ্চী, মহতী, বীণা, কচ্ছপী, রুদ্রবীণা, করিনাসিকা প্রভৃতি বীণাবাদ্য বাজতে লাগল। সেইসাথে তাঁদের নৃত্যে প্রকাশিত হলো পতাকা, ত্রিপতাকা, কর্তরীমুখ, মৃগশীর্ষ, সন্দংশ, সূচিমুখ, অর্ধচন্দ্র, পদ্মকোষ, হংসাস্য,খটকামুখ, অহিতুণ্ডক মুদ্রা (সংযুত, অসংযুত, বিপ্রযুক্ত)। কোনো কোনো গোপী ধ্রুপদী বহুপ্রকার তাল (তাল–অতীত, অনাগত, সম; যতি–সমা, গোপুচ্ছিকা, স্রোতবহা; লয় – দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত) ধারণ করতে লাগলেন। 'চঞ্চৎপুট, চাচপুট, রূপক, সিংহনন্দন, গজলীলা, একতাল, নিঃসারীমাদী, অড্ডক' প্রতীমণ্ঠ, ঝম্প, ত্রিপুট, যতি, নবকুবর, নুদঘট্টক, কুঘট্ট, কোকিলারব, উপাট্ট, দর্পণ, রাজকোলাহল, শচীপ্রিয়, রঙ্গবিদ্যাধর, বাদক, অনুকূলকঙ্কণ, শ্রীরঙ্গ, কন্দর্প, ষটপিতাপুত্রক, পার্বতীলোচন, রাজচূড়ামণি, জনপ্রিয়, রতিলীলা, ত্রিভঙ্গী, বারবিক্রম,[১]– এই তালসমূহ কৃষ্ণ ও সখীগণ ধারণ করলেন।

চিত্রাদি সখীগণের তালে ললিতা প্রভৃতি সখিগণের গানে রাসমণ্ডলে রাধার সাথে কৃষ্ণ নৃত্য করতে লাগলেন। পর্যায়ক্রমে গান ও তালকে মূর্ত করে নানাবিধ 'বোল' উচ্চারণ করতে করতে রাধা, ললিতাদি সখীগণ পৃথক নৃত্য করলেন। রাসস্থলীতে রাধার 'ছালিক্য নৃত্য', গোপীগণের অদ্ভুত নৃত্যমুদ্রা প্রদর্শিত হলো। শৃঙ্গার রসের অনন্ত কলায় মহারাস অনুষ্ঠিত হতে লাগল। স্বীয় আনন্দিনী শক্তি-সহযোগে রাসবিহার হয়ে উঠল পরম-আশ্চর্যময়। অতঃপর নৃত্যশ্রান্তা গোপীগণ গোবিন্দের সাথে নানাবিধ রসময় ক্রিড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। রাসনৃত্য সমাপন করে সখীগণ বৃন্দাদেবীর সহযোগিতায় রাধাশ্যামকে বালুকাসমন্বিত পুলিনে এনে উপবেশন করালেন। জল, ব্যজন, তাম্বূল সেবা শেষে যুগল-মাধুরী দর্শনে সকলেই অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন হলেন।

যমুনা পুলিনে বিশ্রাম-অন্তে বৃন্দাদেবী ও বনদেবীগণ কর্তৃক প্রদত্ত মধু কৃষ্ণ নানারঙ্গে সখীগণের সাথে পান করলেন। মধুমদে-মদনমদে মত্ত কৃষ্ণ সুরতরঙ্গিণী রাধার সঙ্গে মহানন্দে বিলাস করতে লাগলেন।

অতঃপর সখীগণের সাথেও মধুর বিলাস সম্পন্ন হলো। বিলাসকেলি সম্পন্ন হলে রাধা ও সখীগণ পরস্পর হাস্য-পরিহাসে মগ্ন হলেন। গোবিন্দও এসে হাস্য-পরিহাস ক্রিয়ায় যুক্ত হলেন। এক অপূর্ব ক্ষণ রচিত হলো। হাস্য-পরিহাস শেষ হলে যমুনায় জলবিহার শুরু হলো। গোপীগণ সঙ্গে কৃষ্ণ পৃথক পৃথক মণ্ডল রচনা করে জলবিহার করতে লাগলেন। জলসেচন, আদান-প্রদান প্রভৃতি ক্রিয়ার মধ্যে জলযুদ্ধ এবং কলহও সম্পন্ন হতে লাগল। কৃষ্ণ, রাধা ও গোপীগণের বিচিত্র জলবিহার সম্পন্ন হতে লাগল এবং সেবাপরা কিঙ্করীগণ তীরে দাঁড়িয়ে এই অপূর্ব লীলা দর্শন করে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হলেন।

---

১. দ্রষ্টব্য: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (১ম ভাগ)*, রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কলকাতা, ২০২১- পৃষ্ঠা-২১২-৩৩০

যমুনায় জলক্রীড়া সমাপনান্তে মঞ্জরীগণ রাধাকৃষ্ণকে সূক্ষ্ম বস্ত্রে অঙ্গমার্জন করে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করালেন। বৃন্দাদেবী সকলকে নিয়ে সুবর্ণমণ্ডপে কুসুম শয্যার উপরে উপবেশন করালেন। নীলাম্বুজ কুঞ্জে রাধাগোবিন্দ-সখীদের নৈশ ভোজনস্থান 'অরুণাম্বুকুঞ্জে' নিয়ে গেলেন। ভোজ্যসামগ্রী কৃষ্ণকে রাধা নিজহাতে পরম সুখে পরিবেশন করলেন। কৃষ্ণও পরমসুখে ভোজন সম্পন্ন করলেন। কৃষ্ণের ভোজন সম্পন্ন হলে রাধা ও সখীগণ তাঁদের নৈশভোজন সমাপ্ত করলেন। কন্দর্পকেলি মন্দিরে বিন্যস্ত রত্নপালঙ্কের উপর কুসুমরচিত শয্যায় বৃন্দাদেবী গোবিন্দকে শয়ন করালেন। দাসীগণ তাম্বুল, বীজন, পদসেবন দ্বারা গোবিন্দের সেবা করতে লাগলেন। অতঃপর রাধা সখীগণকে নিয়ে গোবিন্দের শয্যা পালঙ্কে এসে বসলেন। ললিতা-বিশাখা রাধাগোবিন্দকে তাম্বূল দান করলেন এবং রূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী রাধাগোবিন্দকে ষোড়শোপচারে অর্চনা করলেন। ক্রীড়াভিলাষী কৃষ্ণ রাধার চরণ-সম্বাহন করার প্রত্যাশা জানালেন। কৃষ্ণের এই প্রত্যাশা পূরণে সকলেই নিকুঞ্জ-মন্দির থেকে নিঃসৃত হলেন। সেবাপরায়ণ মঞ্জরীগণ যুগলের শয়নমন্দিরের বাইরে থেকে পরমানন্দে কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন রেখে যুগলের লীলামাধুরী আস্বাদন করতে লাগলেন। রসালয়ে রাধাকৃষ্ণ সুখনিদ্রায় শায়িত হলেন।

রাসলীলায় যেসব পদ কীর্তনীয়াগণ আসরে পরিবেশন করে থাকেন তার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করছি। (ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত)

ক. শারদ চন্দ, পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ, ফুল্লমল্লিকা মালতীযূথি মত্ত মধুকর ভোরণী।
হেরত রাতি, ঐ ছন ভাতি, শ্যামমোহন মদনে মাতি, মুরলী গান, পঞ্চম তান কূলবতী চিত চোরণী ॥
শুনত গোপী, প্রেম রোপি, মনহি মনহি আপনা সঁপি, তাহি চলত, যাহি বোলত মূরলীক কল কোলনী
বিছুরী গেহ, নিজহি দেহ, এক নয়নে কাজর রেহ, বাঁহে রঞ্জিত, কঙ্কণ এক, এক কুণ্ডল দোলনী ॥
শিথিল ছন্দ, নিবিক বন্ধ, বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ, খসন বসন রসন চেলি গলিত বেণী লোলনী।

ততহিঁ বেলি, সখিনী মেলি, কেহ কাহুক পথ না হেরি, ঐছনে মিলল গোকূল চন্দ গোবিন্দ দাস বোলনী॥

(তাল : চঞ্চুপুট, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৯৪)

খ. বিপিনে মিলল গোপনারী, হেরি হাসত মুরলীধারী
নিরখি বয়ন পুছত বাত, প্রেমসিন্ধু গাহিনী।
পুছত সবক গমনক্ষেম, কহত কিয়ে করব প্রেম,
ব্রজক সবহু কুশল বাত, কাহে কুটিল চাহনি ॥ ...
(তাল : চঞ্চুপুট, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৯৬)

গ. ঐছন বচন কহল যব কান। ব্রজরমণীগণ সজল নয়ান ॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ করণী। অবনত আননে নখে লিখু ধরণী ॥ ...
এতহুঁ কহল ব্রজ যৌবত মেল। শুনি নন্দ নন্দন হরষিত ভেল ॥
করি পরসাদ তহিঁ করত বিলাস। আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস ॥
(তাল : একতালা, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৯৮)

ঘ. কাঞ্চণ মণিগণ, জনু নিরমাওল, রমণীমণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ, মহামরকত সম, শ্যামর নটবর রাজ ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাসবিহার। খির বিজুরি সঞে, চঞ্চল জলধর, রস বরখিয়ে অনিবার ॥
কত কত চান্দ, তিমির পর বিলসই, তিমিরহি কত কত চান্দে।
কনকলতায় তমালই কত কত, দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে ॥
কত কত পদুমিনী, পঞ্চম গাওত, মধুকর ধরু শ্রুতি ভাষ।
মধুকর মেলি কত, পদুমিনী গাওত, মুগধল গোবিন্দ দাস ॥
(তাল : বড় দশকোশী, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-২৯৯)

ঙ. বাজত ডম্ফ, রবাব পাখোয়াজ, করতল তাল ভরল একু মেলি।
চলত চিত্রগতি, সকল কলাবতি, করে করে নয়ানে নয়ানে করু খেলি ॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী। জলদ পুঞ্জে জনু, তড়িত লতাবলী, অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি ॥
নটন হিল্লোল, লোলমণি কুণ্ডল, শ্রমজল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রসভরে গলিত, ললিত কুচ কুঞ্জক, নীতি খসত অরু কবরিক বন্ধ।
দুহুঁ দুহুঁ সরস, পরশ রস লালসে, আলসে রহত লুলাই।
গোবিন্দ দাস পহুঁ, মুরতি মনোভব, কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই ॥
(তাল : ধ্রুব, *শ্রীশ্রীগীত-রত্নাবলী*, পৃষ্ঠা-৩১২)

চ. অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো, মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগো, বেণনা সংজগৌ দেবকীনন্দনঃ ॥
অর্থাৎ, দুইজন গোপীর মধ্যে মাধব অথবা দুই পার্শ্বে দুই মাধব, মধ্যে এক গোপী –
এইভাবে মণ্ডলীর মধ্যে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদন করতে লাগলেন।
(তাল : লোফা, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১৭৩-১৭৪)

ছ. পাহিলে প্যারী, পদুমিনী ধনী, কঙ্কণে ধরি তান।
কৈচে নাচবি, নাচহ দেখি, মুরলীতে নহে গান ॥
রাখালের গাঁথা বনমালা পরি, রমণী ভুলান নয়।
কঙ্কণের তালে, নাচিতে নাচিতে, তাল ছাড়া কেন হয় ॥
ময়ূর পাখির, পাখায় বিনোদ, শিরে নহে চূড়া বাঁধা।
কদম্ব তলায়, ত্রিভঙ্গ হইয়া পায়ে পায়ে নহে ছাঁদা ॥
বয়ানে হাস, মধুর ভাষ, বোলত সব সখী।
কঙ্কণের তালে, গোবিন্দায় বলে, একবার নাচত গিয়া দেখি ॥
(তাল : লোফা, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১৭৪)

জ. চাঁদবদনী নাচত দেখি, তাত্তা থৈয়া থৈয়া তিনিখিটি তিনিখিটি ঝাঁ।
না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর। দ্রুতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্জীর ॥
বিষম সঙ্কটে তালে বাজাইব বাঁশি। ধনু অঙ্ক মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী ॥
হারিলে তোমার লব বেশর কাঁচলী। জিনিলে তোমারে দেব মোহন মুরলী ॥
যেমন বলেন শ্যাম নাগর তেমন নাচেন রাই। মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিকে চাই ॥
সবাই বলে রাইয়ের জয় নাগর হারিলে। দুঃখিনী কহয়ে গোপীমণ্ডলী হাসালে ॥
(তাল : ধামালী, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১৭৫)

ঝ. শ্যাম তোমাকে নাচতে হবে, ঝেন্দা ঝেনা খেটা থোউররলাগঝিনি ঝাঁ।
না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড নূপুরের কড়াই। না নড়িবে বনমালা বুঝিব বড়াই ॥
না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টি শ্রবণের কুণ্ডল, না ন ড়িবে নাসার মতি নয়নের পল ॥
ললিতা বাজায় বীণা বিশাখা মৃদঙ্গ। চিত্রা বাজায় সপ্তস্বরা রাই দেখে রঙ্গ ॥
তুঙ্গবিদ্যা কপিনাস তাম্বুরা রঙ্গদেবী। ইন্দুলেখা পিনাক বাজায় মন্দিরা সুদেবী ॥
উদ্‌ভট্ট তালে যদি হার বনমালী। চূড়া বাঁশী কেড়ে লব দিব করতালি ॥
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী। নইলে কারাগারে রাখিব দুঃখিনী শুনি হাসি ॥

(তাল : ধামালী, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১৭৫)

ঞ. নাচত নব নন্দলাল, রসবতী করি সঙ্গে।
রবাব খবাব বিণ কাপিনাস, বাজত কত রঙ্গে ॥
কোই গায়ত, কোই বায়ত, কোই ধরত তাল।
সখীগণ মিলি নাচই গাওই, মোহিত নন্দলাল ॥
শুক নাচিছে সারী নাচিছে বসিরা তরুর ডালে।
কপোত কপোতী দুজনে মিলিয়া ধরিছে কতই তালে ॥ ...
সুমেরু সহিতে পৃথিবী নাচিছে যার তটে ভালিরে ভালি।
গোবর্ধন গিরি আনন্দে নাচিছে যার তটে রাস কেলি ॥
এসব নাছন দেখিয়া মগন বহিছে আনন্দধারা।
নিমানন্দ দাস নাচন দেখিয়া নাচিছে বাউল পারা ॥
(তাল : ধামালী / লোফা, *বৈষ্ণব পদাবলী*, পৃষ্ঠা-১০১৩-১০১৪)

ট.	রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ ভবনে, এলায়ে অলস ভরে।
শুতল কিশোরী আপনা পাশরি পরাণনাথের কোরে ॥
সখী হের দেখনিয়া যা।
নিদ যায় ধনী, ও চাঁদবদনী, শ্যামের অঙ্গে দিয়ে পা ॥
নাগরের বাহু, সিথান করিছে, বিথার বসন ভূষা।
নাসার নিঃশ্বাসে, বেসর দুলিছে, হাসিখানি মুখে মিশা ॥
পরিহাস করি, নিতে চায় হরি, সাহস না হয় মনে।
ধারি করো বোল, না করিও রোল, দাস জগন্নাথ ভণে ॥
(তাল : একতালা, *পদামৃত-লহরী*, পৃষ্ঠা-১৭৭)

নক্ত বা রাসলীলায় কীর্তনীয়াগণ মণ্ডল তৈরী করে অপূর্ব নৃত্য-সহযোগে উপর্যুক্ত পদগুলো আখর-সহযোগে পরিবেশন করে থাকেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে অষ্টকালীয় নিত্যলীলা স্মরণের কীর্তনে যে বিষয়বস্তু আশ্রয় করে গান গাওয়া হয় তা নিম্নবর্ণিত ছকে উদ্ধৃত করা হলো :

অষ্টকালীয় নিত্যলীলা স্মরণ-কীর্তন

↓

রসোদগার | গোষ্ঠ লীলা | সূর্যপূজা | উত্তর গোষ্ঠ | রূপ | অনুরাগ | রাসলীলা | কুঞ্জভঙ্গ

অষ্টকালীন কীর্তন গানের ক্ষেত্রে দেখা যায়। অধিবাসঅন্তে প্রাতঃকালীন সময়ে সাধারণত ভোর ৬টা থেকে পরবর্তী ভোর ৬টা পর্যন্ত উল্লিখিত লীলাগুলি গাওয়া হয়ে থাকে। পালাগুলির সময়োচিত বিন্যাস থাকে এভাবে–

ভোর ৬ টা থেকে সকাল ৯ টা	:	জাগরণ, রসোদ্গার লীলা কীর্তন।
সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১২ টা	:	গোষ্ঠ লীলা কীর্তন।
দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টা	:	সূর্যপূজা লীলা কীর্তন।
বিকাল ৩ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা	:	উত্তর গোষ্ঠ লীলা কীর্তন।
সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত ৯ টা	:	রূপ লীলা কীর্তন।
রাত ৯ টা থেকে রাত ১২ টা	:	অভিসার লীলা কীর্তন।
রাত ১২ টা থেকে রাত ৩ টা	:	রাস লীলা কীর্তন।
রাত ৩ টা থেকে ভোর ৬ টা	:	অলস ও কুঞ্জভঙ্গ বা নিশান্ত লীলা কীর্তন।

বাংলাদেশের কীর্তনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, চার দল বা সম্প্রদায়ের উপস্থিতি থাকলে উল্লিখিত সময়োচিত বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়, তবে তিন দল বা সম্প্রদায় থাকলে সময়ের ব্যাপ্তি হয় প্রতিটি পালা চার ঘণ্টা।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পদাবলি কীর্তনচর্চা ও তার বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পদাবলি কীর্তনচর্চা ও তার বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পদাবলি কীর্তনচর্চা ও তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ প্রসঙ্গ তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করা যায় :

১. বাংলাদেশে পদাবলি কীর্তনের ক্রমবিকাশের ধারা,
২. পদাবলি কীর্তনচর্চা বিষয়ক অঞ্চলভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, এবং
৩. ভৌগোলিক পরিবেশের নিরিখে তথ্য যাচাইপূর্বক বিশ্লেষণ।

১.বাংলাদেশে পদাবলি কীর্তনের ক্রমবিকাশের ধারা

বাঙালির ধর্মসাধনা ও ধর্মচর্চার ইতিহাস সুপ্রাচীন। এই চর্চা ও সাধনার সূত্র ধরে সাধক কবিরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গান রচনা করে জনসমাজে পরিচিতি লাভ করেছেন। প্রাচীন বাঙালি সমাজে প্রায় প্রতিটি স্তরেই সৌরশক্তির নানামাত্রিক পূজা-অর্চনার প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময়ে গাণপত্য ধর্মের কিছুটা প্রসার ও প্রভাব দেখা যায়। তবে তা বহুল প্রসারিত হয়নি। পর্যায়ক্রমে শক্তি ও শৈব আরাধনা ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। এই শক্তি ও শৈব আরাধনা প্রায় সমান্তরালভাবে এখনো চলমান রয়েছে। এই আরাধনার সূত্র ধরেই সাধন-পদ্ধতি বিষয়ক কিছু গান রচিত হতে দেখা যায়। মূলত এগুলোই কীর্তনের আদি পর্যায়ের গান। যার ধারা বাংলার লোকসংগীতে এখনো দেখা যায়। যেমন : মনসার গান, রয়ানী গান, গাজনের গান, ধর্ম ঠাকুরের গান প্রভৃতি। এছাড়াও মুসলিম শাসনামলে সুফি সম্প্রদায়ের প্রভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের গান ও তার ধারা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এর মূলে ছিল নানাবিধ ধর্মীয় প্রকাশ-প্রকরণ এবং তার তাৎপর্য সন্ধান। গুরুত্বের বিচারে বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণবধর্মমত জনজীবনে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম স্তম্ভ 'ভক্তিবাদ'। চৈতন্যের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ভক্তিবাদী আন্দোলন সুদৃঢ় হয়। পূর্ববর্তী সাধকদের চিন্তার সামগ্রিকতাকে ধারণ করে চৈতন্যদেব তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে ভক্তির জাগরণ ও সর্বস্তরে তা প্রচারের যে পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল কীর্তন গান। বলা যেতে পারে,চৈতন্যের হাত ধরে বাংলায় কীর্তনের পুনর্জন্ম হয়েছিল। কীর্তনকে চৈতন্যদেব শুধু ধর্মীয় আচরণের মধ্যেই রাখেননি, 'নববিধা ভক্তির' অন্যতম অঙ্গ হিসেবে স্থান দিয়েছিলেন।

সভ্যতা ও জাতিসত্তার বিকাশের ধারায় নৃত্য ও সংগীতের রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। অধ্যাপক মেনথিন এই বিকাশের পর্যায়কে চিহ্নিত করতে গিয়ে নৃত্য ও সংগীতের প্রকৃতির ধারাকে নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন:[১]

শিকার → পশুপালন → কৃষিকর্ম

পুরুষ | স্ত্রী

বৈশিষ্ট্য : ১. গানে ছন্দ ও গতির প্রাচুর্য
২. একক গান

বৈশিষ্ট্য : ১. গানে সুরের প্রাচুর্য
২. সমবেত গান

---

১. দ্রষ্টব্য: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (১ম ভাগ)*, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০২১, পৃষ্ঠা-৭২

পাশ্চাত্য সংগীত বিশারদW. D Humbly তাঁর *The Tribal Dance* (1926)-এ প্রাগৈতিহাসিককালে উদ্ভূত সংগীত ও নৃত্যের গতিপ্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে বিন্যাস-পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন তা উদ্ধৃত করছি :

সংগীত ও নৃত্য

সামাজিক
১. জন্ম-সম্বন্ধীয়
২. সংস্কার-সম্বন্ধীয়
৩. বিবাহ-সম্বন্ধীয়
৪. বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানমূলক
৫. যুদ্ধ-সম্বন্ধীয়

ভৌতিক ও ধর্মমূলক
১. পূজা সম্বন্ধীয় (সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, সর্প, বৃক্ষ, পিতৃ পুরুষ, ভূতপ্রেত ইত্যাদি)
২. খাদ্য-সম্বন্ধীয় (পশু শিকার, বৃষ্টি-বন্দনা, ফসল-উৎপাদন বিষয়ক ইত্যাদি)
৩. রোগ-সম্বন্ধীয়
৪. মৃত্যু ও মৃতদেহ সম্বন্ধীয়।[১]

অর্থাৎ, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, সুপ্রাচীনকালের অধিবাসীরা প্রথমে অরণ্যচারী হিসেবে এবং পর্যায়ক্রমে গুহাগাত্রে, নির্দিষ্ট স্থানে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাস করলেও তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল সামাজিক বন্ধন। স্বজন-পরিজন নিয়ে একত্রে বসবাসেরও যথেষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মান-অভিমান থেকে বা শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই তারা মূলত সংগীত ও নৃত্যের আয়োজন করতো এবং নৃত্য-গীত হয়ে উঠেছিল তাদের জীবনের অপরিহার্য উপাদান।

উপর্যুক্ত তথ্যের সূত্র ধরে বলা যায়–প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবন ও যাপনপদ্ধতির মধ্যথেকেই সংগীত ও নৃত্যেরউন্মেষ ঘটেছে। অতঃপর কালপরিক্রমায় তাতে বিবর্তন-পরিবর্তন-সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে।

সংগীতের ক্ষেত্রে স্বরের লীলায়নে এক বা দুই স্তরের স্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং tempo ও timing-এর ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয়ে তা গোছালো ও আধুনিক হয়েছে। বর্তমানে যে কীর্তন-পদ্ধতি তাতেও প্রাচীনকালের ধারা ও প্রবণতার প্রভাব রয়েছে। যেমন : প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণা থেকে জানা যায়,আদিম মানুষেরা হাড়ের বা বাঁশের বাঁশি তৈরি করতে জানত।[২] তাদের নৃত্যে সময়ভিত্তিক ধারা চিহ্নিত করা গেছে। সংগীতে সুরের মধ্যে একটি, দুটি বা কখনো কখনো তিনটি স্বরের সমাবেশ ছিল। পূর্বে প্রদত্ত ছক-অনুযায়ী বিভিন্ন পর্বে বা উৎসবে নানান ছন্দে ও ছন্দের বিশেষ গতিতে একদিকে যেমন নৃত্য হতো অন্যদিকে গান গাওয়া হতো। নৃত্যের ক্ষেত্রে উদ্দাম গতি, বাদ্যযন্ত্রের পরিকল্পিত ব্যবহার (মৃদঙ্গ, বাঁশি প্রভৃতি), করতালি (করতালির দ্বারা নৃত্য ও সংগীতের ছন্দ ঠিক

১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (১ম ভাগ)*, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০২১, পৃষ্ঠা-৭২

২. ED Yong, 3500-year-old German Flutes display excellent Kraftwerk, 2 June 24, 2009. www.nationalgeigraphic.com

রাখতো), শরীর সঞ্চালন, বিশেষ ভূতাপসারণ গুরুত্ব পেত। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে–দলগত সংগীতের অনুষ্ঠান, যা আমাদের বর্তমান কীর্তনের আঙ্গিককে চিহ্নিত করে। আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় তাহলো, লৌকিক স্বরের প্রক্ষেপণ যা এখনো (বিবর্তিত রূপে) পরিদৃশ্যমান। যেমনঃ প্রাচীন যুগের মধ্যম–ম, গান্ধার–গ, ঋষভ–রি, ষড়জ–স, ধৈবত–ধ, নিষাদ–নি, পঞ্চম–প অর্থাৎ পূর্বের লৌকিক স্বরের যে ক্রম তার আবহ ঠিক রেখে গতির ক্ষেত্রে বর্তমানে যে রূপ পাওয়া যায় তার স্বরসজ্জার রূপ ঐ সময় থেকেই থাটের বা স্কেলের পূর্ণায়ত ধারারই বিবর্তিত রূপ। আবার কীর্তনের ক্ষেত্রে যে বিকার, বিশ্লেষণ, বিকর্ষণ, অভ্যাস, বিরাম, স্তোভ-এর বিন্যাসকৃত রূপ দেখতে পাওয়া যায় তার উৎসও প্রাচীন।[১] সুতরাং, ভারতীয় অধ্যাত্ম সংগীতের ধারায় বৈষ্ণব পদাবলি অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত ও বিবর্তিত হলেও গায়নরীতি ভারতীয় ক্ল্যাসিক রীতির অনুরূপ এবং যার উৎস সুপ্রাচীন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।বৈষ্ণব আন্দোলনের (১৪০০ খ্রি. হতে ১৫৮০ খ্রি. পর্যন্ত) স্থিতিকাল ধরে বিচার করলে দেখা যায় পদাবলি কীর্তনের ক্রমবিকাশ উক্ত আন্দোলনের সাথে গভীরভাবেসম্পর্কিত। একদিকে তার যেমন রয়েছে রাজনৈতিক পটভূমি অন্যদিকে আছে জাতিভেদ থেকে বাঁচার আকুতি। বৈশিষ্ট্যগত কারণে বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনকে আমরা নিম্নোক্তভাবে বিভাজিত করতে পারি এবং বর্ণিত বিভাজনের পথ ধরে বাংলায় কীর্তনের ক্রমবিকাশের ধারাটিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সহজতর হবে।

ক. প্রাক-চৈতন্য যুগ (১৪৮০-১৫১০ খ্রি.)
খ. চৈতন্যযুগ (১৫১০-১৫৩৩ খ্রি.)
গ. চৈতন্যোত্তর যুগ (১৫৩৩-১৫৮০ খ্রি.)[২]

চৈতন্যজীবনীগ্রন্থসমূহে চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণসেবা, গীতা-ভাগবতীয় ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও পরিবেশনের তথ্য পাওয়া যায়। কীর্তননির্ভর চৈতন্যের যে প্রচার ও সাধনা তার শুরুটা ছিল দাক্ষিণ্যাত্যের আলোয়ার সম্প্রদায়ের প্রভাবপুষ্ট। প্রাক-চৈতন্য যুগেই এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। স্থানিক, ব্যক্তিক ও সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব আন্দোলন যেমন বেগবান হতে থাকে তেমনি কীর্তনচর্চাও সংগঠিত ও পরিশীলিতরূপে উপস্থাপিত হতে শুরু করে। চৈতন্যযুগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য। প্রাক-চৈতন্য যুগ থেকে চলে আসা স্থান, সম্প্রদায় ও ব্যক্তিভিত্তিক প্রচেষ্টা অবলুপ্ত

করে বৃহত্তর পরিসরে বৈষ্ণবধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞে কীর্তন হয়েউঠেছিল প্রথালুপ্তি ও মিলনের অন্যতম হাতিয়ার। কারণ, বিভিন্ন ভক্তিমার্গী সম্প্রদায়ের মধ্যে (যাদের লক্ষ্য এক হলেও তারা নানান মতের অনুসারী ছিল) বিভক্তিকেচৈতন্য ভক্তিবাদের প্লাবনে বিলুপ্ত করতে পেরেছিলেন এবং একক ভক্তগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভক্তিবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর সময় থেকেই কীর্তন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এ-সময়ে বেশ কিছু শক্তিমান পদকর্তা আবির্ভূত হন। নবদ্বীপ এবং নীলাচলে এই কীর্তনকে উপলক্ষ্য করেই বৃহত্তর ভক্তসমাজ জড়ো হন এবং ভক্তিবাদের মর্মে রাধাকৃষ্ণ-লীলামাধুর্য ও তার দর্শন বৈষ্ণব গ্রন্থ ও বৈষ্ণব পদাবলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। ব্রজমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল, উৎকলমণ্ডল ভক্তিরসের সূত্রে একীভূত হয়ে ওঠে এবং চৈতন্যের নেতৃত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এক অভূতপূর্ব দার্শনিক ধারার যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশের রাজশাহীর খেতুরীর জমিদার-তনয় চৈতন্যসাধক প্রেমভক্তিমহারাজ নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়

১. দ্রষ্টব্য : রমেশচন্দ্র দত্ত অনুদিত, *ঋগ্বেদ-সংহিতা* ২য় খণ্ড, শ্লোক নং-৬/৬/১০, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-২০১৫

২. সুনীতি ভূষণ কানুন গো, *বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলন*, সিগনেট লাইব্রেরি, ১৮ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ১৯৮৭। পৃষ্ঠা-৯।

'খেতুরী মহাসম্মেলন'-এর মধ্য দিয়ে আসরভিত্তিক কীর্তনের যাত্রা শুরু হয় এবং তাঁর সৃষ্ট ঘরানার মাধ্যমে বাংলাদেশে কীর্তন নব উদ্যমে যাত্রা শুরু করে। ব্যাপ্তি কম হলেও সেই ধারা এখনো বাংলাদেশে বিদ্যমান আছে। একক প্রচেষ্টায় এবং মন্দিরকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে দুই ধরনের কীর্তন: নাম কীর্তন ও লীলা কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে; যার মধ্য দিয়ে চৈতন্য-প্রবর্তিত দার্শনিক ধারা ও ভাগবতীয় সাধনধারার চর্চা হয়ে থাকে।

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের বিষয়ভাব, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তিত ধারার স্বরূপ

বাঙালিমননে 'পদাবলি' শব্দটির অবস্থান এক তাৎপর্যপূর্ণ স্থানে আসীন। প্রাচীন বাংলাসাহিত্য, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য এমনকি আধুনিক সাহিত্যধারায়ও পদাবলি ঐতিহ্যে, মননে ও প্রকাশমানতায় এক বিশেষ তাৎপর্যপরিগ্রহ করেছে। মার্গ ও দেশি সঙ্গীতধারায় পদাবলি যুগ-পরিক্রমায় শুধু বিশিষ্ট গীতিকবিতাই হয়ে ওঠেনি, বরং তা মানবমনের অষ্টসাত্ত্বিক ভাবকে বিকশিত করেছে। 'পদ' শব্দটির প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় ভরতের *নাট্যসূত্র*গ্রন্থে। মহাকবি কালিদাস তাঁর *মেঘদূত* কাব্যেও 'পদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আচার্য ভরত ও কালিদাস উভয়ই 'পদ' শব্দটি দ্বারা সংগীতকেই বুঝিয়েছেন।[১] ভরত নাটকেরঅঙ্গ বা সহায়ক-রূপে *নাট্যশাস্ত্রে* সংগীতের আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য, *নাট্যশাস্ত্রে*র সকল অধ্যায়েই সংগীতের কিছু না কিছু প্রসঙ্গ আছে। বিশেষভাবে, 'আটাশ থেকে তেত্রিশ অধ্যায়ে সংগীত-বিষয়ক আলোচনার প্রয়াস বেশি লক্ষণীয়। *নাট্যশাস্ত্রের*আটাশ অধ্যায়ে সংগীতকেভরত নৃত্য-গীত-বাদ্যের সুষ্ঠু ও প্রণালীবদ্ধভাবে উপস্থাপন করেছেন।[২] শ্রুতি, স্বর, থাট, ঠাট বা মেল, অংশ, গ্রহ, ন্যাস, রাগ ও অলঙ্কার প্রভৃতির বিন্যাসেই সংগীতের অপূর্ব মাধুর্য প্রকটিত। বৈদিকযুগ থেকে শুরু করে আধুনিকযুগেও সংগীতের চর্চা প্রণালীবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এই প্রণালীবদ্ধ রূপময়তাই 'পদ', যা সংগীতরূপে ব্যবহৃত হয়েছে ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* এবং কালিদাসের *মেঘদূত*কাব্যে।

প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের ইতিহাসেও সংগীতকে 'পদ' শব্দে ভূষিত করা হয়েছে। সংগীতশাস্ত্রে 'পদ' শব্দটি পারিভাষিক শব্দরূপে বিবেচিত হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী প্রাচীন বাংলায় লেখা বৌদ্ধ চর্যাগানের যে পুঁথি প্রকাশ করেন; ভূমিকায় তিনি এই গানের নাম *চর্যাপদ* দিয়েছেন। 'চর্যাগীতি বাংলা

'পদে'র বা পদাবলি সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন।[৩] মূলত পদসাহিত্য হলো গাইবার মতো গীতি-কবিতা, ভাব ও অনুভূতির কথা। এই অনুভূতির প্রতি ঝোঁক প্রথমাবধিই বাঙালিমননে গভীর স্থান দখল করেছিল এবং তাদের মানসিকতা লক্ষ করা যায় পদসাহিত্য বা গীতি-কবিতার দিকে। চর্যাপদওপ্রচলিত-অপ্রচলিত নানা রাগ-রাগিনীতে পরিপূর্ণ। বৌদ্ধ সাধকেরা চর্যাগুলো নানা রাগ-রাগিনীরসমন্বয়েই পরিবেশন ও আত্মসাধন করতেন। প্রাচীন *ব্রাহ্মণ*ও *উপনিষদে* সংগীতের ধারা লক্ষণীয়। বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ, সূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলিতে সংগীতের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। *ঋক্*, *সাম*,*যজুঃ* ও *অর্থব*-বেদের চারটি ধারার এক-একটি *সংহিতা* নামে অভিহিত। বৈদিক গ্রন্থেও সংগীত এসেছে পদবন্ধরূপে। অর্থাৎ, 'বৈদিক গানই হয়েছে সামগান।'[৪] *ছান্দোগ্য উপনিষদে* সামগানের মধ্যে একটি

১. নীলরতন সেন, *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা - ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১

২. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (২য় ভাগ)*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কলকাতা - ১৯৯১, পৃষ্ঠা-২৪৪

৩. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা-১ম খণ্ড*, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২৬

৪. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (২য় ভাগ)*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা - ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৬

বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও ব্যবহারিক উপযোগিতার স্থান আছে। সেখানে গায়ত্র্য-সামকে প্রাণশক্তি বলা হয়েছে। 'উদ্দেশ্যমূলক কামনাযুক্ত ছিল গানগুলি।'[১] সুতরাং বলা যেতে পারে, পদাবলি শব্দটির উৎস দেশীয় ভাষা, কিন্তু শব্দটির উৎসমূল প্রাচীন।কবি জয়দেব গোস্বামী দ্বাদশ শতকের শেষভাগে এসে তাঁর *গীতগোবিন্দ* কাব্যের আখ্যায়িকাপত্রে মধুর কোমলকান্ত সংগীতের নাম দিলেন 'পদাবলি'। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ সাগ্রহে এই 'পদাবলি' শব্দটিকেই তাদের সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখলেন। জয়দেবই পদাবলি শব্দটির প্রথম সার্থক ব্যবহারকারী।

শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা পদাবলির মুখ্য বিষয়বস্তু। রসের বিভাগে(সখ্য, শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর) বাৎসল্য ও সখ্য রসের পদসম্ভারে কল্লোলিত পদাবলির শ্রীঅঙ্গন। তবে মধুর রসের প্লাবনে বৈষ্ণবীয় রাগমার্গ হয়ে উঠেছে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। আর এর মূলে রয়েছে ভক্তিবাদ। 'ভক্তিতত্ত্বের রয়েছে শাস্ত্রীয় উৎস'।[২] দেবী, শ্রী, রাত্রি প্রভৃতি এবং *ঋগ্বেদে* বশিষ্ঠ প্রভৃতির উক্তি ভিত্তি করে বরুণ, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির সাথে ভক্তির সম্পর্ক ও তার কার্যকারণ লক্ষ করা যায়। *উপনিষদসমূহ*, বিশেষভাবে *বৃহদারণ্যক*, *শতপথ-ব্রাহ্মণ*, *কঠ*, *ছান্দোগ্য*, *তৈত্তিরীয়* প্রভৃতি এবং *পঞ্চরাত্র*,*শৈবসংহিতা*, *ভক্তিসূত্র* প্রভৃতিতে ভক্তিমতের আদর্শ ও পরিপ্রেক্ষিত পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য অনেক গবেষকউল্লিখিত শাস্ত্রসমূহের মাঝে প্রদর্শিত তত্ত্বকে মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করেননি; এমনকি বৈষ্ণবীয় সাধ্য-সাধনার বিষয় যুগলতত্ত্বকেও। অবশ্য বৈষ্ণবীয় চেতনায় পরমাত্মায় বিলীন হবার বা জীবাত্মার সাথে তার অপ্রাকৃত প্রণয়রূপ রসাস্বাদন, আদিমভারতের শক্তি ও শক্তিমানরূপে 'আদিমযুগলে' বিশ্বাসের প্রতিরূপ হলেও তার উৎসমূল সুদৃঢ় এবং শাস্ত্রীয় উৎসধারা হতে নির্ণীত। ফলে, অনায়াসেই চৈতন্য-পরবর্তী সময়ে ঐ একই ধারার বিবর্তিত রূপ বৈষ্ণবসমাজ তাদের সাধনায় কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে। মুখ্য বিষয় অনেকেই মনে করেন 'তত্ত্ব'; অবশ্য শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাও দেওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু একটু গভীর অনুসন্ধান করলেই বোঝা যাবে বৈষ্ণবীয় চেতনা তত্ত্ব নয় ভক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবীয় দর্শন এবং ভাবাদর্শের মূলে রয়েছে ভক্তিবাদের শক্ত খুঁটি। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও বৈষ্ণব পদাবলিই তার অনন্যদৃষ্টান্ত। চৈতন্যপূর্ব যুগে পদাবলির আঙ্গিক ও বিষয়ভাবে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষণীয়; তবে উৎসমূলের মূলচেতনা বা সাধনার বস্তুতে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর এই সূক্ষ্মরসধারা কুসুমে-পল্লবে সুশোভিত হয়ে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য:

> আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তারপর রূপ, সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যে জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়।[৩]

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বৈষ্ণবীয় ধারা বিশেষ করে পদাবলির উৎস ভক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু ভক্তিসাধনার ইতিহাস সুপ্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগ হতেই তার যথেষ্ট নিদর্শন

১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (২য় ভাগ)*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা-১৯৯১, পৃষ্ঠা-৩৫

২. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*(২য় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা - ২০০৩,পৃষ্ঠা-৬

৩. *বঙ্কিম রচনাবলী(২য় খণ্ড)*, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা - ২০০৪, পৃষ্ঠা-৬৪৭

পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ *মন্ত্রে*, *ব্রাহ্মণে*,*উপনিষদে*, *নিরুক্তে*, পাণিনী'র *অষ্টাধ্যায়ী*-তেও ভক্তিবাদ ও সাধন-মার্গ দৃষ্টিগোচর হয়। *উপনিষদের* 'উপাসনা-কাণ্ড'-এর অস্তিত্ব সর্বজনগ্রাহ্য এবং আমরা দেখতে পাই *শ্রীমদ্ভাগবতগীতার* কাণ্ড বিভাগ অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ-এর থেকেই কল্পিত হয়েছে। সুতরাং, গীতার ভক্তিমার্গের উদ্ভববেদের উপাসনা-কাণ্ড হতেই এতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এই ধারা থেকে সাধারণ মানুষ বিচ্যুতহয়ে পড়ে। অবশ্য এই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে।

সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, বিবর্তিত সময়ে বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ কেবল সমাজের বিত্তশালীদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। জ্ঞানের দুর্গম মার্গ ও তার অনুশীলন সর্বোপরি আত্মতৃপ্তি লাভ সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সময়ের বিবর্তনে জ্ঞান ও কর্ম – এই মার্গদ্বয়ের অনুশীলন সমাজের উভয় স্তর থেকে অবরূদ্ধ হয়ে পড়ে এবং অধিকতর আকৃষ্ট হতে থাকে অবৈদিক নীতিপ্রধান বৌদ্ধ ধর্মমতেরদিকে। কিন্তু সমাজের একটি বিশাল অংশ চিত্তপ্রসাদ লাভে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। তারা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন মানসিক শুষ্কতা ও অবসাদ থেকে পরিত্রাণের পথ। পরে দেখা যাবে, ভক্তির প্রাণময় প্রবাহধারায় উল্লিখিত যে শুষ্ক ধর্মীয় রীতি তা থেকে তাঁরা পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে ঋষি শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

> It is true that these things (viz, the ideas of Maya, Lala divine Immanence etc) are realized by the mass of men more readily through the Favour of devotion than by a strenuous effort of thinking. But that is as it must and should be, since the heart of man is nearer to the Truth than his intelligence.[১]

গৌড়ীয় দর্শন অনুযায়ীচৈতন্যদেবএকাধারে প্রেমঘন মুরতি ও মহাভাবতত্ত্বের জীবন্ত বিগ্রহ। কেননা বাঙালির ভাবপর্যায়ের যে জাগরণ তা চৈতন্যদেবের করস্পর্শেই সম্ভব হয়েছিল। ভক্তিরসধারায় পল্লবিত যে হৃদয়ানুভূতির অনুষ্ঠান তিনি করেছিলেন তাতে তিনি কালবিচারে হয়ে উঠেছেন সর্বজনগ্রাহ্য যুগধর্মপ্রবর্তক 'মহাপ্রভু'। লীলাবিস্তারকারী চৈতন্যদেব ভাগবতীয় প্রেমরসধারার ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপ আস্বাদন করেছেন। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের এ-বিষয়ে মতামতঃ

আস্বাদনের জগতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী, লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের মধুররসস্রাবী *কৃষ্ণকর্ণামৃত* কাব্য ও জয়দেবের ললিত-কোমল-কান্ত-পদাবলী*গীতগোবিন্দ*, রায় রামানন্দ-রচিত *জগন্নাথবল্লভ* নাটক প্রভৃতি গ্রন্থের নিরন্তর শ্রবণ, মনন ও আস্বাদন যে তাঁর হৃদয়ের সহজাত ভক্তিভাবকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, কোরকিত, পুষ্পিত ও ফলিত করে তুলেছিল।[২]

একদিকে তন্ত্রের প্রয়োগ-প্রচার, অপরদিকে ঐতিহ্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান। ফলে বৈষ্ণবীয় আচার-অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব গান ও কবিতা উপেক্ষণীয় ছিল না। কীর্তনের যে রসময় ধারা তা চৈতন্য-পূর্ব যুগ হতেই বাংলায় বহুলাংশে প্রচলিত ছিল। বাংলায় বৈষ্ণবীয় ধর্মাশ্রয়ে উল্লিখিত ধারা দুটি খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আসীন হয়ে রয়েছে।চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙালি সমাজে ভাববাদী আদর্শের ক্ষেত্রে সু-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্যদেবের জীবনকালে এই ভাব এক ১.

Sri Aurobindo, *The Foyndations of Indian Culture -J,* Birth Centenary Library, (?) Vol-14.পৃষ্ঠা-১২৮

২. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়,* ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র, *আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,*কলকাতা১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৩

মহাতরঙ্গের সৃষ্টি করে। এই তরঙ্গ বাঙালির ইতিহাসে এক অভিনব সংযোজন। এই সময় বাঙালির পুনর্জাগরণের সময়।

চৈতন্যদেবের অমিয়জীবনগাথায় সবচেয়ে বড় বিষয় মানবীয় সহজভাবের সাধন। চৈতন্য তাঁর পূর্ববর্তী যে সব কবির পদাবলি আস্বাদন করেছিলেন তাতে আনন্দলাভের মুখ্য বিষয় ছিল মানবপ্রেম। যেমন: জয়দেব তাঁর কোমলকান্ত পদাবলিতে যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমচিত্র এঁকেছেন সেখানে তাঁরা দেহভাব পরিত্যাগ করে লৌকিক প্রেমাবেশেই ধরা দিয়েছেন। প্রেমভক্তির সাথে বিলাসকুতূহলীদের রসের আনন্দ এক হয়ে গেছে। কবি বিদ্যাপতিও রাধাকৃষ্ণের যে বহুবিচিত্র যৌবনলীলার চিত্র এঁকেছেন সেখানে মানবীয় প্রেমাবেদন এবং তার প্রভাব কম নয়। ধর্মাচরণে মানবীয় ও সহজভাবের সাধন প্রতিষ্ঠায় চৈতন্য যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ। তিনি সব শ্রেণির মানুষকে ভক্তির পথ দেখিয়েছেন, প্রেমেদীক্ষা দিয়েছেন। ফলে, চৈতন্যদেব এবং তাঁর প্রদর্শিত বৈষ্ণব ধর্ম বাংলাদেশের হৃদয়ের বস্তু হয়েছে।

চৈতন্যযুগের পদাবলির বিষয়ভাবের বৈশিষ্ট্য

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণব সমাজে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনের ধারাটি চেতনাগত। সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে উপাসনার লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত বৈষ্ণব মতের নানা বিষয়ে বিচিত্র লীলানুষঙ্গ এসে যুক্ত হয়। এগুলো বৈষ্ণবীয় দর্শন ও পদাবলিতেও উঠে আসে। বৈষ্ণবীয় মননের সঙ্গে যুক্ত হয় সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণা। বৈষ্ণব পদকর্তারা দেখিয়েছেন, সৃষ্টির শুরুতে পরমপুরুষ স্বরূপ বিধাতা একা ছিলেন (একমেবদ্বিতীয়ম্), এক পর্যায়ে নিঃসঙ্গতামুক্তি ও আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্তে নিজ অংশভূত নারী স্বরূপাকে সৃষ্টি করে 'যুগল' হলেন (একোহম বহুস্যাম)। এই পরম পুরুষ ও প্রকৃতি থেকেই 'মায়াব্রহ্ম' ও 'বিষ্ণুশ্রী' তত্ত্বের উদ্ভব হলো। সৃষ্টির উদ্ভব রহস্য প্রকাশিত হলে অন্তস্তলে এই ধারণা উন্মোচিত হয় যে, মিলনের মধ্যদিয়ে সৃষ্টির উদ্ভব এবং তার মর্মমূলে রয়েছে প্রেম। সুতরাং সৃষ্টির ধারাটি প্রেমজ; কাম হতে উত্তরণের বা কামাতীত অতীন্দ্রিয় জগতের এক মধুর লীলা। সৃষ্টির এই প্রেমজ

ধারায় স্রষ্টা ও সৃষ্টি আনন্দ সহচর হলেন। অতঃপর বিভিন্ন শক্তিতে বিভক্ত হয়ে আনন্দ আস্বাদন চলতে থাকে। আস্বাদনের পর্যায়ে বিচিত্র অনুভবে রঞ্জিত হলো প্রেম। কারণ, অনুরাগের মধ্য দিয়েই হয় প্রেমের উন্মেষ। প্রেমের সার্থক উপলব্ধি ঘটে বিরহবোধে। আর চরম সার্থকতা নিরূপিত হয় মিলনে। এই মিলনসুখই বৈষ্ণবীয় দর্শন এবং চৈতন্য যুগ ও উত্তর যুগের সাধনার বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় আচারমার্গে এমনকি পদাবলির রসময়তায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এভাবেই চৈতন্যদর্শন হিসেবে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব' স্থাপন করেছেন।

পদাবলিতে চৈতন্যযুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে নদীয়ায় অবতীর্ণ গৌরাঙ্গলীলা এবং যুগলরূপ বা অভেদরূপের অনুরাগরঞ্জিত উপস্থাপন। প্রাক-চৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণ যে স্তরের প্রেমিক-প্রেমিকা; চৈতন্যাবির্ভাবে তাদের স্বরূপগত পরিবর্তন ঘটে পদাবলিতে। গোপীশিরোমণি রাধার সঙ্গে মহাভারতের নায়ক-অবতার কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এই প্রণয়ই জীবাত্মা-পরমাত্মার রূপক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল বৈষ্ণব সাহিত্যে, ধর্ম-দর্শনে, সাধন-ভজনের অবলম্বন হিসেবে। তবে পদাবলির মধ্যে এই জীবাত্মা-পরমাত্মার বিরহ-মিলনের তত্ত্ব খুঁজতে যাওয়া বৃথা প্রয়াস মাত্র। রাধা এখানেজীবাত্মার প্রতীক নন। তিনি পরমব্রহ্মের 'হ্লাদিনী শক্তি' এবং জীবব্রহ্মের 'তটস্থাশক্তি'। জীবব্রহ্মের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় *নারদপঞ্চরাত্র* গ্রন্থে। গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জীবব্রহ্ম হচ্ছে তিনিই– যিনি স্বয়ং পরমেশ্বর হতে নির্গত, স্বভাবত সর্বগুণাতীত হয়েও গুণ-রাগের দ্বারা রঞ্জিত। সেই তটস্থ চিদ্রূপই জীব। শ্রীজীব গোস্বামীর ভাষ্য অনুযায়ী ব্রহ্মের শক্তির ভাগ তিনটি :

ক. চিৎশক্তি - যা ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি।
খ. মায়াশক্তি - যা ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তি।
গ. তটস্থাশক্তি - যা মূলত জীবশক্তি।

চৈতন্যযুগে পদাবলির উপজীব্য হলো পাঁচটি ভাবের বিষয়। তাহলো – শান্ত ভাব, দাস্য ভাব, সখ্য ভাব, বাৎসল্য ভাব এবং মধুর ভাব। পদাবলি সাহিত্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের পদ সৃষ্টি হয়েছে বেশি। পাঁচটি ভাবই একে অপরের পরিপূরক। শান্ত ও দাস্য ভাবের মর্ম না অনুধাবন করলে সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করা যায় না। আবার চারটি ভাবের সমন্বিত আস্বাদনীয় রূপ মধুরভাবের আস্বাদন। যারমূল উপসর্গ তৃষ্ণাত্যাগ। শান্তভাবের প্রধান লক্ষণ – কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ। এখানে সেবাভাব নেই। দাস্যভাবের প্রধান লক্ষণ – বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা। বাৎসল্য ভাবের লক্ষণ – মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা, নিষ্ঠা। মধুরভাবের লক্ষণ – আত্মসমর্পণ, মমত্ববোধ, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠা। বৈষ্ণবীয় সাধনায় তথা ভজন-পূজনরীতিতে এবং পদাবলি সাহিত্যে উল্লিখিত ভাবের বিন্যাস অন্যতম উপজীব্য। বিশেষত রাধার যে ভাববর্ণনা, সেখানে কামগন্ধ নেই। কামসম্পর্কিত কোনো কোনো শব্দ ব্যবহৃত হলেও তার অর্থ প্রাকৃত কাম নয়। ভাবের নির্যাস যে প্রেম তা গোপীদের ভাব। বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম অনুষঙ্গ তা। চৈতন্যযুগেই দেখা যায়, চৈতন্যের লীলা ও ভাবের অনুসরণ করে পদাবলি আস্বাদনের একটি রীতির প্রচলন হয়। বৈষ্ণব পদাবলির কীর্তনে একে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলা হয়।

এই অসাধারণত্বই চৈতন্য এবং চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এক অলোকগত অলৌকিক রস মানবিক প্রাণপ্রকৃতির সর্ববিধ বন্ধনকে দিব্যপ্রেমের ছোঁয়ায় মুক্ত করে দিয়েছে। পদাবলির ছোঁয়ায় মানবমন দিব্যপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছে। এই মহিমার জাগরণ হলে হৃদয় উন্মুখ হয় অসীমের স্পর্শ পেতে। শুধু স্পর্শেই ক্ষান্ত হয় না, পরমসত্তাকে গভীর, গভীরতর করে পেতে তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। হৃদয় প্লাবিত হয় ভক্তি-তরঙ্গে। তখন ব্যক্তি হয় ভক্ত আর প্রেম ভক্তি। দুইয়ের মিলনে হৃদয় ছুটে যায় প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে, একত্বের দিকে।

চৈতন্য আবির্ভাবে বাঙালি মানসে যেমন ভক্তি-তরঙ্গের প্লাবন সৃষ্টি হয় তেমনি ভাব-তরঙ্গের অভিঘাতে সৃষ্টি হয় গীতিরসময়ধারা পদাবলি; যা ভাবে, বিন্যাসের প্রাচুর্যে অনন্য এবং উপভোগ্য।

চৈতন্যোত্তর যুগ

বৈষ্ণব ধর্ম এবং পদাবলির যথার্থ বিকাশের সময় চৈতন্য-উত্তর যুগ। কারণ, বৃন্দাবনে ষড়গোস্বামীর বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ এবং বৈষ্ণব ধর্মে প্লাবিত শিক্ষিত পদকারগণ এই সময় বৈষ্ণবধর্ম ও তত্ত্বের একটি সুস্পষ্ট ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। পদাবলি হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। সুতরাং এই পদাবলির রসাস্বাদন করতে হলে বৈষ্ণবতত্ত্বের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আবশ্যকতা রয়েছে। কিন্তু কাব্যরসিকের একটি সাধারণ প্রশ্ন হতে পারে, তা হলো – পদাবলি সাহিত্যের রস আস্বাদনে বৈষ্ণব তত্ত্বের ভূমিকা কতটুকু? প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক। স্মর্তব্য, বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি। যেমন সুফি, বাউলদের গান শুধুমাত্র কবিতা বা গান নয়। এগুলো তাঁদের সাধনসংগীত। চর্যাগীতিতেও আমরা বিষয়টির পরিচয় পাই। চর্যাপদের রস আস্বাদন করতে হলে বৌদ্ধ সাধনতত্ত্ব জানার আবশ্যকতা রয়েছে। তেমনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রচনার যথার্থ রস আস্বাদন করতে হলে বৈষ্ণব তত্ত্ব বা তাঁদের সাম্প্রদায়িক তত্ত্বকথা জানা নিতান্ত আবশ্যক বলেই আমাদের অভিমত।

বৈষ্ণব দর্শনে ভাবুক বৈষ্ণব দেখালেন এক অপূর্ব বিষয়ের তত্ত্বরসসারবস্তুকে। পঞ্চভূতময় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি নয়, অনন্ত। অর্থাৎ, সংখ্যাতীতের ধারণাপ্রসূত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ব্রহ্মা; স্থিতি ও পালনের স্রষ্টা বিষ্ণু এবং সংহারের স্রষ্টা রুদ্র মহাযোগী শিব। যাঁদের অনন্ত সৃষ্টিযজ্ঞে এ অনন্তলোকে প্রতিনিয়ত অবতরণ হচ্ছে স্রষ্টারূপী অবতরীর। কিন্তু কৃষ্ণ অবতার নন। তিনি অবতরীর সুদক্ষ পরিচালক। কারণ :

> ঈশ্বর পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
> অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণ্ম ॥*(ব্রহ্মসংহিতা-৫/১)*
> অর্থাৎ কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি অনাদি ও আদি কেননা সর্ব কারণের কারণ তিনিই গোবিন্দ।[১]

তিনি জানার অতীত, চিন্ময়, শুধুমাত্র ভক্তের অভিষ্ট পূরণের নিমিত্তে তিনি কৃপাসূত্রে ভক্তকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তাঁর অনন্ত রূপের দর্শন করান।[২]

এর প্রমাণ *শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়* পরিলক্ষিত হয়। যেখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। সুতরাং ঈশ্বররূপী কৃষ্ণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হয়েও অপ্রাকৃত চিন্ময় সব ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কর্মজনিত

গুণে অলঙ্কৃত। তিনি সর্বগুণের ভোক্তা ও ভরণকারী। তাহলে কীভাবে এই অনন্ততত্ত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়? বৈষ্ণবগণ তাঁর সান্নিধ্য আশায় গীতাকে উপলক্ষ্য করলেন। তাঁরা দেখালেন – যাঁরা ভক্ত, তাঁরা ভক্তির দ্বারা পরমতত্ত্বকে জানতে পারে। কৃষ্ণ কেমন? তাঁর তত্ত্ব কী? তত্ত্বের অন্তর্নিহিত রসের উৎস

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২১

২. *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* ৩/১৯ নং শ্লোকে এ-বিষয়ে বলা হয়েছে –

অপাণিপাদো জবানো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃনোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহাত্মম্ ॥ – এই শ্লোকে দেখা যায় উপনিষদের ঋষিগণও ঐকান্তিক প্রেম-সাধনা ছাড়া যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অক্ষিসমক্ষে দৃশ্যমান হয় না সেই বিষয়ে তাদের আত্মানুভূতির দর্শনজনিত বিষয় উল্লেখ করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতগীতায়* ত্রয়োদশ অধ্যায়, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ-এ ১৪-১৫ নং শ্লোকে সর্বতঃ পানি-পাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম... ইত্যাদিতেও বিষয়টির বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাই। *ব্রহ্মসংহিতার* ৫/৩৭ শ্লোকে বলা হয়েছে- গোলক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ – অর্থাৎ যদিও তিনি সর্বদাই তাঁর চিন্ময়ধাম, গোলক বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করছেন, তবুও তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। নির্বিশেষবাদীরা এই অপূর্বতত্ত্বের সন্ধান পান না।

একমাত্র পরম ভক্তই কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করে অপ্রাকৃত রসের রসাস্বাদন করতে পারে। এইস্তরে এসে ভক্ত-ভগবান এক গভীরতর বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানও ভক্তপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় এ-বিষয়ে বলেছেন:

> ঔপনিষদিক কাল হতে যে ব্রহ্ম পরতত্ত্ব রূপে অঙ্গীকৃত হয়ে আসছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিকগণের নিকট তা আর পরতত্ত্ব থাকল না, তা হল পরতত্ত্ব ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ। পরতত্ত্ব হলেন, ভগবান প্রোক্ত 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। 'তু' শব্দে অভিলক্ষিত নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ ভগবান শব্দবাচ্য। পরতত্ত্ব কৃষ্ণ সগুণ, সবিশেষ, সশক্তিক, সাকার চরম তত্ত্ববস্তু। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি তাঁর অবতার, এঁরা তাঁর অংশ বা কলা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অভিমত, ভগবান তিনি যিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী এবং যাঁর ভবগত্তায় অপরের ভগবত্তা সাধিত হয়।[১]

বিষ্ণুপুরাণ-এ এই ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানের ষড়বিধ ঐশ্বর্যের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়; যিনি সর্বশক্তিতে বিরাজমান অর্থাৎ, গুণানুপাতিক শক্তিতে বর্তমান। যাঁতে সৎ-চিৎ-আনন্দ শক্তি সমভাবে বিকাশমান। আর আনন্দশক্তিই তাঁর স্বরূপশক্তির আধার এবং অন্যান্য শক্তি থেকে তা স্বতন্ত্র।

চৈতন্য-উত্তর যুগের পদাবলির বিষয় ভাবের বৈশিষ্ট্য

চৈতন্য-উত্তর যুগের পদাবলির দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে আমরা মনে করি 'সাধ্যসাধন' তত্ত্বকে। কারণ মানব জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটির সন্ধান এই তত্ত্বের মুখ্য বিষয়। রায় রামানন্দের সাথে চৈতন্যদেবের সংলাপে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের দার্শনিক রূপরেখার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিমানুষের আত্মপরিচয়ে স্বধর্ম আচরণ গুরুত্বের সাথে রামানন্দ প্রথমেই আলোচনা করলেন। সাধারণত মানুষ সামাজিক জীবনে একটি বর্ণ ও বংশের পরিচয়ে নিজের অবস্থান সুস্পষ্ট করে থাকে। তার বংশসূত্রের মধ্যেই শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী উদ্দিষ্ট কর্তব্য নিরূপিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই স্বধর্ম আচরণই বিষ্ণুভক্তির প্রধান উপলক্ষ্য। বিষ্ণুই এখানে সাধ্য, সর্বোপরি মুখ্য সাধ্য। ভক্তি সাধনার অঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ গৌণ সাধ্য।

সুতরাং স্বধর্ম হচ্ছে সেই আচরণীয় পথ যেখানে এক ধর্মানুশাসনের মধ্যে থেকে একজাতীয় মনোবৃত্তির উদ্বোধন; যা আত্মশান্তি, সমৃদ্ধি, পরিজন ও পরিবেশের নানাবিধ কর্মের দ্বারা সার্বিক পরিতুষ্টি সাধন করে থাকে। ভক্তির স্বরূপ 'নবধা' উপায় অবলম্বনে সাধিত হয়। বলা যেতে পারে, নিজের বা দশের প্রতি কর্মাসক্তি দ্বারা উদিষ্ট কর্ম সম্পাদনের মধ্যেও যখন আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ভগবত সাধনায় সকলের জন্য সুখ-শান্তি কামনা করা হয় এবং 'নবধা' উপায় অবলম্বন করা হয়, তাই ভক্তি অভিধায় সিক্ত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত*-এ এ বিষয়ে বলা হয়েছে :

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বুদ্ধিঃ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ॥
অর্থাৎ বিষ্ণুর নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এই-নব লক্ষণা ভক্তি।[২]

---

১. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১১২

২. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), দেবসাহিত্যকুটীর, কলকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২০৬-২১০

রাগানুগা ভক্তির উদযাপনই পদাবলির মুখ্য বিষয় এবং রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জক্রীড়ার কথা স্মরণ-মনন-আলাপনের মধ্যদিয়ে নিরন্তর রসাস্বাদন করার বিষয়ভাবই পদাবলিতে আলোচিত হয়েছে। পদাবলির দার্শনিক ভিত্তিও উল্লিখিত বিষয়ের নিগূঢ় তাৎপর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাৎপর্যের নিগূঢ় বিষয় – নিরন্তর কৃষ্ণনাম, গুণ, যশ, রাধার আদর্শের সাধনা করা। অনুরাগাশ্রিত পথে বৈষ্ণবগণ কীর্তন করেন, বিগ্রহে আত্মতন্ময় হয়ে ওঠেন। আপনারজন ভেবে প্রিয়তম রাধাকৃষ্ণকে মালা-তুলসী-চন্দন প্রদান করেন। তারা ধীরে ধীরে লীলাসুখ বিহারে দিব্যোন্মাদ হয়ে ওঠেন। রাগানুগা ভক্তিপথের কোনো করণীয় আচরণ বা বিধিবদ্ধ প্রণালী নেই। তাঁরা স্বাধীন থেকে নিয়ত ভগবানকে পুত্ররূপে, সখারূপে, প্রভুরূপে, চিরমধুর কান্তরূপে অন্তরের তীব্র থেকে তীব্রতর অনুরাগকে পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রদান করেন। ভক্ত-ভগবানের অপূর্ব সম্মিলন বিকশিত হতে হতে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

চৈতন্যযুগে আমরা দেখেছি পূর্বযুগ হতে স্বতন্ত্র ধারায় পদাবলির জগত বিকশিত হয়েছে। চৈতন্যের স্পর্শে ভাব-তন্ময়তার জগতেই শুধু নয়, তাঁকে কেন্দ্র করেই পদাবলির বিষয়ভাবে রূপান্তর সাধিত হয়েছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বৈষ্ণব তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপিত হয়নি। চৈতন্য-উত্তর যুগে এসে চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের দার্শনিক ভিত্তি রচিত হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো নবপ্রেমানুরাগের একান্ত ভজনের তাৎপর্যমণ্ডিত দিক। বৈষ্ণব আচার্যগণ দেখালেন, কীভাবে রাধার সাথে কৃষ্ণের নিয়তই নব নব ভাবে ও রসে আনন্দোচ্ছল মিলন সংঘটিত হচ্ছে। সখীগণ কীভাবে সেই নিত্যলীলার পরিকল্পনা ও বিস্তার করছেন। কীভাবে ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা, ভক্তির রসমঞ্জরীর পথ অনুসরণ করে আস্বাদন করছেন। এই আস্বাদক বা রসিক ভক্ত আস্বাদ্য বস্তু বা রসকেই ভাববিগলিত উপায়ে উপস্থাপন করেছেন পদাবলিতে।

চৈতন্য-উত্তর যুগে এসে দেখা যায়, নীলাচল-বৃন্দাবনে গৃহীত চৈতন্যলীলা সম্পর্কে এই নতুন অভিব্যক্তি ও উপলব্ধি সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। অর্থাৎ, কৃষ্ণ ও চৈতন্যের ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলার সমসূত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় বৈষ্ণবধর্মের নতুন ও পূর্ণাঙ্গ পথের রেখাচিত্র অঙ্কিত হয় এবং

বৈষ্ণব পদাবলিরও দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়। চৈতন্যযুগ থেকে চৈতন্যোত্তর যুগের রসময়তার ধারায় একটি সুস্পষ্ট পার্থক্যও পরিলক্ষিত হতে থাকে। নতুন রসশাস্ত্রের প্রভাবে পদাবলি তার সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গি ত্যাগ না করেও সূক্ষ্মতর রসবিবেচনা ও উপস্থাপনের আদর্শ বরণ করে নেয়। কারণটিও সুস্পষ্ট। চৈতন্যের আবির্ভাবেই এই নতুনধর্মের পথ উন্মুক্ত হয়। এই ধর্মপথকে যথোপযুক্ত করতে শ্রেণি অনুযায়ী রসশৈলীও প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু. চৈতন্যলীলায় বৃন্দাবনলীলাই মূল প্রতিপাদ্য, তাই রাধা-কৃষ্ণের লীলাকথামৃত ভক্তজনেরা পদাবলি ও কীর্তনে বিশ্বাসযোগ্য করে ফুটিয়ে তুললেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও পদাবলির বিষয়ভাবে প্রেমধর্মের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতে থাকে।

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির বিষয়ভাবে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু পরিলক্ষিত হয় তাহলো – আধ্যাত্মিক চেতনা। যদিও এই চেতনা চৈতন্যযুগেরই ফসল। কিন্তু উত্তর যুগের পদরচয়িতাদের অন্যতম উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় চৈতন্যের তৃপ্তি উৎপাদন এবং তার যথাযথ প্রতিফলন। ফলে চৈতন্যযুগ থেকে উত্তর যুগের পদাবলিতে দেখা গেল সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতিফলন এবং ব্যাকরণের বিধি রক্ষা করে রসের যথোপযুক্ত নিয়ম মেনে পদ রচনা করা এবং তা কীর্তন করা। ইতোমধ্যে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রসাভাসদুষ্ট গান বা কাব্য শোনাও অপরাধ। যেহেতু সাধনার বা ভজনের অন্যতম অনুষঙ্গ কীর্তন, তাই কৃষ্ণভক্তি যাতে অন্তর্হিত না হয় তার জন্য পদকারদের মধ্যে একটি শুদ্ধধারা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। বলা যেতে পারে, বৈষ্ণব দর্শনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে উত্তর যুগের পদাবলিতে ও বৈষ্ণব কাব্যে।

চৈতন্য তাঁর কর্মময় জীবনে লৌকিক ভাবপ্রকাশের মধ্য দিয়ে, ভাষণে ও আলাপচারিতায় ধর্মের যে স্বরূপ পরিস্ফুট করেছিলেন তাই বৈষ্ণবধর্মের মূল অনুপ্রেরণা এবং পদাবলির প্রধান উপাত্ত। বৈদিক কর্মকাণ্ডাশ্রয়ী ভারতবর্ষে যে ত্রিবর্গ সাধন, অর্থাৎ– কাম, অর্থ ও ধর্ম এবং সেখানে স্বর্গপ্রাপ্তিই তাদের অভিলষিত ছিল। কিন্তু জ্ঞানমার্গের বিস্তারের মাধ্যমে ঐ ত্রিবর্গের সাথে মোক্ষ বা কৈবল্য লক্ষ্যবস্তুতে এসে দাঁড়ায়। ত্রিবর্গ তখন চতুর্বর্গে বিভাজিত হয়। বুদ্ধদেবে এসে যে প্রাচীন ধারণার বিপ্লব আসে, তা হলো– জীবনের লক্ষ্য নির্বাণ, বিষয়ভোগ নয়। চৈতন্যদেবেও এই বৈপ্লবিক সামূহিক চৈতন্যের প্রতিমান লক্ষ করা যায়। তবে তা বুদ্ধদেবের ধারণা থেকে ভিন্ন। বৈষ্ণবীয় অনুশাসনে মুক্তির সোপানসমূহ, যথাঃ সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ইত্যাদিতে মুক্তিসমূহের যে মূল্যই থাকুক না কেন, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে মুক্তিমাত্রই তিরস্কৃত ও নিন্দিত হলো। কারণ জীবের এই মুক্তিকামনা কৈতবযুক্ত, স্বার্থসিদ্ধির এক নিন্দিত পথ। বৈষ্ণব মহাজনেরা সিদ্ধান্ত দিলেন, শুদ্ধভক্তিজাত কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ, মুক্তি থেকে লক্ষ-কোটি যোজন দূরে তার স্থিতি। সুতরাং বিষয়ভোগস্পৃহা যেমন কলঙ্কিত, মুক্তিস্পৃহাও তাই। ভক্তির স্বরূপধারণে এদের কোনো স্থান নেই। এসব বিষয়ে ভক্ত হৃদয়সুখ ও ভক্তিসুখ পেতে পারেন না। ভক্তিসুখ প্রতিষ্ঠায় প্রেম প্রয়োজন। একমাত্র প্রেমলাভের মধ্য দিয়েই ‘মহাভাবের’ স্বরূপ হৃদয়স্থ করা যায়। এই পুরুষার্থ ও প্রেমভক্তির মূল দাঁড়িয়ে আছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বে।

বৈষ্ণব কবির অন্তরে Moment’s creation-এর স্তরে বিচিত্র অনুভবরঞ্জিত উপলব্ধির অভিব্যক্ত রূপ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এসব কবিতার রসাস্বাদনেতত্ত্বনিরপেক্ষ রসলোক সৃষ্টি করলে অতি দ্রুত সংশয় দূর হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *সোনারতরী* কাব্যের ‘বৈষ্ণবকবিতা’য় যে সুর ধ্বনিত করলেন তা বৈষ্ণব পদাবলির

শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশনা। আধ্যাত্মিকতার আবরণে মোড়া বৈষ্ণবীয় পদে প্রাকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি হিসেবে মানবীয় প্রেমের অনুরাগ-অভিমান-বিরহ-মিলনের জয়গানই যেন সার্থক ভাষারূপ পেয়েছে। যথা:

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
পূর্বরাগ অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবনগাথা - এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে - একি শুধু দেবতার![১]

---

১. সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, *রবীন্দ্র রচনাবলি*, চতুর্থ খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৬, ৩৭

প্রাকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি প্রকাশে বৈষ্ণব কবির যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস তা তো মানবীয় প্রেমরূপ হৃদয়ার্তির- বহিঃপ্রকাশ। বৈষ্ণব কাব্যের এমনই মাধুর্য যে, অবৈষ্ণব রসজ্ঞ ব্যক্তিও আনন্দ পান। রসিক সাহিত্য-প্রেমী এর মধ্যে রসই খুঁজে নেন। যেমন:

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নর-নারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার; ... [১]

সুতরাং, পদাবলির বিষয়ভাবের অনুধাবনে বিশুদ্ধ রসদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রত্যেক কাব্যকেই তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে স্থাপন করে বিচার করা উচিত। অতএব, পদকর্তারা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবন ও তাঁদের আরাধ্যকে দেখেছেন, কাব্যসৃষ্টির মূলে যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা, রসবিস্তারে যে তত্ত্ব – তা জানা থাকলে পদাবলির আস্বাদনে এক প্রেমময় রসতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। আরাধ্য 'প্রেম' একাধারে বিষ ও অমৃতময় হয়ে ওঠে। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এ-বিষয়ে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন :

> রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব যেমনই হোক, সেই তত্ত্বে দীক্ষিত না হয়েও নরনারীর হৃদয় ঐ প্রেমের আর্তি, তার বিরহব্যাকুলতা ও মিলন মহোৎসব পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করতে পারে। ঐ যে প্রেমকে বৈষ্ণব কবি 'বিষামৃত' বলে আখ্যায়িত করেছেন, তার মত সত্য আর কি আছে? ঐ প্রেমই বিষ, আবার অমৃতও ঐ প্রেম।[২]

প্রাক-চৈতন্য যুগ, চৈতন্য যুগ ও চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তার পদাবলি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি; শুধু তার ভাব-ভাষা-অলঙ্কারের জন্য নয়, তা এমন এক তত্ত্বাবহ রোমান্টিকভাব-কল্পনার আধার হয়ে আছে যার তুল্য মানবমনের আকুতি পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। পদাবলির রস সীমাবদ্ধ নয় – কালোত্তীর্ণ হয়ে যুগে যুগে ভক্তির বন্যায় যেমন ভাসিয়ে দিয়েছে ভক্ত অন্তর, তেমনি রসগ্রাহী পাঠক বিশুদ্ধ রসদৃষ্টির সাহায্যে লাভ করেছে এর অমিয়কাব্যসুধা।

২.পদাবলি কীর্তনচর্চা বিষয়ক অঞ্চলভিত্তিক তথ্যসংগ্রহ

পদাবলি কীর্তনচর্চার ধারা প্রায় এক হলেও অঞ্চলভেদে এর উপস্থাপনে কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও মূলপদও বিকৃত হয়ে পড়ে। আবার তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে বৈপরীত্যও দেখা যায়। পদাবলি কীর্তনচর্চা বিষয়ক অঞ্চলভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে

১. সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, *রবীন্দ্র রচনাবলি*, চতুর্থ খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা,পৃষ্ঠা-৩৬, ৩৭
২. উদ্ধৃতি, সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৩৬

ক্ষেত্র-গবেষণায় আমরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছি তা নিম্নরূপ:

ক)শব্দ বিশ্লেষণ
খ)বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ
গ)কীর্তন-কাঠামো বিশ্লেষণ

i. শব্দ বিশ্লেষণ

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে কীর্তনের আসরে (অঞ্চলভিত্তিক) ব্যবহৃত শব্দের ভাষাগত দিক ও উচ্চারণ রীতির বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক অনুসন্ধান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে শব্দের উচ্চারণরীতিতে যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তার অন্তর্মূলে রয়েছে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব। অঞ্চলভেদে কীর্তনীয়াদের মধ্যেও এই প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলাদেশের সার্বিক প্রেক্ষাপট বিচারে অধিকাংশ কীর্তনীয়াই আঞ্চলিক তথা ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে শব্দের ব্যবহার, উচ্চারণরীতিতে অঞ্চলকেই প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকেন। তবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত কিছু কীর্তনীয়া রয়েছেন যারা বাংলা শব্দের প্রমিত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কীর্তন-তত্ত্বকে উপস্থাপন করে থাকেন। বর্তমান গবেষক ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এবং ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা অঞ্চল, রাজশাহী অঞ্চল ও খুলনা অঞ্চলে বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের ওপর ক্ষেত্র-গবেষণা পরিচালনা করে। বহু কীর্তনের আসর পর্যবেক্ষণ এবং অঞ্চলকেন্দ্রিক কীর্তনীয়া ও তাদের সহযোগীদের সাথে সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত থেকে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১. কীর্তনীয়াগণ গুরুপ্রদত্ত পদগুলো (পালায় সজ্জিত) তার খাতা থেকে সংগ্রহ করে থাকেন; ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কীর্তনীয়াদের পরিবেশনে মূলপদের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়।

২. পদের আখর কীর্তনীয়াদের সৃজনসক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। এক্ষেত্রে আখর সৃষ্টিতে শব্দের উপস্থাপন ও উচ্চারণ রীতিতে আঞ্চলিক প্রভাব পরিলক্ষ্যিত হয়।

৩. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খুলনা, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, পাবনা, নাটোর–এসব অঞ্চলের কীর্তনীয়াগণ আঞ্চলিক উচ্চারণ রীতিতে উচ্চারণ করে থাকেন। অর্থাৎ আঞ্চলিক প্রভাবের কারণে কোথাও কোথাও পদে ব্যবহৃত মূল শব্দও উচ্চারণের ভিন্নতার কারণে নানান ভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

৪. বাচনরীতিতে অধিকাংশ অঞ্চলেই ‘ও’, ‘হা’, ‘হারে’, ‘ওগো’, ‘গো’, ‘ওহে’ সম্বোধনরীতি ব্যবহৃত হয়।

৫. দীর্ঘ তৎসম শব্দের ব্যবহার অঞ্চলভেদে অনেক কীর্তনীয়াই করে থাকেন। কিছু বহুল ব্যবহৃত তৎসম শব্দযুক্ত বাক্য উপস্থাপন করছি:

ক. শ্রীসুরধনীবেষ্টিত চিন্মধুর, অপ্রাকৃত, কণককান্তিতে সমুজ্জ্বল শ্রীনবদ্বীপ ধাম।

খ. সুতপ্ত-হেমপ্রভ শ্রীঅঙ্গচ্ছটা, অজানুলম্বিত বাহু, অরুণবসনে-উত্তরীয়ে শোভিত মহাভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে প্রকট হয়েছে অশ্রু-কম্পাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব। শ্রীগৌরাঙ্গের স্নিগ্ধোজ্জ্বল অঙ্গচ্ছটায় মনিপ্রদীপাবলি চম্পক কলিকাবৎ পরিদৃশ্যমান হচ্ছে।

গ. হে শুদ্ধ কনককান্তি, প্রেমঘনমুরতি, ব্রজভাবে ভাবিত যুগলতনু – তুমি উদয় হও।

ঘ. শ্রীযুগলের নিরুপম শোভাসিন্ধুতে সখীগণ মহাসুখে সন্তরণ করতে লাগলেন।

ঙ. পক্ষীগণের কলকূজনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ জাগরিত হয়ে মদনের বীণার মতো পঞ্চম তানে একে অপরের প্রশংসা করলেন এবং রজনী অবসানহেতু অতিশয় চঞ্চল হলেও ক্রীড়াসুখময় মোহন-শয্যা ত্যাগ করে গাত্রোত্থান করলেন।

চ. ললিতাদি সখীগণ শ্রীমতীর শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হয়ে সান্ধ্যগগণে তারকারাজির ন্যায় মণ্ডলীবন্ধে রাধাশশীকে ঘিরে বসলেন।

ছ. শ্রীরাধার অন্তরে উল্লাস ও বাহ্যে অসম্মতি বুঝতে পেরে কুন্দলতা সাতিশয় আনন্দলাভ করলেন এবং পরিহাসব্যঞ্জক বাক্যে বললেন, “ওগো রাধাবিনোদিনী, তোমার কুলধর্ম রক্ষার অভিলাষ সহজেই সুসিদ্ধ হবে।” [১]

৬. ক্রিয়াপদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মূলত বস্তুগত ও স্থানগত পরিবেশ ভেদে ক্রিয়াপদের ব্যবহার ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে বর্ণনরীতিতে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণও দেখা যায়। কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি[২]:

মূল ক্রিয়াপদ	ঢাকা বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ	চট্টগ্রাম বিভাগ	ময়মনসিংহ বিভাগ
আসলাম	আসিলাম	আইলাম	আসিলাম গো	আইসা পড়লাম
গমন	যাত্রা	বাহির	যাত্রা	বাইরে
ভোজন	সেবা	ভোজনসেবা	আহারাদি ক্রিয়া	ভোগসেবা
গোষ্ঠক্রীড়া	গোঠের খেলা	গোঠ খেলা	গোষ্ঠের খেলা	গোঠের ক্রীড়া

৭. ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার বৈষ্ণব পদে এক অপরিহার্য বিষয়। এক্ষেত্রে কীর্তনীয়াগণ অঞ্চলভেদে নানাবিধ অর্থে পদ প্রয়োগ করে থাকেন এবং ব্রজবুলি ভাষার পদসমূহে আখর প্রদানের ক্ষেত্রে সহজ সরল শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন :

১. মূলপদ: দামিনী দাম, দমন রুচি দরশনে, দূরে গেও দরপক দাপ।
শোণ কুসুম তাহে, কোন গণিয়েরে, প্রাতর অরুণে সন্তাপ ॥

১. ক্ষেত্র-গবেষণা, ২০১৮-২০১৯, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও ঢাকা অঞ্চলের কীর্তনের আসর থেকে প্রাপ্ত
২. পূর্বোক্ত

প্রয়োগকৃত আখর : আজ গোরার দুঃখ ভাব, নিজরূপের চিন্তা করে ...
আজ গোরা রাধিকা ভাবে, নিজ অঙ্গ দেখিয়া ভাবে।

২. সবহু মিলিত যমুনা তীর, অঞ্জলি পুরি পীয়ত নীর
বৈঠল তহি তরুর ছায়, বীচ নন্দ নন্দনা।
কুন্দ কলিক কলিত চূড়ে, মন্দ পবন বরিহা উড়ে
কটি তটে কিয়ে পীতবসনা, বাহে শোভিত কঙ্কণা ॥
হসিত ললিত বদন ইন্দু, অলপে উপজে ঘরম বিন্দু,
লোল নয়ন কমল-যুগল তাহে ললিত অঞ্জনা।
নখর উজোর যৈছন চন্দ, চকোর নিকর লাগল ধন্ধ
লুব্ধ হেরি চরণ ঘেরি, সঘনে করত চুম্বনা ॥ ...

প্রয়োগকৃত আখর : আমি যদি ব্রজের ছোট্ট ভ্রমর হতাম
গোবিন্দের রাঙা চরণ চুম্বইতাম।
জীবন আমার ধন্য হতো।[১]

উল্লেখ্য, আখর প্রয়োগের ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে নানান বৈচিত্র্য দেখা যায়। শব্দের প্রয়োগ, পরিবেশ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক আখর সৃজন ও পরিবেশন, ভাবদৃষ্টিতে বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে আখর পরিবেশন কীর্তনীয়াদের মুন্সিয়ানার বিষয়। দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূলপদ ও আখরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকে। ঢাকা এবং রাজশাহী অঞ্চলে যারা মনোহরশাহী ঘরের কীর্তন করে থাকেন, তারা আখর পরিবেশনে যথাসম্ভব

গুরু পরম্পরা ও শুদ্ধতা মেনে চলেন। মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর–এসব অঞ্চলের অধিকাংশ কীর্তনীয়া মিশ্র ঘরের কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন। ফলে তাদের আখর সৃষ্টিতেও মিশ্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৮. বাক্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক কারণে নানান পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষত, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া এবং ফরিদপুর অঞ্চলের কীর্তনীয়াদের মধ্যে এই পরিবর্তন বেশি পরিলক্ষ্যিত হয়। পরিবেশনকৃত পদের ব্যাখ্যায় বিশেষণ-নির্ভর বাক্যগঠন ও তার প্রয়োগ অধিক লক্ষনীয়। সমাসবদ্ধ পদ, অধিক তৎসম শব্দের ব্যবহার এবং আঞ্চলিক বাক্যরীতিতে আসরে কীর্তনীয়াগণ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে থাকেন।

৯. উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে নানান বৈচিত্র্য পরিলক্ষ্যিত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের বহু কীর্তনীয়া স্বশিক্ষিত এবং কিছু সংখ্যক কীর্তনীয়া উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। ফলে উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দুয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বৈষ্ণব পদাবলি ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন আলোচনাকালে অনেকেই আছেন যারা প্রকৃতি থেকে উপমা, অলঙ্কার, চিত্রকল্প গ্রহণ করে থাকেন।

অন্যদিকে অনেকে গ্রন্থভুক্ত উপমা, চিত্রকল্পের ব্যবহার করে থাকেন। ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে কোথাও কোথাও লৌকিক ও প্রক্ষিপ্ত উপমা, চিত্রকল্পেরও ব্যবহার দেখা যায়।

---

১. ক্ষেত্র-গবেষণা, ২০১৮-২০১৯, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও ঢাকা অঞ্চলের কীর্তনের আসর থেকে প্রাপ্ত

১০. গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও পদাবলি কীর্তনের তত্ত্ব ভাগবত নির্ভর। অঞ্চলভেদে ভাগবতের লীলা বিবরণ কীর্তনীয়াগণ নানান ভাবে উপস্থাপন করে থাকেন। পদের ক্ষেত্রেও নানান অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। এ-বিষয়ে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি:[১]

ক. মূলপদ ; শচীর নন্দন গোরা চাঁদ বয়ানে
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে।

ঢাকা অঞ্চল : শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বদনে।
ধবলীশাওলী বলি ডাকয়েসঘনে ॥

রাজশাহী অঞ্চল : শচীর নন্দন গোরারও চাঁদ বয়ানে।
ধবলীশাঙগলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥

খুলনা অঞ্চল : শচীর নন্দন গোরার চাঁদ বদনে।
ধবলীশ্যামলীবলে ডাকে সঘনে।

খ. মূলপদ : চাঁদ বদনী নাচত দেখি, তা ত্বা থোই থোই তিনিকিটি তিনিকিটি ঝাঁ
দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ, থোই দৃমি দৃমি দৃমি কি দৃমি কি দৃমি,
তাক তাক গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি গড়ি, গড়ি গড়ি তত্তা দিমিতা তাতা
থোই তিনিকিটি ঝাঁ ॥

ঢাকা অঞ্চল : চাঁদ বদনী নাচত দেখি, তাত্তাথৈয়া থৈয়াতিনিকিটিতিনিকিটি ঝাঁ।

রাজশাহী অঞ্চল : চাঁদ বদনী ধনী নাচত দেখি, তা তাথৈয়াথোইতিনিকিটি
তিনিকিটিতিনিকিটি ঝাঁ।

খুলনা অঞ্চল : চাঁদ বদনী নাচ দেখি, তা তাত্তাথৈয়াথৈয়াতিনিকিটিতিনিকিটিঝাঁ।

ii. বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

চৈতন্যোত্তর যুগে ভক্তি-আন্দোলনের ধারা নানা কারণে ব্যাহত হয়েছিল। এর যেমন রয়েছে সামাজিক কারণ, তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিক পটভূমি। চৈতন্যদেবের নামে তখন কী যে অসামাজিক ভাবধারা প্রচলিত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক সারবত্তা বিস্তৃত গবেষণার বিষয়। বহুকাল পর্যন্ত চৈতন্যের ধর্ম-আন্দোলনের কোনো নির্ধারিত বা সর্বগ্রাহ্য তত্ত্ব প্রচার পায়নি। ফলে, এই সময় দেখা যায় বৃহৎ বাংলায় বহুতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। শুধু তত্ত্বই নয়, বৈষ্ণবগোষ্ঠী বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আবার বহু স্থানে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বও উদ্ভাবিত হয়েছে।

১. ক্ষেত্র-গবেষণা, ২০১৮-২০১৯, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের কীর্তনের আসর থেকে প্রাপ্ত

এই বিরুদ্ধ পরিবেশের উৎস সম্ভবত শ্রীখণ্ডনিবাসী নরহরি সরকার প্রবর্তিত 'গৌরনাগরবাদ' তত্ত্ব। তান্ত্রিক প্রভাবপুষ্ট চিরকুমার বৈষ্ণব সাধক নরহরি সরকার 'বামাচারী' তন্ত্রের দ্বারা সুস্পষ্ট প্রভাবিত ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। কারণ চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ হতে জানা যায়, পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম গদাধর পণ্ডিত ও নরহরি সরকারের সখ্য ছিল এবং তাদের সাধনার পথও ছিল প্রায় একই। গদাধরের অনুসারীদের মতে, গদাধর পণ্ডিত ছিলেন স্বয়ং রাধার অবতার এবং চৈতন্য ছিলেন কৃষ্ণের অবতার। ফলে অনুগামীদের মধ্যে দেখা যায় বামাচারী তন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাবপুষ্ট সাধন-ধারা। তাঁদের দৃষ্টিতে গদাধররূপী রাধা 'কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ সখী বিপরীত-রতি প্রিয়া'। অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের যে পরিণাম দেখা যায় তা সত্যিই অভাবনীয় এবং বেদনাদায়ক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাঢ়ে-বঙ্গে, অর্থাৎ বৃহৎ বাংলায়-ই বৈষ্ণবগোষ্ঠীর বহু দল-উপদল পরিলক্ষিত হয়।

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রধান নির্ণায়ক হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে কীর্তনের আসরে কীর্তনীয়াগণ যে পদ্ধতিতে পালার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে থাকেন।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রধানত অষ্টপ্রহরব্যাপী সময়োপযোগী পালায় বিভক্ত করে পদাবলি কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইদানিং কোথাও কোথাও ষোলোপ্রহরব্যাপীও কীর্তন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ষোলোকালীন কীর্তনের প্রবণতা রাজশাহী, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল অঞ্চলে বেশি। এছাড়া ছুটা পালা হিসেবে একটি বা দুটি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে কীর্তন-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এসব কীর্তন সাধারণত, মৃত্যুবার্ষিক, মানসিক, অন্নপ্রাশন, ভোগরাগ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের

বিষয়বস্তু বা এর আঙ্গিক প্রকরণে অঞ্চলভিত্তিক তেমন কোনো পার্থক্য নেই। শুধু সংগীতাঞ্চলের মধ্যে পরিবেশনায় বা প্রকরণের উপস্থাপনায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের বিষয়বস্তু অনেকটা নির্ধারিত। বৈষ্ণব আচার্য ও পদকারগণ নানান তত্ত্বে-উপাত্তে কীর্তনের বিষয়বস্তুকে সজ্জিত করে দিয়ে গেছেন, তবে মূল বৈষ্ণব পদের সমাহারে তাত্ত্বিক বিষয়বস্তু এত বিস্তৃত পরিসরে রয়েছে যে তা থেকে যথোপযুক্ত পদ বাছাই করাও কষ্টসাধ্য। বস্তুত বাংলাদেশে পদাবলি কীর্তনে পালা সজ্জিতকরণ এবং তার বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত গুরুপরম্পারাকেই মান্যতা দেওয়া হয়। সে-ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু শ্রেণিকরণের মাধ্যমে কীর্তনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্যদিক হচ্ছে ভৌগোলিক পরিবেশের অভ্যন্তরের ভাবমূলক পরিবেশ ও তার আঞ্চলিক রূপ, যা ঐ সংগীতাঞ্চলকে[১] প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তত্ত্ব বা দর্শন বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাব ও ভাষা, ছন্দ ও বন্ধের, ধর্ম ও কর্মের বিষয়কে কীর্তনীয়াগণ নানা উপায়ে উপস্থাপন করে থাকেন। এক্ষেত্রে কীর্তনের বিষয়বস্তুর বাইরে এসে কীর্তনীয়াগণ যুক্ত করেন বাউল, ভাটিয়ালি, সারী, ঝুমুর, পাঁচালি, কড়চা প্রভৃতি প্রকরণ। ফলে পালার বিষয়বস্তু ঠিক রেখে তাতে যুক্ত হয় নানান উপকথা, নানান কাহিনী। যাকে 'দেশাচার' নামে অভিহিত করা যায়। ফলে অনেক জায়গায় কীর্তনের যে মূলভাব তা অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়। কোনো কোনো

১. টীকা: সংগীতাঞ্চল বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ ধরনের সংগীতধারার যাত্রা, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের পথ ধরে কতদূর পর্যন্ত প্রসারণ লাভ করল এবং প্রসারণের ফলে সেই সংগীতধারার পরিভ্রমণ ভূমি নিয়েই যে অঞ্চল তাকে বোঝানো হয়েছে। মূলত ক্রমবিকাশের পথ এবং তার দ্বারা প্রভাবিত এলাকা অথবা বর্তমানে বহুল পরিচিত পরিসরের পরিসীমাই হলো অঞ্চল।

অঞ্চলে কীর্তন ও লোকসংগীত মিশে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হতেও দেখা যায়। যদিও কীর্তন ও লোকসংগীত এই উভয় সংগীতধারার মূল বিষয় হচ্ছে ভাব। সুতরাং আদর্শের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনের জায়গাটি প্রায় সবক্ষেত্রেইএক হয়ে যায়। তখন কীর্তনের আঙ্গিকে আর শুধু কীর্তন বা তার তত্ত্ব থাকে না। রূপ ও রীতির বিচারে কীর্তন ও তার বিষয়বস্তু এক নতুন মাত্রা লাভ করে।

লীলাকীর্তন বস্তুত ভারতীয় শুদ্ধ সংগীতরূপেই আদর্শ। রাগালাপ, সুর-সংযোজন, প্রক্ষেপ, প্রভৃতি বিষয় লীলাকীর্তনের অন্যতম বিষয় এবং ভাগবত-প্রবর্তিত নববিধা ভক্তির বিন্যাস কীর্তনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কীর্তন পরিবেশনের মূলসূত্র ধরে বিচার করলে তার পাঁচটি ধারার উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে– গড়ানহাটী, মনোহরশাহী, রেনেটি, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডী। বাংলাদেশে উত্তর অঞ্চলে প্রধানত গড়ানহাটী ঘরের চর্চা বেশি হয়ে থাকে। অন্যান্য অঞ্চলে উপর্যুক্ত ঘরের মিশ্ররূপ পরিলক্ষিত হয়। কীর্তনের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে 'ঘরানা' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

লীলাকীর্তন মূলত গোস্বামীগণের রসশাস্ত্র দ্বারা প্রবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত। কীর্তনীয়াগণের এক্ষেত্রে মূল আশ্রয়স্থল শ্রীরূপ গোস্বামীর *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থ। কারণ কীর্তনের রসপর্যায়, নায়ক-নায়িকার লক্ষণ, বিচিত্র ভাব ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থভুক্ত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। অঞ্চলভেদে মাঠপর্যায়ে কীর্তনের ওপর ক্ষেত্র-গবেষণায় বর্তমান গবেষক উপর্যুক্ত বিষয়ে নানাবিধ অসঙ্গতি দেখেছে বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে। এই অসঙ্গতির ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত হলো–আঞ্চলিক পর্যায়ে অনেক কীর্তনীয়ার

শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ সম্পর্কে যথার্থ পাঠ না থাকা। এছাড়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ক্ষেত্রে যে ভক্তিতত্ত্ব তা-ও *শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ও *ভক্তিসন্দর্ভ*গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং গ্রন্থচর্চা যথাযথ না থাকলে কীর্তনীয়াগণ যেমন যথার্থরূপে কীর্তনের বিষয়ভাবকে উপস্থাপন করতে পারেন না, অন্যদিকে শ্রোতাদেরও যোগ্য হয়ে উঠতে হয় নানান গ্রন্থ পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে। লীলাকীর্তন বা পালা কীর্তন বাংলাদেশে অধিকাংশ জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

'পালা' শব্দটির অর্থ-তাৎপর্য অনেকটা ইংরেজি Canto এবং যাত্রা বা নাটকের পালার সাথে সম্পর্কিত। এই ধারায় যাত্রা বা নাটকের মতোই চরিত্র বর্তমান থাকে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে প্রকাশিত রাধা, কৃষ্ণ, সখীবৃন্দ, মা যশোদা, গোপ ও গোপললনাবৃন্দ, গোপীবৃন্দ, ব্রজরাখালগণ সকলের সঙ্গে গোবিন্দের বিলাসসূচক লীলাই যখন পালা বা ঘটনা আকারে প্রকাশ করা হয়, তাই লীলা বা পালা কীর্তন। এই কীর্তনের উৎসধারা আনন্দস্বরূপ ভগবৎরূপের অপ্রাকৃত খেলা, কিন্তু তা প্রকট বৃন্দাবনে পরিদৃশ্যমান। গোস্বামীবর্গের রসশাস্ত্র দ্বারা লীলাকীর্তন নিয়ন্ত্রিত থাকে, মুখ্যত, শ্রীরূপ গোস্বামীর *উজ্জ্বলনীলমণি*দ্বারা। রসপর্যায়, নায়ক-নায়িকা, তাঁদের লক্ষণ ও ভাব এই গ্রন্থানুসরণে উপস্থাপিত হয়। ভক্তিসিদ্ধান্তগুলি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ও *ভক্তিসন্দর্ভ*গ্রন্থানুসারে প্রয়োগ হয়। কৃষ্ণস্বরূপের লীলাস্বরূপ প্রসঙ্গ নানাভাবে ভাগবতীয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং তারই সূত্র ধরে বৈষ্ণব মহাজনেরা তাঁদের কল্পনাশক্তির ব্যবহারে বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভবের গভীরতার সহায়তায় ভিন্ন ভিন্ন লীলারস-রূপ আস্বাদন করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই অনুভব-রস পারমার্থিক আস্বাদন এবং এর লক্ষ্য পরমপুরুষ কৃষ্ণ। লীলাকীর্তনে তাই রসের বিলাস দ্বারা কৃষ্ণের উপভোগকে ফুটিয়ে তোলা হয়। তাই এই কীর্তন 'রস কীর্তন' নামেও পরিচিত। প্রখ্যাত গবেষক ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী পালা বা লীলা কীর্তনের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। তবে এগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পর্যায় রক্ষা করে।

কীর্তনের বিষয়বস্তু রসনির্ভর। চারটি প্রধান রস – দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা উজ্জ্বল; একে কেন্দ্র বা আশ্রয় করেই পরমার্থিক আস্বাদন হয়ে থাকে এবং রসের বিলাস দ্বারা কৃষ্ণের উপভোগ্য বিষয়কে তুলে ধরা হয়। বৈষ্ণবীয় সাধনায় মধুর রসের ব্যাপ্তি বেশি। ফলে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে মধুর রসের লীলা বেশি পরিবেশিত হয়। যেহেতু এই রস দুইভাগে যথাক্রমে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ-এ বিভক্ত। সুতরাং নায়ক-নায়িকার তীব্র মিলনের আকাঙ্ক্ষা থেকে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাই বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ স্তর অতিক্রম করে পরস্পর মিলনের উল্লাসে অর্থাৎ সম্ভোগের মধ্য দিয়ে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। পদাবলি কীর্তনের ক্ষেত্রে বা তার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সকল অঞ্চলেই উপর্যুক্ত রসবিভাগ অনুযায়ী পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিষয়বস্তুর উপবিভাগে থাকে পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস – এগুলো বিপ্রলম্ভের উপবিভাগ। সম্ভোগ বা উজ্জ্বল রসের উপবিভাগে থাকে সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। এই আটটি উপবিভাগের আবার আটটি করে অংশ থাকে; ফলে মধুর রসের ক্ষেত্রে মোট ভাগের সংখ্যা হয় চৌষট্টিটি। বর্তমানে বাংলাদেশে পদাবলির কীর্তনীয়ার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য এবং ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী অঞ্চলের তরুণ শিল্পীগণ কীর্তনকে গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করে চলেছেন।

মাঠপর্যায়ে বর্তমান গবেষকের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ের কীর্তনীয়াদের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণে কীর্তনের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বিষয়গুলো পাওয়া গিয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. যথেষ্ট পরিমাণে ভক্তিশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র অধ্যয়ন না থাকায় তাৎপর্যপূর্ণ কীর্তনের বিষয়বস্তু এবং তার দার্শনিক ধারার মধ্যে অঞ্চলভেদে নানান অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়।

২. রসের বিভিন্ন পর্যায় উপস্থাপনে শাস্ত্রীয় সংগীতের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ প্রত্যেকটি পদের সুর (জাত সুর) ভারতীয় মার্গ সংগীতের narrative দ্বারা আচ্ছাদিত। কিন্তু অঞ্চলভেদে জাতসুরকে বিকৃত করে পাঁচালির ঢঙে অনেক কীর্তনীয়াই পরিবেশন করছেন। ক্ষেত্রবিশেষে লোক সংগীতের ধারাকেও তারা পদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে চালিয়ে দিচ্ছেন। ফলে অঞ্চলভেদে কীর্তনের যে আঙ্গিক বা তার যে পরিবেশন রীতি তাতে বিশুদ্ধ কীর্তনের বিষয়ভাবের ঔজ্জ্বল্য অনেকাংশেই ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

৩. ভক্তির কারণে লীলা কীর্তন বস্তুত ভাবময় সংগীত। এখানে গায়ক-বাদক-শ্রোতা সকলেই ভক্তজন। কীর্তনের বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় যে ভাবের জন্ম হয় তা 'অষ্টসাত্ত্বিক ভাব' (অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, বৈবর্ণ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ, মূর্চ্ছা)। কিন্তু বর্তমান সময়ে কীর্তনে ভাব-তন্ময়তার পরিবর্তে আধুনিক নানান বিষয় যুক্ত হওয়ায় ভাবের বিকাশ ব্যহত হচ্ছে।

৪. কীর্তনের বহু তাৎপর্যপূর্ণ পদ ব্রজবুলি ভাষায় হওয়ায় তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। সংগত কারণে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কথা, তুক, আখর প্রয়োগ অবশ্যকরণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলে কীর্তনীয়াগণ ব্রজবুলিপদবিন্যাসে অর্থাৎ সুর ও তালের পোষকতায় রসপুষ্টির নামে যেসব ব্যাখ্যা প্রদান বা আখর সংযোজন করে থাকেন তাতে অঞ্চলভেদে নানান বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।[১]

৫. কীর্তনের বিষয়বস্তু বর্ণনের ক্ষেত্রে তুক ও ছুটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তুক হচ্ছে অনুপ্রাসবহুল ছন্দময় মিলনাত্মক গাথা আর ছুট হচ্ছে একটু হালকা ধরনের গান। বস্তুত, বড় তালের গানের মধ্যে তালের সরলীকরণে ছোট তালের যে গান গাওয়া হয় তাই ছুট গান। অঞ্চলভেদে তুক ও ছুটের ক্ষেত্রে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষ্যিত হয়। বিশেষত, ঢাকা অঞ্চলের কীর্তনীয়াগণ তুক ও ছুটকে এক ভিন্নমাত্রায় পরিবেশন করে থাকেন। অনেকাংশে হালকা চালের ফলে এইসব ছুট মূল সুরধারাকে কোথাও কোথাও ব্যাহত করে থাকে। তবে রাজশাহী অঞ্চলের কীর্তনীয়াগণের মধ্যে তুক ও ছুটের ক্ষেত্রে বেশ যত্নশীল হতে দেখা যায়।

৬. কীর্তনের বিষয়বস্তুতে গৌরচন্দ্রিকা, মূল লীলা এবং মিলন – এই তিনটি প্রকরণই মূল বিষয়। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের সব অঞ্চলে উপর্যুক্ত রীতিতেই কীর্তন পরিবেশিত হয়ে থাকে। মিলনের ক্ষেত্রে সব অঞ্চলের কীর্তনীয়াগণই একই পদ্ধতিতে অর্থাৎ 'ঝুমুর' সুরের মাধ্যমে মিলন-পর্ব গেয়ে থাকেন। তবে এই মিলন-পর্ব নির্ধারিত পালা অনুযায়ী হয়ে থাকে।

৭. মৃদঙ্গ বাজনার কাটান অঞ্চলভেদে ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। 'ঠেকা' বাজানোর ক্ষত্রে ঢাকা ও রাজশাহী অঞ্চলের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। রাজশাহী অঞ্চলে ঠেকার মাঝে মাঝে কিছু অভিজ্ঞ মৃদঙ্গ বাদক 'মান' ব্যবহার করে থাকেন। ফরিদপুর অঞ্চলেও কেউ কেউ 'মান' ব্যবহার করে থাকেন।'লহর' ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঢাকা অঞ্চলের মৃদঙ্গ-বাদকের অধিক যত্নশীল হতে দেখা যায়। তবে সমতাল, বড় দশকোশী, যোতসম, তাল-ধরা, দুঠুকীর যথাযথ ব্যবহার বা

প্রয়োগ হতে দেখা যায় না। উপর্যুক্ত তালগুলি নানান রূপে (বিকৃত) পরিবেশিত হতে দেখা যায়। 'মাতন' ও 'মূচ্ছর্ণা' প্রায় সব অঞ্চলেই একই পদ্ধতিতে পরিবেশিত হয়। ঢাকা অঞ্চলের কীর্তনে 'দ্রুত পরণ' বেশি বাজানো হয়ে থাকে।[২]

iii. কীর্তন-কাঠামো বিশ্লেষণ

কীর্তন মূলত গান কিন্তু এর দেহে জড়িয়ে থাকে নাটকীয় উপস্থাপনা, কীর্তনীয়াগণের নতুন নতুন সংযোজনা এবং প্রতিমূহুর্তে শ্রোতার অকৃত্রিম প্রত্যাশা। এসব আকর্ষণের মর্মমূলে রয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূলসুর কিন্তু বহিরঙ্গে গানের সাথে গায়ক, বাদক এবং শ্রোতার এক মাটির সম্পর্ক। সাধারণত সংগীতের পারদর্শিতা গায়কের পাণ্ডিত্যের ওপর নির্ভর করে থাকে কিন্তু কীর্তন পাণ্ডিত্য প্রধান নয়, কীর্তনের রূপ-জৌলুস নির্ভর করে অনুরাগ, প্রেম, ভক্তি ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের ওপর। তবে এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় সংগীতের পারদর্শিতা থাকতে হয়। একজন গবেষকের মন্তব্য এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি যাগ্য :

---

১. টীকা : বর্তমান গবেষক একই পদের ক্ষেত্রে ঢাকা ও রাজশাহী অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা পেয়েছে এবং তা পরিবেশিত হতে দেখেছে। ক্ষেত্র-গবেষণা, জগদ্বন্ধু আশ্রম, ফরিদপুর ও গৌরাঙ্গ বাড়ী, খেতুরি, রাজশাহী, মার্চ ২০১৮।

২. টীকা : বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক শান্তিরঞ্জন সরকার চরভদ্রাসন, ফরিদপুর, বর্তমান গবেষককে জানিয়েছেন বাংলাদেশের মৃদঙ্গচর্চা বিষয়ে। যোগ্য ওস্তাদের বা প্রতিষ্ঠানের অভাবে দক্ষ মৃদঙ্গবাদক তৈরি হচ্ছে না। ফলে কীর্তনের আসরে বড় তাল (জাত সুর) বাজানোর ক্ষেত্রে নানান অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। দক্ষ বাদকের অভাবে অনেক জায়গায় বড় তাল গাওয়া হচ্ছে না। সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২, রাধাবল্লভ অঙ্গন, রাজবাড়ী।

> কীর্তন বাঙালীর সাংস্কৃতিক সম্পদ, কারণ অবিভক্ত বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রতিটি গৃহস্থ-ঘরে যে- কোন মাঙ্গলিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কীর্তন গানের ব্যবস্থা করা হত এবং বর্তমানেও হয়ে থাকে। কীর্তনের পরিব্যাপ্তি জনজীবনের সর্বত্র। কেবল ধর্মীয় আবরণ বলে সীমিত করে রাখলে যেমন কীর্তনকে সংকীর্ণ করা হয় – তেমনি কেবল গানের ধারা বললেও কীর্তনের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। কীর্তন হল বাঙালীর উদার মানসিকতার পরিচয়বাহী উন্নতমানের সংগীত, যার উপর ধর্মীয় গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে ...।[১]

উপর্যুক্ত মন্তব্যের আলোকে আমাদের অভিমত – কীর্তন ধর্মীয় আচ্ছাদনে মোড়ানো এক দার্শনিক ধারা, ভক্তির সাধনা এবং মধুর রস আস্বাদনের এক অপূর্ব শাস্ত্রীয় সংগীতের আলয়। আবার এর অন্তর্মূলে রয়েছে সোদা মাটির গন্ধ।

দার্শনিক ধারায় কীর্তনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে গুরুমুখীসাধনা হিসেবে বৈধী ও রাগানুগা সাধন-প্রণালি। মধুর রসে রাগানুগা সাধন ভক্তির ভজন ও তার প্রণালির রূপান্তর ঘটে মঞ্জরী রসের সাধনায়। মঞ্জরী-সাধনা যুগলমিলনের ক্ষেত্রে যে অখণ্ড আনন্দের প্রয়াস ঘটে তার নৈকট্য লাভ করতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। পদাবলি কীর্তনের কাঠামো বিশ্লেষণে এই ধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বৈষ্ণব পদাবলির পদকারবৃন্দ অনন্য মঞ্জরীসাধক যাঁরা ব্রজের রাধাকৃষ্ণের মিলনেই পরমানন্দ পেয়ে থাকেন এবং যুগল মিলনের লীলা পরিপুষ্টির জন্য মঞ্জরীর অনুগত হয়ে প্রেমসেবার অধিকার প্রার্থনা করে থাকেন। বস্তুত সেবা-অধিকার লাভই উপর্যুক্ত সাধকের সাধন-সার্থকতা এবং এতেই চরম আনন্দের উপলব্ধি হয়ে থাকে। মূলত, এই আনন্দের উপলব্ধিই সার্বিক মুক্তির অনন্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং, এই

তাত্ত্বিক মহিমাময় কীর্তনের অঙ্গ কাঠামো বিনির্মাণে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ভূমিকা যিনি পালন করেছিলেন তিনি রাজশাহীর খেতুরির জমিদার তনয় নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। 'খেতুরি মহোৎসবে' তিনি আঞ্চলিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তত্ত্ব ও শাস্ত্রের সমন্বয় সাধন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ও ধর্মের সামাজিক সংগঠন, সাংগঠিক স্তরকে দৃঢ় ও ব্যাপক করে তুলেছিলেন। বাংলার প্রচলিত কাব্যসংগীত ও লোকসংগীতের সঙ্গে প্রবহমান ভারতীয় রাগ সংগীতের মিলন-মিশ্রণ করে কীর্তনের এক নতুন কাঠামো দান করেন এবং গায়ন পদ্ধতি প্রকাশ করেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় 'খেতুরী মহোৎসবে' যে কীর্তন-কাঠামোপ্রদান করেছিলেন তা নিম্নরূপ :

ক. নিবন্ধ সংগীত হিসেবে গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান
খ. রাধাকৃষ্ণের বিলাসবিষয়ক গান
গ. প্রবন্ধ সংগীত হিসেবে বৈঠকী পদগান
ঘ. পদগানকে বৈঠকী পর্যায় থেকে সরিয়ে এনে প্রচলিত পাঁচালী গানের ধাঁচে খোলা আসরে পরিবেশন
ঙ. গায়ক - বাদকের ঐকান্তিকতায় অভিনয়ের কৌশলে বিলাস উপস্থাপন।

বাংলাদেশে পদাবলি কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা, রাধাকৃষ্ণের বিলাসবিষয়ক গান ও মিলন–এই তিন পর্বে কীর্তন উপস্থাপন হয়ে থাকে।

১.ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৭ ও ৮

ক. গৌরচন্দ্রিকা গান

গৌরচন্দ্রিকা শব্দের ব্যবহারিক অর্থ যাই হোক না কেন, কীর্তনের ক্ষেত্রে গৌরচন্দ্রিকা মূলত গান এবং তা গৌরাঙ্গের লীলা প্রসঙ্গের বর্ণনা। কৃষ্ণে যেমন অনুরক্ত রাধা, অনুরূপ নবদ্বীপবাসী অনুরক্ত গৌরাঙ্গে। প্রতিটি পালা পর্যায়ে অনেক গৌরচন্দ্রিকা পদ রয়েছে। কীর্তনীয়ারা গৌরচন্দ্রিকা পদগুলি সাধারণত বড় দশকোশী, সমতাল, যোতসম প্রভৃতি তালে গেয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, জাত গানের মূল সুরেই সাধারণত গৌর চন্দ্রিকার পদ গাওয়া হয়। বিভিন্ন লীলা প্রসঙ্গে দেখা যায় – গৌরাঙ্গের দুটি সত্তায় এই পদগুলি বিন্যস্ত থাকে। প্রথমত কৃষ্ণসত্তা এবং অপরটি রাধাসত্তা। লীলাপ্রকটের ক্ষেত্রে রাধাভাবে ভাবিত মনোভাব যে-সব পদের মধ্যে প্রকাশ পায় সেগুলি 'ভাবময় গৌরচন্দ্রিকা' হিসেবে প্রচলিত।

গৌরচন্দ্রিকা গানে প্রথম অংশ নিয়মানুসারে বিলম্বিত সুরে ও তালে গাওয়া হয়। শেষ অংশে জাতগানের মধ্যম সুর ব্যবহৃত হয় এবং তাতে আখর সংযোজিত হয়। পদের শেষ অংশের ভণিতা অংশটি বিশেষ বিশেষ কাটানের সুরে কীর্তনীয়ারা গেয়ে থাকেন। তারপর নানা ধরনের বাদ্যের মাধ্যমে বাদকগণ কীর্তনের আসরকে মাতিয়ে তোলেন। বহু ধরনের গৌরচন্দ্রিকা রয়েছে।

খ. কীর্তন সংগীতের কাঠামো

ততম্ চৈবানদ্ধম চ ঘনম সুষির মেব চ।

চতুর্বিধম তু বিজ্ঞেয় মাতোদ্যম লক্ষণান্বিতম্ ॥
ততম্ তন্ত্রীগতম জ্ঞেয়মবনদ্ধম তু পৌষ্করম্।
ঘনম্ তালুস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষিরোঃ বংশ উচ্যতে ॥[১]

আচার্য ভরতের উল্লিখিত শ্রেণিবিভাগ অনুসারে সাজালে বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ হয় :

ক. তত যন্ত্র (তারযুক্ত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র)
খ. সুষির যন্ত্র (বায়ু দ্বারা চালিত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র)
গ. আনদ্ধ যন্ত্র (চর্মদ্বারা আচ্ছাদিত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র)
ঘ. ঘন যন্ত্র (ধাতুদ্বারা নির্মিত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র)

'তত' বা তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে সেতার, বীণা ইত্যাদি। 'সুষির' বা বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে বাঁশি, শিঙ্গা, শঙ্খ, ক্ল্যারিওনেট ইত্যাদি। 'আনদ্ধ' বা চর্মদ্বারা আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে মুরজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি। 'ঘন' বা ধাতুদ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে করতাল, ঘণ্টা, খঞ্জনী, মন্দিরা, নূপুর, কাঁসর প্রভৃতি। আধুনিক কালে কীর্তনের নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন : এসরাজ, বেহালা, দোতারা, সরোদ প্রভৃতি। বটুক বা বৈঠকী গানের ক্ষেত্রে 'তত' যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তবে পালা বা লীলা কীর্তনের ক্ষেত্রে এসব বাদ্যযন্ত্র খুব একটা দৃশ্যমান হয় না। 'সুষির' শ্রেণিভুক্ত বাদ্যযন্ত্র হামেশাই কীর্তনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃতহয়ে থাকে।

১. ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, অধ্যায়-২৮, শ্লোক ১ ও ২, উদ্ধৃতি ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২১৯

বর্তমানে নাম কীর্তন বা লীলা কীর্তনে বাঁশি অনেকটা অপরিহার্য যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়াম। বাংলাদেশের প্রায় সকল ধরনের কীর্তনেই এই বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু একটি সময়ে এই বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বহু কীর্তনগায়কই কীর্তনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপত্তি করতেন। কারণ –

> তাঁদের মতে কীর্তন গানে বহু ধরণের শ্রুতির ব্যবহার ও মীড়ের প্রাধান্য আছে। এসব শ্রুতির অবস্থান ও মীড়ের প্রয়োগ হারমোনিয়মের দ্বারা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র খালি গলায়ই এসব প্রয়োগ সম্ভব।[১]

উপর্যুক্ত মন্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য। কীর্তনের ক্ষেত্রে শ্রুতির অবস্থানগত বিষয় ও যথার্থ মীড়ের প্রয়োগগত বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হারমোনিয়ম থেকে বা এই জাতীয় যন্ত্র থেকে উৎপন্ন স্বরগুলির তীব্রতা অনেকক্ষেত্রে কীর্তনসাধকের সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। বাঈ সম্প্রদায়ের কীর্তনীয়ারাই সর্বপ্রথম সর্বতোভাবে হারমোনিয়ম ব্যবহার করত বলে আমরা ধারণা পোষণ করি। কীর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে খোল ও করতাল।

কীর্তনের অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খোল বা শ্রীখোল 'আনদ্ধ' যন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত। বৈষ্ণবীয় অভিমত এই যে, চৈতন্যদেবই এই যন্ত্রের রূপকার। তাই বিশেষ মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বৈষ্ণবীয় সংস্কাররীতি অনুযায়ী 'শ্রী' শব্দটি যুক্ত করে 'শ্রীখোল' বলা হয়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহেও শ্রীখোল বিষয়ক আলোচনা পাওয়া

যায়। নরহরি চক্রবর্তী তাঁর *ভক্তিরত্নাকর*গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ের ৩১২৩-২৫ অনুচ্ছেদে শ্রীখোল সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করেছেন। কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা দ্বারা দুই প্রকারের খোলের কথা তিনি বলেছেন। বৈষ্ণবীয় নানান গ্রন্থে শ্রীখোল সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলায় 'কাজী উদ্ধার' পর্বে খোলের ব্যবহার ও এর দৈবপ্রভাব সম্পর্কে জানা যায় (দ্রষ্টব্য : *চৈতন্যভাগবত*, *চৈতন্যচরিতামৃত*)। আবার নীলাচল পর্বে রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে যে সাতটি সম্প্রদায়ে কীর্তনীয়াদের শ্রেণিবিন্যাস করেছিলেন, সেখানেও 'মাদল বাদক' পাওয়া যায়। খোল শব্দটি খুব সম্ভবত মৃদঙ্গ শব্দের আঞ্চলিক রূপ। মৃদঙ্গ > মাদল > খোল – এভাবেই হয়তো শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। মৃদঙ্গ শব্দটির ব্যবহার শিক্ষিতসমাজে ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং তা এখনও দেখতে পাওয়া যায়। বাঙালির জনজীবনে মৃদঙ্গই খোল হিসেবে পরিচিত ও ব্যবহৃত। মৃদঙ্গের রূপ সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'মাদল', 'মুরজ' ইত্যাদি আনদ্ধ যন্ত্রে। শ্রীখোলের পরিমাপ দেড় হাত লম্বা (আদিতেও এরূপই ছিল) এবং মধ্যভাগ স্ফীত। খোলের বায়ার মাপ বারো কিংবা তেরো আঙুল এবং ডাইনা সাধারণত ছয় বা সাড়ে ছয় আঙুল হয়ে থাকে।

কীর্তনের আসরে (লীলা কীর্তনে) দুই জন বাদকের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। একজন কীর্তনীয়ার ডানে এবং অন্যজন বামে প্রায় সমান্তরাল ভাবে দণ্ডায়মান থাকেন। এক্ষেত্রে কীর্তনীয়ার ডানের বাদকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি।

---

১. ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, অধ্যায়-২৮, শ্লোক ১ ও ২, উদ্ধৃতি ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২২১

শ্রীখোলের বাদকগণ গুরু বাণী ও লঘু বাণীর (আঘাতের জোড় বিচারে) দ্বারা কীর্তনকে যথাযথ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলেন। কীর্তনীয়ার সাথে বাদকের পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ না ঘটলে গানের সুর ও রসকে রক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

কীর্তনের আসরে দেখা যায় সঙ্গীতের তিনটি পর্যায় শ্রীখোল বাদকগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পাদন করে থাকেন। কীর্তনের প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় এক গতিময় শৃঙ্খলা। এই পর্যায়ে বাদকগণ 'লওয়া' বা প্রচলিত 'ঠেকা'-র ব্যবহার করেন। কেবলমাত্র তালের মাত্রার সমতা এই পর্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য নয়, সুরকে পুষিয়ে রাখতে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিতভাবে ব্যবহার করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে 'লহর'। কীর্তনীয়ার আখর সংযোজনের সময় গানের ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই আবর্ত কমে যায়; দক্ষ শ্রীখোলবাদক এই উপযুক্ত সময়েই 'লহর'-এর ব্যবহার ঘটান। তৃতীয় পর্যায়ে থাকে 'মাতন'। মাতন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক প্রকরণ। গায়কের আখর প্রদান শেষ হওয়া মাত্রই বাদক তাঁর সুবিধা অনুযায়ী মাতন শুরু করেন। আসরকে মাতিয়ে তুলতে 'মাতন'-এর বিকল্প নেই। চতুর্থ বা শেষ পর্যায় হলো 'মূর্চ্ছনা'। এই অংশটি সমাপ্তিসূচক বাদ্য। বিভিন্ন তালের ক্ষেত্রে থাকে বিভিন্ন মূর্চ্ছনা। এই মূর্চ্ছন বা মূর্চ্ছনার শেষ অভিঘাত 'মান'। 'মান' বাদ্যের পরপরই কীর্তন গান আবার মূল স্তরে ফিরে আসে।[১]

শ্রীখোলবাদকগণ কীর্তনের গানগুলির ক্ষেত্রে দক্ষতা অনুযায়ী তালের ছন্দকে ফুটিয়ে তোলেন, ছন্দ রক্ষা করে দ্রুত নানান ধরনের 'পরণ' বাজান, তাতে গানের গতি ও শ্রোতার আনন্দ পরিপূর্ণতা পায়।

কীর্তন গানের ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র ‘করতাল’। করতাল ‘ঘন’ শ্রেণিভুক্ত বাদ্যযন্ত্র। কীর্তন গানের উপস্থাপনের বৈচিত্র্যে দেখা যায় এই শ্রেণিভুক্ত অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। যেমন : কাঁসর, মন্দিরা, ঝাঁজ, নূপুর ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। মূলত করতাল ছাড়া কীর্তন হয় না। কারণ, যেহেতু কীর্তন একটি তাল প্রধান গান, তাই তালের যথাযথ বিষয় বা দিশা রক্ষা করার জন্য আবশ্যকীয় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে করতাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। করতালের নিজস্ব কোন বোল নেই তবে ঘাতজনিত শব্দের তারতম্য ঘটানোর পদ্ধতি থাকে। কীর্তন গানে শ্রীখোলবাদক যখন ‘মাতন’ শুরু করেন করতালের মাতনও ঠিক তখনই ঘটে থাকে। করতালবাদকগণ গানের তালের রক্ষা করেন এবং ঐ তালের ঝোঁকটি সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলেন। ফলে উৎপাদিত ছন্দটি শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং রসভোগ্য হয়ে ওঠে।

চৈতন্যদেব কর্তৃক কীর্তন গানে আরোপিত হয়েছিল করতাল, তাই বৈষ্ণবগণ এই বাদ্যযন্ত্রটিকে মঙ্গলের স্মারক হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

প্রধান গায়ক

লীলা বা পালা কীর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান গায়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কীর্তনের প্রধান কাণ্ডারী। বাংলাদেশে শব্দটি মূল গায়েন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটির উৎস ‘মুখ্য গায়ন’ এবং তারই অপভ্রংশরূপ বা আঞ্চলিকরূপ মূল গায়েন। অধুনা বাংলাদেশে মূল গায়েন ‘কীর্তনীয়া’ পদবাচ্যেও ভূষিত

১. ক্ষেত্রসমীক্ষা : বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক শান্তিরঞ্জন সরকার, চরভদ্রাসন, হাজীগঞ্জ, ফরিদপুর-এর বিশেষ সাক্ষাৎকার। ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

হয়ে থাকে। বৃন্দগান প্রসঙ্গে মুখ্য গায়নই বর্তমানের মুল গায়েন বা প্রধান কীর্তনীয়া। কীর্তন মূলত প্রাচীন বৃন্দগানেরই একটি সুস্পষ্ট ধারা। বৃন্দগান হলো দল বেঁধে গান গাওয়া। কীর্তন গানের ক্ষেত্রে দল বা সম্প্রদায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বৃন্দগানের তিনটি ধারার উল্লেখ পাওয়া যায় – উত্তমবৃন্দ, মধ্যমবৃন্দ এবং নিষ্ঠবৃন্দ। এই বৃন্দের নামকরণ হয়েছে গায়ক ও বাদকের সংখ্যার তারতম্য অনুসারে। কীর্তন গানের ক্ষেত্রে যিনি প্রধান গায়ক তিনি ‘মুখ্যগায়ন বা গায়ক’। এই মুখ্যগায়ককে যারা কণ্ঠ দিয়ে সহযোগিতা করেন তাঁরা ‘সমগায়ন বা দোহার’। দোহারের সাথে বাদক (মৃদঙ্গ) মার্দাঙ্গিক নামে পরিচিত এবং বংশীবাদক বাংশীক নামে পরিচিত। কীর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি বৃন্দ থাকে –

উত্তমবৃন্দ → মুখ্যগায়ন - ৪ জন
সমগায়ন - ৮ জন
গায়িকা - ১২ জন
মার্দাঙ্গিক - ৪ জন
বাংশীক - ৪ জন

মধ্যমবৃন্দ → মুখ্যগায়ন - ২ জন
সমগায়ন - ৪ জন
গায়িকা - ৬ জন

মার্দাঙ্গিক - ২ জন
বাংশীক - ২ জন

কনিষ্ঠবৃন্দ → মুখ্যগায়ন - ১ জন
সমগায়ন - ৩ জন
গায়িকা - ৪ জন
মার্দাঙ্গিক - ২ জন
বাংশীক - ২ জন

বর্তমানে বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন গানে যে দল বা সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায় তার শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ :

মুখ্যগায়ন - ১ জন
সমগায়ন - ৩ জন
গায়িকা - সাধারণত থাকে না, তবে কোনো কোনো দলে দেখা যায়।
মার্দাঙ্গিক - ২ জন
বাংশীক - ১ জন (সবক্ষেত্রে নয়। এই স্থলে বা তার সাথেই সংযুক্ত হয় বেহালা বাদক, সরোদ বাদক প্রভৃতি)

মূলগায়ক কীর্তনের যথাযথ পদ, আখর, সুর, তাল প্রয়োগ করে থাকেন। কীর্তনের যথাযথ বিন্যাস, শাস্ত্রাদি আলোচনা, তুক গানের প্রয়োগ, ছুট পদের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় মূলগায়কই করে থাকেন।

দোহার

দোহার হচ্ছে মুল গায়কের একান্ত এবং অবিচ্ছিন্ন সহায়তাকারী। কীর্তন গানের ক্ষেত্রে দোহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ কীর্তন গানের ক্ষেত্রে বা প্রধান গায়কের যে সাফল্য তা অনেকাংশে দোহারের উপর নির্ভরশীল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে – দোহার শব্দটির মধ্যে আনুগত্য পরায়ণতার ভাব পরিদৃশ্যমান হলেও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আভিজাত্যময় শব্দ। দোহারকে সর্বময় তাল ও রাগ সম্পর্কে অবগত থাকতে হয়। সাধারণত চার শ্রেণির দোহার দেখা যায়। এরা হলেন : শির দোহার, বাঁয় দোহার, কান দোহার ও সুর দোহার।

মূলগায়কের ডানদিকে দুইজন দোহার এবং বামদিকে দুইজন দোহার থাকে। এদের মধ্যে ডান ও বাঁয় দোহার গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দুইজন সুর সংযোজন করে থাকে। বাংলাদেশে অধুনা যে সব কীর্তনের দল দেখা যায় তাতে সাধারণত দুইজন দোহার দেখতে পাওয়া যায়। এরা একাধারে করতাল বাদক ও দোহারের কাজ করে থাকেন। ডান ও বাঁয় দোহারের মধ্যবর্তী স্থানে আর একজন সুর দোহার থাকেন। তিনি হারমোনিয়াম বাজিয়ে কীর্তনের সুর ও স্কেলকে ধরে রাখেন। বাংশীক বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রী ডান বা বাঁয় দোহারের পাশে বসে কীর্তনকে গুণগ্রাহী ও রসময় করে তোলেন। কীর্তনের ক্ষেত্রে দোহারকে খুবই

দক্ষ হতে হয় কারণ, তাঁদের সুকণ্ঠ, তত্ত্বজ্ঞান ও সঙ্গীতজ্ঞান কীর্তনকে পল্লবিত করে এবং রাগরাগিণীর বিস্তার কীর্তনের আসরকে রসপ্লাবিত করে তোলে।

মৃদঙ্গবাদক

কীর্তনের আসরে দোহারগণের ন্যায় মৃদঙ্গ বা খোল বাদকগণও দুই ভাগে অবস্থান করেন। প্রধান বাদক মূলগায়কের ডান পাশে অবস্থান করেন। তিনি 'শির বায়েন' নামে পরিচিত। বামের বাদক 'বাঁয়াটি বায়েন' নামে পরিচিত। শির বায়েন কীর্তনের আঙ্গিক প্রকরণে নানাবিধ বিষয় সংযোজন করে থাকেন। কীর্তন গানের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে তার অবদান অনস্বীকার্য। যেমন : মাতন, মূর্চ্ছনা, লহর, ঠেকা ইত্যাদি প্রদান করে তিনি কীর্তন গানকে আকর্ষণীয় ও রসময় করে তোলেন। বাঁয়াটি বায়েন মূলত শির বায়েনের সহায়তাকারী হলেও তার গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়।

বাংলাদেশের পদাবলি কীর্তনে যে সব তাল অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হয় তার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। [ক্ষেত্র-গবেষণা হতে প্রাপ্ত]

ক. বড় দশকোশী
তাল : ২৮ মাত্রা
বিন্যাস : ৮ ৮ ৪ ৮

খ. মধ্যম দশকোশী
তাল : ১৪ মাত্রা
বিন্যাস : ৪ ৪ ২ ৪

গ. সোম
তাল : ২৮ মাত্রা
বিন্যাস : ৮ ৮ ৪ ৮

ঘ. যোতসোম
তাল : ২৮ মাত্রা
বিন্যাস : ৮ ৮ ৪ ৮

ঙ. ধরা
তাল : ১৬ মাত্রা
বিন্যাস : ৪ ৪ ৪ ৪

চ. তেওট
i) মায়ূর

তাল : ১৪ মাত্রা

বিন্যাস : ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২, + ০ ০ ২ ০ ৩ ০

ii) বিভাস

তাল : ১৪ মাত্রা

বন্যাস : ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২, + ০ ০ ২ ০ ৩ ০

জ. দোঠুকি

তাল : ১৪ মাত্রা

বিন্যাস : ৩ ২ ২ ৩ ২ ২

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন এবং এর মনস্তাাত্ত্বিক প্রভাব

ক. বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন ও লোকমানস

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল জ্ঞানবাদ ও কর্মবাদের যৌথ উত্থানপর্ব। রাজা রামমোহন রায় বস্তুত জ্ঞান ও কর্মের একটি সমন্বয়সাধন করেছিলেন। ধর্মসঙ্কটের এই যুগে চৈতন্য-প্রবর্তিত 'প্রেমধর্ম-আন্দোলন' ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও চৈতন্যের আদর্শ এবং উনিশ শতকের যে কর্ম-জাগরণ তার পদ্ধতি ও প্রয়োগে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। বেদান্তবাদী ধারার এক প্রবল তরঙ্গ উপর্যুক্ত শতকে বাঙালি মানসকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। আঠারো শতকের শেষের দিকে এসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব ও এর দার্শনিক প্রবাহ লোকমানসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে ছিল। কীর্তন হয়ে উঠেছিল এর অন্যতম অনুষঙ্গ।

মানব সমাজে সাংস্কৃতিক বিকাশ বা ক্ষেত্র বিনির্মানে মানুষের আচরণের প্রভাব অনস্বীকার্য। এই আচরণ বস্তুত শিক্ষানির্ভর এবং মানের মূল্যায়ন নির্ভর করে অর্জিত আচরণশিক্ষার ওপর। আচরণের প্রকৃত অর্থে দুইটি ধারা–মুক্ত ও স্বকীয় সংস্কারবদ্ধ। এগুলো যখন কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায় তখন তা লোকাচারের মধ্যে পড়ে। এই আচরণগুলো লোকমানসে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ঘটিয়ে থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এক অনন্য দিক সংস্কৃতিমনস্কতা। ফলে কাব্য, গীত, বাদ্য, নৃত্য সহযোগে একত্রিত হওয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একপ্রকার সাধনপন্থা। বৈষ্ণবের সহজসাধক হয়ে ওঠা এবং সংসারী মানুষের কাছে সহজবোধ হয়ে ওঠার তত্ত্বদর্শী মাধ্যম কীর্তন, যা বাংলার লোকমানসে উপলব্ধিকে সহজ এবং পরমার্থের অনন্য পথ প্রদর্শন করে থাকে। এর অন্তর্মূলে রয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শাস্ত্রসম্মত তত্ত্ব – চৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু ; অর্থাৎ তিনি অন্তরে কৃষ্ণ বাইরে রাধা। কিন্তু লোকমানসে বৈচিত্র্যপূর্ণ কীর্তনের প্রভাবে এই তত্ত্বের সহজীকরণ, বিকৃতি ও প্রসারণ ঘটেছে। যেমন :

১. গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ।

২. চৈতন্য-বিষয়ক পদে ব্রজের রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলার অনুরূপ লীলা বর্ণিত হয়েছে।

৩. ভক্ত কবিগণের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চৈতন্যদেবের লৌকিক জীবনে অলৌকিকত্বের আবরণ নতুন ও অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন চৈতন্যচরিত ধরা পড়েছে।

৪. লোকসাহিত্যের প্রখ্যাত Motifঅস্বাভাবিক জন্ম-কর্ম এবং তার অতিশায়ন চৈতন্যজীবনপ্রবাহে ঘটেছে সমান্তরালভাবে।

৫. চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ দশাকে 'গৌরনাগরবাদ' তত্ত্বে প্রকাশ করা হয়েছে যা লোকমানসে চৈতন্য হয়ে উঠেছেন Folktale-এ অতিলৌকিক সত্তা।

৬. চৈতন্য চরিত্রের যে অতিশায়ন ঘটেছে লোকমানসে তার ভিত্তি চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ। চরিতকারগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত তাঁর অন্তর্ধান-প্রসঙ্গ নানান ভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন :

ক. লোচন দাস তাঁর *চৈতন্যমঙ্গল*-এ জানালেন, তিনি গুণ্ডিচাবাড়িতে জগন্নাথে লীন হয়েছেন।

খ. নরহরি চক্রবর্তীর *ভক্তিরত্নাকর*-এ বর্ণিত হয়েছে, তিনি টোটা গোপীনাথের বিগ্রহে লীন হয়েছেন।

গ. অচ্যুতানন্দ *শূন্যসংহিতা*-য় জানিয়েছেন, তিনি জগন্নাথ বিগ্রহে বিলীন হয়ে গেছেন।

ঘ. দিবাকর দাস *জগন্নাথ চরিতামৃত*-এ লিখেছেন, তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বিলীন হয়ে গেছেন।

ঙ. মেলভিল. টি. কেনেডি তাঁর *দ্য চৈতন্য মুভমেন্ট*-এ জানিয়েছেন, চৈতন্য সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছেন।

চ. কবি কর্ণপুর *শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়ম্*-নাটকে স্ব-ধামে ফিরে যাবার খবর দিয়েছেন।

ছ. বৃন্দাবন দাসের *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত* এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ-এর *শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে* অন্তর্ধান সম্পর্কে অতিরিক্ত ভাবাবেগের ফলে নিশ্চুপ থেকেছেন।

৭. তত্ত্বের দিক দিয়ে অধিকারী ভক্তের চোখে চৈতন্যদেব বিচিত্রভাবনার প্রতীক। নবদ্বীপে তিনি কৃষ্ণের অবতার। অর্থাৎ কৃষ্ণের যে দ্বৈতরূপ—বাঁশি এবং চক্র অর্থাৎ প্রেম ও দ্রোহ যা নবদ্বীপে চৈতন্যচরিতে প্রকাশ হয়েছে। আবার নীলাচলে তিনি রাধা-কৃষ্ণ অথবা সচল জগন্নাথ। কিন্তু এই সূক্ষ্ম ভেদ-অভেদ জ্ঞান সাধারণ লোকমানস গ্রহণ করেনি। ফলে চৈতন্যে রাধাতত্ত্ব সাধারণ মানসে বেশি প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। বিশেষভাবে পদাবলি কীর্তনে রাধাভাব অঙ্গীকার করার তত্ত্বই বেশি প্রদর্শিত। ফলে এই রাধাকৃষ্ণ বা শুধু রাধাতত্ত্বই তাঁর লোকায়ত রূপ লাভ করে সকলের কাছে প্রেম প্রকাশের এক অন্যন্য মাধ্যম হয়ে গেছে।

৮. কীর্তনের মাধ্যমে চৈতন্য বা রাধাকৃষ্ণের যে লীলারূপ প্রকাশ পায় তার উপমা, চিত্রকল্প, বিন্যাস, লীলাসংগঠন-প্রক্রিয়া পরমার্থিক হলেও তা লোকজ উপাদানে ভরপুর ফলে সাধারণ লোকমানসে বিষয়টি হয়ে ওঠে একান্ত আপনার জগৎ।

৯. কোনো সৃষ্টির সাথে যে বিষয়টি গভীরভাবে সংযুক্ত থাকে তা হলো 'আবেগ'। ভক্তির আবেগ এবং সংহতি একত্রিত হয়ে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ দর্শনের জন্ম দেয়, যা প্রচার-প্রসারে লোকমানসে প্রভাব বিস্তার করে। বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, রসময়তার এক অনন্য মাধ্যম। ফলে এই Motif সাধারণ লোকমানসকে করেছে উজ্জীবিত এবং ভক্তিবাদের জোয়ারকে করেছে প্লাবিত।

১০. সংস্কৃতির এক অনন্য বিশেষত্ব Extension ও Fusion। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের মাধ্যমে পূর্ণতার দ্যোতক হিসেবে লোকমানসে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ, পঞ্চতত্ত্ব (চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীবাস) ও রাধাকৃষ্ণ ভজন-সাধনের এক অপূর্ব পথ রচিত হয়। অর্থাৎ, এই সাধ্যসাধন তত্ত্ব কীর্তনের মাধ্যমে সাধারণ লোকমানসে একীভূত হবার ক্ষেত্রে এবং অধ্যাত্মবাদী সাধনার ক্ষেত্রে মূল Potentiality খুঁজে পায়।

সহজ সাধনে বৈচিত্র্যের মাত্রা বেশি থাকে, ফলে নানান গোষ্ঠীর আবির্ভাব ও মতান্তরও এক্ষেত্রে ঘটে থাকে। চৈতন্য-তিরোভাবের পর বৈষ্ণব সমাজে দেখা যায় নানান মতবাদ ও মতান্তর ঘটতে। যেহেতু 'চৈতন্যদেবের সময়ে ভক্তিধর্মের বিরুদ্ধবাদীরা প্রবল তর্ক খাড়া করেছিলেন।'[১] কিন্তু চৈতন্য এবং তার অনুসারীগণ কোনো তর্ক-বিতর্ক করেননি। একটা পর্যায়ে তর্ক-বিতর্ক অপরিহার্য হয়ে উঠলে চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মে গোস্বামীগণ (সনাতন গোস্বামী রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গাস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ নানান সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনেন ফলে বাংলার বৈষ্ণবদের মধ্যে এক ধরনের বিভাজন তৈরি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলার বৈষ্ণব সমাজ বিশেষভাবে শ্রীনিবাস, নরোত্তম দত্ত, শ্যামানন্দ—এই ত্রয়ী বৈষ্ণবের প্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠিত হয়। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*- কেন্দ্রিক শাস্ত্রধারা ও সহজপন্থী নানান গুহ্যসাধনধারা সূচিত হয়। এই তত্ত্ব ও সাধনধারার অনন্য মাধ্যম হয়ে উঠেছিল কীর্তন। পদাবলি কীর্তনের মধ্যদিয়ে স্বকীয়া-পরকীয়া রতি ও শুদ্ধ ভজন প্রণালী বিকশিত হতে থাকে। লোকমানসে এই সংগীতের ধারার মধ্য দিয়ে উপাস্য ও উপাসনার পথ সহজতর হয়ে ওঠে।[২]

---

১. হীতেশরঞ্জন সন্যাল, *বাঙালা কীর্তনের ইতিহাস*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২২৬
২. দ্রষ্টব্য: অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *চৈতন্যদেব: ইতিহাস ও অবদান*, সুধীর চক্রবর্তী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও উপ-সম্প্রদায়, আহম্মদ শরীফ, 'ইসলাম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ,' বিমলকুমার মুখোপধ্যায় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বাংলার সহজিয়া', সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০২২

চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম বা প্রেমধর্ম শেষ পর্যন্ত বাংলার বৈষ্ণবদের কাছে Culture-এ পরিণত হয়েছে। সংস্কৃতির প্রবহমান ধারায় চেতনা ও চৈতন্যের এক বিশেষ দিক থাকে। চৈতন্যদেব এই চেতনা ও চৈতন্যকে সমন্বয় করেছিলেন। এই সমন্বয়টি সাধিত হয়েছিল ভাব ও রূপের মেলবন্ধনে। ভাব হলো চেতনা বা চৈতন্যের দিক; রূপ হলো তার সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ। এই রূপকে নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন Super-organic Concept of Culture। এক্ষেত্রে লোকমানস সমীকরণ (Equation) সাঙ্গীকরণ (Assimilation) এবং প্রসারণের (Extension) মধ্য দিয়ে কোনো বিশেষ তত্ত্বের প্রতি একাত্ম হয়ে ওঠে।[১] বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন তেমনই এক Super organic concept যেখানে লোকমানসে এক বিশেষ সংগঠন স্থিতি লাভ করে। যেমন :

ক. জাতিভেদকে অস্বীকার করা অর্থাৎ মহোৎসবের মধ্য দিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক সারিতে ভোজন।

খ. পদাবলি কীর্তন ও নাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রেণিবৈষম্য দূর করা।

গ. ভক্তিকেই অনন্য হেতু হিসেবে বিবেচনা করা। অর্থাৎ, ভক্তির মাধ্যমে চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হতে পারে।

ঘ. ব্যাভিচার ও সামাজিক অনাচারকে রুখতে কীর্তনের মাধ্যমে নৈতিক শৃঙ্খলা প্রদান করা।

ঙ. ভক্তির বিকাশ, চৈতন্য সারবত্তা নির্ণয় ও যুগল সাধনার উপযুক্ত পথ নির্দেশ।

চ. সর্বপ্রাণবাদ প্রতিষ্ঠা (সর্ব জীবে প্রাণি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান)।

ছ. লীলা কীর্তনের মাধ্যমে লোকমানসে উন্নত রুচি ও মননশীলতার চর্চাকে উৎসাহিত করা।

জ. সর্বাত্মক সাধন প্রণালী প্রদান এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে একীভূতকরণ।

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। কীর্তন শ্রবণের মাধ্যমে অলৌকিক রসের আস্বাদন হয় এবং তা ধীরে ধীরে আনন্দ-রূপ রতিতে পর্যবসিত হয়। এরপর বিভাবাদির সঙ্গে চিত্ত সংযোগে রতির সাক্ষাৎকার ঘটে। পরবর্তীসময়ে রতি রস-রূপে পরিণত হয় এবং বিভাবাদিযুক্ত রসের দ্বারা যুগলতত্ত্বের উপলব্ধি বা তার চরম আস্বাদন ঘটে থাকে। ড. সুশীলকুমার দে এ-বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধৃত করছি:

> The work is, therefore essentially a vaisnava religious treatise, presented in a literary garb, taking Krisna as the ideal hero, with the caution, however, that what is true of Krisna as the hero does not apply to the ordinary secular hero.[২]

সুতরাং, বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন লোকমানসে সাংগঠনিক ভিত্তি প্রদান করে এবং প্রকৃত বৈষ্ণব সাধনার উপযুক্ত পথ প্রদর্শন করে।

১. দ্রষ্টব্য : জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *চৈতন্য-প্রসঙ্গ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৩২-২৩৪

২. Dr. Sushilkumar Dey, *Sanskrit Poectics as a study of aesthetic enjoyment*, P.61- দ্রষ্টব্য:অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *চৈতন্যদেব: ইতিহাস ও অবদান*,সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০২২, পৃষ্ঠা ৩৫৪

বৈষ্ণব আন্দোলন ও বৈষ্ণব পদাবলি কীতনচর্চা

বৈষ্ণব আন্দোলন মূলত ধর্মীয় হলেও এর সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মধ্যযুগে স্থানীয় মানুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল; সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত ছিল সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে বঞ্চিত মানুষের জন্য এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব আন্দোলন ধর্মীয় ও সামাজিক অধঃপতন রোধে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। এই আন্দোলনের ফলে শুধু যে ধর্মীয় ও সমাজের অধঃপতন রোধ হয়েছিল তা নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই একধরনের জাগরণ সূচিত হয়েছিল।

অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজ, উচ্চশ্রেণির হিন্দুসমাজ তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী আচরণের ফলে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা কলুষিত হয়ে পড়েছিল। বৃন্দাবন দাসের *শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত*-এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়াও জমিদারদের উচ্ছৃংখল আচরণ, দুর্নীতিপরায়ণতা ও মানসিক অত্যাচার সামাজিক

অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি নিষ্ঠুর জাতিভেদ প্রথায় শৃঙ্খলিত নিম্নশ্রেণির হিন্দু সমাজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণে ছিল নিস্পেষিত। সামাজিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের কারণে দারিদ্র্য ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। ধর্মীয় আচার ও জীবনযাপনপ্রণালী ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। চৈতন্যদেব স্বীয় প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে জনমানসে গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন, যা ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছিল। বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে সমাজজীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার কিছু দিক উল্লেখ করা হলোঃ

ক. বৈষ্ণব আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দ জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। কারণ, জন্মসূত্রে তথাকথিত যে জাতিভেদ প্রথা বা তার ধারণা তা চৈতন্যের আদর্শ-বিরুদ্ধ বিষয় ছিল। তাদের আদর্শ ছিল –

> সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
> সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
> সেই শাস্ত্র সত্য-কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
> অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ড পায়॥
> চণ্ডাল চণ্ডাল নহে –যদি কৃষ্ণ বোলে।
> বিপ্র নহে বিপ্র – যদি অসৎপথে চলে॥[১]

চৈতন্যভাগবতকার সমাজে সবার উপরে ভক্তের স্থান দিয়েছেন। সমাজের শ্রেণিবৈষম্য ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তা বৈষ্ণব আন্দোলনের অন্যতম বিষয় ছিল, যা আজও নানান বৈষ্ণব ক্রিয়া-কাণ্ডে অব্যাহত আছে। কীর্তন তার অনন্য অনুষঙ্গ। W. W. Huter এ-বিষয়ে জানিয়েছেন :

---

১. বৃন্দাবন দাস, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত)*শ্রীচৈতন্যভাগবত*, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-১৩২

> … It may still be said with truth that they do not hold by caste. Any Hindu can join the Vaishavs – from the lowest chandals to the highest Brahman.[১]

খ. জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও সামাজিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে চৈতন্যদেবই প্রথম সক্রিয় আন্দোলন শুরু করেছিলেন। অবশ্য এই আন্দোলনে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রাহ্মনেরাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তাঁরা উপর্যুক্ত আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। বস্তুত তাঁরা জন্মগত ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন না। ফলে চৈতন্য ও বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র হিন্দু সমাজই বৈষ্ণব আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। জাতিগত বৈষম্য ও সমাজপতিদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব আন্দোলন সে-সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

গ. চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনে নারী জাতির সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। প্রকাশ্যে নারীর পক্ষে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা দুরুহ ছিল। বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর হয় এবং নারী সমাজ সকল সামাজিক ক্রিয়া-কর্মে সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। যেমনঃ নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবী, যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ভক্তিশাস্ত্রসমূহ প্রচার লাভ করে। তাঁর নেতৃত্বে বিছিন্ন বৈষ্ণবগণ একত্রিত হন এবং বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমান বাংলাদেশে যে পদাবলি কীর্তনচর্চা হয় তার মধ্যে বহু কীর্তনীয়া রয়েছেন নারী। যারা এককভাবে দল পরিচালনা এবং কীর্তনের আসরে নিয়মিত কীর্তন পরিবেশন করছেন। নারীর এই সামাজিক মর্যাদার যুগান্তকারী পরিবর্তন বৈষ্ণব আন্দোলনের মাধ্যমেই বেগবান হয়েছিল।

ঘ. বৈষ্ণব আন্দোলন ছিল মূলত সামাজিক আন্দোলন, যা-ছিল সাধারণ জনগণ দ্বারা পরিচালিত। সনাতন ধর্মের যে শাস্ত্রীয় মতাদর্শ, যে কঠিন দিক নির্দেশনা, জাতিভেদ তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসন এবং বিজয়ী বহিঃ দেশীয় শাসকদের শাসন ও ধর্মান্তরকরণ তার থেকে রক্ষা পেতে বৈষ্ণব ধর্ম ও আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত এই আন্দোলনকে উপমহাদেশের প্রথম গণআন্দোলনের সূচনা বলা যায়। বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের যে ক্ষেত্র, যে আদর্শ অথবা যে ক্রিয়া-কৌশল তার মধ্য দিয়ে প্রধানত ধর্মীয় এবং সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা পরিলক্ষ্যিত হয়।

ঙ. কৃত্রিম সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে বৈষ্ণব আন্দোলন শুরু থেকেই ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল যা এখনও অব্যাহত আছে। একেশ্বরবাদী চিন্তায় *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* কে আশ্রয় করে এক নতুন সমাজ-কাঠামো সৃজন করতে প্রয়াস চালিয়েছেন বাংলার বৈষ্ণব সমাজ। ভক্তিকে অবলম্বন করে প্রেমকে অন্যতম উপলক্ষ্য জেনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ সুসংহত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ-বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা স্মরণযোগ্য :

---

১. W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, *Journal of the Asiatic Society of Bangal,* Calcutta, Vol-1, 1970, P-66

i. হাজার উপদেশ যেখানে কার্যকরী হয় না, আদর্শের যাদুদণ্ড সেখানে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। মানুষের মত মানুষের হাতে পড়িলে একটিমাত্র লেখনীমুখে অঙ্কিত রেখাচিত্র অসংখ্যজনের নয়নে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহারা দিকে দিকে আদর্শকে জীবন্ত দেখে। তেমন মানুষের বাগ-বিভূতি যে হাজার হাজার নর-নারীকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু সমাজজীবনে অভাবনীয় প্রভাবের গতিবেগ সঞ্চায়িত করে মানুষের আচরণ। একজন মহত্তর মানবের জীবনাদর্শই লক্ষ লোকের জীবন-প্রবাহকে উজানে বহাইয়া আনে। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে বাঙলায় এমনই একজন মানুষ আসিয়াছিলেন শ্রীধাম নবদ্বীপে, নাম তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ দেব। এই মানববিগ্রহ দেখাইয়া গিয়াছেন, মনুষ্যত্বের কোন জাতি নাই।[১]

ii. কূর্ম যেমন কঠিন পৃষ্ঠাবরণের অন্তরালে কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি লুকাইয়া রাখিয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করে, এই অসহযোগের মনোবৃত্তি অনেকটাই সেইরূপ। ইহার ফলেই জাতির অবরূদ্ধ জীবন স্রোতে এক শ্বাসবিরোধী বিষবাষ্পের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্জন ছিল, গ্রহণ ছিল না। এই সর্বনাশা

মহামারীর হাত হইতে জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন মহাপ্রভু। তাঁহার কুলপ্লাবী করুণা বন্যায় জাতির অবরুদ্ধ জীবনপ্রবাহের মোহনা শতধা বিদীর্ণ হইয়া জাতিকে মুক্তির সাগর সঙ্গমে মিলাইয়া দিয়াছিল।[২]

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনে বৈষ্ণব আন্দোলনের ভাব বিস্তার

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন যদিও চৈতন্যলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণন, কিন্তু এই লীলা বর্ণনের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলনের গতিকে তরান্বিত করে। প্রথমত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের যে মূলনীতি, "সর্বজীবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান," – এই তত্ত্বকে লীলার তরঙ্গাঘাতে প্রকাশ করা যায়। কীর্তনের আসর হয়ে ওঠে এমন এক তীর্থভূমি যেখানে বিপ্র-শূদ্র বলে কিছু থাকে না, এক সুর, এক নাম, এক প্রেম, এক গাথা, এক সূত্র – ভক্তি-ভক্ত। সামাজিক বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ঠ উচুঁ-নিচু থাকে বলে কিছু থাকে না। সব একসূত্রে গ্রন্থিত করার অদম্য প্রয়াস ছিল চৈতন্য ও মহাজন-প্রবর্তিত পদকীর্তনে। নারী-পুরুষের বৈষম্যও এখানে নেই। ভক্তির প্লাবনে সবঅমৃতের সন্তান বলে পরিগণিত হন। অর্থাৎ, সমাজবিন্যাসের ধারায় সমস্ত ভেদাভেদকে দূর করে দিয়ে চৈতন্য-আদর্শের যে ধারা কীর্তন, তার মাধ্যমে সর্বপ্রাণবাদের চর্চা হয়ে থাকে।

সমাজ মনস্তত্ত্বে বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের প্রভাব

বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলনের প্রভাব পুষ্ট। সনাতনধর্মীয় যে মার্গ দর্শন, যাগযজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠান তা কালের বিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে সনাতন সমাজ নানান ভাগে-মতে বিভক্ত হয়ে জটিলতর সমাজ জীবনে এসে পৌঁছেছিল। প্রাক-চৈতন্য যুগের যে ধর্মাচরণ, জীবন প্রণালী বহমান ছিল চৈতন্যদেবের করস্পর্শে সেই ছুঁৎমার্গের সমাজে পরিবর্তন সূচিত হলো। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে ছিল ভক্তিবাদ। ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে নীতিভিত্তিক বৈষ্ণব ধর্ম সমাজের জাতিভেদ প্রথা, ছুঁৎমার্গ, বর্ণ বৈষম্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে একটি বড় প্লাটফর্ম হয়ে দাঁড়ায়। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব দর্শন ও তত্ত্ব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*-এর দ্বারা লোকায়ত সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক বৃন্দাবন থেকে গোস্বামী গ্রন্থ বাংলায় এনে তার প্রচারের দ্বারা বাঙালি জনজীবনে এই ভাগবতী প্রেম ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম এক নতুন জীবন দর্শনের সন্ধান দিয়েছিল। এক্ষেত্রে নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী, তাঁর পুত্র বীরচন্দ্র, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্যামানন্দ – এছাড়াও অগণিত বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের অমিয়বাণী নানাভাবে উচ্চ থেকে একেবারে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সাধারনের কাছে চৈতন্য হয়ে উঠেছিলেন –

ক. কৃপাসুধা-সারিদ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচ গেব সদা জাতি তং চৈতন্যপ্রভু ং ভজে ॥

১.ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১১, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪০-৪১

চৈতন্য প্রভুর দয়া যেন অমৃতের নদী। নদী সারা জগৎ ভাসিয়ে দিলেও সব সময় নীচের দিকেই বয়ে যায়। মহাপ্রভুর করুণার ধারাও তেমনি সারা জগৎকে ভাসিয়ে দিয়েও নীচ অভাজন যারা তাদের দিকেই বয়ে গেছে। সেই চৈতন্যকে ভজনা করি।[১]

খ. ন যৎ কখমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং।
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্ গুরুতরাবতারান্তরে ॥
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ।
শচীসুত মরি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপান্ ॥
হে রসরত্নাকর !যাহা বেদে নাই, উপনিষদে নাই এবং অন্যান্য অবতারে প্রকাশিত হয় নাই, যেই ভক্তি রত্ন তুমি ধরাতলে বিতরণ করিতেছ। হে শচীনন্দন ! অধম জনে কৃপা কর।[২]

এছাড়াও ভক্তিতত্ত্ব অনুশীলনে এবং পরমার্থিক সাধনায় কোনো ভেদজ্ঞান নেই এই তথ্য সমাজ মনস্তত্ত্বে পূর্ববর্তী যে-সকল ধারা সমাজে বিদ্যমান ছিল তাতে আঘাত হানতে সমর্থ হয়। ফলে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে এক নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল।

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে কীর্তনের নানা ধরন থাকলেও চৈতন্যযুগ এবং চৈতন্যোত্তর যুগে কীর্তন অনন্য মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছিল। খতুরি মহোৎসবের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন আসরভিত্তিক যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন হয়ে ওঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলন বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। বিদ্যাপতি, জয়দেব থেকে চণ্ডীদাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, বাসু ঘোষ, লোচন দাস প্রমুখের পদাবলি কীর্তনের আসরে হয়ে ওঠে প্রেম ও সবার্থসাধনার অনন্য মাধ্যম, পদ কীর্তনে সুর-তাল-ছন্দের অন্তর্মূলে যে কান্তাপ্রেম ও পঞ্চরসের প্লাবন তার দ্বারা জনমানসে ভক্তির অসাধারণ ব্যাপ্তি ঘটেছিল। বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের মাধ্যমে মনোজগতে Other-worldliness অর্থাৎ সবকিছু বাহ্যজগৎ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের অতীত হয়ে পড়েছিল।

১.কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১১৫
২. কবি কর্ণপুর, ত্রিদণ্ডী গোস্বামী ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ সম্পাদিত, *চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্*, শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্করণ, মায়াপুর, নদীয়া, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা-১৫৩

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন যজ্ঞ

অধিবাস

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনযজ্ঞের শুরুতে অধিবাস কীর্তন ও আহবানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অর্থাৎ পরের দিন প্রাতঃকাল থেকে কীর্তন মহোৎসব শুরু হবে এই সংকল্প করে রাধাকৃষ্ণ, পঞ্চতত্ত্ব, অষ্ট কবিরাজ, চৌষট্টি মোহন্ত এবং বৈষ্ণব মহাজনদের আবাহনের মধ্য দিয়ে অধিবাস কীর্তনের সূচনা হয়ে থাকে। বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অষ্টপ্রহর ব্যাপীই হয়ে থাকে, তবে বর্তমানে বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চলে ষোলোপ্রহর ব্যাপীও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অধিবাস কীর্তন মূল কীর্তনের আগের দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়ে

থাকে। গায়ক-বাদক-শ্রোতার উপস্থিতিতে এই কীর্তনের পরেই বৈষ্ণব রীতি অনুযায়ী অধিবাস অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মন্দির সজ্জা, ঘটস্থাপন, বিগ্রহ স্থাপন ও অভিষেকের মধ্য দিয়ে এই কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, সংকল্পিত এই অবিরাম কীর্তনের প্রবর্তক স্বয়ং চৈতন্য। অধিবাস কীর্তনের শুরুতে ভাগবত পাঠ ও পাঠকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বটি সবার সমান অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

অষ্ট বা ষোলো প্রহর ব্যাপী কীর্তন যজ্ঞ

অধিবাসের পরের দিন প্রাতঃকালীন সময় থেকে দণ্ড বা সময় বিবেচনা করে রাধাকৃষ্ণের নানা লীলা কীর্তনীয়াগণ আসরে পরিবেশন করেন। প্রহর বিবেচনায় নির্ধারিত লীলা পরিবেশিত হয়ে থাকে। কীর্তন হলো মূলত গান, কিন্তু কীর্তনীয়াগণ এর সঙ্গে নাটকীয় উপস্থাপনার দ্বারা উপস্থিত জনমানসে লীলাকে দৃশ্যমান করে তোলেন এবং বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলনের প্রবাহকে গতিশীল করে তোলেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি আসর থাকে ভক্তেপরিপূর্ণ এবং থাকে প্রসাদের ব্যবস্থা। এই কীর্তন যজ্ঞে থাকে না কোনো জাত্যভিমান, ব্যবধান, সামাজিক বৈষম্যের চিহ্ন। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে থাকে একই আহারের ব্যবস্থা, একই চাদোয়ার নিচে অবস্থান।

ভোগরাগ ও নগর কীর্তন

আট বা ষোলো প্রহর কীর্তন শেষে নগর-সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ, উপস্থিত সবাই নগর পরিক্রমার মধ্য দিয়ে আমন্ত্রণ বার্তা পৌঁছে দেন ভোগরাগে সমবেত হবার। ভোগ আরতি কীর্তনের মধ্য দিয়ে ভোগরাগ সম্পন্ন হয়। ক্রিয়াদি শেষে সকলে একত্রে মিলিত হয়ে পাশাপাশি বসে মহোৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং সবার কণ্ঠে 'হরিবোল' জয়ধ্বনি থাকে। ভোগমহোৎসব মূলত একটি সমবেত ক্রিয়া। এক্ষেত্রে সমাজের সবার অংশগ্রহণ থাকে বলে এটি সর্বজনীন উৎসব হয়ে ওঠে।

জলকেলি ও মোহন্ত বিদায়

ভোগ-মহোৎসব শেষে সববেত ভক্তমণ্ডলির জলকেলি অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বটি সমাজের সকল স্তরের মানুষের দ্বারা এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। সমাপনি কীর্তনের মধ্য দিয়ে মোহন্ত বিদায় পর্ব ও ঘট বিসর্জন হয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে যে ঐতিহ্যগত লোকশিক্ষাব্যবস্থা তারই এক অপূর্ব নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। কারণ, সমাজজীবনে লোকশিক্ষা এবং প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভাব-আন্দোলনকে প্রবাহিত করা, দর্শনধারাকে বেগবান করা এবং তত্ত্বজ্ঞানের কঠিন বিষয়কে রসে পর্যবসিত করে কীর্তনীয়াগণ আসরে কীর্তনের মাধ্যমে তা প্রকাশ ও প্রচার করে থাকেন। ফলে, মহাজনের তত্ত্বকথার কাব্যরূপ শ্রবণ এবং তত্ত্বকথার আধার পদাবলি কীর্তন শ্রবণে ঐতিহ্যগত লোকশিক্ষায় দারুন প্রভাব ফেলে। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মন্তব্য উপস্থাপন করছি :

> য়ুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠিতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের

> নিত্যই ছিল চলাচল। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন-কি, যে-সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যাবসায়ে আলোচিত তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। ... তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে। ... সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েছে; ... সমাজ দেশের বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে।[১]

কীর্তন যজ্ঞ মূলত প্রেম সাধনার স্থান, ভক্তি জাগ্রত করার আশ্রয় ও বিষয়। কীর্তন যজ্ঞের দ্বারা মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, কামনা-বাসনা, বিরহ-মিলন জনিত যে ভাব হৃদয়ের গভীরে সুপ্ত থাকে, কীর্তনের রস ও ভক্তিতরঙ্গ সেই অনাবৃত ভাবকে নিগূঢ় মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ দ্বারা সমাজ জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে. তাহলো একদিকে অসম্ভাবিত অনুভূতি সঞ্চার এবং অন্যদিকে ভাবের অনুভূতিকে সর্বজনীন করে তোলা।এখানে কোনো ভেদাভেদ নেই। একান্ত বাসনা থাকে অখণ্ড বিশ্বজনীন এক জীবনের তীব্র উপলব্ধি করা যা প্রকৃত পরমানন্দময় 'প্রেম'। বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন যজ্ঞ সমাজজীবনের ঐহিক জীবনবোধকে অধ্যাত্মভাবনায় উত্তরণ ঘটায়।

অর্থনৈতিক প্রভাব

বর্তমানে বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের সাথে অর্থনীতির যুগপৎ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অঞ্চল যাকে আমারা সংগীতাঞ্চল বলে চিহ্নিত করেছি, সে-সব অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ কীর্তন-সংগীতকে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে কীর্তন থেকে শহুরে সমাজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, একুশে শতকে এসে দেখা গেল তারাই কীর্তনকে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে শুরু করেছে। তবে বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃতি না থাকায় কীর্তন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। একটি কীর্তন যজ্ঞানুষ্ঠানের সাথে অর্থনৈতিক নানা বিষয় যুক্ত থাকে। আসরসজ্জায় শোলাশিল্পী, ভোগরাগ ও অন্যান্য ক্রিয়ায় মৃৎশিল্পী, প্রসাদব্যবস্থায় রন্ধনশিল্পী, মঞ্চব্যবস্থাপনায় ডেকোরেশন শিল্পী, আলোকসজ্জা, সাউণ্ডসিস্টেম, কোথাও কোথাও আবাসিক হোটেল প্রভৃতি বিষয় কীর্তনের সাথে যুক্ত থাকে। ফলে কীর্তনযজ্ঞ চলাকালীন বড় অংকের আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে। বিশেষ স্থানে বাৎসরিক কীর্তনযজ্ঞে গ্রামীণ লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়। কীর্তন-

১. সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত*রবীন্দ্র রচনাবলি*,ত্রয়োদশ খণ্ড, প্রবন্ধ : শিক্ষার বিকিরণ, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৬০৪

কেন্দ্রিক বহু লোক তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। যেমনঃ ভাগবত পাঠক, কীর্তন শিল্পী, দোহার, যন্ত্রশিল্পী, কুঞ্জসেবাকারী বৈষ্ণব ও তার সহযোগী, মালা-চন্দন-পূজার উপকরণ বিক্রেতা, গ্রন্থ বিক্রেতা, ফুল বিক্রেতা, মাধুকরী দ্বারা জীবনযাপনকারী বৈষ্ণব, খেলনা প্রস্তুতকারী, সংসার উপযোগী নানা উপকরণ বিক্রেতা প্রভৃতি।

বর্তমান গবেষক বাংলাদেশের কীর্তন-অঞ্চল সমূহে ২০১৮ থেকে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যে ক্ষেত্র-গবেষণা পরিচালনা করেছে তার ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপর্যুক্ত বিষয় তুলে ধরা হলো :

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র-গবেষণা পদাবলি কীর্তন আসর কেন্দ্রিক পরিচালিত হয়েছে। সাক্ষাৎকার ও কীর্তনকেন্দ্রিক প্রচার-প্রসার বিষয়ে উল্লিখিত সারণি প্রস্তুত করা হয়েছে।

সারণি - ১

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের মাধ্যমে বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার ও তার প্রভাব

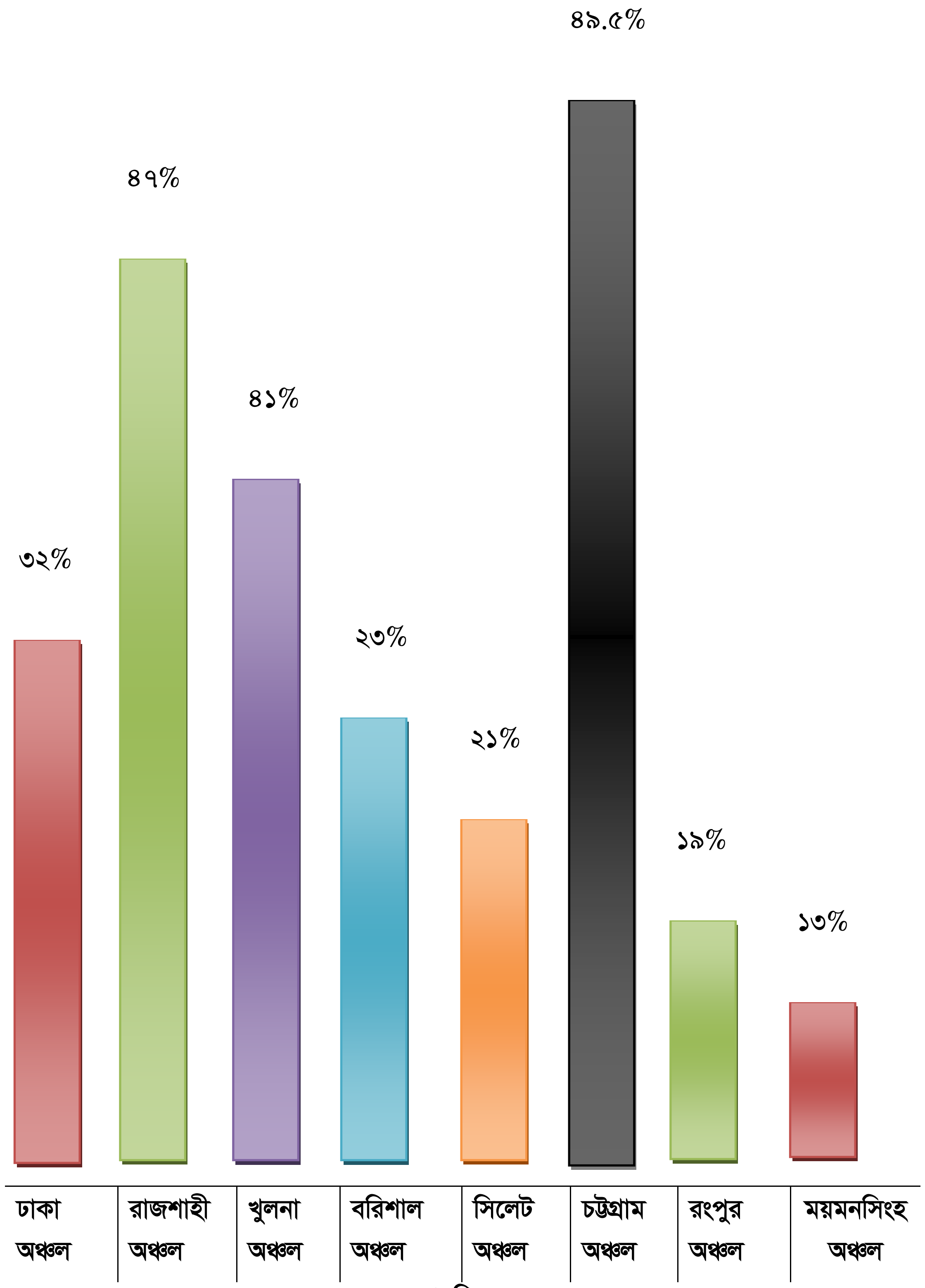

সারণি - ২

বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন-অনুষ্ঠান [নভেম্বর - এপ্রিল}

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও সামাজিক রীতি অনুযায়ী বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বেশি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অন্য সময়ে সংকীর্তন যজ্ঞের চেয়ে ছুটাপালাকীর্তন বেশি অনুষ্ঠিত হয়।

* উল্লিখিত অঞ্চলকেন্দ্রিক শতকরা হিসাব নামসংকীর্তন যজ্ঞে লীলাকীর্তনকে ধরে করা হয়েছে।

সারণি - ৩

অঞ্চলকেন্দ্রিক পদাবলি-কীর্তনীয়াদের অবস্থান সম্পর্কিত শতকরা হিসাব

* বর্তমানে অঞ্চলকেন্দ্রিক বৈষ্ণবপদাবলি কীর্তনীয়াদের সংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে। কীর্তনশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা না করা, জীবিকা হিসেবে কীর্তনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি না থাকা, পরিবেশের অভাব, যথার্থ শিক্ষাগুরুর অভাব প্রভৃতি কারণে পদাবলি কীর্তনকে অনেক শিল্পী পেশা হিসেবে গ্রহণ করছে না।

<u>সারণি - ৪</u>

যে সব ভৌগোলিক অঞ্চলে বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন বেশি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে

সারণি - ৫

বাংলাদেশের বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের ভৌগোলিক অঞ্চল

* নামসংকীর্তন অঞ্চল : শুধু তারকব্রহ্ম হরিনামসংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান।

Dhaka University Institutional Repository

* পদাবলি সংকীর্তন অঞ্চল : অষ্টকালীন বা ষোলেকালীন বা শুধু পালাকীর্তন অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশের কীর্তন সংগীত ও অঞ্চলভিত্তিক চর্চা

একটি বিশেষ জরিপ

প্রশ্নোত্তরমালা

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ২০১৯-২০২০

ক. সাক্ষাৎদাতা কীর্তনীয়ার নাম : .... পিতার নাম : .... মাতার নাম : ....। পেশা : .... শিক্ষামান :............... গ্রাম : .... ডাকঘরঃ .... থানা/উপজেলা : .... জেলা ; .... বয়স : ....

খ. আপনি কী কীর্তন করেন?

১. বৈষ্ণব পদাবলি ২. নাম সংকীর্তন ৩. অন্যান্য (উত্তর ১ হলে পরবর্তী প্রশ্ন)

গ. বৈষ্ণব পদাবলি আপনি কোন ঘরানায় পরিবেশন করেন?

ঘ. বাংলাদেশের বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তনের সাথে ভারতীয় রাগমার্গীয় সংগীতের সম্পর্ক আছে কি? থাকলে বিশদভাবে বলুন।

ঙ. পদাবলি কীর্তনে কোন কোন তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং কেন?

১. গৌরাঙ্গতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ২. গৌরাঙ্গতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্ব ৩. গৌরনাগরবাদী সহজিয়াতত্ত্ব

চ. পদাবলি কীর্তনে শ্রোতাদের মধ্যে কোন ভাব প্রাধান্য পায়?

ছ. বৈষ্ণবধর্মে কীর্তনকে উপাসনার স্মারক বা চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়। আপনার ব্যাখ্যা কী?

জ. পদাবলি কীর্তনে ভক্তমনে কোন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি মেটে? কেন?

ঝ. বাংলাদেশে পদাবলি কীর্তনের পরিবেশ কেমন? আঞ্চলিক চর্চায় মূল বৈশিষ্ট্য কী?

ঞ. পদের বিকৃতি রোধে আপনি কোন পথ বেছে নিয়েছেন?

ট. যে কীর্তন আপনি আসরে করেন তাতে কি অধ্যাত্মসাধনার পাশে পারিপার্শ্বিকতার ছবি ফুটে ওঠে?

ঠ. উত্তর হ্যাঁ হলে, কীভাবে?

ড. আপনি কত বছর ধরে পদাবলি চর্চা করছেন?

ঢ. এই চর্চার ধারা কি আপনার বংশানুক্রমিক না কি অন্য মাধ্যম অর্থাৎ বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী থেকে তালিম নিয়েছেন? বিস্তারিত বলুন।

ণ. সাধারণত কোন সময়ে পদাবলি কীর্তন বেশি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে?

ত. আপনার সহযোগী বা দোহার যারা, তারা কি এটাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে?

উত্তর : ১. হ্যাঁ ২. না ৩. বিশেষ সময়ের কাজ হিসেবে

থ. আপনার জীবন, জীবিকা ও সাধনায় পদাবলি চর্চার গুরুত্ব কতখানি?

দ. আপনি আসরে যে সব আখর ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেন তার উৎস কী?

ধ. আপনি বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলি চর্চার ভবিষ্যৎকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

ন. সংগীতের এই ধারাকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষক বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলি কীর্তন-সংশ্লিষ্ট ৬টি বিভাগের (ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং বরিশাল) ত্রিশ জন কীর্তনীয়ার উল্লিখিত প্রশ্নের আলোকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সাক্ষাৎকার পর্বগুলি অনুষ্ঠিত হয় বিভাগীয় অঞ্চলের বিভিন্ন লীলা কীর্তনের আসরে এবং অবশিষ্ট কীর্তনীয়াদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে। লীলা কীর্তনের আসর-কেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার শব্দযন্ত্রে ধারণ করে বর্তমান পরিচ্ছেদে তা অনুলিখিত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের সাক্ষাৎকারও অনুরূপভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আসরকেন্দ্রিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :১ম সাক্ষাৎকার : রাধাবল্লভ অঙ্গন, বাণীবহ, রাজবাড়ী

১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮

২য় সাক্ষাৎকার :রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির, বাণীবহ, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী

১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৮

৩য় সাক্ষাৎকার : শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধু আশ্রম, ফরিদপুর

১৮ই এপ্রিল ২০১৮

৪র্থ সাক্ষাৎকার : গৌরাঙ্গ বাড়ি, খেতুরী, রাজশাহী

১০ই অক্টোবর ২০১৮

৫ম সাক্ষাৎকার : নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরের আশ্রম, পাটবাড়ী, বেনাপোল, যশোর

২১এ ডিসেম্বর ২০১৮

৬ষ্ঠ সাক্ষাৎকার : জগদ্বন্ধু আশ্রম, ময়মনসিংহ স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

১৮ই এপ্রিল ২০২২

৭ম সাক্ষাৎকার : ডা. নারায়ণচন্দ্রের বাড়ির কীর্তন অনুষ্ঠান, বানিয়াজুরি, মানিকগঞ্জ

৯ই অক্টোবর ২০২২

৮ম সাক্ষাৎকার : সর্বজনীন কালী মন্দির, আটদাপুনীয়া, রাজবাড়ী

৩রা মার্চ ২০২২

৯ম সাক্ষাৎকার : রাধাগোবিন্দ মন্দির, নাটোর (উত্তরা গণভবন সংলগ্ন)

২৩এ মার্চ, ২০২২

সাক্ষাৎকারদাতা কীর্তনীয়াদের নামের তালিকা :

১. মিহির কান্তি ঘোষ
   বাল্লোপাড়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ
২. অশোক কুমার গোস্বামী
   বাণীবহ, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী
৩. গোপেশ মোহন্ত
   চণ্ডীপুর, শিবরামপুর, ফরিদপুর
৪. বেণীমাধব ব্রহ্মচারী
   বলিহার, শান্তাহার, নওঁগা
৫. উত্তম কুমার সাহা
   মোকামতলা, বগুড়া সদর, বগুড়া

Dhaka University Institutional Repository

৬. অমল ব্যানার্জী
গজারিয়া, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর

৭. তৃষ্ণা দেবনাথ
বগুড়া

৮. অন্তর মোহন্ত
ঢাকা রোড, বগুড়া সদর, বগুড়া

৯. পরাণ সরকার
জয়দেবপুর, গাজীপুর

১০. নিমাই চন্দ্র পাল
গোয়ালন্দ বাজার, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী

১১. স্বপন কুমার দাস
রাণীহাটি, কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১২. প্রীতম মন্ডল
ঢাকা

১৩. কৃষ্ণকীর্তন দাস ব্রহ্মচারী
ইসকন, দয়াগঞ্জ, ঢাকা

১৪. অসিত সরকার
মোকামতলা, বগুড়া সদর , বগুড়া

১৫. উত্তমানন্দ দাস
বেজপাড়া, যশোর

১৬. কিংকরবন্ধু ব্রহ্মচারী
জগদ্বন্ধু আশ্রম, ময়মনসিংহ স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উল্লিখিত কীর্তনীয়াগণকে এবং বিশেষক্ষেত্রে দোহারকে সংযুক্ত বিশটি প্রশ্ন করা হয়। গ নং প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৮৬ কীর্তনীয়া মিশ্রিত ঘরানা এবং অবশিষ্ট ১৪ ভাগের ১২ ভাগ গড়ানহাটী ও মনোহরশাহী'র মিশ্রিত আঙ্গিক। অপর ২ ভাগ বিশুদ্ধ গড়ানহাটী ঘরের কীর্তনের ক্ষেত্রে মত প্রদান করেন। ঝ নং প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সকলেই একই উত্তর প্রদান করেন। তাঁরা বর্তমানে কীর্তনের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিকূল অবস্থার কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি কীর্তনের স্বাভাবিক গতিতে বাধা সৃষ্টি করছে বলে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেন এবং বহু লোক কীর্তন শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় তাঁদের জীবন ও জীবিকা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এতে কীর্তনের যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং রসসুধা, তা থেকে শ্রোতারা বঞ্চিত হচ্ছে। ণ নং প্রশ্নের উত্তরে কীর্তনীয়ারা একই মত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে অক্টোবরের শেষ হতে এপ্রিল পর্যন্ত পদাবলি বা লীলা কীর্তন বেশি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ১৮ জন কীর্তনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে দোহারেরা মত প্রকাশ করেন। ধ নং প্রশ্নের উত্তরে কীর্তনীয়াগণ হতাশা ব্যক্ত করেন। তাঁদের ধারণা উপযুক্ত পরিবেশ, সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় শিক্ষা, উপযুক্ত

গুরুর অভাব এবং অনিশ্চিত জীবন-জীবিকা হওয়ায় তরুণ শিল্পীরা এই শিল্পমাধ্যমে আশানুরূপভাবে অংশগ্রহণ করছে না। তাঁরা সর্বান্তঃকরণে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও উপযুক্ত পরিবেশ কামনা করেন।

সংযুক্ত প্রশ্নোত্তরমালার উপরে ক্ষেত্র গবেষণাকৃত ফলাফলের সারণি নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

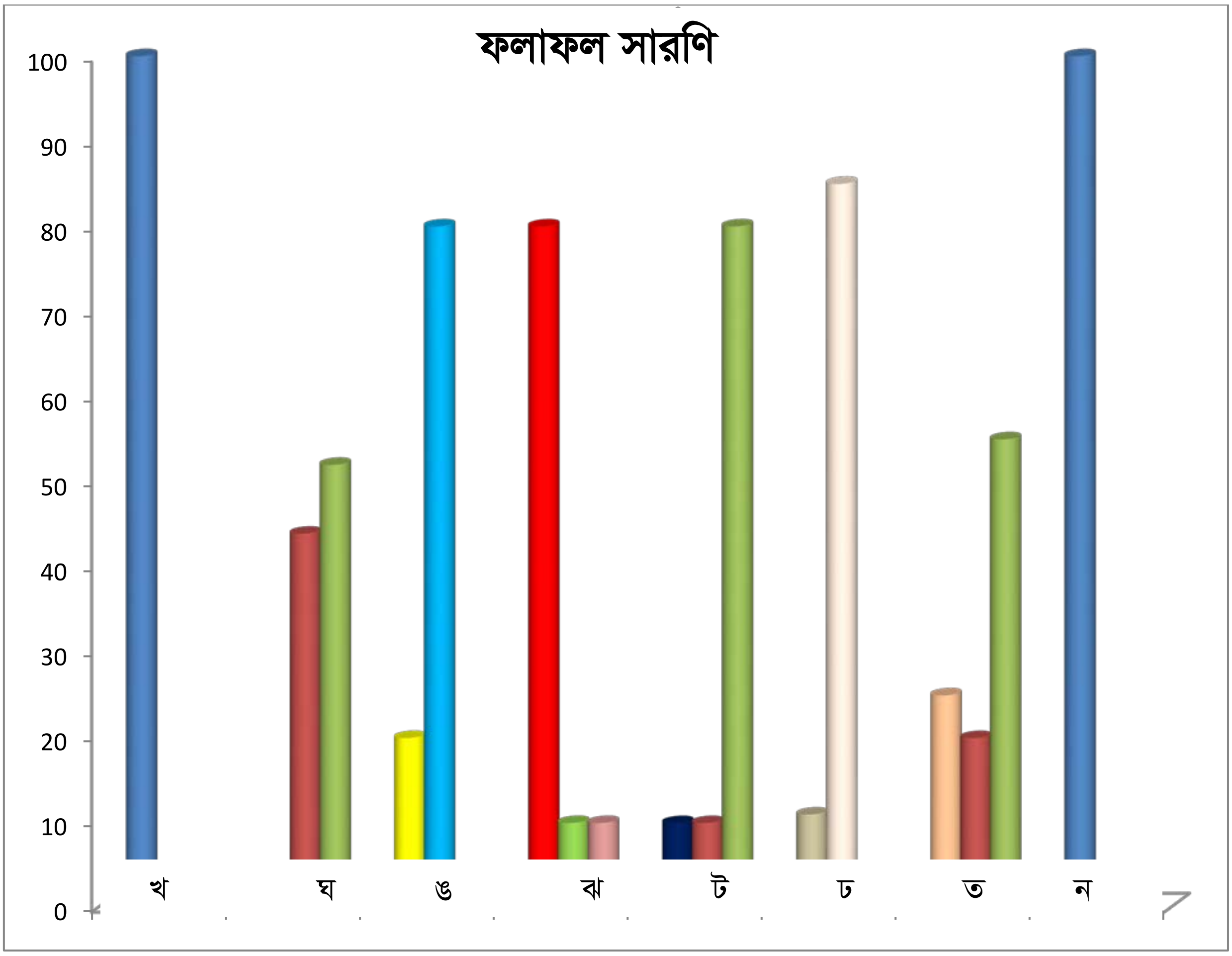

ক্ষেত্রগবেষণার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বিবরণী

- ১০০ ভাগ
- মন্তব্য নেই (৪% ও ১০%)
- ৪%, ১০% ও ২০%)
- হ্যাঁ (৫২%, ৮০% ও ৫৫%)
- ১নং (৮০%)
- ২ নং (২০%)
- ভালো ০%)
- মোটামুটি (১০%)
- ভালো (১০%)
- (১১%)
- অন্যান্য থেকে (৮৫%)
- বংশ (৪%)
- বিশেষ কাজ (২৫%

বি. দ্র : উপর্যুক্ত ফলাফল সারণিতে প্রতিটি বিষয়ে শতকরা হিসাব উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কেবলবাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেও বৈষ্ণবদর্শন ও পদাবলির অবস্থান উজ্জ্বল। মধ্যযুগে রচিত পদাবলি কাব্যধারায় বাংলা গীতিকবিতার প্রাথমিক লক্ষণ স্পষ্ট। কোনো কোনো সমালোচক বৈষ্ণব কবিতাকে তাই সীমিত অর্থে গীতিকবিতা বলে চিহ্নিত করেছেন। বাঙালির ভাব-সম্পদ 'পদাবলি কীর্তন' ভাবে ও প্রাচুর্যে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ভক্তি-আন্দোলনের অন্যতম উপায় হিসেবেও স্বীকৃত। একথা সত্য যে, যুগে যুগে পদাবলি সাহিত্যের বিষয়ভাবে এবং প্রকাশভঙ্গিমায় সাধিত হয়েছে সুস্পষ্ট পরিবর্তন। প্রাক-চৈতন্য যুগে রচিত পদাবলির সঙ্গে চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলির ব্যবধানও বিস্তর। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাংলায় যে ভক্তিবাদের বৈপ্লবিক আবহ তৈরি হয়, ইতিহাসের কালানুক্রমিক বিচারে তা বিস্ময়কর। ভক্তিতত্ত্বের শাস্ত্রীয় উৎসের ধারাবাহিকতা, ভক্তিবাদের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা, বৈষ্ণবমতের স্বরূপ প্রকাশ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনকে প্রতিষ্ঠা করা, চৈতন্য-দর্শনকে সাধন সংগীত হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলিতে 'মহাভাব' প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আত্মস্থ করা–এ সময়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। চৈতন্য ও তাঁর উত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পিত স্বরূপ। সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে পদাবলি কীর্তনকে 'অষ্টসাত্ত্বিক মহাভাব' প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়কেই নয়, যুগ যুগ ধরে তা সর্বস্তরের বাঙালি মানসকে করেছে আন্দোলিত।

চৈতন্যোত্তর যুগে ভক্তি-প্রেমের ভাবধারায় পল্লবিত বাংলায় সাধনার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও পদাবলি। তাত্ত্বিক ও কীর্তনীয়াগণের গায়কীতে এই ধারা আজও বহমান। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপে অবস্থানকালে 'কাজী উদ্ধার' পর্বে সশব্দে সংকীর্তন ব্যাপকতা লাভ করে। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ এবং নীলাচলের কর্মব্যাপ্তিতে 'কীর্তন' একটি অন্যতম অনুষঙ্গরূপে বিবেচিত হতে থাকে। পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সংকীর্তনে ব্যাপকতা এবং বিশেষ গায়কী পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। নরোত্তম ঠাকুরের বিখ্যাত খেতুরী উৎসবের মধ্য দিয়েই মূলত এই কীর্তন যৌক্তিক অর্থে বিভিন্ন ঘরানায় আসরে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। যুগের ধারাবাহিকতায় কীর্তনীয়াগণের চেষ্টায় এই গায়কী বাংলা গানের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নেয়। বস্তুত, এই ভাব-সম্পদ বাঙালির মননজাত এবং আনুষ্ঠানিক চর্চার মাধ্যমে তার অব্যাহত ঋদ্ধি।

চৈতন্য ও তাঁর উত্তরকালে বৈষ্ণবধর্ম, পদাবলি প্রভৃতি অনুষঙ্গের মূল আশ্রয়স্থল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, মধ্যযুগ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মানসে যে সর্বমানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় তা অনেকাংশে বৈষ্ণবদর্শনের প্রভাবজাত। সুফিবাদ, তান্ত্রিক মতবাদ ও অন্যান্য বিষয়ের একটি সমন্বয়ও এ-সময়ের অন্যতম লক্ষণীয় বিষয়।

বৈষ্ণবদর্শন ও পদাবলির শিল্পিত চর্চা বাঙালি সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি বাঙালির রাগমার্গের সাধনাকে অতি উচ্চস্তরে আসীন করেছে। সংগীত সাধনার মধ্য দিয়ে 'জীবাত্মা-পরমাত্মার' যৌথ মিলন প্রত্যাশা বাঙালির শুদ্ধ মননে 'অষ্টসাত্ত্বিক' ভাবের বিকাশ ঘটিয়েছে। বৈষ্ণবদর্শন ও পদাবলির চর্চা এবং এর গায়কী নিবেদন বাঙালির নিজস্ব ঘরানার। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বৈষ্ণবধর্মকে আনুষ্ঠানিক রূপদান করতে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীগণ ভক্তি তথা রাগমার্গের দর্শনকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করান। সুপরিকল্পিতভাবে এই দার্শনিক ধারায় বৈষ্ণবীয় সাধনার অনুষঙ্গ যেমন সুচারুরূপে উপস্থাপিত হয়েছে তেমনি এই ধারার সাথে ভারতীয় দর্শনের একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য তথা দর্শন বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদের প্রাণধর্মের স্বরূপ স্বতন্ত্র এবং এই ধারায় সংযোজিত হয়েছে ভারতীয় ভক্তিবাদের উত্থান ও বিকাশের পটভূমি। ঐহিক সম্মিলনের বড় দুটি মাধ্যম জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ –বড় দুটি বিভাগও বটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূলভিত্তি হলো – মানসিক এই দুটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সাধ্যসাধনার পথকে উপলক্ষ্য করে রসমার্গের স্বরূপ উন্মোচনের একান্ত প্রয়াস। রাধাকৃষ্ণের যুগলতত্ত্ব চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বেই বাঙালি মননকে আন্দোলিত করেছিল, কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে এর দার্শনিক প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলো। দার্শনিক তাৎপর্য এমন একটি বিশেষ ধারায় পর্যবসিত হলো যে দ্বৈতবাদী দর্শন, ঈশ্বরবাদী দর্শন-প্রস্থান অর্থাৎ, ভেদ-অভেদ এক হয়ে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' তত্ত্বে পরিণত হলো ; এমনকি তাদের সাধন-ভজনের ধারাও নির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত হলো। ভক্তিধর্মের আবহ সাহিত্যকে অবলম্বন করে গোটা জাতিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল প্রায় চারশতক।

চৈতন্যদেব প্রচারিত ভক্তিধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–গোপীপ্রেম বা রাধাভাবের ভজন। চৈতন্য-পূর্ববর্তী মাধবেন্দ্রপুরী থেকে এই ভক্তিরসের ধারা উৎসারিত হলেও যথার্থ পূর্ণতা দেন চৈতন্যদেব। ভক্তির প্রাবল্যেই সেই সময়ে মানুষ ভক্তিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। প্রেম-ভক্তির অনন্যপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন এবং ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসেই চৈতন্যবদান্যতায় 'কীর্তন' সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর ভাষ্য-অনুযায়ী কীর্তনের আঙ্গিক সৌষ্ঠব বিকশিত হয়। এই কীর্তনই হয়ে ওঠে ভক্তিবাদের প্রধান অবলম্বন। সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর রসের ভজনের ধারার মধ্যেই নাম-নামী অভেদ হয়ে দেখা দেয়। ঈশ্বর–সখা, প্রভু, সন্তান ও মধুর প্রেমময় হিসেবে ভক্তজন-মনে আসীন হলেন। এই প্রাপ্তির স্বরূপ আনন্দ ও চিন্ময়। লৌকিক অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে 'রতি' বলা হয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাই হলো 'মধুর' রতি। এই রতির বৈশিষ্ট্য – নায়ক-নায়িকাগত প্রেমভাব সমুচিত বিভাব-অনুভাব ও ব্যভিচারীর যোগে মধুর রসে পরিণাম লাভ করে। এই রসই সর্বোত্তম। তাই বৈষ্ণবীয় আদর্শ হলো–কান্তাপ্রেমই সর্বসাধ্যসার। বৈষ্ণব

Dhaka University Institutional Repository

কবিগণও এই সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করে অপূর্ব মধুররসসহ অন্যান্য রসের পদাবলি সৃজন করলেন। এই সৃষ্টি রসোত্তীর্ণ হয়ে লোকোত্তীর্ণ হলো; যুগোত্তীর্ণ হয়ে অলৌকিকরূপে ধরা দিল বুভুক্ষু অন্তরে। এই নান্দনিক সৃষ্টি-ভাণ্ডারই পরবর্তীকালে বিচিত্র রাগ-রাগিণীতে পরিবেশিত হতে লাগলো পদাবলি কীর্তনরূপে। চৈতন্য-উত্তর যুগে এই কীর্তন বাঙালির নিজস্ব বা একান্ত সাংস্কৃতিক সম্পদ হয়ে উঠলো, আর তাতে প্রতিষ্ঠিত হলো গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্ব।

বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর নেতৃত্বে যে গৌড়মণ্ডল পরিচালিত হয়েছিল তার মধ্যে বিশেষ স্থানে আসীন ছিল উপযুক্ত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, সাধনার রূপ নির্ণয় এবং বৈষ্ণবদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসরূপ কীর্তনের ব্যবস্থা। চৈতন্য-তিরোভাবের বেশ পরে তিন জন উজ্জ্বল সাধক, যথাক্রমে শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম দাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় (বিশেষভাবে নরোত্তম দাস) রাজশাহীর খেতুরীতে এক ধর্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই মহোৎসবেই নরোত্তম দাস কর্তৃক কীর্তনের বিশুদ্ধ ধারার প্রচলন হয়। গড়ানহাটী, মনোহরশাহী, রেনেটী প্রভৃতি ঘরের কীর্তন-আঙ্গিক বৈষ্ণব পদাবলির যে বিশুদ্ধভাব তা রক্ষা করে,এবং তা ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের বিচিত্র ধারায় গাওয়া শুরু হয়। বাংলার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারায় কীর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম; যা এখনও বাংলাদেশের কীর্তনীয়া সম্প্রদায় গুরুপরম্পরায় সেই ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। যদিও যুগের পরিবর্তন, অতি আধুনিকায়ন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে মধ্যযুগ থেকে বয়ে আসা এই ভাগবতীয় রসকীর্তির ধারা এখন অনেকটা ম্রিয়মান, তবুও কীর্তনীয়া-ভক্তদের ঐকান্তিকতায় কীর্তনাঙ্গীয় সাংগীতিক বিষয়টি এখনও চলমান রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়ভাব ও তার শিল্প-আঙ্গিককে পদাবলি কীর্তনীয়া নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ-শিল্প-আঙ্গিকে পরিবেশন করছেন; বলছেন স্রষ্টা-সৃষ্টির অপূর্ব মধুরতম মিলনের কথা। এই মিলনাকাঙ্ক্ষা বিপুল মানুষের জীবন দর্পণে অমিয় রসসুধার অন্তরঙ্গ সম্মিলন ঘটায়; যার স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় – 'সর্বজীবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান' অথবা 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। এই সর্বমানবতাবাদী দর্শন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও কৌলীন্যের গণ্ডি ছাপিয়ে সর্বজনচিত্তে সঞ্চারিত করে চলেছে বিশুদ্ধ আনন্দরস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অক্ষয় কুমার দত্ত : *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়*, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭

অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯২

অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : *চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০২২

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত (সম্পাদিত) : *শ্রীমদ্ভাগবতগীতা যথাযথ*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, মায়াপুর, কলকাতা-২০১০

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*,মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেটলিমিটেড, কলকাতা-১৯৯৯

আহমদ শরীফ : *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*(২য় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩

উমা রায় : *গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০

এস. সি. মুখার্জি :*এ স্টাডি অফ বৈষ্ণব বিজম ইন এনশিয়েন্ট অ্যাণ্ড মিডিয়াভাল বেঙ্গল*, কলিকাতা, ১৯৬৬

কবি কর্ণপুর, ত্রিদণ্ডী গোস্বামী ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ(সম্পাদিত) : *চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্*, শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্করণ, মায়াপুর, নদীয়া, ১৯৭৪

কাঞ্চন বসু (সম্পাদিত) : *বৈষ্ণব পদাবলী*, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৯৭

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : *মধ্যযুগে বাঙ্গালা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

কোকা আন্তোনভা, গ্রিগেরি : *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৬

বোনগার্দ-লেভিন, গ্রিগেরি কতোভ্স্কি

কৃষ্ণমাচার্য এম্বার(সম্পাদিত) : *জয়াখ্য সংহিতা*, বরোদা, ১৯৮১

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত) : *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা-৯, ১৯৭৯

কৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবা, অনন্তদাস (সম্পাদিত) :*শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃত গুটিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদনট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ

ক্ষুদিরাম দাস : *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯

গীতা প্রেস প্রকাশিত : *উপনিষদ*, গোরক্ষপুর, ২০০৮

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, গোরক্ষপুর, ২০১৯

গোপাল হালদার : *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা* - ১ম খণ্ড, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬

জগদ্বন্ধু ভদ্র (সম্পাদিত) : *শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩১০ বঙ্গাব্দ

জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) :*চৈতন্য-প্রসঙ্গ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

জগদীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদিত) : *শ্রীগীতা*, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৯৬

জনৈক কীটাধম (সম্পাদিত) : *ভজন-পূজন-মালা*, মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, কলিকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

জয়ানন্দ, বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : *চৈতন্যমঙ্গল*,কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১

জীব গোস্বামী, শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন (অনূদিত) : *পরমাত্ম সন্দর্ভঃ* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

জীব গোস্বামী, শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : *তত্ত্বসন্দর্ভ*, সদেশ, কলকাতা, ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

দীনেশচন্দ্র সেন : *বৃহৎবঙ্গ* (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩

নরহরি চক্রবর্তী : *গীতচন্দ্রোদয়*, গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬০

নরহরি চক্রবর্তী, নন্দলাল বিদ্যাসাগর (সম্পাদিত) : *ভক্তিরত্নাকর*, গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬০

নরহরি চক্রবর্তী, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (সম্পাদিত) : *নরোত্তমবিলাস*, রাধারমণ প্রেস, বহরমপুর, ১৯২১

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *ধর্ম ও সংস্কৃতি*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৮

নরেশচন্দ্র জানা : *বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ১৯৭০

নরোত্তম দাস ঠাকুর, অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ(সম্পাদিত) :*প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা*, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১৬

নিত্যানন্দ দাস : *প্রেমবিলাস*, হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা সংস্করণ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

নীলরতন সেন : *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় : নবপর্যায়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা - ২০০৭

প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী, অনন্তদাস বাবাজীমহারাজ (অনূদিত) : *শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধিঃ*,শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাসদন ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

প্রদীপ কুমার ঘোষ : *সংগীত শাস্ত্র সমীক্ষা (২য় পর্ব)*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৫

প্রভু জগদ্বন্ধু : *শ্রীশ্রীহরিকথা*, মহাউদ্ধারণ মঠ, কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

প্রমথনাথ তর্কভূষণ : *বাংলার বৈষ্ণবধর্ম*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : *বঙ্কিম রচনাবলী(২য় খণ্ড)*, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪

বঙ্কুবিহারী সাহা (সম্পাদিত) : *শ্রীশ্রীপদামৃত-তরঙ্গিণী*, (?) কলিকাতা। ১ম সংস্করণ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

বঙ্কুবিহারী সাহা : *গীতরত্নাবলী*, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা (?)

বল্লাল সেন, ভবতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) :*দানসাগর*, কলিকাতা, ১৯৫৫

বিজয় গুপ্ত, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : *মনসামঙ্গল*, বাণী নিকেতন, কলিকাতা, (?)

Dhaka University Institutional Repository

বিমানবিহারী মজুমদার (সম্পাদিত) : *জ্ঞানদাস ও তাহার পদাবলী*, শতাব্দী গ্রন্থভবন, কলকাতা,

বিমানবিহারী মজুমদার : *পাঁচশত বৎসরের পদাবলী*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, ভৃগুনাথ মিশ্র (সম্পাদিত) :*শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্*, জীব, বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য : *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়; ভক্তিরস ও অলঙ্কার শাস্ত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, *১৪০০ বঙ্গাব্দ*

বিষ্ণুপুরী, এ. বি (সম্পাদিত) : *বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী*, এলাহাবাদ, ১৯১৮

বুদ্ধদেব বসু (অনূদিত) : *কালিদাসের মেঘদূত*, হোসেন বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৮

বৃন্দাবন দাস, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত) : *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা-৯, ১৩৬৯বঙ্গাব্দ

ভরত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) :*নাট্যশাস্ত্র (১ম খণ্ড)*, , নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৯৭

ভক্তিবিলাসতীর্থ গোস্বামী : *গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক*, শ্রীচৈতন্যমঠ, নদীয়া, ১৯৯৪

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : *বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭

মতঙ্গ, কে সাম্ব শিবশাস্ত্রী (সম্পাদিত) : *বৃহদ্দেশী*, ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণ, ১৯২৮

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী : *উদ্ভব-সন্দেশ*, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মহানাম অঙ্গন, কলকাতা, ২০০৯

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী (সম্পাদিত) : *শ্রীমদ্ভাগবত*, শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, মহানামঅঙ্গন, কলিকাতা-৫৯, ১৪০০ সাল

মুহম্মদ আবদুল হাই ও ড. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) : *মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮

মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী : *বাংলার কীর্তন গান*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত) :*রবীন্দ্র-রচনাবলি*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৬

রমাকান্ত চক্রবর্তী : *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৫

রমেশচন্দ্র দত্ত (অনুদিত) : *ঋগ্বেদ-সংহিতা* ২য় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫

রাজ্যেশ্বর মিত্র (সম্পাদিত) : *রাগতরঙ্গিণী*, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীহরিদাস দাস (সম্পাদিত) : *সাধনদীপিকা*, হরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ, ১৯৪৬

রাধাগোবিন্দ নাথ : *গৌড়ীয়বৈষ্ণব দর্শন*-১ম-৯ম খণ্ড (সংস্কৃত বুক ডিপো সংস্করণ- ১, ২, ৩), কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

রূপ গোস্বামী, রামদেব মিশ্র (সম্পাদিত) : *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*, হরিভক্তি প্রদায়িনী সংস্করণ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ

রূপ গোস্বামী, ভক্তিবিলাস তীর্থ (সম্পাদিত) : *লঘুভাগবতামৃত*, শ্রীচৈতন্য মঠ সংস্করণ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,১৯৩৩

রূপ গোস্বামী, হরিদাস দাস (সম্পাদিত) : *শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০১৭

লোচন দাস, ভগবানদাস (সম্পাদিত) : *চৈতন্যমঙ্গল*, আনন্দগোপাল শাস্ত্রী সংস্করণ, নবদ্বীপ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে*, এ মুখার্জি এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

সতীশচন্দ্র রায় (সম্পাদিত) : *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ

সুকুমার সেন : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্সপ্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-২০০৪

সুনীতি ভূষণ কানুন গো : *বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলন*, সিগনেট লাইব্রেরি, ১৮ আন্দরকিল্লা,চট্টগ্রাম, ১৯৮৭

সুখময় মুখ্যোপাধ্যায় : *প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়*, (?) কলকাতা, ১৯৭৩

সুখময় মুখোপাধ্যায় : *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*, জি ভট্টাচার্য এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৭৪

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় : *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা*, সোনারতরী, কলিকাতা-৫৭, ১৯৯৭

সুবীরা জায়সবাল, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায় (অনুদিত) : *বৈষ্ণবধর্মেরউৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৩

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) : *পদামৃত লহরী*, জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস* (১ম ভাগ), শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা - ৬, ১৯৭০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : *ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস* (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ), শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কলিকাতা, ১৯৯১, ২০২১

হরেকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায় : : *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১১

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : *পদাবলী পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৯০

হরেকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : *বৈষ্ণব পদাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৫

হরেকৃষ্ণ মুখ্যোপাধ্যায় : *শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ ও বৈষ্ণব তত্ত্ব*, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৪

হরিদাস দাস (সম্পাদিত) : *শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান*, নবদ্বীপ, ১৯৫৭

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : *উপনিষদের দর্শন*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪

হীতেশরঞ্জন সান্যাল : *বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস*, কেপি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৯

প্রবন্ধ

অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী : 'চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে নাট্য-উপাদান', সাহিত্য পত্রিকা, সংখ্যাঃ ৩, বর্ষঃ ৫৫, জুন ২০১৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Abhaya Kumar Guha : *The Rasa Cult in the Chaitanya-ChaiCharitammrita,* SirAsutosh Mookerjee Silver jubilee volume-III Calcutta University. (?)

A. B Keith : *A History ofSanskrit Literature,* Oxford, 1928

A Govindacharya : The Translation of the term Bhagavan', *Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ierland,* 1911

B. C pal (Bipinchndra pal) :*Bengal Vaishnavism,* Calcutta, 1933

D.C. Sircar : *Select Inscriptions bearing of Indian History and Civilization,* Vol-1, Calcutta, 1942

D. D. Kosambi, V. V. Gokhalw (Ed) : *Subhasitaratnakosa of Vidyakare,* Cambridge, Massachusetts. 1975

Edward C. Dimcok, Jr. : *The Place of Hidden Moom.* The University of Chicago Press,1966

Dhaka University Institutional Repository

J. N Farquhar : *An outline of Religions Literature of India*, Delhi, 1967

Max Weber : *The Religion of India, The Sociology of Hinduism and Buddhism*, The free press of Glencoe, 1962

Melvil T. Kanedy : *The Chaitanya Movement: A study of Vaishnavism in Bengal*, Calcutta, 1925

M. Winternitz : *A History of Indian Literature*, Voll-1, New Delhi, 1971

M. R. Tarafdar : *Hussain Shahi Bengal :A Socio-Political Study*, Asiatic Society of Pakistan. 1965.

Mahindramohon Basu : *Post Chaitanya Sahajia Cult*, Calcatta (?)

Muhammad Enamul Haq : *A history of Sufism In Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dacca, 1975

Patanjali, Keilhorn (Ed.) : *Vyakarara Mahabhasyas*, Vol-1, Bombay, 1978

Ralph L. Beals and Harry Hoijer company, : *An Introduction of Anthropology*, The Macmillan New York, 3rd Ed.1965

Richard Lanoy *Society*, : *The Speaking Tree : A Study of India Culture and* Bombay, 1971,

R. Shama Sastri (Ed.) : *Baudhayana Grhya Sutra*, Mysore, India, 1920

R. S. Sarma : *Materia-Milieu of Tantricism, Indian Society : HistoricalProbings : Essay's in Honour of D. D. Kosambi*, R. S. Sarma(ed). New Delhi, people's publishing House, 1974

Sir Jadunath Sarkar (Ed.) : *History of Bengal (Vol-11)*

Sir Jadunath Sarker : *India Through Ages, (?)*, 1951

Sri Aurobindo : *The Foyndations of Indian Culture -J,*Birth Centenary Library, (?) Vol-14

Surendranath Dasgupta : *A History of Indian Philosophy*, IV (Cambridge) Cambridge University press, 1961

Surandranath Dasgupta : *The Cultural Heritage of India*, Voll-111, (?), 1953

Sushilkumar Dey : *Sanskrit Poectics as a study of aesthetic enjoyment*, Calcutta, 1976

Sushil Kumar Dey : *Vaishnava Faith and Movement in Bengal*, Calcutta, 1961

W. W. Hunter : A Statistical Account of Bengal, *Journal of the Asiatic Society of Bangal*, Calcutta, Vol-1, 1970

ED Yong, 3500-year-old German Flutes display excellent Kraftwerk, 2 June 24, 2009. www.nationalgeigraphic.com.(Online source)